আলেক্সি তলস্তয়

অগ্নিপরীক্ষা

তিন খণ্ডে সমাপ্ত

প্রথম খণ্ড

দুই বোন

ন্যাশনাল বুক এজেন্সি লিঃ
কলিকাতা ১২

প্রথম সংস্করণঃ **ডিসেম্বর ১৯৫৪ ॥**

আলেক্সি তল্‌স্তয়ের **অর্ডিয়েল** উপন্যাসের প্রথম খণ্ড **দি সিস্টারস্**
মূল রুশ ভাষা থেকে ইংরেজি অনুবাদঃ **আইভি লিংভিনোভা ও তাতিয়ানা লিংভিনোভা ॥**

ইংরেজি সংস্করণের প্রকাশকঃ ফরেন ল্যাঙ্গোয়েজেস্
পাবলিশিং হাউস, মস্কো ॥

প্রথম খণ্ডের বাংলা অনুবাদঃ **দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ॥**

প্রচ্ছদপটঃ **খালেদ চৌধুরী ॥**

প্রকাশকঃ **সুরেন দত্ত**
ন্যাশনাল বুক এজেন্সি লিঃ
১২ বঙ্কিম চাটার্জি স্ট্রীট
কলিকাতা ১২ ॥

মুদ্রকঃ **রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য**
মেট্রোপলিটান প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং হাউস লিঃ
১৪৯ সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি রোড,
কলিকাতা ১৩ ॥

পাঁচ টাকা ॥

প্রথম খণ্ড

দুই বোন

রচনা সমাপ্তি কাল
আগস্ট, ১৯২১

আলেক্সি তলস্তয়

অগ্নিপরীক্ষা

(তিন খণ্ডে সমাপ্ত)

স্তালিন পুরস্কার

১৯৪৩

সংক্ষিপ্ত আত্মজীবনী

প্রথম জীবনে সামারা থেকে প্রায় ষাট মাইল দূরে স্তেপ অঞ্চলে এক খামার বাড়িতে আমি মানুষ। আমার পিতা নিকলাই আলেক্সিয়েভিচ তলস্তয় সামারার একজন ভূম্যধিকারী ছিলেন। আমার মা আলেকজান্দ্রা লিওনতিয়েভনা, ওরফে তুর্গেনেভা (তিনি ছিলেন নিকলাই ইভানোভিচ তুর্গেনেভ-এর নাতনী *) আমার জন্মের পূর্বেই আমার পিতাকে ত্যাগ করেছিলেন। তাঁর দ্বিতীয় পতি, আমার বিপিতা, আলেক্সি আপোলোনোভিচ বোস্ত্রম সে সময় নিকলায়েভস্ক্ (এখন পুগাচেভস্ক্) শহর থেকে জেমস্তভোর সদস্যপদ লাভ করেছিলেন।

আমার পিতাকে ত্যাগ করার সময় আমার মা তাঁর তিনটি শিশুকে রেখে যান—দুই পুত্র আলেকজান্দার ও মস্তিস্লাভ, এবং এক কন্যা এলিজাবেতা। গৃহত্যাগ করে মা স্বেচ্ছায় এক কষ্টের জীবন গ্রহণ করলেন, কারণ সে পথে যাওয়া মানেই পরিবারের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করা এবং অভিজাত সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া। স্বামীত্যাগ করা মহা অপরাধ, কলংক, সমাজের দৃষ্টিতে তিনি আর সতী রইলেন না, কুলটার পর্যায়ে নেমে গেলেন। তাঁর পিতা লিওন্তি বোরিসোভিচ তুর্গেনেভ, তাঁর মা একাতেরিনা আলেকজান্দ্রোভ্না এবং অন্যান্য সকলেই তাঁকে এই দৃষ্টিতে দেখতেন।

খালি এ. এ. বোস্ত্রমের প্রতি অত্যধিক আসক্তি বশতই যে তিনি এরূপ একটা কঠিন পথ অবলম্বন করেছিলেন এমন নয়, আমার মা ছিলেন সেকালের একজন বিদুষী মহিলা ও লেখিকা। ('অশান্ত হৃদয়' ও 'দূর কোণ' উপন্যাস দুখানির রচয়িত্রী তিনি, পরে শিশুদের জন্য তিনি গ্রন্থমালা রচনা করেন, তন্মধ্যে 'আমার বন্ধু' বইখানি সর্বাধিক জনপ্রিয়।) নির্বাসিত মার্কসবাদীদের আগমনের পূর্ব পর্যন্ত উনিশ শতকের নবম দশকে সামারা সমাজের চিত্র অতীব ঘৃণাজনক ও হতাশাব্যঞ্জক। ময়দার কলের ধনী মালিকগোষ্ঠী ও বণিক সম্প্রদায় ভদ্রসমাজের জায়গীর কিনে নেয়। স্তেপের ভূম্যধিকারিগণ ক্রমশ ধ্বংসের পথে এগিয়ে যাচ্ছিল আর আলস্য ও গতানুগতিকতার মধ্যে দিনাতিপাত করছিল, অপরদিকে ছিল কদর্য রুচিসম্পন্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণী যাদের ক্লেদাক্ত জীবনের চিত্র এঁকেছেন গর্কি।

* নিকলাই ইভানোভিচ তুর্গেনেভ (১৭৮৯-১৮৭১)—পুঁজিদার ও সমাজসেবক। ভূমিদাসপ্রথার বিরোধিতা করেন। ১৮২৫ সালের ১৪ই ডিসেম্বর জারবিরোধী অভ্যুত্থানে যোগদানের জন্য তাঁর প্রতি প্রাণদণ্ডাদেশ হয়। বিদেশে তিনি না থাকায় দণ্ডাদেশ কার্যে পরিণত করা সম্ভব হয় না।

ধূলোকীর্ণ, ভীষণ, দূষিত এই শহর এবং তার চতুষ্পার্শ্বস্থ উপকণ্ঠ তখন মাতলামি ও অসচ্চরিত্রতায় নিমজ্জিত ছিল। তরুণ, সুন্দর, উদারনৈতিক, পঠনশীল, আত্মিক ভাবাপন্ন, ক্ষুদ্র ভূস্বামী আলেক্সি আপোলোনোভিচ বোল্কম এসে যখন এই রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হলেন তখন আমার মায়ের সামনে জীবন-মরণ সমস্যা উপস্থিত : তিনি কি এই কলুষিত পংকিল-ভূমিতে নিজেকে ক্ষয় হতে দেবেন, না একটা উন্নত আত্মিক, নিষ্কলুষ জীবনের পথ অবলম্বন করবেন ? শেষ পর্যন্ত তিনি তাঁর নতুন পতির কাছেই চলে গেলেন এবং নিকলায়েভস্ক্ এ গিয়ে নতুন জীবন আরম্ভ করলেন। সেখানেই আমার মা দুটি বড় গল্প লেখেন যা দূর কোণ নামে প্রকাশিত হয়।

উদারনৈতিক ও "সপ্তক দশক দলের উত্তরাধিকারী"* ("সপ্তক দশক" শব্দ দুটি লোকে খুব শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারণ করত, এর সঙ্গে পবিত্র ও উচ্চ ভাব জড়িত ছিল, আলেক্সি আপোলোনোভিচ নিকলায়েভস্কের স্তেপ ভূম্যধিকারীদের সঙ্গে পেরে উঠলেন না, জেমস্তভোতে পুনর্নির্বাচিত হতে না পেরে তিনি মা ও আমাকে নিয়ে আবার সস্নোভ্কার খামার বাড়িতে ফিরে গেলেন। আমি তখন দু বছরের শিশু।

সেখানেই আমার শৈশব কাটে। একটা ফলের বাগান পুকুরের ধারে খাগড়া বন ও চারপাশে উইলো গাছের সারি স্তেপের নদী চাগ্রা। গ্রাম্য ছেলেরাই ছিল আমার একমাত্র সাথী। চড়বার ঘোড়াগুলি। পত্রযুক্ত ঘাসে আবৃত সেই স্তেপ অঞ্চল, একঘেয়ে দিকচক্রবালরেখা ভঙ্গ করেছে একমাত্র সমাধির উপরিস্থিত মৃত্তিকার স্তূপ। ঋতু পরিবর্তনকে মনে হত বড় রকমের ঘটনা এবং প্রত্যেক বারই তা অভিনব ঠেকত। এসমস্ত আমার কল্পনা শক্তিকে বাড়িয়ে দিতে সাহায্য করেছিল এবং সবচেয়ে বেশি সাহায্যে এসেছিল আমার সেই নির্জনবাস।

শীতকালে ফলের বাগান ও গৃহের ওপর স্তূপীকৃত তুষারপাত হত রাত্রিবেলা নেকড়ে বাঘের ডাক শোনা যেত। চিম্নির ভেতর বাতাস ঢুকে যখন আর্তনাদ করে উঠত, খাবার ঘরে তখন গোলটেবিলটার ওপর ঝুলোনো বাতিটা জেলে দেওয়া হত। আস্তর করা ঘরটা সাধারণভাবে সাজান ছিল। আমার বিপিতা খুব গলা ছেড়ে পাঠ করতেন—নেক্রাসভ, লিও তলস্তয় অথবা তুর্গেনেভ-এর ** বই ই তিনি সাধারণত পড়তেন এবং ইউরোপীয়ান হেরাল্ড-এর চলতি সংখ্যাও সময় সময় দেখতেন।

আমার মা বসে বসে শুনতেন আর মোজা বুনতেন। আমি একটা গল্পের বই এ ছবি আঁকতাম আর না হলে ছবিগুলিতে রং লাগাতাম। সেই পুরনো কাঠের বাড়িতে সন্ধ্যাগুলি বেশ শান্তিতেই কাটত, শান্তিভঙ্গ হবার মত কিছুই ছিল না। ঘুঁটে অথবা খড়ের আগুনে

---

* 'সপ্তক দশকের' লোকেরা ছিলেন ঊনবিংশ শতাব্দীর সপ্তম দশকের প্রগতিশীল বিপ্লবী-গণতান্ত্রিক লেখকবর্গ। তাঁরা ১৮৬১ সালের ১৯শে ফেব্রুয়ারীর ভূমি সংস্কারের সমালোচনা করেছিলেন এবং বৈপ্লবিক স্লোগান দিয়েছিলেন। সেই আন্দোলনে ছিলেন এন. জি. চের্নিশেভস্কি, এন. এ. দোব্রোলিউবভ, এ আই, হেজেন, এন, পি. ওগারেভ প্রভৃতির মত লোক।

** তুর্গেনেভ—লেখক ইভান সার্গেইভিচ তুর্গেনেভ (১৮১৮—১৮৮৩)।

উত্তপ্ত সাদা চুনকামকরা চুল্লীটার আঁচে ঘরটা গরম হত। একটা অন্ধকার ঘর থেকে আর একটা ঘরে কাউকে যেতে হলে মোমবাতি জ্বালিয়ে যেতে হত।

শিশুপাঠ্য কোন বই আমি পড়েছি বলে মনে পড়ে না, সম্ভবত সেরকম কোন বই-ই আমার ছিল না। তুর্গেনেভের লেখা আমার খুব ভাল লাগত। সাত বছর বয়েস থেকেই আমি তুর্গেনেভের বই শুনতে অভ্যস্ত ছিলাম। শীতের সন্ধ্যায় যখন তাঁর গ্রন্থাবলী জোরে জোরে পড়া হ'ত আমি তখন বসে তা শুনতাম। তাঁকে বাদ দিলে প্রিয় লেখকদের মধ্যে পছন্দ অনুযায়ী ধরলে এরূপ দাঁড়ায়ঃ লিও তলস্তয়, নেক্রাসভ ও পুশকিন। (আমাদের পরিবারে দস্তয়েভস্কি খানিকটা ভীতির সঞ্চার করতেন—তিনি 'নিষ্ঠুর' লেখক বলে গণ্য হতেন।)

আমার বি-পিতা ছিলেন একজন ঘোর নাস্তিক ও বস্তুবাদী। বাকল্, স্পেন্সার, কান্ট তাঁর পড়া ছিল। কোন ভাবাদর্শগত প্রশ্নে তর্ক করতে তিনি সব চাইতে বেশি ভালবাসতেন। অবশ্য সেজন্য দেয়ালে আরশুলো গিজগিজ করছে, মেঝেটা স্যাঁতসেঁতে, ছাদ ভেঙে পড়ছে এমন বাড়িতে শ্রমিকদের রাখতে বা তাদের পচা মাংস খাওয়াতে তাঁর আটকাত না।

তারপর মার্ক্সবাদীরা যখন নির্বাসনে আসতে লাগলেন, আমার বি-পিতার সঙ্গে তাঁদের জানাশুনো হল। তাঁদের সঙ্গে তাঁর অনেক গরম আলোচনা হত তবে 'ক্যাপিটাল' তিনি কখনো আয়ত্ত করেননি, কান্ট ও ইংরেজ অর্থনীতিবিদদের গ্রন্থাবলী পড়েই তিনি সন্তুষ্ট থাকতেন।

আমার মাও নাস্তিক ছিলেন, তবে আমার ধারণা নীতিগত ভাবেই তিনি নাস্তিকতা স্বীকার করতেন, মনেপ্রাণে ততখানি নাস্তিক ছিলেন না। তাঁর মৃত্যুভয় ছিল। তিনি ছিলেন কল্পনাপ্রিয়, সর্বদাই লিখতেন। আমার বি-পিতা তাঁর 'মতবাদ' জোর করেই আমার মায়ের ওপর চাপিয়ে দিয়েছিলেন, তার ফলে আমার মায়ের নাটকগুলিতে যেসমস্ত শিক্ষক, গ্রাম্য ধাত্রী ও জেমস্তভো কর্মীর চরিত্র আছে তাদের মুখ দিয়ে সামাজিক তাৎপর্যপূর্ণ বহু কথা স্বগতোক্তির আকারে উচ্ছ্বসিত ভাবে বলানো হয়েছে। অবশ্য সে সমস্ত নাটকের কোনটিই রঙ্গমঞ্চ পর্যন্ত পৌঁছায়নি।

দশ বছর বয়েস থেকেই আমি প্রচুর বই পড়তে থাকি, তখনো আমার পড়াশুনো ছিল ক্ল্যাসিক বই-এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু তিন বছর পরে আমার মা-বাপ যখন অনায়াসে আমাকে সাইজ্রান "মডার্ন" উচ্চ বিদ্যালয়ে ভর্তি করিয়ে দিতে পারলেন (প্রবেশিকা পরীক্ষায় সমস্ত বিষয়ে আমি নিম্নতম নম্বর পেয়েছিলাম) তখন সেখানে মিউনিসিপ্যাল লাইব্রেরিতে আমি জুলে ভার্ন, ফেনিমোর কুপার ও মেন রীডের গ্রন্থাবলীর সন্ধান পেলাম। আমার মা ও বি-পিতা নাক সিঁটকিয়ে বলতেন ওগুলো "বাজে" বই। বইগুলি আমি কিন্তু পেয়েই গোগ্রাসে গিলে ফেলেছিলাম।

সাইজ্রান উচ্চ বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত আমি বাড়িতেই পড়াশুনো করতাম। আমার বি-পিতা সামারা থেকে একজন শিক্ষক আনিয়েছিলেন, তাঁর নাম ছিল আর্কাদি ইভানোভিচ স্লোভুকোতক। তিনি ছিলেন ধর্ম বিদ্যালয়ের ছাত্র। তাঁর মুখে বসন্তের দাগ ছিল, চুল ছিল একেবারে লাল, বেশ মানুষ ছিলেন তিনি, তাঁর সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছিল, খুব বেশি কিছু তাঁর কাছ থেকে শিখিওনি বা পড়া নিয়ে নিজেকে অত্যধিক

ভারাক্রান্তও করিনি। স্লোভুকোতকের পরে আমাকে পড়াতে আসেন একজন নির্বাসিত মার্ক্সবাদী। একটা শীত তিনি আমাদের সংগে কাটান। নিতান্ত অনিচ্ছায় তিনি আমাকে বীজগণিত শেখাতেন, জানালার কাচের পরকলার মধ্যে যে লোহার ভেন্টিলেটারটা ঘুরত তার দিকে নিরাশভাবে চেয়ে থাকতেন, আমার বি-পিতার সংগে পারতপক্ষে মতবাদ নিয়ে তর্ক করতেন না। বসন্তকালে তিনি চলে গেলেন।...

শীতকাল—আমার বয়েস তখন বছর দশ হবে—মা আমাকে একটা গল্প লিখতে বললেন। মার খুবই ইচ্ছে ছিল আমি লেখক হই। স্তেপকা নামক একটা বালকের দুরন্তপনা নিয়ে একটা গল্প লেখার জন্য বহু সন্ধ্যা আমি কাটালাম, কিন্তু সেই গল্পের কিছুই আজ আমার মনে নেই, একমাত্র মনে পড়ছে এ ক'টি কথা, চন্দ্রকিরণে তুষার হীরের মত জবলজবল করছে। হীরে আমি তখনো পর্যন্ত দেখিনি, কিন্তু এই শব্দ ক'টি আমার খুব ভালো লেগেছিল। স্তেপকার গল্প নিশ্চয়ই উতরায়নি, কেননা তারপর মা কখনো আর আমাকে দিয়ে জোর করে লেখাবার চেষ্টা করেননি।

তের বছর বয়েস পর্যন্ত অর্থাৎ উচ্চ বিদ্যালয়ে ভর্তি হবার আগে পর্যন্ত আমি এক স্বপ্নলোকে, এক কল্পনাজগতে বাস করতাম। তা বলে ঘাস শুকোবার জায়গা, ফসলকাটা মাঠ ও শস্য মাড়াবার ক্ষেত্রে আমি সারাদিন না কাটাতাম এমন নয়, নদীর ধারে গ্রাম্য বালকদের সংগেও আমি দিন কাটিয়ে দিতাম। কৃষক পরিবারের যেসমস্ত ছেলেমেয়ে আমার বন্ধু ছিল, শীতকালে আমি তাদের কাছে যেতাম গল্প, রূপকথা ও গান শুনতে, আবার তাদের সংগে গাঁট্টা-মারা খেলাও খেলতাম তাসও পিটতাম ("ইস্তক," "বিন্তি," "তুরুপ," ইত্যাদি), বায়ুতাড়িত তুষাররাশির মধ্যে উত্তেজক খেলা ঘুষোঘুষিতেও যোগ দিতাম।.. আর আনন্দ পেতাম পোষ না মানা ঘোড়ার খালি পিঠে চড়ে এবং বড়দিন ও নববর্ষে ভালো পোষাক পরে।

১৮৯১ থেকে ১৮৯৩ সাল পর্যন্ত তিনবছর যে আকাল যায় তার ছাপ আমার মনের ওপর এমন ভাবে পড়ে যে, জীবনে তা আর কখনো মোছে না। মাটি ফেটে চৌচির হয়ে গিয়েছিল, গাছের রং বদলে গিয়েছিল, পাতাগুলি সব ঝরে পড়েছিল, মাঠের ফসল কাঠফাটা রোদে পুড়ে পিঙ্গলবর্ণ ধারণ করেছিল। দিগন্তে একটা অস্পষ্ট তাপপ্রবাহ কম্পিত হত উদ্ভিদ জীবনের সামান্য অস্তিত্বটুকুও তা পুড়িয়ে নিঃশেষ করত।

গ্রামে ঘরের চালে কারো খড় ছিল না, গরুছাগলকে তা খাওয়াতে হত, যে সমস্ত পশু কঙ্কালসার হয়ে বেঁচে ছিল সেগুলিকে কড়িকাঠের সংগে বেঁধে রাখতে হত, না হলে পায়ে ভর করে সেগুলি দাঁড়াতে পারত না। সে ক'বছর আমার বি-পিতাকে খুব কষ্ট করে তার জায়গীর রক্ষা করতে হয় এবং শেষ পর্যন্ত কয়েক বছর পরে তিনি তা বেচে দিতে বাধ্য হন। গোটা সামারা প্রদেশটাই বিরাট জমিদার শেখোবালক-এর হাতে চলে যায়। ভদ্রশ্রেণীর কাছ থেকে জমি কিনে নিয়ে সে তার খুশিমত বার্ষিক খাজনা করে কৃষকদের কাছে জমি পত্তন দেয়।

১৮৯৭ সালে আমরা চিরদিনের মত সোস্নোভ্‌কা ছেড়ে চলে যাই। একজন কুলাকের কাছে আমাদের জমিদারী বিক্রী করা হয়। সে 'পোস্ট অফিস' নামে পরিচিত ছিল। লোকটা

একটা ডাকঘর লুণ্ঠন করে আইনের চোখে ধুলো দেবার জন্য দশ বছর টাকাকড়ি লুকিয়ে রেখেছিল বলে লোকে তাকে এই নামে ডাকে। এই করে তার সমৃদ্ধির বুনিয়াদ স্থাপিত হয়। সম্পত্তি যাদের কাছে বন্ধক রাখা হয়েছিল তাদের পাওনা ও অন্যান্য দেনা মিটিয়ে আমার বি-পিতার যে টাকা অবশিষ্ট রইল তা দিয়ে তিনি সামারা শহরে সারাতোভস্কায়া স্ট্রীটে একটি বাড়ি কিনলেন। আমরা সেই বাড়িতে গিয়ে উঠলাম।

১৯০১ সালে সামারায় উচ্চ বিদ্যালয় থেকে আমি গ্র্যাজুয়েট হই এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হবার উদ্দেশ্যে পিতার্সবুর্গে যাই। তদুদ্দেশ্যে আমি তেরিওকি-র এস, ভয়্রতিনস্কির প্রিপেরটরি স্কুলে ভর্তি হই। টেকনোলজিক্যাল ইন্স্টি-ট্যুটের প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে আমি মেকানিক্স ডিপার্টমেন্টে ভর্তি হয়ে যাই।

ষোল বছর বয়েসে আমি প্রথম সাহিত্য রচনায় প্রবৃত্ত হই—নেক্রাসফ ও নাদসন-এর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে আমি কয়েকটা কাঁচা কবিতা লিখি। কি প্রেরণায় আমি সেগুলি লিখেছিলাম ঠিক মনে নেই, তবে বোধ হয় আমার অস্পষ্ট আকাঙ্ক্ষা বাইরে রূপ ধরে যে আত্মপ্রকাশ করতে চাইছিল, সেগুলি ছিল তারই ফল। কবিতাগুলি ছিল মামুলি ধরনের, এবং সেজন্যই আমি আর সেদিকে এগোবার চেষ্টা করিনি।

কিন্তু আমার মধ্যে কোনো না কোনোরূপে একটা সৃষ্টির প্রেরণা আগাগোড়াই ছিল; নোট বই, কলম ও কালি ছিল আমার অত্যন্ত প্রিয়বস্তু। .

ছাত্রাবস্থায় বার বার আমি লেখার চেষ্টা করেছি, কিন্তু তা ছিল সূচনা মাত্র, আমি যা বলতে চাইতাম তার ঠিক রূপ তখনো দিতে পারতাম না, পরিপূর্ণতা লাভে তখনো দেরি ছিল। .

মাত্র উনিশ বছর বয়েসে আমার বিয়ে হয়। আমার স্ত্রী ছিলেন মেডিক্যাল স্কুলের ছাত্রী এবং কার্যত ১৯০৬ সালের শেষ ভাগ পর্যন্ত আমরা উভয়ে যে যার পড়াশুনো নিয়েই ব্যস্ত ছিলাম। অন্যান্যের মত আমিও ছাত্র আন্দোলন ও ধর্মঘটে যোগ দিতাম এবং সোস্যাল-ডেমোক্রাটিক দলের সভ্য ছিলাম। টেক্নোলজিক্যাল ইন্স্টিট্যুটের ডাইনিং-রুম কমিটিতেও আমি কাজ করতাম। একবার কাজান গীর্জার সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শনের সময় একটা গোলাকার প্রস্তরের ঢিল লেগে মারা পড়েছিলাম আর কি, কেবল আমার কোটের ভেতরে বুকের কাছে একটা বই ঢুকানো ছিল বলে কোনরকমে বেঁচে যাই।

১৯০৫ সালে উচ্চ বিদ্যায়তনগুলি যখন বন্ধ হয়ে যায় তখন এক বছর পলিটেক্নিক্যাল শিক্ষার জন্য আমি ড্রেসডেনে যাই। সেখানে গিয়ে আবার আমি কবিতা লিখি, তান-বোগোরাজ ও তরুণ কবি বালমন্তও তখন লিখছিলেন। তাঁদের মত আমিও বিপ্লবী কবিতা লেখা নিয়ে পরীক্ষা করতে থাকি; অবশ্য কবিতাগুলি গীতিকাব্যের আকারেই আসে। ১৯০৬ সালে সামারায় ফিরে সেগুলি আমার মাকে দেখাই। তিনি দুঃখ করে বলেছিলেন, অত্যন্ত সাধারণ কবিতা হয়েছে সেগুলি। সে নোট বই আর নেই।

প্রত্যেক যুগেরই একটা নিজস্ব প্রকাশভঙ্গি আছে, এবং তাই ধরে রাখে সেযুগের চিন্তা, উন্মাদনা ও আবেগরাশিকে। আমি তখনো এই নতুন প্রকাশভঙ্গিকে আয়ত্ত করতে পারিনি এবং আমার নিজের জন্য তা সৃষ্টি করার সামর্থ্যও তখনো পর্যন্ত আমার হয়নি।

১৯০৬ সালের গ্রীষ্মকালে আমার মা মেনিনজাইটিস রোগে মারা যান। টেক্‌নো-লজিক্যাল ইন্‌স্টিট্যুটে আমার পড়া চালিয়ে যাবার জন্য আবার আমি পিটার্সবুর্গে যাই।

এই সময় একটা প্রতিক্রিয়াশীল যুগের সূত্রপাত হয় এবং সেই সুযোগে প্রতীকমার্গীরা (সিম্বলিস্টগণ) একেবারে পাদপ্রদীপের সামনে এসে দাঁড়ায়।...

পথ ও যানবাহন দপ্তরের কর্মচারী কন্‌স্তান্তিন সার্গেইভিচ ভাল্দেরাফ্লিং ছিলেন একজন প্রমোদতরণীর মালিক, খামখেয়ালী প্রকৃতির লোক, কল্পনাবিলাসী। তিনিই প্রথম আমাকে তাঁদের সাহিত্যের সহিত পরিচয় করিয়ে দেন। তাঁদের দলে ছিলেন ভায়াচেস্লাভ ইভানভ, বালমন্ত্‌ ও আন্দ্রেই বাইয়েলি। ভাসিলিয়েভ্‌স্কি দ্বীপে এক বাড়ির উপরতলায় তাঁর ঘরে বসে তিনি এক তেলের বাতি জেলে আমাকে প্রতীকমার্গীদের কবিতা পড়ে শোনান এবং তাঁর অননুকরণীয় কল্পনার উক্তার দ্বারা সেগুলি ব্যাখ্যা করে বোঝান।

এরপর ১৯০৭ সালে আমি আমার "ক্ষুয়িক্ষু" কবিতাসমূহের প্রথম খণ্ড প্রকাশ করি; অপরের অনুকরণে লেখা, নিরলংকার, বাজে কবিতা সেগুলি। তবে কবিতার আধুনিক রচনাশৈলী আয়ত্ত করার পথে সেগুলি আমার সহায় হয়েছিল। এক বছর পরে আমার আর একখানা কবিতার বই তৈরী হ'ল, নাম 'নীল নদীর ওপারে'। এই কবিতার বই-এর জন্য আজ আমি লজ্জিত নই। রুশ উপকথা ও রুশ লোককলার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়ের ফল হ'ল 'নীল নদীর ওপারে'।

অতঃপর আমি প্রথম যে গদ্য রচনায় হাত দিই তার নাম 'বাচাল পাখির কাহিনী।' আমি তাতে গল্পচ্ছলে আমার শৈশবের স্মৃতি বর্ণনার চেষ্টা করেছিলাম। তবে বহু বছর পরে 'নিকিতার শৈশব' গ্রন্থেই আমি তা আরো অনেক বেশি সাফল্যের সঙ্গে লিখতে পেরেছিলাম।

কবি ও অনুবাদক মাসিয়ে ভলোশিন-ই আমাকে প্রথম উপন্যাস রচনায় উৎসাহ দেন। ১৯০৯ সালের গ্রীষ্মকালে আমি তাঁকে তাঁর অঁরি দ্য রেনিএ-র বই-এর অনুবাদ পড়তে শুনেছিলাম। চমৎকার ভাবে ক্ষোদিত সেই মূর্তি আমার মনে গভীর রেখাপাত করেছিল। রচনাশৈলী ও আঙ্গিক ব্যতীত যে শিল্পোচিত সৃষ্টি হতে পারেনা, রচনাশৈলী-সন্ধানী প্রতীকমার্গীরা এবং রেনিএ-র মত রসতত্ত্ববিদগণ আমার মধ্যে প্রথম সেই ধারণা প্রথিত করে দিয়েছিলেন; তার আগে আমার সে ধারণা ছিল না।

১৯০৯ সালের শরৎকালে আমি আমার প্রথম গল্প 'তুর্গেনেভোতে এক সপ্তাহ' লিখি এবং পরে তা আমি আমার 'ভল্গা সংকলন'এর অন্তর্ভুক্ত করি। তারও পরে যেসকল ভূম্যাধিকারী ও ভদ্রসমাজের ভূসম্পত্তি লোপোখিনভ-এর মত নতুন জমিদারেরা ক্রমশ কিনে নিয়েছিল তাদের সম্পর্কে রচিত গল্পগুলি 'প্রাচীন লাইমবৃক্ষের নীচে' নামে আরো একটি বড় সংকলন-গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় এবং তাতে পূর্বোক্ত গল্পটিও স্থান পায়।

ভদ্রসম্প্রদায়ের ভূস্বামীদের মধ্যে যারা মাটি কামড়ে পড়ে থাকে এবং একান্তভাবে কৃষি-জীবীতে পরিণত হয় তাদের কথা আমার বইতে বলা হয়নি। তাদের খবর আমি রাখতাম না।

তারপর দুখানা উপন্যাস লিখিঃ 'খোঁড়া যুবরাজ' ও 'উৎকেন্দ্রিক'; যে পারিপার্শ্বিককে

আমার প্রথম যৌবন কাটে সে সম্পর্কে আমার লেখার প্রথম পর্বের এখানেই শেষ।

আমার স্মৃতির ভাণ্ডার নিঃশেষ হয়ে গেলে সমসাময়িক জীবনের দিকে আমি মুখ ঘুরাই। কিন্তু এ অধ্যায় বড় বেদনাদায়ক। এ সময় আমি যত উপন্যাস ও গল্প লিখি তা সমস্ত ব্যর্থ হয়, যুগের বৈশিষ্ট্যগুলি তাতে ধরা দেয় না। এখন আমি তার কারণ বুঝতে পারি। তখনো পর্যন্ত আমি প্রতীকমার্গীদের গণ্ডীর মধ্যেই ছিলাম, যে আধুনিক জীবন ঝড়ের মত দুর্নিবার গতিতে বিপ্লবের দিকে এগিয়ে চলেছিল। প্রতীক মার্গীদের প্রতিক্রিয়াশীল আর্ট তাকে প্রত্যাখ্যান করেছিল।

প্রতীকমার্গীরা নির্লিপ্ততা ও রহস্যবাদের মধ্যে ডুবে গিয়েছিল, তাদের 'গজদন্ত মিনারে' গিয়ে তারা আশ্রয় নিয়ে ভেবেছিল সেখানে বসেই তাদের প্রতিভার অনুশীলন করা চলবে এবং আসন্ন ঘটনাবলী এড়িয়ে যাওয়া যাবে।

জীবনকে আমি ভালবাসতাম এবং ভালবাসতাম বলেই আমার প্রকৃতির সমস্ত শক্তি দিয়ে সেই নির্লিপ্ততা ও ভাববাদী দৃষ্টিভঙ্গির বিরোধিতা করেছিলাম। ১৯১০ সালে যা আমার কাছে প্রয়োজনীয় ছিল, ১৯১৩ সালে তা এসে বিপদ ও বিঘ্ন হয়ে দাঁড়াল।

আমি সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করতে পেরেছিলাম যে, এই অবস্থা বেশিদিন চলতে পারে না। চিরদিনই আমি পরিশ্রমী ছিলাম। পূর্বের চেয়ে আমি আরো বেশি কাজ করে যেতে লাগলাম কিন্তু ফল হল নৈরাশ্যকর, কারণ জনসাধারণ ও দেশের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে আমি কিছুই জানতাম না।

এরপর যুদ্ধ বাধল। 'রাশিয়ান রেকর্ড' পত্রিকার সমর সংবাদদাতারূপে আমি রণাঙ্গনে চলে গেলাম। ১৯১৬ সালে আমি ইংলণ্ড ও ফ্রান্সে যাই। যা আমি দেখেছিলাম এবং যে অভিজ্ঞতা হয়েছিল জার-কর্তৃপক্ষের কাঁচি চালনার দরুণ তা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করা সম্ভব ছিল না, কাজেই যুদ্ধকালীন প্রবন্ধাবলী নিয়ে আমার যে বই প্রকাশিত হয়েছিল তা আর আমি পুনর্মুদ্রিত করিনি। কেবল সেই সময়ের কয়েকটি গল্প আমার গ্রন্থাবলীতে স্থান পেয়েছে।

কিন্তু আমি আসল জীবন দেখেছি, সেই জীবনের সঙ্গে মিশেছি, প্রতীকমার্গীদের শক্ত কলার বোতাম আঁটা কালো ফ্রক কোটটা ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে আমি রুশ জনগণকে দেখেছি।

ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের গোড়ার দিকেই আমি 'পিটার দি গ্রেট'-এর কাহিনী নিয়ে উপন্যাস রচনায় প্রবৃত্ত হই। যুক্তির চেয়ে এই ব্যাপারে আমার শৈল্পিক প্রেরণাই ছিল বেশি এবং তাই আমাকে এই কাহিনীর মধ্যে রুশজাতির রহস্যের চাবিকাঠি, রুশ রাজনৈতিক বিচক্ষণতা খুঁজে বার করতে প্রণোদিত করে। নতুন গ্রন্থ রচনায় পরলোকগত ঐতিহাসিক ভি. ভি. কাল্লাশ আমায় খুব সাহায্য করেন। রুশ ভাষার ভাণ্ডার তার সমস্ত শক্তি ঐশ্বর্য ও ঔজ্জ্বল্য নিয়ে আমার কাছে দেখা দেয়। অবশেষে সাহিত্যসৃষ্টির গুপ্তমন্ত্র আমি আবিষ্কার করলাম: সাহিত্যিক রচনাশৈলী নির্ধারিত হয় লেখকের নিজের অন্তরের অনুভূতির দ্বারা প্রথমে তা প্রকাশ পায় অঙ্গভঙ্গীর (অভিব্যক্তি) মাধ্যমে এবং তারপর আসে শব্দ (বাণী), সেখানে শব্দের নির্বাচন ও বিন্যাস হয় দৈহিক অভিব্যক্তির সমতুল্য।

নাট্যরচনায়ও আমি যথার্থ হাত দিই যুদ্ধের গোড়ার দিকে। ১৯১৫ সালের আগে

আমি 'অত্যাচারী' নামে একটি মিলনান্ত নাটক লিখেছিলাম, মস্কোর মালি থিয়েটারে তা অভিনীত হয়েছিল। এক শ্রেণীর লোকের মধ্যে তা নিয়ে বিষম প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়, ইম্পিরিয়াল থিয়েটার্সের পরিচালক অচিরেই তা নিষিদ্ধ করেন।

১৯১৪ থেকে ১৯১৭ সালের মধ্যে আমি পাঁচখানি নাটক রচনা করি এবং সবগুলিই মঞ্চে অভিনীত হয়। নাটকগুলির নাম: 'গুলি', 'পাপিষ্ঠ', 'প্রিয়তমা', 'হাউই' ও 'তিক্ত পুষ্পমুকুল'।*

অক্টোবর বিপ্লবের পর আবার আমি উপন্যাস রচনায় মন দিই। 'পিটারের আমল' উপন্যাসটির একটি খসড়া তৈরী করি আর 'অনুকম্পা!' লিখতে থাকি। শেষোক্ত কাহিনীতে অক্টোবর বিপ্লবের দাবাগ্নির আলোতে রুশ উদারনৈতিক বুদ্ধিজীবীশ্রেণীর বিচার বিশ্লেষণ করে মূল্য নির্ধারণের চেষ্টা আমি প্রথম করি।

১৯১৮ সালের শরৎকালে সপরিবারে ইউক্রেনে গিয়ে আমি শীতকালটা ওদেসায় কাটাই এবং সেখানে 'প্রেমের স্বর্ণলিপি' নাটক ও 'কাপ্লিওস্ত্রো' নামে একটি বড় গল্প লিখি। ওদেসা থেকে সস্ত্রীক আমি প্যারিসে যাই এবং সেখানে ১৯১৯ সালের জুলাই মাসে আমার মহাগ্রন্থ 'অর্ডিয়েল' ('অগ্নিপরীক্ষা') লিখতে আরম্ভ করি।

প্রবাসে যে কষ্টে আমাকে দিনযাপন করতে হয় এমন কষ্ট জীবনে আর কখনো আমি পাইনি। 'পারিয়া' হয়ে থাকা, স্বদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকা, বন্ধ্যা ও ত্রিশঙ্কু অবস্থায় থাকা, সকলের কাছে অবাঞ্ছিত হয়ে থাকা, প্রবাসে যে কোন অবস্থাতেই থাকা যে কি কষ্টকর, আমি সেখানে তা টের পেয়েছিলাম।

আমি তখন প্রবল উদ্যমে 'দুই বোন' ('অগ্নিপরীক্ষার' প্রথম খন্ড), 'নিকিতার শৈশব' (গল্প) এবং 'নিকিতা রশ্চিনের দুঃসাহসিকতা' লেখায় আত্মনিয়োগ করি এবং সঙ্গে সঙ্গে আগের লেখাগুলির মধ্যে যেগুলির কিছুটা মূল্য আছে বলে মনে হয়েছিল সেগুলি সমস্ত সংশোধন করে পুনর্লিখনের কাজে প্রবৃত্ত হই।..

১৯২১ সালে আমি বার্লিনে যাই এবং সেখানে গিয়ে 'স্মিয়েনা ভেখ' (পরিবর্তনশীল ভূ-সীমা চিহ্ন) দলে যোগ দিই।** সেই দলে যোগ দেবার ফলে সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত প্রবাসী

---

*'গুলি' পরে 'কুকু গ্র্যাস' নাটকে পরিণত হয়। 'তিক্ত পুষ্পমুকুল'এর পরে নাম দেওয়া হয় 'প্রতিক্রিয়াশীল' এবং তারও পরে দুবার এই নাটকের নাম পরিবর্তিত হয়: 'অ্যাকুইলা' এবং 'উড়নচণ্ডের বহিষ্কার'।

**'স্মিয়েনা ভেখ'—যেসকল শ্বেত রুশ বুদ্ধিজীবী প্রবাসে চলে আসে, ১৯২১ সালে তাদের মধ্যে এই রাজনৈতিক বুর্জোয়া আন্দোলন আরম্ভ হয়। 'স্মিয়েনাভেখ' (পরিবর্তনশীল ভূ-সীমা চিহ্ন) নাম দিয়ে কতগুলি প্রবন্ধের একটি সংকলন প্রকাশ করার পর এই দল উক্ত নাম নেয়। সোবিয়েত শক্তির পতন ঘটানো অসম্ভব একথা বুঝতে পেরে 'স্মিয়েনা ভেখ'-এর লোকেরা স্বপ্ন দেখতে থাকে যে, 'নতুন অর্থনৈতিক পন্থতির' ফলে সোবিয়েত রাষ্ট্র ভেতর থেকে ভেঙে পড়বে। আলেক্সি তলস্তয় 'স্মিয়েনা ভেখ' দলের সোবিয়েতবিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল মনোভাবের পূর্ণ তাৎপর্য গোড়ায় হৃদয়ঙ্গম করতে পারেননি। তারপর ১৯২২ সালে এন ভি চায়কোভস্কির কাছে তাঁর লেখা চিঠি যখন প্রকাশিত হয় তখন একথাটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, কেবল সমগ্রভাবে হোয়াইট গার্ডদের (বিপ্লববৈরী) সঙ্গেই নয়, 'স্মিয়েনা ভেখ' দলের সঙ্গেও আলেক্সি তলস্তয়ের অনেক বিষয়ে অনৈক্য হচ্ছে।

লেখকের সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। আমার আগেকার বন্ধুরা আমার জন্য আপসোস করতে লাগলেন। ১৯২২ সালের বসন্তকালে আলেক্সি ম্যাক্সিমোভিচ পেশকভ (গোর্কি) সোবিয়েত যুক্তরাষ্ট্র থেকে বার্লিনে আসেন। আমাদের মধ্যে তখন বন্ধুত্ব হয়।

বার্লিনে থাকাকালে আমি 'এলিতা' উপন্যাস এবং 'কৃষ্ণ শুক্রবার', 'এন্তয়েন রিবো হত্যা', ও 'শয্যাতলে প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপি' এই ক'টি গল্প লিখি। বিষয়বস্তুর দিক থেকে শেষোক্ত গল্পটি সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ! সে সময়েই আমি 'নিকিতার শৈশব' ও 'অগ্নিপরীক্ষার' প্রথম খণ্ড লেখা চূড়ান্ত ভাবে সমাধা করি।

প্যারিসে আমার ওপর যে অভিশাপ জমে উঠেছিল, ১৯২২ সালের বসন্তকালে তারই উত্তর স্বরূপ আমি আমার 'চায়কোভস্কির নিকট চিঠি' প্রকাশ করি ('ইজভেস্তিয়া'য় তা পুনর্মুদ্রিত হয়) এবং আমি সপরিবারে সোবিয়েত রুশিয়ায় চলে আসি।

স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে আমি দুটি পুস্তক রচনায় হাত দিই; 'ইবিকাস' (গল্প) ও 'নীল নগরী', (ছোট কাহিনী)। ইউক্রেনে একবার ঘুরে আসার পর এটা লেখা হয়। এছাড়া কয়েকটি ছোট গল্পও আমি লিখি, তবে সেগুলির মূল্য কম।

'চায়কোভস্কির নিকট চিঠি' লেখার মূলে প্রেরণা ছিল আমার স্বদেশপ্রীতি, স্বদেশসেবা ও দেশগঠনে আর একবার আমার সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করার আকাঙ্ক্ষা এবং এই চিঠিই হ'ল আমার ছাড়পত্র, কিন্তু 'বামপন্থী' দল ট্রট্স্কিপন্থীরা নিজেদের আবর্তে ঘুরপাক খাচ্ছিল, চিঠিটা তাদের মনঃপূত হ'ল না এবং তার ফলে আর-এ-পি-ডব্লিউর বহু নেতাও এই ব্যাপারে বিরূপ ছিলেন।*

১৯২৪ সালে আবার আমি নাট্যরচনায় মন দিই। এবার লিখি "উড়নচণ্ডের বহিষ্কার" 'সম্রাজ্ঞীর গুপ্তপ্রেম', 'আজেফ' এবং মিলনান্ত নাটক 'বিস্ময়ের সীমা নেই', 'যৌবনের পুনরাবির্ভাব' আর তিনটি উপন্যাসের নাট্যরূপ—চাপেক-এর 'যন্ত্রের খুনোখুনি', হাসেনক্লেয়ার-এর 'ব্যবসায়ী' ও ও'নীলের 'অন্য ক্রিস্টী'।

আর-এ-পি-ডব্লিউ আমার ওপর ক্রমাগত চাপ দিতে থাকে এবং এক বছর থেকে আর এক বছর তা বেড়েই চলে। অবশেষে এমন অবস্থা হয় যে, কয়েক বছরের মত আমাকে নাটক লেখা ছেড়েই দিতে হয়।

১৯২৬ সালে আমি 'এঞ্জিনিয়ার গারিনের বাড়াবাড়ি' নামক উপন্যাস রচনা করি এবং এক বছর পরে 'অগ্নিপরীক্ষার' দ্বিতীয় খণ্ড—'১৯১৮' লেখায় হাত দিই।

এসমস্ত লেখার সময় আমার আগেকার লেখাগুলিরও উৎকর্ষ বিধানের চেষ্টা করি।

আমার 'তীব্র যাতনা' নাটক পিটার দি গ্রেটকে কেন্দ্র করে রচনা করি। কাহিনী বর্ণনায় তাতে আমি খানিকটা 'প্রচলিত' রীতিরই অনুসরণ করেছিলাম। ১৯২৯ সালে আমি আবার

* আর-এ-পি-ডব্লিউ—রাশিয়ান এসোসিয়েশন অব প্রোলেটারিয়ান রাইটার্স (রুশ সর্বহারা লেখক সংঘ)। ১৯২৫ সালে প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিকদের রাজনৈতিক সংস্থা। গোড়ার দিকে সর্বহারাশ্রেণীর সাহিত্য রচনার ব্যাপারে এই সংস্থা খানিকটা কাজ করেছিল। তত্ত্বগত ও রাজনৈতিক ব্যাপারে কতগুলি মারাত্মক রকমের ভুল করার পর ১৯৩২ সালে এই সংস্থা তুলে দেওয়া হয়।

এই বিষয়বস্তু নিয়ে নতুন করে লিখতে চেষ্টা করি। ১৯৩৪ সালে নাটকটি একেবারে নতুন ভাবে লেখা হয় এবং লেনিনগ্রাদে আলেকজান্দ্রিন্স্কি থিয়েটার তা মঞ্চস্থ করে। তারপর ১৯৩৭ সালে নাটকটির আমি চূড়ান্ত রূপ দিই এবং উক্ত থিয়েটারই আবার নতুনভাবে তা মঞ্চস্থ করে।

'পিটার'-এর প্রথম নাট্যরূপ যখন দ্বিতীয় আর্ট থিয়েটারে অভিনীত হয়, আর-এ-পি-ডব্লিউ তখন প্রকাশ্যে তার বিরোধিতা করে, কিন্তু কমরেড স্তালিন বাঁচিয়ে দেন, ১৯২৯ সালে তিনি পিটারের আমলের যথার্থ ঐতিহাসিক মূল্য নিরূপণ করেন।

১৯৩০ সালে আমি আমার 'প্রথম পিটার' উপন্যাসের প্রথম খণ্ড রচনা করি। দেড় বছর পরে লিখি 'কালো সোনা'। এটা ঠিক উপন্যাস নয়। ১৯৩৮ সালে এই বই একেবারে ঢেলে সাজি; 'প্রবাসী' নামে তা প্রকাশিত হয়। ১৯৩৪ সালে 'প্রথম পিটার' উপন্যাসের দ্বিতীয় খণ্ড লেখা শেষ করি।

'প্রথম পিটার' এর প্রকাশিত দুই খণ্ডকে তৃতীয় খণ্ডের ভূমিকা মাত্র বলা চলে। তৃতীয় খণ্ড লেখায় সবেমাত্র হাত দিয়েছি। (শরৎকাল, ১৯৪৩)।*

'প্রথম পিটার'-এর যুগ নিয়ে কেন লিখতে গেলাম? আমাদের কালকে বড় করে দেখাবার জন্যই যে বিপরীত পটভূমি হিসেবে সে যুগকে আমি বেছে নিয়েছিলাম তা নয়। সে সময় রুশ চরিত্র বিশেষ জীবন্ত ভাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল। সে সময়কার জীবনে যে অনন্যসাধারণ সৃজনী শক্তি অন্তর্নিহিত ছিল তার পরিপূর্ণতার সংবেদনাই আমাকে আকৃষ্ট করেছিল।

চারটি যুগকে সাহিত্যে রূপ দেবার আকাঙ্ক্ষা যে আমার মধ্যে জাগে তার কারণগুলি একই: দুর্ধর্ষ ইভানের যুগ, প্রথম পিটারের যুগ, ১৯১৮ থেকে ১৯২০ সাল পর্যন্ত গৃহযুদ্ধের কাল এবং অসীম সম্ভাবনা ও গুরুত্বপূর্ণ আমাদের নিজেদের যুগ—যাকে বলা যায় অভূতপূর্ব যুগ। কিন্তু তার কথা তো পরে। রুশ জাতির মহত্ত্ব ও গূঢ়ত্বকে বুঝতে হলে আমাদের ইতিহাস, তার পরম মুহূর্তগুলি, যে বেদনাময় ও সৃজনশীল যুগগুলির মধ্য দিয়ে রুশ চরিত্র গড়ে উঠেছে অর্থাৎ রুশ জাতির অতীত সম্পর্কে সম্যক গভীর জ্ঞান অর্জন করা আবশ্যক।

১৯৩০ সালের পর আমি দু'তিনবার নাট্যশালায় ফিরে যাবার চেষ্টা করি এবং তাতে দৃঢ় বাধা আসে ট্রটস্কিপন্থীদের পত্রিকা ও আর-এ-পি-ডব্লিউ-র দিক থেকে। আর এ-পি ডব্লিউ যখন উঠে যায়, ট্রটস্কিপন্থী ও তাদের অনুরাগীরা যখন আমাদের সমাজজীবন থেকে সম্পূর্ণ উৎখাত হয় এবং যারা আমাদের স্বদেশের প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ ও তার ক্ষতিসাধনে সচেষ্ট ছিল তাদের অস্তিত্ব যখন লোপ পায়, একমাত্র তখনই আমি উপলব্ধি করতে পারি যে, প্রতিকূল পরিবেশ থেকে আমি মুক্ত। তখন থেকেই সামাজিক ও সাহিত্য-কর্মে আমার পূর্ণ শক্তি

* 'প্রথম পিটার' উপন্যাসের তৃতীয় খণ্ড রচনায় আলেক্সি তলস্তয় ১৯৪৪ সালের সারা বছর এবং ১৯৪৫ সালের গোড়া পর্যন্ত ব্যাপৃত থাকেন। তারপর তাঁর কঠিন পীড়া হয় এবং তাতেই ১৯৪৫ সালের ফেব্রুয়ারীতে তিনি মারা যান; বইটি আর তিনি শেষ করে যেতে পারেননি। তৃতীয় খণ্ডের মাত্র ছয়টি অধ্যায় লেখা হয়েছিল।

নিয়োজিত করা সম্ভব হয়। বিদেশে ফাশিস্ত বিরোধী কংগ্রেসসমূহে আমি পাঁচবার বক্তৃতা করি, লেনিনগ্রাদ সোবিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের সর্বোচ্চ সোবিয়েত-এ সদস্য নির্বাচিত হই। সোবিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞান পরিষদেও আমাকে সদস্য মনোনীত করা হয়।

১৯৩৫ সালে আমি 'রুটি' লেখা আরম্ভ করি। এটি একটি সুদীর্ঘ গল্প। '১৯১৮' উপন্যাস ও সংকল্পিত উপন্যাস 'বিষণ্ণ প্রভাত'-এর মধ্যে এই গল্পটিকে একটি প্রয়োজনীয় যোগসূত্র বলা যেতে পারে। 'রুটি' লেখা শেষ হয় ১৯৩৭ সালের শরৎকালে। এই গল্পের জন্য আমাকে বিস্তর সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছে, প্রধানত সমালোচনা হয়েছে এই বলে যে, লেখাটা 'নীরস' ও "দায়সারা" গোছের। আমার দিক থেকে এর সমর্থনে আমি শুধু একটি কথা বলব। 'রুটি' গল্পে আমি যথার্থ ঐতিহাসিক বস্তুকে শিল্পসম্মত উপায়ে একত্র গ্রথিত করবার চেষ্টা করেছি, সেজন্যই তাতে অবাধ কল্পনার অভাব থাকতে বাধ্য। কিন্তু আমার এই প্রচেষ্টা একদিন কারো কাজেও লাগতে পারে। আমি মনে করি, লেখায় পরীক্ষানিরীক্ষার অধিকার লেখকের আছে এবং তাতে ভুলত্রুটিও থাকবেই। সাহিত্যিক পরীক্ষাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে দেখতে হবে—সাহস না থাকলে আর্ট হবে না। লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, 'প্রথম পিটার' এর মতো 'রুটি'ও প্রায় সমস্ত ভাষাতেই অনূদিত হয়েছে, এমন কি তার চেয়ে ব্যাপক ভাবেও হয়ে থাকতে পারে।

১৯৩৮ সালের বসন্তকালে আমি আমার নাটক 'জয়ের পথ' লিখি এবং সে বছরই শরৎকালে আমার ফাশিস্তবিরোধী পুস্তিকা 'শয়তানের সেতু' প্রকাশ করি।

এসমস্ত সাহিত্য কর্মের সঙ্গে সঙ্গে শিশু-সাহিত্য প্রকাশন ভবনের (দেৎগিজ) জন্য পাঁচ খণ্ড রুশ উপকথার মালমসলা তৈরীর কাজও আমি করি। এই সমস্ত কাহিনী অবলম্বন করে আমি নিজের খুশিমত কিছু লিখিনি। বর্ণিত কাহিনীর মৌলিকতা রক্ষা করে, একটি বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র করে যতরকম গল্পের সৃষ্টি হয়েছে সেগুলিকে মিলিয়ে মিশিয়ে একটি গল্পে পরিণত করেছি, সঙ্গে সঙ্গে কথ্য ভাষার সমস্ত বৈশিষ্ট্যই রক্ষা করেছি তবে গল্পিকের সীমাবদ্ধতা, অন্যান্য কাহিনী থেকে যান্ত্রিকভাবে বিষয়বস্তু আমদানী করে পরিবেশন, অথবা নিতান্তই স্থানীয় যার কোন সাধারণ আবেদন নেই —তেমন বস্তু প্রক্ষিপ্ত করার ফলে যে অপ্রয়োজনীয় বিশদ বর্ণনা বা বাহুল্য ছিল তা থেকে গল্পগুলিকে আমি মুক্ত করে দিয়েছি।

১৯৪১ সালের ২২শে জুন আমি আমার উপন্যাস 'বিষণ্ণ প্রভাত' লেখা শেষ করি। ঐ দিনই যুদ্ধ ঘোষিত হয় (হিটলারের বাহিনী সোবিয়েত দেশ আক্রমণ করে—অনুবাদক)। আমার তিনখণ্ডে সমাপ্ত উপন্যাস ছাপাখানায় পাঠাবার আগে প্রথম দু'খণ্ড আবার ভাল করে পড়ে সংশোধন করি। এই তিনখণ্ডে সমাপ্ত উপন্যাস রচনায় আমার বাইশ বছর লাগে। এর বিষয়বস্তু হল গৃহে প্রত্যাবর্তন, স্বদেশের পথ। 'বিষণ্ণ প্রভাত'-এর শেষ ক'ছত্র যখন লেখা হয় তখন আমাদের জন্মভূমির ওপর গোলাগুলি চলেছে। এ থেকে আমার দৃঢ় প্রত্যয় হয়েছে যে, এই উপন্যাসে প্রদর্শিত পথই হ'ল আসল পথ।

ভয়ংকর ধ্বংসাত্মক যুদ্ধের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত দু'টি বছরের দিকে আমি যখন আজ ফিরে তাকাই তখন উপলব্ধি করি আমাদের সংগ্রাম ও জয়ের শক্তিলাভের মূলে নিহিত আছে

আমাদের জনগণের অফুরন্ত শক্তিতে অবিচল বিশ্বাস, দুস্তর কঠিন ঐতিহাসিক পথের যাথার্থ্যে আস্থা, স্বদেশপ্রেম, মহান জীবন লাভের খাঁটি মানবিক পথে চলা, দুঃখের সুতীব্র বেদনা সহ্য করার সাহস ও শত্রুর প্রতি ঘৃণা। এমন কি ১৯৪১ সালের অক্টোবর-নভেম্বর মাসে অত্যন্ত সংকটপূর্ণ সময়েও আমাদের জয় হবে বলেই আমার বিশ্বাস ছিল। সে সময় জিমেংকিতে (ভল্‌গা তীরে গর্কি শহরের অদূরে) আমি আমার 'ইভান গ্রজনি' নাটক রচনা আরম্ভ করি। আমার জন্মভূমির যে অপমান জার্মানরা করছিল, এ ছিল তারই জবাব। আমার "জাগ্রত বিবেককে" সুরক্ষিত করার জন্য 'দুর্ধর্ষ' 'ইভান'-এর মহান, দৃপ্ত রুশ আত্মাকে নরক থেকে উদ্ধার করে আবার জীবন্ত মানুষের রূপ দিই। এই নাটক রচনার সময় আমি পরপর কয়েকটি প্রবন্ধও প্রকাশ করে যাই তার মধ্যে 'আমরা কিসের জন্য লড়াই করছি', 'স্বদেশ ও 'জাতির শোণিত' এই ক'টি প্রবন্ধ সকলের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। যুদ্ধের সময় বিভিন্ন পত্রিকায় আমার যেসকল প্রবন্ধ বেরোয় দু'খণ্ডে সংকলিত হয়ে তা প্রকাশিত হয়েছে। ১৯৪২ সালের ফেব্রুয়ারীতে আমি 'ঈগল পক্ষী ও তার সাথী' ('ইভান গ্রজনি'র প্রথম খণ্ড) এবং ১৯৪৩ সালের এপ্রিলে 'দুর্বৎসর সমূহ' (ইভান গ্রজনির দ্বিতীয় খণ্ড) লেখা শেষ করি। এছাড়া ইভান সুদারেভের কাহিনী' এবং অন্যান্য বইও লিখি।

১৯৪৩ আলেক্সি তলস্তয়

"হে রণভূমি।"
—ইগরের উপকথা

॥ এক ॥

মফঃস্বল শহরের দু'পাশ্বস্থিত বৃক্ষশ্রেণীর সবুজ পত্রাচ্ছাদিত রাস্তা থেকে কেউ যখন প্রথম এসে পিতার্সবুর্গে পদার্পণ করে তখন একদিকে যেমন তাব বুদ্ধিবৃত্তিটা উদ্দীপ্ত হযে ওঠে তেমনি অপর দিকে আসে একটা মানসিক অবসাদ।

কুয়াশাচ্ছন্ন সোজা রাস্তা ধরে চলতে চলতে যখন কোন আগন্তুকের নজরে পডবে দু'পাশে আলোহীন জনশূন্য পুরনো বাড়ি, প্রতি বাড়ির ফটকের সামনে তন্দ্রাচ্ছন্ন দারোয়ান, পরিপূর্ণ নেভা নদীর বিস্তৃত কৃষ্ণ বক্ষ, সন্ধ্যার প্রাক্কালে আলোকিত সেতুসমূহের নীলাভ প্রান্তরেখাবলী, দু'পাশে নির্জ্জন নিরানন্দ প্রাসাদসমূহ ও সেগুলির সম্মুখে সারি সারি স্তম্ভ, গগনচুম্বী পিটার পল গীর্জা যার চূড়োর দিকে তাকালে মাথা ঘুরে যায় আর রুশিয়ায় যার মত উঁচু গীর্জা সচরাচব দেখা যায় না, নিম্নে নদীবক্ষে জীর্ণ তরীসমূহ যেগুলির গলুই কালো জলে সর্বদাই নাক ডুবিয়ে আছে তারপর স্ফটিক প্রস্তরের জেটির পাশ ধরে সার বেঁধে দ‚ড়ানো ভেজা কাঠবোঝাই অসংখ্য বজরা, রাস্তায় চিন্তান্বিত বিরসবদন পথচারিগণ যাদের মুখেব দিকে তাকালেই মনে হবে নগরীয় মতই তাদের চোখও নিষ্প্রভ নিষ্প্রাণ—তখন খোশমেজাজে থাকলে তার কেবল বিস্ময় বেড়ে যাবে, আর তা না হলে আপন মনে সে বলবে একটা প্রচণ্ড ঘুষিতে এই পাথরের যাদুপুরী ভেঙে টুকরো টুকরো করে দিলে ক্ষতি কি!

শোনা যায় পিটার দি গ্রেটের আমলে ট্রিনিটি সেতুর অদূরে অবস্থিত ট্রিনিটি গীর্জার একজন তত্ত্বাবধায়ক একদিন সন্ধ্যায় যখন ঘড়িঘরের সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছিলেন তখন এক কৃশ কোটবগতচক্ষু বালিকার প্রেতাত্মা দেখে তিনি চমকে উঠেছিলেন। প্রেতাত্মার মাথা ছিল অনাবৃত। ভয় পেয়ে তিনি

দৌড়ে গিয়ে এক পাঠশালায় ওঠেন এবং চিৎকার করে বলেন: "পিতার্সবুর্গ গেল!" এজন্যে গোয়েন্দারা তাকে গ্রেপ্তার করে নানাভাবে যন্ত্রণা দেয় এবং প্রশ্নাদি করে, নিষ্ঠুরের মত তার ওপর বেতও চালায়।

সেই থেকে ক্রমাগত একটা গুজব চলে আসে যে পিতার্সবুর্গের ব্যাপারটা একটু রহস্যময়। কেউ কেউ বলে যে, ভাসিলিয়েভস্কি দ্বীপের রাস্তার শয়তানকে দ্রশ্‌কি (আরামদায়ক ঘোড়ার গাড়ী) চালিয়ে যেতে তারা স্বচক্ষে দেখেছে। আবার কারো কারো মুখে শোনা যায় গভীর রাত্রে তারা ব্রঞ্জ নির্মিত সম্রাটকে তার স্ফটিক প্রস্তরের পাদানি থেকে লাফ দিয়ে পড়তে দেখেছে—আরো তারা বলে যে, জোয়ারের সময় ঝড়ের মধ্যে সম্রাট রাস্তার পাথরগুলির ওপর দিয়ে দ্রুতগতিতে লাফিয়ে লাফিয়ে চলেন। তারপর শোনা যায়, একজন সরকারী আমলার মৃতদেহ জনৈক প্রিভি কাউন্সিলরের ঘোড়ার গাড়ীর জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দিয়েছিল। শহরে এই ধরনের কত গল্পই না শোনা যায়।

এই সেদিন কবি আলেক্সি আলেক্সিয়েভিচ বেসনভ একটি কুব্জপৃষ্ঠ সেতুর ওপর দিয়ে রবারের চাকা লাগানো দ্রশ্‌কি দ্রুত হাঁকিয়ে যখন সেই দ্বীপের দিকে যাচ্ছিল তখন তার সজল নয়নের দৃষ্টি পড়ে গিয়ে স্তরে স্তরে সাজানো মেঘের ফাঁক দিয়ে পশ্চাদ্দিকস্থ আকাশের গায়ে একটা তারার ওপর। তারাটার দিকে চেয়ে তার মনে হয় দ্রশ্‌কি, সেতুবক্ষের আলোমালা ও পিছনের ঘুমন্ত পিতার্সবুর্গ, এসমস্তই যেন একটা স্বপ্ন, একটা ভ্রান্তি, সুরা, প্রণয় ও ক্লান্তিতে আচ্ছন্ন মস্তিষ্কের অলীক কল্পনা।

স্বপ্নের মত দু'শতাব্দী কেটে গেছে। পৃথিবীর একপ্রান্তে জলা ও পতিত-জমির মাঝখানে দাঁড়িয়ে পিতার্সবুর্গ অনন্ত গৌরব ও অপরিসীম ক্ষমতার দিবাস্বপ্ন দেখেছে। প্রাসাদ বিপ্লব, সম্রাট হত্যা, রাজধানীতে বিজয় অভিযান, রক্তাক্ত হত্যাকান্ড একের পর এক এমনভাবে ঘটে গেছে যা ভাবলে মনে হয় প্রহেলিকা। ভ্রষ্টাচরিত্রা নারী পেয়েছে সম্মানের সর্বোচ্চ আসন; প্রণয়ী যুগলের চলন্ত শকটে নিরূপিত হয়েছে জাতির ভাগ্য; কর্দমাক্তবক্ষ অমার্জিত উদ্ধত যুবকদের অকস্মাৎ রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হয়ে ক্ষমতা দখল এবং রানীদের শয্যাসঙ্গী ও তাদের অতুল ঐশ্বর্যের অংশীদার হবার জন্য দৃঢ়পদে এগিয়ে আসতে দেখা গেছে সিংহাসনের দিকে।

খেয়ালের এই উন্মাদনা যেন প্রতিবেশী দেশগুলির লোকের প্রাণে খানিকটা ভীতি সঞ্চার করেছিল। রাজধানীর এই বিকার রুশগণের চিত্তে ত্রাস ও নৈরাশ্য এনে দিয়েছিল। পিতার্সবুর্গের লোলুপ ভূতপ্রেতের উদরপূরণের জন্য জাতির জীবনশোণিত শোষণ করা হচ্ছিল।

পিতার্সবুর্গের আসল রূপ ফুটে ওঠে রাত্রিবেলা—বন্য, হৃদয়হীন, যেন আপনাতে আপনি বিভোর। উন্মাদনা ও লাম্পট্যপূর্ণ গ্রীষ্মের উজ্জ্বল রজনী, শীতের অতন্দ্র নিশি, তাসের জুয়াখেলার টেবিল ও স্বর্ণের ঠুনঠুন শব্দ;

নাচ গান হল্লা, আলো বিচ্ছুরিত জানালার ধারে জোড়া জোড়া প্রণয়ী; তিন ঘোড়ার দ্রুতগামী স্লেজ, ভবঘুরের দল, প্রত্যুষে দ্বন্দ্বযুদ্ধ, বরফের মত ঠান্ডা হাওয়ায় সৈন্যদের কুচকাওয়াজ, সঙ্গে সরু আওয়াজের বাঁশী, কান্নার মত তার সুর, ওপরে দাঁড়িয়ে দেখেন দোর্দণ্ড প্রতাপ জার। এই তো শহরের জীবন।

গত দশ বছরে অতি দ্রুত সব বড় বড় ইমারত গড়ে উঠেছে, মনে হয় আকাশ থেকে যেন রাজৈশ্বর্যের ডালি নেমে এসেছে। কাঁচ ও সিমেণ্ট দিয়ে তৈরী হয়েছে ব্যাংক, সঙ্গীতভবন, বরফাচ্ছন্ন ক্রীড়াভূমি; সঙ্গে সঙ্গে খোলা হয়েছে জাঁকজমকপূর্ণ সমস্ত রেস্তোরাঁ—গানবাজনা, বড় বড় উজ্জ্বল আয়না, অর্ধনগ্ন নারীমূর্তি আগন্তুকদের সেখানে স্তম্ভিত করে দেয়; বিলাসী প্রিয় মদিরা শ্যাম্পেনের প্রভাবে তাদের চেতনা স্তিমিত হয়ে আসে।

জুয়ার আড্ডা, প্রণয়ী-প্রণয়িণীর মিলন-ভবন, থিয়েটার, সিনেমা এবং প্রমোদ উদ্যানসমূহের উদ্বোধন বেশ দ্রুত হতে থাকে। পিতার্সবুর্গের অদূরে এক দ্বীপে অভূতপূর্ব বিলাসপূর্ণ একটা নতুন রাজধানী সৃষ্টির পরিকল্পনা নিয়ে ব্যস্ত আছেন এঞ্জিনিয়ার ও পুঁজিদারগণ। অবশ্য সেই দ্বীপে এখনো পর্যন্ত কোন বাড়িঘরই নির্মিত হয়নি বা সেখানে কেউ বসবাসও করছে না।

শহরে হঠাৎ আত্মহত্যার হিড়িক পড়ে যায়। আদালতে মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত স্ত্রীলোকের অসম্ভব ভীড়, চাঞ্চল্যকর মামলাসমূহের ন্যক্কারজনক বিস্তৃত বিবরণী শোনার জন্য নির্লজ্জ ব্যাকুলতা। অর্থ হলে সব কিছুই মেলে—সম্ভোগের সমস্ত উপকরণ ও নারী। সর্বত্র দুর্নীতি, প্লেগের মত তা আদালতেও ছড়িয়ে পড়েছে।

আর প্রাসাদে? এক নিরক্ষর চাষী, বুনো তার চাহনি, বলিষ্ঠ দেহ, সরাসরি সে তার পথ করে নিয়েছে সম্রাটের সিংহাসনের দিকে—তার রূঢ় প্রকৃতি, মানব-বিদ্বেষ রুশিয়ার মুখে কলংক লেপন করে দিয়েছে।

অন্যান্য বড় শহরের মত পিতার্সবুর্গের নিজস্ব জীবনেও একটা উত্তেজনা, একটা প্রবণতা আছে। এই জীবন নিয়ন্ত্রিত হয় কেন্দ্রীয় শক্তির দ্বারা। শহরের ভাবধারার মধ্যে কিন্তু কেন্দ্রীয় শক্তি নিজেকে মিলিয়ে দেয়নি। কেন্দ্রীয় শক্তি চায় যাতে শহরে শান্তি, শৃংখলা ও ভব্যতা রক্ষা হয়; কিন্তু শহরের সাধারণ মনোভাব হলো এই কেন্দ্রীয় শক্তিকে ধ্বংস করা। ধ্বংসের মনোবৃত্তি সব কিছুকে যেন বিষিয়ে দিয়েছে; এই বিষ গিয়ে ঢুকেছে কুখ্যাত সাশ্‌কা সাকেলম্যানের আর্থিক ফাটকাবাজীতে, ইস্পাত-কারখানার শ্রমিকের স্তব্ধ রোষে, "রেড স্লেজ বেল্‌স্" ভোজনালয়ের নীচের তলায় ভোর পাঁচটা পর্যন্ত উপবিষ্টা কোনও কল্পনাশ্রয়ী মহিলা কবির বিক্ষিপ্ত চিন্তারাশির মধ্যে। এমন কি ধ্বংসের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা যাদের দায়িত্ব তারাও তাদের মনের অজ্ঞাতসারে তারই পথ সুগম করে দিচ্ছে।

দিনকালের গতি এমনই হয়ে দাঁড়ায় যে, প্রেম, প্রীতি, সৎপ্রবৃত্তিগুলির

কোন মূল্যই কেউ দেয় না; লোকে মনে করে, এগুলো এযুগে অচল। প্রেমের স্থল এসে দখল করে লালসা—উদগ্র লালসার অনলে মানুষ যেন নিজের জীবনী-শক্তিকে পুড়িয়ে ছাই করবার জন্য উন্মত্ত হয়ে উঠল।

বালিকারা তাদের সরলতা হারিয়ে ফেলল, দাম্পত্য জীবনের বিশ্বস্ততা গেল নষ্ট হয়ে। নাশকতা যেন সুরুচির পরিচয় হয়ে দাঁড়াল; স্নায়বিক দৌর্বল্যের নাম দেওয়া হল ভব্যতা। ভুঁইফোড়ের মত রাতারাতি গজাতে লাগল সব সৌখীন সাহিত্যিক, তাদেরই কলম দিয়ে বেরোত এই সমস্ত নববিধান। পাপ ও দুষ্কর্মের সব অভিনব পন্থা আবিষ্কার করতে লাগল লোক—কিছুতেই যেন তৃপ্তি নেই, কিছুতেই যেন শেষ নেই।

১৯১৪ সালের পিতার্সবুর্গের এই অবস্থা। অতন্দ্র নিশিযাপনের ক্লান্তি, সুরা ও অর্থের নেশাজনিত বিষাদ, প্রেমহীন প্রণয়, লাস্য নৃত্যের প্রবল উত্তেজনা, কামানলের লেলিহান শিখা, মৃত্যুর তাণ্ডব—যেন কোন চরম দুর্দিনের প্রতীক্ষায় আছে সে। সেই দিনের আভাসও যে না পাওয়া যাচ্ছিল এমন নয়—প্রতিটি ফাটল থেকেই যেন নতুন ও অদ্ভুত পাঁক বেরিয়ে আসছিল।

॥ দুই ॥

"...স্মৃতির মূল্য কি? আমরা বলিঃ ঠিক আছে! অতীতকে পৃষ্ঠ-প্রদর্শন কর। আমার পশ্চাতে কে? ভেনাস দ্য মিলো? ভালো—সে কি রসনাতৃপ্তিকর? সে কি কেশবৃদ্ধিকর? ঐ মর্মর মূর্তি আমার কোন্ কাজে আসবে আমি বুঝিনে! তুমি বল, আর্ট? এখনো তুমি সেই আনন্দেই মশগুল হয়ে থাকতে চাও? চারপাশে চেয়ে দেখ, সামনে মাটির দিকে তাকাও! মার্কিন জুতো পরছ তুমি। ধন্য মার্কিন জুতো! লাল একখানা মোটর গাড়ী, রবারের চাকা, এক গ্যালন পেট্রল, ঘণ্টায় সত্তর মাইল—এই হলো আর্ট! স্থানের দূরত্বকে কমিয়ে দেবার কি সুন্দর উপায়! আরো দেখবে আর্ট? এসো, দেখঃ ৪০ ফুট লম্বা পোস্টার, কেমন চালাক যুবকটি, টপ্ হ্যাটের মধ্যে যেন সূর্যের মত জ্বলজ্বল কচ্ছে। দর্জিই হলো যথার্থ আর্টিস্ট, আজকের দিনের প্রতিভা। আমি চাই উত্তেজনার মধ্যে নিজেকে নিঃশেষ করে দিতে আর তুমি চাও দেহমন স্নিগ্ধকর সুধা পান করাতে আমাকে! তা তোলা থাক নির্বীর্যের জন্য. ."

একটি ক্ষুদ্র সভাগৃহে আসনগুলির পিছনে ঠাসাঠাসি করে দাঁড়িয়ে আছে বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু ছাত্রছাত্রী। তাদের দিক থেকে ভেসে আসছে হাসির রোল ও করতাল ধ্বনি। বক্তা সার্গেই সার্গিয়েভিচ সাপঝকভের অধরোষ্ঠে মৃদু হাসি। স্প্রিংএর চশমা সযত্নে উন্নত নাসিকার ওপর ঠিক করে নিয়ে সে এক কাঠের বিরাট বক্তৃতামঞ্চ থেকে সিঁড়ি দিয়ে হাসিমুখে ধীরে ধীরে নেমে যায়।

সভাগৃহের একপাশে সান্ধ্য "দার্শনিক বৈঠক"-এর সভ্যরা একটি লম্বা টেবিলের পেছনে বসে আছেন। টেবিলের ওপর দুটি মোমের পঞ্চপ্রদীপ জ্বলছে। যাঁরা বসে তাঁদের মধ্যে রয়েছেন, বৈঠকের সভাপতি ও অধ্যাত্মবিদ্যার অধ্যাপক আস্তোনোভাস্কি, ঐতিহাসিক ভোলিয়ামিনভ, দার্শনিক বোরাস্কি এবং মার্জিত রুচিসম্পন্ন লেখক সাকুনিন। ঐতিহাসিক ভোলিয়ামিনভ সেদিন বক্তাও ছিলেন।

তখন শীতকাল, সান্ধ্য দার্শনিক বৈঠকের ওপর একদিন আক্রমণ শুরু করল একদল অখ্যাতনামা কলহপরায়ণ যুবক। বিশিষ্ট লেখক ও শ্রদ্ধেয় দার্শনিকদের তারা চটকদার ভাষায় এমন তীব্র সমালোচনা করল যার ফলে ফনতাংকায় একটা পুরনো বাড়িতে অবস্থিত বৈঠকের সদর কার্যালয়ে প্রতি শনিবার প্রকাশ্য সভা ডাকলেই লোকে লোকারণ্য হয়ে যেত।

সেদিনও তার ব্যতিক্রম হয়নি। তুমুল হর্ষধ্বনির মধ্যে সাপজ্ঞনভ মঞ্চ থেকে নেমে যাবার পর একজন খর্বাকৃতি যুবক এসে তার স্থান নেয়। তার চোয়াল দুটো বেশ বড়, পিঙ্গল বর্ণ মাথার চুল এত ছোট করে ছাঁটা যে খুলির স্ফীত জায়গাগুলি বেরিয়ে পড়েছে। নাম তার আকুন্দিন, এখানে সে নবাগত। তবে এরই মধ্যে সে বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে, বিশেষ করে পিছনের সারির লোকের কাছে তার খাতিরের অন্ত নেই। কেউ যখন প্রশ্ন করেঃ লোকটা কে, কোথা থেকে সে এসেছে, তখনই তাকে যারা জানে তাদের মুখে কেবল একটু রহস্যপূর্ণ হাসি ফুটে ওঠে। অবশ্য প্রায় সকলেই জানে যে, আকুন্দিন তার আসল নাম নয় এবং বিদেশ থেকে এসেছে সে। তার বক্তৃতার পিছনে যে গূঢ় উদ্দেশ্য আছে একথাও কারো বুঝতে বাকী নেই।

দাড়িতে আঙুল বুলিয়ে আকুন্দিন একবার সভাগৃহের চতুর্দিক নিরীক্ষণ করে নেয়। লোক তার কথা শোনার জন্য উৎগ্রীব। একটু চাপাহাসি হেসে নিয়ে সে তার বক্তৃতা আরম্ভ করে। তৃতীয় সারিতে প্রবেশপথের কাছে একখানি চেয়ারে একটি তরুণী সারাক্ষণ বসে আছে। পশমের কালো পোশাক পরেছে সে, গলা পর্যন্ত ঢাকা। গালে হাত দিয়ে বসা। রেশমের মত মসৃন তার কুন্তলরাশি কানের উপর দিয়ে পেছনের দিকে টেনে নিয়ে চিরুনির সাহায্যে একটি বড় খোঁপা করে বাঁধা। কোন চাঞ্চল্য নেই প্রশান্ত, গম্ভীর। সবুজ টেবিলের ধারে যারা বসে, তার দৃষ্টি কেবল তাঁদের দিকে। মাঝে মাঝে খালি জ্বলন্ত মোমের শিখাগুলি তার নয়ন দুটিকে লক্ষ্যান্তরে নিয়ে যাচ্ছে।

মঞ্চের ওপর ঘুষি মেরে আকুন্দিন চীৎকার করে বলে ওঠেঃ "বিশ্ব-অর্থনীতির বজ্রমুষ্টি প্রথম আঘাত হানবে গীর্জার চূড়ায়।" তরুণী শান্তভাবে একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে, গাল থেকে হাত নামিয়ে নেয় আর এক টুকরো মিষ্টি মুখে দেয়।

আকুন্দিন বলে চলেঃ

"... আপনারা এখনো মর্ত্যে স্বর্গের অলীক স্বপ্ন দেখছেন; কিন্তু আপনাদের এত চেষ্টা সত্ত্বেও তাঁর তো ঘুম ভাঙছে না। আপনাদের বুঝি আশা, বালামের গাধার মত তিনি শেষ পর্যন্ত জাগবেন এবং কথা বলবেন? হ্যাঁ, জাগবেন, তিনি নিশ্চয়ই জাগবেন, তবে আপনাদের কবিবৃন্দের মিষ্ট কণ্ঠস্বরে নয়, আপনাদের ধূপের ধোঁয়ায় নয়—একমাত্র কারখানার বাঁশীই সাধারণ লোককে জাগাতে পারে। তারা জাগাবে এবং বলবে—তবে তাদের কণ্ঠস্বর আপনাদের কানে মধু বর্ষণ করবে না। আপনারা কি আপনাদের মনের খানাডোবায় বা গহন কোণে লুকিয়ে থেকে বাঁচতে পারবেন বলে আশা করছেন? এই স্বপ্ন নিয়ে আপনাদের আর বড় জোর পঞ্চাশ বছর চলতে পারে। কিন্তু মেসায়ার আগমনকাল পর্যন্ত এভাবে চলবে, একথা আপনারা বলেন কোন্ ভরসায়? ভবিষ্যতের কথা নয়, আপনারা বলেন অতীতের কথা। এখানে, এই পিতার্সবুর্গে এই সুরম্য প্রাসাদে রুশ কৃষক মুজিকের কথা আবিষ্কৃত হয়! তার সম্বন্ধে শত শত পুস্তক লেখা হয় এমন কি কয়েকটি গীতিনাট্যও রচিত হয়েছে! কিন্তু আমার মনে হয়, একদিন রক্তপাতের মধ্যে এক মস্ত কৌতুকের অবসান হবে..."

সভাপতি বক্তাকে বাধা দেন। আকুন্দিন একটু চাপা হাসি হাসে। সে টেব পকেট থেকে একখানি বড় রুমাল বের করে একটা বিশেষ ভঙ্গীতে ঘাড় ও মুখ মুছে নেয় সে। সভার শেষ প্রান্ত থেকে চীৎকার ওঠে:

"তাঁকে বলতে দিন!"

"এভাবে একজনের কণ্ঠরোধ করা অন্যায়!"

"জবরদস্তি আর কাকে বলে!"

"পেছনের লোক চুপ করুন!"

"আপনারা চুপ করুন, মশায়!"

আকুনিদন আবার বলে চলে:

"রুশ কৃষকরাই হল আজ আমাদের চিন্তার মূলকেন্দ্র। হ্যাঁ, সত্যি তাই। কিন্তু যুগ যুগ ধরে তার মধ্যে রয়েছে যে বাসনা, সর্বসাধারণের মতই তার মধ্যে রয়েছে যে সহজ ন্যায়বোধ, তার সঙ্গে একাত্মা না হয়ে যে সমস্ত তত্ত্বকথা বলা হবে, সেগুলি হবে মরুভূমিতে বীজ বপনের মত, কোন অঙ্কুরই তা থেকে গজাবে না। কে কবে রুশ কৃষককে কল্পনায় দেবতা করে এঁকেছিল, তা ভাবলে চলবেনা; রুশ কৃষককে ভাবতে হবে সাধারণ মানুষ বলে, অনাহারক্লিষ্ট, অতিরিক্ত শ্রমে ন্যুব্জপৃষ্ঠ—এই ত তার আসল চিত্র। যতদিন তাকে দেবত্ব আরোপ করা হবে ততদিন কল্পনা ও বাস্তবের মধ্যে থেকে যাবে এক বিরাট ব্যবধান। কৃষকদের যদি আপনারা জানবার চেষ্টা না করেন তবে পুঁথিগত বিদ্যা থেকে কল্পনার দ্বারা সৃষ্ট মানুষের সঙ্গে আসল মানুষের কোন মিলই থাকবে না। এখানে আপনাদের সমালোচনা করার অভিপ্রায় আমাদের মোটেই নেই।

কল্পনার জঞ্জাল ঘেঁটে সময় নষ্ট করা নির্বোধের কাজ। আমরা তা করতে চাইনে। আমাদের পরামর্শ হল, আপনারা সময় থাকতে সরে পড়ুন; কারণ আপনাদের চিন্তাধারা, আপনাদের রত্নরাশি অত্যন্ত অবজ্ঞাভরে ইতিহাসের আবর্জনাস্তূপে নিক্ষিপ্ত হবে।"

বক্তৃতামঞ্চ থেকে যে কথাগুলি বলা হচ্ছিল, তা যেন কালো পোশাকপরা মেয়েটির মর্ম তেমনভাবে স্পর্শ করতে পারছিল না। অবশ্য একথা তার মনে হচ্ছিল যে, কথাগুলি অত্যন্ত মূল্যবান এবং দরকারী। কিন্তু তাহলেও কোথায় যেন কি একটা ফাঁক রয়ে গেছে। যে-কথা বলা উচিত সে-কথা যেন এদের কারো মুখ দিয়ে বেরুচ্ছেনা।

এমন সময় এক ব্যক্তি এসে সবুজ টেবিলের ধারে সভাপতির পাশে ধীরস্থির ভাবে আসন গ্রহণ করে। দক্ষিণে ও বামে একবার মস্তক হেলন করে সে তুষারসিক্ত কেশ আঙুলে ঝেড়ে নেয়। হিমে তার হাতের আঙুলগুলি লাল হয়ে গেছে। তারপর টেবিলের প্রান্তভাগের নীচে তার হাত দুখানি আড়াল করে বসে সোজা হয়ে। বেশ আঁটসাঁট কালো ফ্রককোট পরা। পাতলা মুখ, দীপ্তিহীন। বাঁকা ভ্রূযুগলের নীচে গভীর কোটরে কটা চোখ। মাথায় একরাশি চুল। একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকার গত সংখ্যায় আলেক্সি আলেক্সিয়েভিচ বেসনভের যে ছবি বেরিয়েছে তার সঙ্গে লোকটির চেহারার হুবহু মিল।

বিশ্রী চেহারা, তবু যেন কি একটা আকর্ষণ রয়েছে লোকটির মুখে। মেয়েটির সমস্ত মনোযোগ গিয়ে পড়ে তার ওপর। পিতার্সবুর্গে মাঝে মাঝে রাত্রে পাগলা হাওয়ায় ঘুমন্ত অবস্থায় স্বপ্নে যে মূর্তি এসে তার সামনে দাঁড়ায়, এই লোকটির অবয়বে তার যেন অনেকগুলি লক্ষণ আছে। এক বিচিত্র অনুভূতি মেয়েটির মনে—ভীতিমিশ্রিত চিত্তচাঞ্চল্য!

পাশে যিনি আছেন তার দিকে কান এগিয়ে দিয়ে সে যেন কি শুনছে; অধরোষ্ঠে ঈষৎ হাসি। হাসিটাই কেমন যেন তার মাধুর্যহীন। সরু নাসারন্ধ্র, নারীসুলভ ভ্রূযুগল অর্থাৎ চোখমুখ ও সমগ্র অবয়বে যেন একটা বিশ্বাস-ঘাতকতা, ঔদ্ধত্যের ছাপ। শুধু তাই নয়, তারও চাইতে যেন কিছু বেশি। ভাষায় হয়তো তা প্রকাশ করার সাধ্য মেয়েটির নেই, কিন্তু উপলব্ধিটা তাকে বড় বিচলিত করে তুলেছে।

ইতিমধ্যে একজন বক্তা ওঠেন। নাম ভেলিয়ামিনভ। বঙ্কিম মুখ, শ্বশ্রু-মণ্ডিত, নাকে সোনার চশমা, মস্তকের চারদিকে স্বর্ণাভ পলিত কেশগুচ্ছ। আকুন্দিনের বক্তৃতার জবাবে তিনি বলেন ঃ

"...পর্বতশিখর থেকে সশব্দে তুষারের ধস নামে, তা যেমন সত্য, আপনিও তেমনি সত্য। আমরা অনেকদিন থেকেই ভাবছি, এক বিভীষিকার যুগ আসছে।

আপনি যে সত্যের কথা বলছেন, তার জয়ের লক্ষণ আমরা অনেকদিন আগে থেকেই দেখে আসছি।

"আপনারাই সর্বেসর্বা হবেন এবং আমাদের যে কোন অস্তিত্বই থাকবেনা, তা আমরা জানি। তবে আমরা একথাও জানি যে, কলের বাঁশী বাজিয়ে লোক জড় করে আপনারা যে জয়লাভ করতে চাচ্ছেন, যে চূড়ান্ত ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা করতে চাচ্ছেন, তার পরিণতি হবে রাশিকৃত এক বিশৃংখলা, ভগ্ন ইষ্টকের এক স্তূপ। মানুষ তার মধ্যে দিশা হারিয়ে ফেলবে, বেদনায় অসহায়ের মত আর্তনাদ করে উঠবে, 'বড় তৃষ্ণা, একটু জল'। যে পবিত্র ভগবৎপ্রেম মানুষের তৃষ্ণা নিবারণ করে তার এক বিন্দুও যে তখন থাকবে না। সাবধান!"—ভোলিয়ামিনভ তাঁর তর্জনী পেন্সিলের মত সোজা করে সামনের দিকে তুলে ধরেন এবং চশমার ভেতর দিয়ে শ্রোতৃমণ্ডলীর প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হেনে আবার বলেন—"যে স্বর্গরাজ্যের দিবাস্বপ্ন আপনারা দেখছেন--যার জন্য আপনারা মানুষকে যন্ত্রে পরিণত করতে চাচ্ছেন—সকল বৈচিত্র্য নষ্ট করে দিয়ে মানুষকে কেবল কতগুলি সংখ্যায় পরিণত করবেন ভাবছেন, সেই ভয়ংকর স্বর্গরাজ্যে দেখা যাচ্ছে এক নতুন বিপ্লবের ইঙ্গিত, প্রচণ্ডতম বিপ্লব—ভাববিপ্লব!"

আকুন্দিন তাঁর আসনে বসেই শান্ত ভাবে উত্তর দেয়ঃ

"মানুষকে কেবল সংখ্যায় পরিণত করা—উদ্ভট কল্পনা, বাড়াবাড়ি!"

ভোলিয়ামিনভ অবজ্ঞাভরে তাঁর দু'কাঁধ নাচান। মোমের আলোতে তাঁর টাকপড়া মাথা একবার চিকচিক করে ওঠে। তিনি তাঁর বক্তৃতায় বোঝাতে চেষ্টা করেন, পৃথিবী কিভাবে পাপে ডুবে যাচ্ছে এবং তার পরিণতি কি ভয়ংকর। শ্রোতাদের মধ্যে অনেকে কেশে গলা পরিষ্কার করবার চেষ্টা করে।

বিরামের সময় তরুণীটি খাবারের দোকানে যায়। দরজার পাশে দাঁড়িয়ে সে তীব্র দৃষ্টিপাত করে। পানশালায় সস্ত্রীক কয়েকজন ব্যারিস্টার চা-পানে রত—তারা গলা ফাটিয়ে কথা বলছে। চুল্লীর কাছেই বসে আছে বিখ্যাত লেখক চেরনোবিলিন, সে মাছ ও জামের চাটনি খাচ্ছে আর তার পাশ দিয়ে যারা যাতায়াত করছে তাদের দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করছে। মদে তার আঁখি ঢুলুঢুলু। মধ্যবয়সী দু'জন সাহিত্যসেবিকা দোকানের একপাশে বসে স্যান্ডউইচ খাচ্ছে আর তার চপচপ শব্দ শোনা যাচ্ছে। গ্রীবাদেশ তাদের অপরিচ্ছন্ন অধৌত, বাঁকা চিরুনি দিয়ে মাথার চুল বাঁধা। সাধারণ লোক থেকে একটু দূরে একপাশে কয়েকজন ধর্মযাজক গাম্ভীর্যের ভাব নিয়ে পায়চারি কচ্ছে। ঝাড়ের নীচে সমালোচক চির্ভা কার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে। লম্বা ফ্রককোটের প্রান্তভাগটা সে ধরে রেখেছে হাতে। চুলে পাক ধরেছে, গর্ব করেই যেন চুল অবিন্যস্ত রাখা হয়েছে। দাঁড়িয়েছে সে গোড়ালির ওপর জোর দিয়ে সোজা হয়ে। ভোলিয়ামিনভ ঘরে ঢুকতেই একজন সাহিত্যসেবিকা তাড়াতাড়ি উঠে তাঁর কাছে যায় এবং তাঁর জামার আস্তিনটা অকস্মাৎ চেপে ধরে। অপর [illegible] উদ্বেগে খাওয়া বন্ধ

করে রুটির গুঁড়োগুলি জামা থেকে ঝেড়ে ফেলে গলাটা সামনের দিকে একটু বাড়িয়ে বিস্ফারিত লোচনে তাকিয়ে থাকে। বেসনভ তার কাছে এগিয়ে আসে এবং দক্ষিণে ও বামে কিঞ্চিৎ অংগহেলন করে ভব্যতা প্রকাশ করে।

ভদ্রমহিলা তার অংগবাসের মধ্যে কেমন যেন একটু আড়ষ্ট ও শক্ত হয়ে ওঠে। কালো পোশাকপরা মেয়েটির দৃষ্টি তা এড়ায়নি। বেসনভ মৃদুহাস্যে তাকে যেন কি বলে। সাহিত্যসেবিকা তার মেদবহুল দু'হাতে তালি বাজিয়ে হো হো করে হেসে ওঠে। দু'চোখে যেন তার আনন্দ আর ধরেনা।

মেয়েটি তার দু'কাঁধ ইষৎ উত্তোলিত করে দোকান থেকে চলে যায়। কে একজন তাকে নাম ধরে ডাকে। অনুজ্জ্বল গায়ের রং, কৃশ তনু, বেগুনে রংএর জ্যাকেট গায়ে একটি যুবক ভীড় ঠেলে এগিয়ে আসছে তার দিকে। তাকে দেখে যুবকটির অপার আনন্দ হয়েছে। তার কাছে এসে সে বার বার নতশির হয়ে অভিনন্দন জানায় এবং ব্যগ্রতায় নাসিকা কুঞ্চিত করতে থাকে। ভেজা হাতে সে মেয়েটির হাত চেপে ধরে। তুষারসিক্ত এক গোছা চুল এসে যুবকটির কপালে পড়েছে। কালো দুটি চোখে চেয়ে আছে সে মেয়েটির দিকে, তার চাহনি যেন তুষারের মতই কোমলতায় ভরা। নাম তার আলেকজান্দার ইভানোভিচ জিরভ। সে বলেঃ

"আপনি এখানে? এখানে কিসের জন্য এসেছেন দারিয়া দ্মিত্রেভ্না?"

সে উত্তর দেয়ঃ "আপনি যে জন্য এসেছেন আমিও সেজন্যই।" দাশা নিজের হাত ছাড়িয়ে নিয়ে রুমালে ঘষে গরম করে নেয় এবং পরে তাতে দস্তানা পরিয়ে দেয়।

যুবকটি আনন্দে একটু চাপা হাসি হাসে। দৃষ্টিতে যেন তার আরো মাধুর্য ফুটে ওঠে।

"ভালো, সাপোঝকভের কথা কি আপনার ভাল লাগেনি? একজন ঋষির মত তিনি আজ বললেন। তাঁর উগ্রতা ও বলার বিশেষ ভংগি হয়ত আপনার বিরক্তির কারণ হতে পারে; কিন্তু তিনি যে কথাগুলি বললেন তার যদি সারাংশ নেওয়া যায় তবে কি একথাই বলতে হয়না যে, যেকথা আমাদের মনে গুমরে মরছে অথচ মুখ খুলে বলতে সাহস পাচ্ছিনে, সেকথাই তিনি আজ বললেন? তিনি কিন্তু বলতে একটুও কুণ্ঠিত হলেন না। এ যেনঃ

> শিশু, মোরা শিশু, অতি শিশু,
> উদরে মোদের নারকীয় ক্ষুধা,
> আকাশ গিলিব মোরা।

অপূর্ব, অভিনব, কি সাহস! একটা নতুন কিছু ভীড় করে আসছে, এটা কি আপনি উপলব্ধি করতে পাচ্ছেন না, দারিয়া দ্মিত্রেভ্না? যা আমাদের নিজস্ব, যা নতুন, যা অপ্রত্যাশিত, যা দুর্লভ—তাই যেন আসছে! আকুন্দিন, হ্যাঁ সেও! সে বড় বেশি যুক্তিবাদী, কিন্তু তার বক্তব্যকে কি সুন্দরভাবে সে

প্রকাশ করে! আর দু'তিন বছর যাক্ দেখবেন সব কিছু ভেঙে পড়বে, খণ্ড খণ্ড হয়ে যাবে।—কি মজা!"

অনুচ্চ কণ্ঠে বেশ হাসতে হাসতে সে কথাগুলি বলে। দাশার মনে হয়, লোকটার সর্বাঙ্গ যেন প্রচণ্ড আবেগে থরথর করে কাঁপছে। যুবকের কথা শেষ হবার অপেক্ষায় না থেকে একবার মাথা নেড়ে সে কোনরকমে নিজের পথ করে নেয় এবং বস্ত্রাদি রাখার ঘরের দিকে চলে যায়।

অসন্তুষ্ট ও বিরক্ত পরিচারক, বাহুতে তার রাশীকৃত কোট ও হাতে অনেক-গুলো জুতো। দাশা যে তার দিকে টিকিটখানা বাড়িয়ে ধরেছে, সেদিকে তার নজরই পড়েনি।

সুইং-ডোরের পাশে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করছে সে। অদূরে গ্রাম্য নীল পোষাক পরা গাড়োয়ানরা হাঁকছে:

"আমার গাড়ী নিন দয়া করে জবর ঘোড়া আছে!"

"পেস্কি যাবেন তো এদিকে আসুন!"

হঠাৎ দাশার পিছনে বেসনভের কণ্ঠস্বর শোনা যায়:

"ও কর্তা, আমার কোট, টুপী, ছড়ি?"

দাশা যেন তীব্র কষাঘাত অনুভব করে। সহসা মুখ ঘুরিয়ে সে সোজা বেসনভের চোখের দিকে তাকায়, দেখে বেসনভ বেশ শান্ত ভাবেই চেয়ে আছে। মনে হয় এই যেন তার প্রাপ্য, কিন্তু অকস্মাৎ বেসনভের চোখের পাতায় চাঞ্চল্য দেখা দেয়, কটা চোখ দুটো যেন জ্বলজ্বল করে ওঠে যেন এক ঝলক বিদ্যুৎ খেলে যায়, মনে হয় আত্মসমর্পণ। দাশার হৃদয়েও কম্পন শুরু হয়।

"আপনার বোনের বাড়িতে আপনার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল, না?"

সামান্য নতজানু হয়ে বেসনভ জিজ্ঞেস করে।

দাশা তৎক্ষণাৎ অকম্পিত কণ্ঠে জবাব দেয়:

"হ্যাঁ হয়েছিল।"

পরিচারকের হাত থেকে ফ্রককোটটা প্রায় ছিনিয়ে নিয়ে দশা দ্রুতপদে ফটকের দিকে চলে যায়। বাইরে ভীষণ ঠাণ্ডা হাওয়া, জলো হাওয়া—তার জামায় বিন্দু বিন্দু বৃষ্টির জল পড়তে থাকে। ফ্রককোটের কলারের মধ্যে সে মুখ ঢুকিয়ে দেয়, কেবল চোখদুটো খোলা থাকে। একজন পথচারী প্রায় তার কানের কাছে এসে বলে:

"কিগো, সুনয়না!"

ভেজা পীচঢালা রাস্তায় বিজলী বাতি পড়ে চিকচিক করছে। দাশা দ্রুত পদক্ষেপে এগিয়ে চলে। একটা রেস্তোরাঁর খোলা জানালা দিয়ে বেহালার সুর ভেসে আসছে। দাশা কোনদিকে দৃকপাত না করে কোটের কলারের মধ্যে মুখ লুকিয়ে খালি আপন মনে বলে চলে:

"অত সোজা নয়! অত সোজা নয়!"

॥ তিন ॥

বাড়িতে ঢুকতেই পড়ে হলঘর। সেখানে ভেজা কোটটা খুলে রেখে দাশা পরিচারিকাকে জিজ্ঞেস করে ঃ

"বাড়িতে বুঝি কেউ নেই ?"

পরিচারিকার নাম লুশা। তার চোয়াল দুটো অস্বাভাবিক বড়। মুখে সে এত বেশি পাউডার মাখে যে দেখে একটা রংকরা পুতুল বলে মনে হয় তাকে। সেজন্য সবাই তাকে গ্র্যাণ্ড মোগল বলে ডাকে। আয়নায় দাশার প্রতিবিম্বটা পড়েছে। সেদিকে তাকিয়ে সে মিহি সুরে জবাব দেয়, গৃহকর্ত্রী বাইরে গেছেন, তবে কর্তা বাড়িতেই তাঁর পড়ার ঘরে আছেন ; আরো বলে যে, আধ ঘণ্টার মধ্যেই কর্তা তাঁর নৈশভোজন সারবেন।

দাশা ড্রইংরুমে চলে যায়। বিরাট পিয়ানোটার ধারে গিয়ে সে বসে, এক পায়ের ওপর আরেক পা তুলে দিয়ে দুহাতে জানু পরিবেষ্টন করে ধরে।

জামাইবাবু বাড়িতে আছেন—ব্যাপার কি ? নিশ্চয়ই দিদির সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে। তবে তো মেজাজ তাঁর খিচড়ে আছে। তাকে দেখতে পেলেই তিনি দিদির মুণ্ডপাত করে ছাড়বেন। রাত এগারটা, তিনটের আগে তো কিছু করবারও নেই, তিনটে বাজলে তবে তো শোয়া যেতে পারে। পড়া ?—কিন্তু কি পড়বে ? যাই হোক, সে পড়তে চায় না। বসে বসে চিন্তা করা আরো খারাপ হবে। সময় সময় জীবনটা কেমন বিস্বাদ মনে হয়।

দাশা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করে, পিয়ানোটা খোলে এবং এক পাশে বসে এক হাতে স্ক্রিয়াবিনের একটা গৎ বাজাবার চেষ্টা করে। ঊনিশ বছর বয়েসটা বড় সুবিধের নয়, বিশেষ করে এমন কোন মেয়ের যে মেয়ের বুদ্ধি আছে, কাছে প্রচুর প্রলোভনের জিনিস আছে কিন্তু খুঁতখুঁতে প্রকৃতির জন্য যে কিছুই গ্রহণ করতে পারে না—এতগুলি পুরুষ শুধু তার সঙ্গে একটু মেলামেশার জন্য লালায়িত, অথচ তাদের প্রতি অকারণেই সে কি কঠোর !

আইন পড়বার জন্য দাশা এক বছর হল সামারা থেকে পিতার্সবুর্গে এসেছে। এখানে এসে সে তার বড় বোনের বাড়িতে আছে। দিদির নাম একাতেরিনা দমিত্রেভ্না স্মোকোভ্নিকভ। তার ভগ্নিপতি একজন নামকরা উকিল, বেশ পসার, সুখে-স্বচ্ছন্দেই আছেন তাঁরা।

দিদির চেয়ে দাশা পাঁচ বছরের ছোট। কাতিয়ার যখন বিয়ে হয় তখন দাশা একেবারেই নাবালিকা। বিয়ের পর দুবোনের দেখা হয়েছে খুব কমই ; কাজেই দুজনের মধ্যে একটা নতুন সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। দাশা দিদির প্রতি শ্রদ্ধাশীলা আর দিদি ছোট বোনের প্রতি স্নেহপরায়ণা।

গোড়ার দিকে এসে দাশা দিদির সব কিছু অন্ধভাবে নকল করে ; দিদির

রূপ, দিদির রুচি, দিদির চালচলনের প্রশংসায় সে পঞ্চমুখ। প্রথম দিকটায় কাতিয়ার বন্ধুবান্ধবদের কাছে সে কেমন সংকুচিত হয়ে পড়ত, আবার সময় সময় কারো কারো কাছে লজ্জার আতিশয্যই তাকে প্রগল্‌ভ করে তুলত।

বাড়িটাকে আধুনিক রুচির পীঠস্থান করে তুলতে কাতিয়ার চেষ্টার অন্ত নেই। যেসমস্ত নতুন জিনিস এখনো সাধারণ লোকের কাছে সহজলভ্য হয়ে ওঠেনি সেগুলি সে সংগ্রহ করে এনে ঘর সাজায়; চিত্রকলা প্রদর্শনী একটাও তার বাদ যায় না; ফিউচারিস্ট্‌দের আঁকা ছবিগুলি সে কিনে আনে। গতবছর এ নিয়ে স্বামীর সঙ্গে তার খুব কথা কাটাকাটি হয়ে গেছে; কারণ যেসমস্ত ছবির ভাব সুস্পষ্ট সেগুলিই নিকলাই ইভানোভিচ পছন্দ করেন, কিন্তু কাতিয়ার মধ্যে একটা নারীসুলভ ফ্যাশনের মোহ আছে, নতুন আর্ট সে বুঝুক না বুঝুক তাতে কিছু এসে যায় না, লোকে তো বলতে পারবে না যে তার আধুনিক রুচি নেই।

ড্রইং-রুমে টাঙানো এই সমস্ত অদ্ভুত ছবির প্রশংসা দাশাও করে। তবে সময় সময় তার মনে হয়, জ্যামিতিক ভঙ্গীতে আঁকা চতুষ্কোণ বিশিষ্ট এসব ছবি, কতগুলি অতিরিক্ত হাত-পা, বিরক্তিকর ফিকে অনুজ্জ্বল রং --এবং এই সমস্ত ছাঁচে ঢালা অর্থহীন আর্টের যথার্থ মর্ম উপলব্ধি করতে পারার মত মাথা তার নেই।

প্রতি মঙ্গলবারই রাত্রে স্মোকভ্‌নিকভের বাড়িতে তাঁর বন্ধুবান্ধবদের নৈশভোজনে আপ্যায়িত করা হয়। জনসমাগমে বাড়ীটি বেশ সরগরম হয়ে ওঠে। নারী ও অতিআধুনিক সাহিত্য সম্পর্কে অত্যুৎসাহী মুখর ব্যারিস্টারবর্গ; দু'তিনজন সাংবাদিক যারা মনে করে দেশের স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্র নীতি কি হওয়া উচিত একমাত্র তারাই তা ভাল বোঝে; উৎকট সাহিত্য সমালোচক চির্ভা যে সর্বদাই বলে থাকে সাহিত্যের আর আশা নেই—এ ধরনের সমস্ত লোকের ভীড় হয় সে বাড়িতে। তরুণ কবিরাও কখনো কখনো আসে; তবে তারা একটু আগেই আসে এবং তাদের কবিতার পাণ্ডুলিপি হলঘরে ওভারকোটের পকেটে ফেলে রেখে যায়। আহারের ঠিক পূর্বক্ষণে আসে একজন নামজাদা লোক। ধীর পদক্ষেপে প্রবেশ করেই সে কাতিয়ার হস্তচুম্বন করে এবং তার জন্য নির্দিষ্ট আরাম কেদারায় সে বেশ ভারিক্কী চালে বসে পড়ে। ভোজন আরম্ভ হয়—জুতোর ঠকঠক শব্দ—অকস্মাৎ একজন মোলায়েম সুরে বলে ওঠেঃ

"গ্র্যান্ড মোগল, কুশল ত ?"

তার পরমুহূর্তেই পেশাদার মঞ্চের একজন লোলচর্ম অভিনেতাকে বলতে শোনা যায়ঃ

"কাতিয়া—তোমার ছোট থাবা !"

দাড়িগোঁফ পরিষ্কার করে কামানো। কথা বলার জন্য তিনি কাতিয়ার চেয়ারের পেছনদিক দিয়ে গলাটা বাড়িয়ে দেন।

এই ভোজপর্বে দিদিকেই সব কিছুর কেন্দ্র বলে দাশার মনে হয়। ছলা-

কলাহীন দিদির আপ্যায়নে কেউ যদি বিশেষ সাড়া না দেয়, দাশা তার ওপর মনে মনে অত্যন্ত চটে যায়; আবার কাতিয়ার দিকে কেউ বেশি নজর দিলেও তার রক্ষা নেই, দাশা ঈর্ষান্বিতা হয়ে ওঠে—রাগে তার দিকে কটমট করে তাকায়।

গোড়ায় দাশা কেমন হতভম্ব হয়ে যেত, এখন সে অনেকটা সামলে নিয়েছে। এই লোকজনের ভীড়ে কি করে চলতে হয় সে জানে। জুনিয়র ব্যারিস্টারদের সে ঘৃণাই করে, তাদের অদ্ভুত পোশাক তার মোটেই ভাল লাগে না। নামকরা সেই অভিনেতাটিকেও সে পছন্দ করে না। তার দিদিকে "কাতিয়া" বলে সম্বোধন করার কি অধিকার আছে তার? পরিচারিকাকেই বা তিনি "গ্র্যান্ড মোগল" বলে ডাকবেন কেন? এক গ্লাস ভদকা পান করে মাতালের মত ঝিমোতে ঝিমোতে দাশার দিকে চেয়ে কেন তিনি বলেন--"সুরা পান করে ঐ পুষ্পশোভিত আলমন্ড গাছটার মতই আমি পরিপূর্ণতা লাভ করি।"

যতবারই তিনি এরকম করেন ততবারই দাশা রেগে আগুন হয়। সত্য বটে দাশার গণ্ডদেশ গোলাপের মত রক্তিম, কিন্তু এই ভব্য সমাজে তার নিজেকে একটা রংকরা গেঁয়ো কাঠের পুতুল ছাড়া আর কিছু মনে হয় না।

গ্রীষ্মের ছুটিতে দাশা সামারায় তার বাবার কাছে গেল না, কেননা সেখানে বড্ড ধুলো ও গরম। সেস্ত্রবেৎস্কে সমুদ্রতীরে দিদির সঙ্গে সে বেড়াতে যায়। শীতকালে যাদের সঙ্গে মেলামেশা হত সেখানেও তাদেরই সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ, তবে ঘনিষ্ঠতা একটু বেড়ে যায়—নৌকাবিহার, সমুদ্রস্নান, দেবদারু গাছের তলায় বসে বরফ খাওয়া, সন্ধ্যাবেলা বসে গান শোনা, কাসিনোর বারান্দায় রাত্রি-বেলা তারকাখচিত আকাশের নীচে বসে সকলের একসঙ্গে ভোজন ও গল্প-গুজব করার মধ্য দিয়ে দিনগুলি বেশ আনন্দেই অতিবাহিত হয়।

কাতিয়া বোনের জন্য এম্ব্রয়ডারি করা একটা সাদা পোশাক, কালো ফিতে লাগানো সিল্কের একটা বড় সাদা টুপি এবং সিল্কের একটা সুন্দর কোমরবন্ধ বানিয়ে দেয়। ভগ্নিপতির সহকারী নিকানর য়ুরেভিচ কুলিচক হঠাৎ দাশার প্রেমে পড়ে যায়। মনে হয়, সে যেন দাশার সৌন্দর্য অকস্মাৎ আবিষ্কার করে ফেলেছে।

কিন্তু সে নীচুঘরের লোক। দাশা রেগে গেছে। একদিন সে তাকে বেড়া-বার জন্য আমন্ত্রণ করে বনের মধ্যে নিয়ে যায়। সেখানে দাশা তাকে স্পষ্টই জানিয়ে দেয়, সে যেন তাকে সাধারণ মেয়ে বলে মনে না করে, তার আচরণে সে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়েছে এবং তার এই দুরাশার কথা ভগ্নিপতিকে সে অচিরেই জানিয়ে দেবে। কুলিচককে আত্মপক্ষ সমর্থনের কোন সুযোগই সে দেয় না। কুলিচক কেবল হাতের রুমাল দিয়ে তার ঘর্মাক্ত ললাট বার বার মোছে।

সেদিনই সন্ধ্যাবেলা দাশা কার্যত তার ভগ্নিপতিকে একথা বলেও দেয়। নিকলাই ইভানোভিচ চুপ করে তার সব কথা শোনেন এবং কেবল দাড়িতে তিনি মৃদু অঙ্গুলি সঞ্চালন করেন। দেখেন তিনি, ক্রোধে দাশার মুখচোখ লাল হয়ে

উঠেছে, এত চটে গেছে যে তার মাথার টুপিটা পর্যন্ত কাঁপছে। তন্বী, শুভ্র দাশার দিকে তিনি বিস্মিত হয়ে চেয়ে থাকেন। তারপর তিনি জলের ধারে বালির ওপর বসে পড়েন এবং হো হো করে হেসে ওঠেন। পকেট থেকে রুমাল বার করে তিনি তার চোখ দুটো মুছে নেন এবং বলেন ঃ

"চলে যাও, চলে যাও, দারিয়া, না হলে মরব!"

দাশা এর অর্থ কিছুই বোঝে না। একটু অপ্রস্তুত হয়েই সে চলে যায়। কুলিচক আর দাশার দিকে তাকাতেও সাহস পায় না ঃ চেহারা তার অনেকটা রোগা হয়ে গেছে। কারো সঙ্গে সে বড় একটা মেশে না, একা থাকে। দাশার ইজ্জত রক্ষা হয়; কিন্তু কৌমার্যের গর্বে যেসব অনুভূতি তার সুপ্ত ছিল সেই ব্যাপারটা যেন অপ্রত্যাশিতভাবে সেগুলিকে জাগিয়ে দেয়। কোথায় যেন একটা কি গরমিল হয়ে গেছে তার মনের সেই অনাবিল শান্তি নেই আর, সমস্ত দেহেও যেন তার প্রতিক্রিয়া হচ্ছে, আপাদমস্তক পরিবর্তন, সে যেন আর একটা মানুষ হয়ে গেছে—ফাঁকা, স্তব্ধ, কিম্ভূতকিমাকার, ভেতরে ভেতরে একটা অস্বস্তি। মর্মে মর্মে সে উপলব্ধি করছে, মনে যেন একটা আবিলতা এসে গেছে, এই অদৃশ্য মাকড়সার জাল সে ছিন্ন করে ফেলতে চায়। সে চায় আবার হাল্‌কা, প্রফুল্ল ও সজীব হতে।

প্রত্যহ সে একটানা কয়েক ঘণ্টা করে টেনিস খেলে, দিনে দু'বার সমুদ্র স্নান করে, প্রতিদিন প্রত্যুষে ঘুম থেকে ওঠে। এত সকালে ওঠে যে, তখনও ঘাসের ওপর শিশিরবিন্দু মুক্তার মত ঝলমল করতে থাকে, আরশিসদৃশ সাগরবক্ষের ওপর কুয়াশার একটা পর্দা দেখা যায়, খালি বারান্দায় চেয়ারগুলি তখনো পর্যন্ত ভেজা অবস্থায়ই দৃষ্ট হয় এবং সিক্ত বালুপথ ঝাঁট দেওয়া হতে থাকে।

কিন্তু দিনের আলো যখন স্পষ্ট হয়ে ওঠে অথবা রাত্রিতে সে যখন কোমল শয্যায় শুয়ে পড়ে তখন তার মধ্যে আরেকটা মানুষ চাড়া দিয়ে ওঠে, চুপে চুপে হাত বাড়িয়ে সেই মানুষটা যেন তার হৃদয়টাকে নিংড়ে নিতে থাকে। দাশা যেন তাকে উৎপাটন করতে পারে না, মন থেকে ধুয়েমুছে ফেলতে পারে না। যতই সে ভুলে যাবার চেষ্টা করে ততই যেন সে আরো চেপে বসে।

বন্ধুবান্ধব সকলেই বিশেষ করে তার বোন কাতিয়া সবার আগেই এটা লক্ষ্য করেছে যে, দাশা যেন এবার গরমের সময় বেশ সুশ্রী হয়ে উঠেছে এবং প্রতিদিনই তার দেহের লাবণ্য বেড়ে যাচ্ছে। কাতিয়া একদিন সকালবেলা তার বোনের ঘরে এসে বলে ঃ

"ভালো, দাশা, তারপর কি হবে?"

"তুই কি বলতে চাস, দিদি?"

দাশা একটা শেমিজ পরে আছে। বিছানায় বসে সে চুল বাঁধছে।

"তুই যে দিনদিনই রূপসী হয়ে উঠছিস। এই রূপের ডালি নিয়ে এখন আমরা কি করি বল তো?"

দিদির দিকে একবার কটমট করে চেয়ে দাশা ঘুরে বসে। তার কর্ণমূল পর্যন্ত লাল হয়ে ওঠে।

"দিদি, আমি চাইনে তোর মুখ দিয়ে এ ধরনের কথাবার্তা বেরোয়—বুঝলি ?"

একাতেরিনা দ্মিত্রেভ্না বিছানার ওপর বসে পড়ে। দাশার অনাবৃত পিঠের দিকে সে গাল বাড়িয়ে দেয়, তার ঘাড়ের নিচে চুম্বন করে সে হেসে ওঠে।

"আমরা বড্ড রাগী, যেন এক একটি বনবেড়াল—না রে!"

একদিন টেনিস খেলার মাঠে একজন ইংরেজ এসে উপস্থিত। লিকলিকে চেহারা, গোঁফদাড়ি কামানো চ্যাপটা চৌকো চিবুক, দৃষ্টি সরল। বেশভূষায় এমন ফিটফাট যে, কাতিয়ার স্তাবক যুবকদলের মধ্যে অনেকে যেন একটু দমেই যায়। তার সঙ্গে টেনিস খেলার জন্য সে দাশাকে আহ্বান করে। ঠিক একটি মেশিনের মত সে খেলে যায়। দাশার মনে হয়, খেলার সময় যুবকটি একবারও যেন তার দিকে তাকায়নি, কিন্তু তার দিকে মুখ করেই তো তাকে খেলতে হয়েছে। দাশা হেরে যায়, আর একবার যুবকটি খেলার প্রস্তাব করে। খেলতে আরো সুবিধে হবে বলে দাশা তার সাদা ব্লাউজের আস্তিন গুটিয়ে নেয়। তার সাদা টুপির ভেতর থেকে চুলের একটি গুচ্ছ বেরিয়ে পড়েছে, পেছন দিকে তা সরিয়ে দেবার কোন চেষ্টাই সে করে না। বলটাকে দাশা এমনভাবে রিটার্ন দেয় যে, মনে হয় বলটা বুঝি জালটাকে প্রায় ছুঁয়েই গেল। আপন মনে সে ভাবতে থাকে:

"দক্ষ রুশ মেয়ের সমগ্র চালচলনেই একটা অপূর্ব মাধুর্য আছে এবং তার গণ্ডদেশের লালিমা অত্যন্ত মনোরম ..."

এবারও খেলায় ইংরেজ যুবকটিরই জয় হয়। একটু অবনত হয়ে দাশাকে সে সম্ভ্রম জানায়। একটা দামী সিগারেট ধরিয়ে নিকটেই সে বসে এবং লিমনেডের অর্ডার দেয়।

একজন ছাত্রের সংগে তৃতীয় সেট খেলতে গিয়ে দাশা আড়চোখে বার কয়েক ইংরেজ যুবকটিকে দেখে নেয়। যুবকটি একটি টেবিলের ধারে স্থির হয়ে বসে সমুদ্রের দিকে চেয়ে আছে, সিল্কের মোজা পরা একটা পা হাঁটুর ওপর তুলে গোড়ালিতে হাত বুলোচ্ছে।

রাত্রে বিছানায় শুয়ে দাশার এই সমস্ত কথা মনে পড়ে যায়। সেই টেনিস খেলার মাঠে ছুটোছুটি, সেই মুখের গোলাপী আভা, সেই টুপির ভেতর থেকে বেরিয়ে পড়া একটি চুলের গোছা—সমস্ত ছবি যেন স্পষ্ট হয়ে তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। তার মনে এমন একটা অনুভূতি আসে যা চেপে রাখা তার পক্ষে প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে, আহত অভিমানে সে কেঁদে ফেলে।

সেদিন থেকে টেনিস কোর্টে যাওয়া সে বন্ধ করে দেয়। একদিন একাতেরিনা দ্মিত্রেভ্না তাকে বলে:

"দাশা, তোর কথা মিঃ বেইলি রোজই জিজ্ঞেস করেন—তুই আর খেলতে যাসনে কেন?"

দিদির কথা শুনে দাশা যেন একটু চমকে ওঠে, বাকশক্তি তার রোধ হয়ে আসে। তারপর হঠাৎ সে উষ্মা প্রকাশ করে বলে বসে যে, যতসব বাজে কথা শোনার মত প্রবৃত্তি তার নেই, আর মিঃ বেইলি বলে কোন লোককে সে জানেও না বা জানতে চায়ও না। তাছাড়া সেই লোকটার একথা ভাবাও ধৃষ্টতা যে তারই জন্য সে টেনিস খেলা বন্ধ করেছে। টেনিস খেলার কোন অর্থ হয়!

খেতে গেল না সে। কিছু রুটি ও গুজবেরি ফল পকেটে পুরে সে জঙ্গলে চলে যায়। দেবদারু গাছ থেকে যে ধুনো বেরিয়েছে তার গন্ধ হাওয়ার সঙ্গে মিশে চারদিক আমোদিত করেছে, লম্বা লম্বা গাছের মধ্য দিয়ে বিচরণ করতে করতে দাশা এসে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছায় যে, এই বিষম সত্য আর বেশি-দিন চেপে রাখা যায় না: ইংরেজ যুবকটিকে সে ভালবাসে এবং এজন্যই তার যত অশান্তি।

এভাবে আবার ধীরে ধীরে দাশার মধ্যে সেই দ্বিতীয় মানুষটি জেগে ওঠে। প্রথম দিকে দাশা যেন এ অবস্থাটা বরদাস্ত করতে পারত না, মনটা তার বিষিয়ে উঠত, কিন্তু এখন এ অবস্থাটা তার অনেকটা গা-সওয়া হয়ে গেছে। গরমের সময় মুক্ত হাওয়া সেবন ও শীতল জল পানের পর মানুষ আবার যেমন শীত-কালে সেই শীতবস্ত্রে নিজের দেহকে আবৃত করতে অভ্যস্ত হয়ে যায়, দাশাও এখন এই ব্যাপারে ঠিক তেমনি অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। ইংরেজ যুবকের প্রতি তার অনুরাগ ছিল একতরফা, দিন পনের তা স্থায়ী হল। নিজের প্রতি দাশার যেন একটা ঘেন্না এসে গেল, লোকটার ওপর হল তার বিষম রাগ। সে যখন শখ করে হাল্কাভাবে টেনিস খেলত বা রুশ নাবিকদের সঙ্গে বসে আহার করত, দাশা তখন মাঝে মাঝে দূর থেকে তার দিকে তাকাত, কেবলই তার মনে হত এমন চমৎকার মানুষ কি পৃথিবীতে দ্বিতীয়টি আছে?

তারপর একদিন দেখা গেল সাদা ফ্লানেলের জামা পরিহিতা একটি লম্বা রোগাপানা মেয়ে এসে তার সঙ্গে যোগ দিল—মেয়েটি ইংরেজ এবং যুবকটির প্রণয়িনী—তারা দুজনে চলে গেল। সারা রাত দাশার ঘুম হল না: নিজের প্রতি তার ধিক্কার এসে গেল—সকালের দিকে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল, এমন ভুল জীবনে আর সে করবে না।

এই সংকল্প করার পর মনে শান্তি ফিরে এল। কত সহজে এবং কত তাড়াতাড়ি সমস্ত ব্যাপারটার অবসান হয়ে গেল, তা ভেবে সে যেন একটু বিস্মিত হয়। কিন্তু সত্যি কি সব কিছু মিটে গেছে? দাশা ভাবে, সেই ভূতটা তার মধ্যে একেবারে মিলিয়ে গেছে, তাকে সে হজম করে ফেলেছে তার আর কোন অস্তিত্বই নেই, এখন সে একেবারে অন্য মানুষটি হয়ে গেছে, মন তার সেই আগেকার মতই হাল্‌কা, কোন ক্লেদই আর নেই, তবে যেন আরো

কোমল, আরো সূক্ষ্ম, আরো রহস্যময় হয়ে উঠেছে বিষয়টা। আয়নার দিকে তাকালে নিজের মুখ যেন চিনতেই পারেনা দাশা—বিশেষ করে চোখ দুটোকে তো নয়ই। এই তার চোখ! দেখলে মাথা ঘুরে যায়।

আগস্টের মাঝামাঝি স্মোকোভনিকভ সস্ত্রীক পিতার্সবুর্গে তাঁর ফ্ল্যাটে ফিরে এলেন—দাশাও তাঁদের সংগে এল। আবার আরম্ভ হলঃ সেই মংগলবারের সান্ধ্য মজলিস, চিত্র প্রদর্শনী, থিয়েটারগুলিতে কোলাহলপূর্ণ প্রথম রজনী, আদালতসমূহে যত কেচ্ছাপূর্ণ মামলা, ছবি খরিদ, শহরের বাইরে অবস্থিত সমরকন্দ রেস্তোরাঁয় সেই সারারাত্রিব্যাপী কদর্য নাচগান হল্লা, সেই যাযাবরী তান্ডব—সেই তার্কিক মদ্যসেবী প্রেমিকও আছেন, হাওয়া পরিবর্তনে গিয়ে এক ঝরণার খনিজ জল খেয়ে তাঁর তেইশ পাউন্ড মেদ কমে গেছে। এসমস্ত উদ্দাম আমোদপ্রমোদ তো আছেই; তদুপরি সবারই মুখে এক প্রবল গুজব—একটা পরিবর্তন আসছে।

গভীরভাবে চিন্তা করা বা ভাববার মত সময় আজকাল দাশার নেই। সকাল বেলা ক্লাস; বেলা চারটায় দিদির সংগে বাজার করা; সন্ধ্যার দিকে থিয়েটার, সংগীতের আসর, নৈশভোজন, লোক সমাগম—সারাদিনের মধ্যে একটি নীরব মুহূর্তও নেই।

এক মংগলবার নৈশভোজনের পর সকলে বসে সুরা পান করছে; আলেক্সি আলেক্সিয়েভিচ বেসনভ তখন ড্রইংরুমে ঢোকে। তাকে দরজার কাছে দেখেই কাতিয়ার মুখ লাল হয়ে ওঠে। আলোচনার স্রোত বন্ধ হয়ে যায়। বেসনভ একটা সোফায় বসে কাতিয়ার কাছে এক কাপ কফি চেয়ে নেয়।

সাহিত্যরসিক দুজন ব্যারিস্টার বেসনভের পাশেই বসে আছে। তাদের দিকে ভ্রূক্ষেপও না করে সে কাতিয়াকে একবার তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে দেখে নেয় এবং বলে আর্টফার্ট, ওসব কিচ্ছু নয়, সব বাজে। ভারতীয় ফকিরের দড়িখেলার মতই ওটা একটা ভোজবাজী।

"কবিতা বলতেও কিছু নেই। বহুদিন আগেই ওসব লোপ পেয়ে গেছে—জনগণ, শিল্প--এসমস্তের কি কোন অস্তিত্ব আছে? রুশিয়া এক গলিত মাংসপিন্ডে পরিণত হয়েছে, এক ঝাঁক ক্ষুধার্ত কাক তার ওপর চড়ছে, কাকের নেমন্তন্ন। আর কবিতা যারা লিখছে তাদের জন্য নরকের পথ খোলাই আছে।"

নিরুত্তর নিম্নস্বরেই কথাগুলি বলে সে। তার ক্ষুব্ধ নিষ্প্রভ মুখের দুটি স্থান রক্তিম হয়ে ওঠে, কোটের নরম কলার কুঞ্চিত হয়ে যায়, সিগারেটের ছাই কোটের ওপর পড়ে জমে ওঠে, হাতের কাপ থেকে ঝলক খেয়ে কফি কার্পেটের ওপর ফোঁটা ফোঁটা করে পড়তে থাকে।

সাহিত্যরসিক দুজন তার সংগে তর্ক করতে ইচ্ছুক, কিন্তু তাদের সে আমলই দিল না। কাতিয়ার দিকে আর একবার প্রগাঢ় দৃষ্টিপাত করে সে তার কাছে এগিয়ে যায়। তার কথাগুলি দাশার কানে আসেঃ

"লোকের সঙ্গ আমার ভাল লাগে না। মাফ করবেন, আমি যাই।"

আরো খানিকক্ষণ থেকে গিয়ে কিছু পড়ে শোনাবার জন্য কাতিয়া তাকে বিনীতভাবে অনুরোধ করে; কিন্তু সে ঘাড় নেড়ে না জানায়। যাবার সময় আদব জানাতে গিয়ে সে কাতিয়ার হাতটা এতক্ষণ চেপে ধরে যে, লজ্জায় কাতিয়ার আপাদমস্তক লাল হয়ে যায়।

বেসনভ চলে যাবার পর তর্কের ঝড় ওঠে। সকলেই একবাক্যে বলে, "সব কিছুরই একটা সীমা থাকা উচিত। ভদ্রসমাজে এসে এভাবে সকলকে সরাসরি অসম্মান করা—এ কিছুতেই বরদাস্ত করা যায় না।" সমালোচক চির্ভা প্রত্যেককে বলেনঃ "মশায়, তিনি যে মদে একেবারে চুরচুর হয়ে এসেছিলেন।" কিন্তু মহিলারা সিদ্ধান্ত করেঃ "তিনি নেশা করেই বসে থাকুন বা তাঁর নিজের কোন বিশেষ ভাবে বিভোর হয়েই তিনি এখানে দেখা দিয়ে থাকুন—একটা চমৎকার ব্যক্তিত্ব আছে তাঁর এবং সকলে যত তাড়াতাড়ি তা উপলব্ধি করবেন ততই মঙ্গল।"

পরদিন আহারের সময় দাশা বলে যে, তার ধারণা কাতিয়ার অন্তরঙ্গ মহলে যারা আছে তাদের প্রায় সকলকেই চেনা যায় বেসনভকে দেখে, তাদের দোষগুণ, রুচি, আচারব্যবহার, জীবনের অভিজ্ঞতা সব কিছুই তার মধ্যে বিদ্যমান। সে যেন সকলের প্রতিভূ। দাশার মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসেঃ "এমন পুরুষ দেখলে কোন্ মেয়ের না মন টলে, দিদি! আমি সবই বুঝি।"

নিকলাই ইভানোভিচ একটু ক্ষুব্ধ হন। তিনি বলেনঃ "তাঁর খ্যাতির কথা শুনে তুমি বুঝি মুগ্ধ হয়ে গেছ, দাশা।"

কাতিয়া নীরব। বেসনভকে আর স্মোকোভনিকভদের বাড়ি দেখতে পাওয়া যায়নি। গুজব, অভিনেত্রী চাবোদায়েভাকে নিয়ে সে পর্দার অন্তরালে সরে পড়েছে। কুলিচক তার কয়েকজন বন্ধুকে নিয়ে চাবোদায়েভাকে দেখতে গিয়েছিল, কিন্তু তাকে দেখে তারা একেবারে হতাশ হয়ে ফিরে এসেছে— অস্থিচর্মসার, লেসফিতা ও পেটিকোটসর্বস্ব...

একদিন এক প্রদর্শনীতে বেসনভের সঙ্গে দাশার দেখা। একটা জানালার ধারে দাঁড়িয়ে সে নিস্পৃহভাবে ক্যাটালগের পাতাগুলি উল্টিয়ে যাচ্ছে, সামনে দুজন কলেজের ছাত্রী দাঁড়িয়ে তার দিকে তাকাচ্ছিল এবং কেবল হাসছিল—মনে হচ্ছিল মোমের খেলনার কারখানায় সে যেন একটি পুতুল।

দাশা ধীরে পাশ কাটিয়ে চলে যায়। কাছেই একটি ঘরে গিয়ে সে বসে। তার মনে স্ফূর্তি নেই, কেমন যেন অদ্ভুত শ্রান্ত মনে হচ্ছিল তার নিজেকে।

এরপর দাশা বেসনভের একখানি ফটোগ্রাফ কিনে তার টেবিলের ওপর রেখে দেয়। তার কবিতার বই—সাদা পাতলা তিনটি খণ্ড—প্রথম দিকে দাশার কাছে বিষ বলে মনে হত; কদিন থেকে কেমন যেন তার একা থাকতে ভাল লাগে, মনে হয় সে যেন কি একটা অপরাধ করে ফেলেছে। কবিতাগুলি সে পড়ে, বার বার

পড়ে—কোথায় যেন কি একটা মাদকতা আছে—মন তাতে উত্তেজিত হয়ে ওঠে—একটা নতুন আনন্দের আস্বাদ পায় সে—কে যেন তাকে কানে কানে বলে সব কিছু ভুলে যেতে—বিষাদ থেকে মনকে মুক্ত করতে, একটা মহামূল্যবান কিছু ভেঙে টুকরো টুকরো করে ফেলতে। এমন একটা কিছু পাবার জন্য তার মন ব্যাকুল হয়ে ওঠে যার কোন অস্তিত্বই নেই।

শুধু বেসনভকে দেখবার জন্য দাশা "দার্শনিক সমিতির" সান্ধ্য বৈঠকগুলিতে ঘন ঘন যেতে আরম্ভ করে। বেসনভ প্রায়ই দেরীতে গিয়ে হাজির হয় এবং বক্তৃতাও করে খুব কম দিনই। কিন্তু প্রত্যেকদিনই দাশা বেশ একটা উৎফুল্ল মন নিয়ে বাড়িতে ফিরে আসে এবং গৃহে অভ্যাগতদের দেখে তার খুব আনন্দ হয়।

কিন্তু আজ গৃহে কোন অতিথির সমাগম নেই। দাশা একা একা বসে পিয়ানোতে স্ক্রিয়াবিনের গান বাজায়। গানের সুরগুলি যেন তার মনকে তেমনভাবে নাড়া দিতে পারছে না। হ্রদের অতল গভীর কালো জলের ওপর টুকরো টুকরো বরফ ছুঁড়ে মারলে যা হয় এও হয়েছে সেই অবস্থা। ওপরের নীর একটু চঞ্চল হয়ে ওঠে, খানিকটা জল ছিটকে উঠে আবার দেখতে না দেখতেই মিলিয়ে যায়। গানের সুরগুলিও ঠিক তেমনি দাশার মনের ওপরের দিকটাই ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে—অতল স্পর্শ করতে পারছে না। তার উষ্ণ হৃদয়ের অন্তস্তলে চলেছে এক গভীর আলোড়ন, এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দুর্ভাবনা। কেবলই তার মনে হচ্ছে, একটা অঘটন ঘটতে আর বুঝি দেরি নেই।

দাশা তার হাত দু'খানা জানুর ওপর রেখে ওপরের দিকে তাকায়। কমলা রংএর ঢাকনা দেওয়া বাতিটা থেকে যে মৃদু আলো ঘরে ছড়িয়ে পড়েছে তাতে দেখা যায়, দেয়াল থেকে নীল-কৃষ্ণাভ রংএর কতগুলি স্ফীত মুখ দাঁত বার করে হাসছে, চোখগুলি ঠিকরে পড়েছে, সৃষ্টির প্রথম দিনে কতগুলি অশরীরী ছায়ামূর্তি বুঝি নন্দন-কাননের বেড়ার ফাঁক দিয়ে ঠিক এমনি ব্যাকুলভাবে তাকিয়ে ছিল।

দাশা আপন মনে চিৎকার করে বলে ওঠেঃ "হায়, আমার একি হল! কোথায় যাচ্ছি আমি?" হঠাৎ সে পিয়ানোর পর্দা চাড়িয়ে সন্তমে চলে যায়; তারপর নিঃশব্দে পিয়ানোটা বন্ধ করে দেয়। জাপানী বাক্স থেকে একটা সিগারেট বার করে ধরায়। কাশি আসতেই ছাইদানীতে সিগারেটটা চেপে ধরে নিভিয়ে দেয়। সে চেঁচিয়ে বলে ওঠেঃ "জামাইবাবু, কটা বাজে?" এমন ভাবে চেঁচিয়ে ওঠে যে, তিনমহল পার হয়েও সে-আওয়াজ গিয়ে পৌঁছায়।

পড়ার ঘরের মেঝেতে কি পড়ে যাবার শব্দ শোনা যায়, কিন্তু কোন উত্তর আসে না। গ্র্যান্ড মোগল এসে হাজির। আয়নায় নিজেকে সে একবার দেখে নেয়। তারপর বলে, রাত্রির খাবার তৈরী।

খাবারঘরে দাশা একটা ফুলদানীর সামনে বসে। ফুলগুলি শুকিয়ে

গেছে। দাশা ফুলের পাপড়িগুলি ছিঁড়ে ছিঁড়ে টেবিলক্লথের ওপর ছড়াতে থাকে। গ্র্যান্ড মোগল চা, ঠান্ডা মাংস এবং একটা ওমলেট নিয়ে আসে। অবশেষে নিকলাই ইভানোভিচ এসে হাজির, একটা নতুন নীল রংএর স্যুট পরনে, কলার নেই। তাঁর চুল উস্কোখুস্কো, দাড়ি একদিকে বেঁকে, তাতে আবার একটা পালক ঢুকে আছে, বোধ হয় কুশান থেকে খসে গিয়ে দাড়িতে আশ্রয় নিয়েছে। নীরবে ঘাড় নুইয়ে দাশাকে তিনি আপ্যায়িত করেন। তারপর টেবিলের শেষ প্রান্তে গিয়ে বসে ডিমের থালাটা টেনে নেন এবং খেতে থাকেন। তাঁর খাওয়ার ভঙ্গি দেখে মনে হয় তিনি অত্যন্ত ক্ষুধার্ত হয়ে পড়েছিলেন।

কয়েক মিনিট বাদে তিনি টেবিলের ওপর দুই কনুই রেখে গালে হাত দিয়ে বসেন। রোমশ দুখানি হাত। চোখ দুটো তাঁর ফুলের ছেঁড়া পাপড়ির স্তূপের ওপর, তবে মনে হয় তিনি যেন তা দেখেও দেখছেন না; কি রকম একটা অস্বাভাবিকভাবে কণ্ঠস্বর নামিয়ে তিনি বলেনঃ

"গতকাল রাত্রে তোমার দিদি আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে।"

॥ চার ॥

তার নিজের বোন কাতিয়া এমন একটা কান্ড করে বসেছে যা ধারণাতীত, যা অত্যন্ত কুৎসিত এবং মারাত্মক। গতকাল রাত্রে কাতিয়া বালিশ থেকে মাথা তোলেনি। যা কিছু জীবন্ত, যা কিছু প্রিয়, যা কিছু পরিচিত সবই যেন তার কাছে অসহ্য হয়ে উঠেছিল। সর্বাঙ্গ যেন তার ভেঙে পড়েছিল, বিকৃত হয়ে গিয়েছিল। দাশা আঁতকে ওঠে। তা হলে নিকলাই ইভানোভিচ আভাসে তাকে একথাই বলেছেন। তারপর ব্যাপারটা গিয়ে চূড়ান্ত পর্যায়ে দাঁড়িয়েছে, কাতিয়া আজ বাড়িতেই নেই, এ পৃথিবীতেও তার অস্তিত্ব আছে কিনা কে জানে!

দাশা যেন একেবারে স্তব্ধ হয়ে যায়। কোনদিকে সে তাকাতে পারছে না। তার মাথা ঘুরতে থাকে। রুদ্ধশ্বাসে সে শুধু অপেক্ষা করে কখন নিকলাই ইভানোভিচ ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠবেন বা এমন ভীষণভাবে কান্না শুরু করে দেবেন যা সে কল্পনাও করতে পারে না, কিন্তু তিনি আর একটি কথাও বললেন না; কেবল একটা ছুরি আঙুলের সাহায্যে ওল্টাতে পাল্টাতে লাগলেন। দাশা তাঁর মুখের দিকে তাকাতেও পারছিল না।

অনেকক্ষণ মৌন থাকার পর চেয়ারটাকে সশব্দে পেছনে ঠেলে দিয়ে তিনি উঠে পড়ার ঘরে চলে যান। দাশা ভাবেঃ "নিজের গুলিতে নিজে আত্মহত্যা করবেন না তো?" না, তার ভুল। অকস্মাৎ তার মনে পড়ে যায়, নিকলাই ইভানোভিচের দীর্ঘ রোমশ বাহুটি কিভাবে টেবিলের ওপর পড়ে ছিল। কেমন যেন তার একটু সহানুভূতি জাগে। ভগ্নিপতির কথাই কেবল তার মনে হতে থাকে। তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়েঃ "তারপর? এখন কি করা যাবে?"

এই একই কথা যেন তার কানে ঘুরে ঘুরে আসছে। সব, সব কিছুই মাটি হয়ে গেল—ভেঙে একেবারে চুরমার।

দরজার পর্দা সরিয়ে গ্র্যান্ড মোগল একটা ট্রে হাতে ঘরে ঢোকে। তার দিকে তাকাতেই দাশার মনে হয়, আর গ্র্যান্ড মোগল! জলে তার দু'চোখ ভরে ওঠে। দাঁতে দাঁত চেপে সে ছুটে ড্রইংরুমে চলে যায়।

কাতিয়া নিজ হাতে এই ঘরের সব কিছু সাজিয়েছে। ক্ষুদ্রতম জিনিসটিতেও তার হাতের স্পর্শ রয়েছে। কিন্তু কাতিয়ার হৃদয় আর এ কক্ষে নেই; কাজেই সবই যেন কিম্ভূতকিমাকার নিষ্প্রাণ হয়ে গেছে। দাশা সোফায় বসে পড়ে। হঠাৎ একটা ছবি তার নজরে আসে। কয়েকদিন আগেই কাতিয়া ছবিটা কিনেছিল। দাশা এই প্রথম দেখে বুঝল, ছবিটার অর্থ কি।

এক নগ্ন নারীর চিত্র। গায়ের রং করা হয়েছে লাল, তবে মাঝে মাঝে কলঙ্ক রয়েছে, মনে হয় যেন তার ত্বক টেনে খুলে ফেলা হয়েছে। মুখ ছেঁটে ফেলা হয়েছে; নাক একেবারেই নেই তার জায়গায় রয়েছে একটি ত্রিকোণ গর্ত, মাথা চৌকো, আর রয়েছে আসল কাপড়ের একটি ঝাড়ন তার সঙ্গে আঁটা। পা দুটো দেখে মনে হয় কাঠের গুঁড়ি কব্জায় আটকানো। হাতে একটি ফুল। আর খুঁটিয়ে বর্ণনা করলে তা গিয়ে বীভৎসতায় দাঁড়াবে। সব চেয়ে ভয়াবহ হ'ল সেই কোণটি যেখানে সে দু'পা বিস্তৃত করে বসে আছে—সেখানকার রং হল গাঢ় পিঙ্গল। ছবিটির নাম "ভালোবাসা"। কাতিয়া তার নাম দেয় "এযুগের উর্বশী।"

"এজন্যই এই ভীষণাকৃতি ছবিটি দিদির এত প্রিয় ছিল। এখন তার নিজের অবস্থাও এই ছবির মতই—এক কোণে, হাতে একটি ফুল।" দাশা একটা কুশানের হেলানে মুখ থুবড়ে বসে পড়ে। কান্না চাপবার জন্য দাঁত দিয়ে সেটাকে কামড়ে ধরে। ভীষণভাবে তার কান্না পাচ্ছিল। কাঁদে, তবে অতি কষ্টে আওয়াজ চেপে যায়। একটু পরেই নিকলাই ইভানোভিচ ড্রইং-রুমে প্রবেশ করেন। তিনি দু'পা ফাঁক করে দাঁড়ান। রাগে সিগারেট লাইটারটাকে বার কয়েক জ্বালেন, তারপর পিয়ানোর কাছে গিয়ে বসেন এবং সুর ভাঁজবার চেষ্টা করেন। তাঁর আঙুলের আঘাতে একটা তরল তুচ্ছ সুর বেজে ওঠে। দাশার রক্ত জমাট হয়ে যায়। নিকলাই ইভানোভিচ সশব্দে পিয়ানোর ঢাকনাটা বন্ধ করে বলে ওঠেন: "ঠিক যা আশঙ্কা করেছিলাম তাই।"

দাশা মনে মনে এই কথাটাই পুনরাবৃত্তি করে চলে, নিহিতার্থটা সে বুঝতে চায়। অকস্মাৎ দোরে জোরে ঘণ্টা বেজে ওঠে। নিকলাই ইভানোভিচ একবার তাঁর দাড়িতে হাত বুলোন, "ও!" বলে একটা টানা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেন—গলাটা যেন তাঁর ধরে আসছে। তাড়াতাড়ি তিনি পড়ার ঘরে চলে যান। গ্র্যান্ড মোগল ঠক্ ঠক্ শব্দ করে দ্রুত গতিতে ঘরের পাশ দিয়ে চলে যায়, মনে হয় যেন ঘোড়ার খুরের শব্দ। দাশা কুশান ছেড়ে লাফিয়ে ওঠে এবং ছুটে হলঘরে চলে

যায়। বুক তার দুরদুর করে কাঁপছে, মাথা ঘুরছে, দু'চোখে সে অন্ধকার দেখে।

কাতিয়া সেখানে দাঁড়িয়ে তার ফার-হুডের লাল ফিতে খুলছে। ঠাণ্ডায় তার হাতের আঙুলগুলি যেন জড়সড় হয়ে গেছে। নাকটা একবার টেনে নিয়ে বোনকে সে তার ঠাণ্ডা রক্তিম গালটা বাড়িয়ে দেয় চুম্বনের আশায়। কিন্তু দাশার কাছ থেকে কোন সাড়া না পেয়ে সে মাথাটা একবার নাড়ে, স্থির সন্ধানী দৃষ্টিতে বোনের দিকে তাকায়।

স্বাভাবিক মধুর ও স্নেহার্দ্র কণ্ঠে সে দাশাকে জিজ্ঞেস করে, "কিছু হয়েছে না কিরে? দু'জনে ঝগড়া করিসনি তো?"

নিকলাই ইভানোভিচের চামড়ার ওভারশু জোড়ার দিকে দাশা একবার তাকায়। এই পরিবারে জুতো জোড়ার নাম দেওয়া হয়েছে 'স্টীমবোট'। দাশার মনে হয় বড় অযত্নে পড়ে আছে জুতোজোড়া। তার অধরোষ্ঠ কেঁপে ওঠে: "না, কিছুই হয়নি তো; এমনিই।"

দাশার চোখ দু'টো তখনো নিকলাই ইভানোভিচের জুতোজোড়ার ওপরই পড়ে আছে। একটু রুক্ষ কণ্ঠে সে বলে ওঠে:

"কোথায় ছিলি, দিদি?"

"এক সাহিত্য-মজলিসে বোন। খানাপিনা ছিল। ' কার জন্য যে হ'ল ভগবানই জানেন। নতুন কিছু নয়। বড্ড ক্লান্ত হয়ে পড়েছি—বিছানায় না পড়ে আর পারছিনে।" এই বলে খাবার ঘরে গিয়ে সে তার চামড়ার হাতব্যাগটা টেবিলের ওপর ছুঁড়ে রাখে। রুমালে নাকটা একবার মুছে নিয়ে তারপর সে দাশাকে জিজ্ঞেস করে:

"ফুলের পাপড়িগুলি ছিঁড়ল কে? নিকলাই ইভানোভিচই বা কোথায়? শুয়ে পড়েছে নাকি?"

দাশা বুঝতে পারে না এ অবস্থায় তার কি করা উচিত। সেই বিশ্রী ছবিটার সঙ্গে তার দিদির তো কোথাও মিল নেই। দিদি তো দূরে চলে যায়নি, তাকে বরং তার আজ আরো বেশি কাছের মানুষ বলেই মনে হচ্ছে। তাকে গিয়ে আদরযত্ন করতে ইচ্ছে হয় দাশার। কিন্তু দাশার মাথায় হঠাৎ একটা বুদ্ধি খেলে যায়। টেবিলক্লথের ওপর নখে আঁচড় কাটতে কাটতে দাশা বলে:

"দিদি!"

"কি, বোন?"

"আমি সমস্তই জানি।"

"কি জানিস? দোহাই ঈশ্বরের, বল কি হয়েছে?"

কাতিয়া টেবিলের ধারে বসে ছিল। তার জানুদ্বয় দাশার পা স্পর্শ করেছে। উৎসুক নয়নে সে দাশার দিকে চেয়ে আছে।

দাশা বলে: "জামাইবাবু আমাকে সব কথাই বলেছেন।"

কাতিয়া বিবর্ণ হয়ে যায়। দাশা তার মুখের দিকে তাকাতে পারে না।

উভয়েই চুপ। অসহ্য নীরবতার মধ্যে খানিকক্ষণ কাটার পর কাতিয়া সরোষে বলে ওঠেঃ

"আমার সম্পর্কে তোর জামাইবাবু তোকে এমন কি মারাত্মক কথা বলতে পারে যে তুই এভাবে কথা বলছিস?"

"দিদি, তুই জানিস।"

"না, আমি কিছুই জানি নে।"

"আমি কিছুই জানিনে" কাতিয়া বলে বটে, কিন্তু তার সুরটা বড্ড নরম, বরফের মত ঠাণ্ডা বললেও চলে।

দাশা ধপাস করে দিদির পায়ের কাছে বসে পড়ে।

"তা হ'লে সত্যি নয়? বল দিদি, তুই বল, প্রাণের বোনটি আমার, বল তুই যে একথা সত্যি নয়!" দাশা দিদির সুগন্ধিমাখা কোমল হাত দু'খানি টেনে নিয়ে বার বার চুম্বন করতে থাকে। কাতিয়ার হাতের শিরাগুলি নীল হয়ে ওঠে।

"নিশ্চয়ই সত্যি নয়।" কাতিয়া জবাব দেয়। ক্লান্তিতে তার চোখ দু'টি নিমীলিত হয়ে আসে। "কাঁদিসনি বো'ন। কাঁদতে কাঁদতে যে চোখমুখ ফুলে যাবে, কাল মুখ দেখাবি কি করে?"

দাশাকে সে ধরে তোলে। তার চুলে অধরোষ্ঠ রেখে অনেকক্ষণ ধরে সে আদর করে।

দাশা দিদির বুকে মুখ লুকোয়। বলেঃ "আমি একটা বোকা, দিদি।"

এমন সময় পড়ার ঘর থেকে নিকলাই ইভানোভিচকে উচ্চকণ্ঠে বলতে শোনা যায়ঃ

"সে মিথ্যে কথা বলছে!"

দু'বোনই মুখ ঘুরিয়ে তাকায়, কিন্তু দরজা বন্ধ।

কাতিয়া বলেঃ "যা, শোগে। আচ্ছা, আমি দেখছি ব্যাপারটা কি। মজাই বটে! এর একটা ফয়সালা নিশ্চয়ই করতে হবে।"

দাশার শোবার ঘরে কাতিয়া তাকে নিয়ে যায়, অন্যমনস্ক ভাবে ছোট বোনকে চুম্বন করে, তারপর খাবার ঘরে ফিরে আসে, ব্যাগটাকে টেনে নেয়, চুল ঠিক করে নিয়ে পড়ার ঘরের দরজায় গিয়ে এক আঙুলে আস্তে আস্তে টোকা মারে।

"নিকলাই! দোর খোল, ভেতরে আসব।"

গোড়ায় কোন সাড়াই মিলল না। একেবারে চুপ। তারপর শোনা গেল একটা গজগজানি। বোঝা গেল, চাবি দিয়ে তালা খুলে দেওয়া হল। দোর ঠেলে, ঘরে ঢুকতেই কাতিয়ার চোখের সামনে পড়ে তার স্বামীর প্রশস্ত পৃষ্ঠদেশ। কোনদিকে না তাকিয়েই তিনি তাঁর টেবিলের দিকে সোজা চলে যান এবং একটি চামড়ার আরাম-কেদারায় গিয়ে বসেন। হাতির দাঁতের একটা কাগজ-

কাটা ছুরি তিনি বইএর পৃষ্ঠার মধ্যে ঢুকিয়ে দেন। এমন একটা ভাব দেখান, যেন কাতিয়ার উপস্থিতি তিনি টেরই পাননি।

কাতিয়া একটা সোফায় বসে পড়ে, হাঁটুর ওপর স্কার্টটা সে সোজা টেনে দেয়, রুমালটা তার ব্যাগে রাখে। তারপর সশব্দে দোর বন্ধ করে। এই শব্দে নিকলাই ইভানোভিচের মাথার এক গোছা চুল যেন খাড়া হয়ে ওঠে।

কাতিয়া বলেঃ "একটা জিনিস আমি বুঝতে পারিনে। তোমার যেমন খুশি তুমি ভাবতে পার, কিন্তু তোমার ধারণা দাশার মাথায় ঢুকিয়ে দেবে কেন?"

কথা শুনে তিনি অকস্মাৎ চেয়ারে ঘুরে বসেন। সামনের দিকে গলাটা একটু বাড়িয়ে দেন তিনি, দাড়ি এগিয়ে আসে। দাঁত কিড়মিড় করে বলেনঃ "এটাকে আমার ধারণা বলতে তোমার আটকাল না?"

"তুমি যে কি বলতে চাও আমি কিছুই বুঝতে পারছি নে!"

"চমৎকার! আমি কি বলছি তুমি কিছুই জাননা! কিন্তু রাস্তার স্ত্রীলোকের মত কি করে ব্যবহার করতে হয় তাতো খুব ভাল জান!"

কথা শুনে কাতিয়া হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। স্বামীর মুখের চেহারা অত্যন্ত কঠিন হয়ে উঠেছে। রাগে কর্ণমূল পর্যন্ত লাল দেখাচ্ছে। শান্ত ভাবে কাতিয়া বলেঃ

"তুমি কি আমার সঙ্গে এই সুরেই কথা বলবে?"

"মাফ কর! কোন সুরে কথা বলতে হবে জানিনে। স্পষ্ট কথা হল, আমি সমস্তটা জানতে চাই।"

"সমস্তটা! তার মানে?"

"মুখের ওপর মিথ্যে কথা বোলো না!"

"ও, বুঝতে পেরেছি তুমি কি বলতে চাও!" কাতিয়া তার চোখ দু'টো ঘুরিয়ে নেয়। মনে হয়, সে যেন বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। "এই না আমি সেদিন তোমাকে কি বললাম কি বলেছিলাম ছাই মনেও নেই।"

"কার সঙ্গে ব্যাপারটা ঘটেছিল আমি জানতে চাই।"

"আমি তো জানিনে।"

"আবার মিথ্যে কথা!"

"মিথ্যে কথা আমি বলছিনে। কেন আমি তোমাকে মিথ্যে কথা বলব? রাগের মাথায় তখন কি বলে ফেলেছিলাম, এখন কি তা মনে আছে নাকি!"

মুখের কাঠিন্য তখনো যায়নি কিন্তু স্ত্রীর কথা শুনে নিকলাই ইভানোভিচের মনটা যেন এরই মধ্যে একটু ভিজে গেছে। যাক, বাঁচা গেল। কাতিয়া তবে নিজের সম্বন্ধে মিথ্যেকথা বলেছে। তা হলে তার কথা আর বিশ্বাস না করলেও চলবে। কাতিয়াকে জোরগলায়ই তিনি একথা বলতে পারবেন। যেন একটু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচেন তিনি। তাহলে এবার কথা বলা যেতে পারে।

চেয়ার ছেড়ে তিনি উঠে দাঁড়ান। কার্পেটটা পার হন, একটু থামেন, হাতীর দাঁতের কাগজ কাটা ছুরিটা ওপরের দিকে তুলে ধরেন। তারপর এক দীর্ঘ বক্তৃতা দেন। কিভাবে পারিবারিক জীবনে অবনতি ঘটছে, কিভাবে নৈতিক অধঃপতন হচ্ছে, স্ত্রীর পবিত্র কর্তব্যগুলি কিভাবে তারা ভুলে যাচ্ছে, মায়ের কর্তব্য কি, সহধর্মিনীর কর্তব্য কি—নানা কথার অবতারণা করেন তিনি। চপলতার জন্য কাতিয়াকে তিনি মৃদু ভর্ৎসনা করেন; বলেন, বুকের রক্ত দিয়ে যে অর্থ রোজগার করা হয় সে কেন তা জলের মত খরচ করে?...(কাতিয়া বলে, "রক্ত দিয়ে নয়, গলাবাজী করে")। না, রক্তের চেয়েও বেশি, এজন্যে স্নায়ু চালনা করতে দেয়। যাকে তাকে বন্ধু বলে গ্রহণ করা, ঘরদোর বিশৃংখল অবস্থায় রাখা, 'ঐ বোকা' গ্র্যান্ড মোগলের কথা অন্ধভাবে বিশ্বাস করা প্রভৃতির জন্য তিনি কাতিয়াকে তিরস্কার করেন। অবশেষে তিনি বলেন, "তোমার ঐ মধ্যবিত্তসুলভ ড্রইং-রুমে আমি যখন তোমার প্রিয় ঐ সমস্ত বিদকুটে ছবিগুলির দিকে তাকাই তখন রাগে আমার সর্বাঙ্গ জ্বলে যায়।"

মোট কথা, এসমস্ত কথা বলে মনকে তিনি অনেকখানি হাল্কা করে নেন।

রাত তখন চারটে। স্বামীর কথা বলা শেস হয়েছে দেখে কাতিয়া এবার বলেঃ "খ্যাপা মোটা মানুষের চেয়ে অসুন্দর বোধ হয় পৃথিবীতে আর কিছু নেই।" উঠে সে শোবার ঘরে চলে যায়।

নিকলাই ইভানোভিচ এখন এমনই জল হয়ে গেছেন যে, কাতিয়ার এই উক্তিটাও পর্যন্ত তাঁকে বিন্দুমাত্র উত্তপ্ত করতে পারল না। ধীরে ধীরে তিনি গায়ের জামা খুলে চেয়ারের পেছনে ঝুলিয়ে রাখেন, ঘড়ির ঢাকনাটা বন্ধ করেন। ছোট্ট একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে চামড়ার সোফার ওপর পাতা পরিচ্ছন্ন নরম বিছানায় গা এলিয়ে দেন।

"হ্যাঁ, আমাদের জীবনযাত্রার প্রণালীটাই ঠিক নয়। আবার নতুন করে জীবন আরম্ভ করতে হবে। ভুল, সব ভুল।" তাঁর মাথায় একরাশি চিন্তা। ঘুমিয়ে পড়ার আগে মনকে শান্ত করার জন্য তিনি একটা বই খুলে তাতে মনোনিবেশের চেষ্টা করেন, কিন্তু পরমুহূর্তেই বইটাকে রেখে দেন। কান পেতে কি শোনার চেষ্টা করেন তিনি, কিন্তু সমস্ত বাড়ি নিস্তব্ধ। একটা কান্নার শব্দ আসছে না? হৃদয়ের স্পন্দন দ্রুততর হয়ে ওঠে। "তবে সে কাঁদছে?" মনটা তাঁর খচখচ করে। "এতটা না করলেও হ'ত। একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলেছি।"

খানিকক্ষণ আগেই যেসমস্ত কথা হয়ে গেছে সেগুলো তাঁর মনের মধ্যে তোলপাড় করতে আরম্ভ করে। কাতিয়া বসে যেভাবে কথাগুলি শুনছিল সেছবি তাঁর মনে পড়ে যায়। তার জন্য দুঃখ হয় তাঁর। এক কনুইএ ভর করে দেহটাকে খানিকটা আলগা করেন তিনি, বিছানা থেকে নেমে যাবেন, অকস্মাৎ

নিজেকে বড় ক্লান্ত বোধ হয়, যেন অনেকদিনের পরিশ্রমজনিত ক্লান্তি। আবার বালিশে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েন তিনি।

দাশা তার পারিপাট্যপূর্ণ ক্ষুদ্র শয়নকক্ষে জামাকাপড় ছেড়ে মাথা থেকে চিরুনিটা খুলে ফেলে। মাথাটাকে সে এমন জোরে ঝাঁকুনি দেয় যে, চুলের কাঁটাগুলো সঙ্গে সঙ্গে ছিটকে পড়ে যায়। তুষারশুভ্র শয্যায় শুয়ে পড়ে একটা চাদরে আপাদমস্তক ঢেকে দেয় সে। চোখ দু'টো বুজে আপনমনে সে বলেঃ "বাঁচালে ঠাকুর, সমস্তই ঠিক আছে! আর ভেবে কাজ নেই,—এবার ঘুমিয়ে পড়।" চোখের এক কোণে যেন একটা অদ্ভুত মুখের ছবি ভেসে ওঠে। দাশা হাসে, পা দু'টো গুটিয়ে আনে, বালিশটাকে চেপে ধরে। গভীর নিদ্রায় মগ্ন। অকস্মাৎ যেন কাতিয়ার কণ্ঠস্বর তার কানে আসেঃ "মোটেই একথা সত্যি নয়।"

দাশা চোখ মেলে চায়। "কৈ, আমি তো দিদিকে কখনো কিছু বলিনি, না একটা কথাও বলিনি! আমি তাকে শুধু জিজ্ঞেস করেছিলাম, একথা সত্য কিনা। আমি যা বলতে চাচ্ছিলাম সে যেন তার সবটাই বুঝে ফেলেছিল-- জবাবটা তো সে সেভাবেই দিল।" চিন্তাটা তাকে ছুঁচের মত বিঁধতে থাকে। "দিদি আমার কাছে তাহলে মিথ্যে কথা বলল!" কাতিয়ার সমস্ত কথাবার্তা হাবভাব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তার মনে পড়ে। দাশার কাছে সমস্ত পরিষ্কার হয়ে যায়ঃ হ্যাঁ, তবে সবটাই মিথ্যে। বজ্রাহতের মত তার অবস্থা। কাতিয়া স্বামীর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। বিশ্বাসঘাতকতা করুক, পাপ করুক, মিথ্যে কথা বলুক, যাই করুক না কেন তবু কেন যেন দিদিকে আরো বেশি ভালো লাগে। যার চোখ আছে সে কিছুতেই কাতিয়ার উচ্ছল সজীবতা দেখে মুগ্ধ না হয়ে পারে না, প্রশংসায় সে পঞ্চমুখ হয়ে উঠবেই। যেভাবে সে মিথ্যে কথা বলেছে তাতে যেন তাকে আরো বেশি ভালবাসবার জন্য মন উতলা হয়ে ওঠে। "কিন্তু সে তো পাপিষ্ঠা।" নয়? দাশা যেন কিছু বুঝে উঠতে পারে না, কেমন যেন সমস্ত ঘুলিয়ে যায়।

আর ভাবতে পারে না দাশা, হতবুদ্ধি হয়ে যায়। এক গ্লাস জল পান করে সে। আলোটা একবার জ্বালে একবার নেভায়। ভোর হওয়া পর্যন্ত সে বিছানায় শুয়ে ছটফট করে। দিদিকে সে কোনভাবেই দোষী বলে ভাবতে পারে না বা দিদি যে কি করেছে তাও তার মাথায় আসে না।

কাতিয়ারও সে-রাত্রে আর ঘুম হ'ল না। সটান চিৎ হয়ে সে সারারাত বিছানায় শুয়ে থাকে। সর্বাঙ্গ যেন তার অবশ। নরম বিছানার ওপর তার হাত দুখানি অসাড় অবস্থায় পড়ে আছে। সে কাঁদছে, কিন্তু চোখে জল নেই। কাঁদছে, কেন না নিজেকে বড় অসহায়, অশুচি, অপবিত্র বলে মনে হচ্ছে তার, কিন্তু এই ব্যাপারে কিছুই সে করতে পারে না, কারণ দাশার মত ভাবপ্রবণতাও তার মধ্যে নেই, আবার তার মত দৃঢ়ও সে হতে পারে না। কোনদিন সে তা হতে পারবেও না। স্বামী তাকে রাস্তার স্ত্রীলোক বলে তিরস্কার করেছে, তার ড্রইং-রুমকে

বলেছে মধ্যবিত্তের কদর্য ড্রইং-রুম—কথাগুলি মনে পড়ে আর সে কাঁদে। আরো বেশি করে কান্না পায় যখন সে ভাবে গত পরশু দিন মাঝরাতে আলেক্সি আলেক্সিয়েভিচ বেসনভ একটা রবারের চাকাওয়ালা দ্রশ্কিতে করে কিভাবে তাকে শহরের বাইরে এক হোটেলে নিয়ে গিয়েছিল এবং তাকে কোনভাবে জানবার চেষ্টা না করে, তার (কাতিয়ার) প্রতি কোনরূপ ভালবাসা বা অনুরাগ না থাকা সত্ত্বেও কিভাবে সে সহসা তাকে একেবারে হাতের মুঠোর মধ্যে নিয়ে গিয়েছিল। একথা যখন কাতিয়া ভাবে তখন কান্নায় তার বুক ফেটে যায়। কাতিয়ার ভাল লাগেনি মোটেই, কিন্তু রোধ করার শক্তিও তার ছিল না, সে যেন একটা মোমের পুতুল হয়ে গিয়েছিল—মনে হচ্ছিল মোরস্কায়া স্ট্রীটের কোন ফরাসী পোশাকের দোকানে শো-কেসে সাজানো সে একটি নিষ্প্রাণ রঙিন ডামি।

॥ পাঁচ ॥

ভাসিলিয়েভস্কি দ্বীপের ১৯ নং রাস্তায় নবনির্মিত ফ্ল্যাটবাড়ির ছয়তলার একটি ফ্ল্যাটে থাকে এঞ্জিনিয়ার ইভান ইলিচ তেলেগিন। "সংস্কার বিরোধী কেন্দ্রের" প্রধান কার্যালয় স্থাপিত হয়েছে সেখানে।

নতুন বাড়ি। ঘরের ভেজা দেয়াল তখনো শুকোয়নি। সেই অবস্থায় তেলেগিন গিয়ে সেখানে ওঠে। এই কারণে ফ্ল্যাটটি একবছরের জন্য সে কিছু কম ভাড়ায়ই পেয়ে যায়। নিজের জন্য সে একটি ঘর রাখে, বাকী ঘরগুলি ভাড়া দেয়। ঘরগুলিতে আসবাবপত্র বলতে রয়েছে লোহার খাট, দেবদারু কাঠের টেবিল ও টুল। অবিবাহিত লোকও এসে যাতে স্বচ্ছন্দে ও আনন্দে থাকতে পারে তারই জন্য এসমস্ত রাখা হয়েছে। তার পুরনো বন্ধু ও সহপাঠী সার্গি সার্গিনিয়েভিচ সাপোঝকভ তাকে অনায়াসেই এই ধরনের সমস্ত লোক যোগাড় করে দিতে পেরেছে।

বাসিন্দাদের মধ্যে আছে আইন কলেজের ছাত্র আলেকজান্দার ইভানোভিচ জিরভ, সাংবাদিক আন্তোশকা আরনলদভ, চিত্রকর ভালিয়েত এবং বেকার তরুণী এলিজাবেতা কিয়েভনা রাস্তরগুইভা। মেয়েটি এখনো পর্যন্ত কোন কাজের সুবিধে করে উঠতে পারেনি।

তেলেগিন তার কারখানা থেকে প্রাতরাশের জন্য যখন ফ্ল্যাটে ফিরে আসে তখন এরা ঘুম থেকে ওঠে এবং তারপর যে যার কাজে যায়। আন্তোশকা আর্নলদভ ট্রামে চেপে নেভস্কীর তীরে অবস্থিত একটি চায়ের দোকানে গিয়ে ওঠে এবং সেখানে লোকের গল্পগুজব শুনে পরে অফিসের পথ ধরে। ভালিয়েত সাধারণত তার ছবি আঁকতে বসে যায়। সাপোঝকভ দোর বন্ধ করে তার ঘরে বসে নতুন আর্ট সম্পর্কে বক্তৃতা ও প্রবন্ধ রচনায় লেগে যায়। জিরভ পারতপক্ষে এলিজাবেতা কিয়েভনার সংগ ছাড়ে না, তার নরম মিহি সুরে সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা

বসে কিয়েভনার সঙ্গে জীবনের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করে। সে কবিতাও লেখে, কিন্তু কাউকে দেখাতে সাহস করে না। এলিজাবেতা কিয়েভনা তাকে প্রতিভাবান পুরুষ বলে মনে করে। জিরভ এবং অন্যান্যের সঙ্গে সে গল্পসল্প তো করেই তাছাড়া নানা রংয়ের পশম দিয়ে অনবরত লম্বা লম্বা কি বুনে যায়, কেন কিসের জন্য যে সেগুলো বোনে বোঝা যায় না। বোনার সময় আপন মনে সে য়ুক্রেনীয় গান গায়, বেশ দরাজ গলা, তবে বেসুরো। একেক সময় সে তার চুল অস্বাভাবিক ভাবে বাঁধে; আবার কোন কোন সময় দেখা যায় চুল ছেড়ে দিয়ে একটা বইএর ওপর মুখ রেখে সে শুয়ে আছে। যতক্ষণ না তার মাথা ধরছে ততক্ষণ সে বই ছেড়ে উঠবে না। বেশ লম্বা গড়ন, দেখতে সুশ্রী, রক্তিম গণ্ডদেশ, বেশি দূরে তাকাতে পারে না, দেখে মনে হয় চোখ দুটো বুঝি কেউ তার মুখে এঁকে দিয়েছে; পোশাকপরিচ্ছদে কোন রুচিবোধ নেই, এমন কি ভেলেগিনের এখানে যারা থাকে অনেক সময় তারা এ নিয়ে তাকে ঠাট্টাবিদ্রূপ করতেও ছাড়ে না।

নতুন কোন লোক এলেই কিয়েভনা তাকে তার ঘরে ডেকে নিয়ে গিয়ে তার সঙ্গে প্রাণ খুলে গল্প জুড়ে দেয়। আলাপ যেন তার আর শেষ হতে চায় না। কথার ফাঁকে একবার সে জিজ্ঞেসা করবেই যে, কখনো তার কোন দুষ্কার্য করার প্রবৃত্তি জেগেছিল কিনা? সে জিজ্ঞেস করে বসবে: "আপনি খুন করতে পারেন? নিজেকে উত্তেজিত করার ঝোঁক আপনার কখনো হয়েছে?" তার ধারণা, যারা অসাধারণ লোক তাদের মধ্যে এরূপ প্রবণতা না থেকেই পারে না। ব্যাপারটা বেশ মজার হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফ্ল্যাটের লোকেরা কিয়েভনার প্রশ্নাবলীর একটা তালিকা কাগজে লিখে তার ঘরের দরজার সামনে পিন দিয়ে এঁটে দিয়েছে। মোট কথা, সে অত্যন্ত অতৃপ্ত। সর্বদাই সে ভাবে প্রলয়ংকর একটা কিছু ঘটুক, একটা ভীষণ কিছু হয়ে যাক, তাতেই জীবন উজ্জ্বলতর হয়ে উঠবে, নারী তার পরিপূর্ণতা লাভের সুযোগ পাবে, বর্ষার বারিসিক্ত ঝাপসা জানালার কাঁচের দিকে চেয়ে থেকে ক্লান্ত হয়ে পড়ার চাইতে তা অনেক ভাল।

ভেলেগিন তার ফ্ল্যাটে যাদের স্থান দিয়েছে তাদের দেখে সে প্রচুর আনন্দ পায়। তার কাছে তারা বড় মজার লোক, কিন্তু সময়াভাবে সে তাদের সঙ্গে তেমন বেশি মেলামেশা করতে পারে না।

সেদিন বড়দিনের ছুটি। ফ্ল্যাটের সবাইকে ডেকে সাপোঝ্‌কভ্‌ বক্তৃতা শুরু করে: '

"কমরেডগণ, কাজের সময় এসেছে। সংখ্যায় আমরা বহু, কিন্তু আমাদের একতা নেই। এপর্যন্ত আমরা ভীরুর মতো একা একা পথ চলে এসেছি। কিন্তু এখন আমাদের এক হয়ে বজ্রের মত দৃঢ় হতে হবে, বুর্জোয়া সমাজের ওপর আঘাত হানতে হবে। এজন্য আমরা প্রথমে আমাদের নিজেদের একটি নির্দিষ্ট দেশ গড়ব; তারপর আমরা একটি ইস্তাহার প্রচার করব—সেটি হচ্ছে এই:

"আমরা নতুন কলম্বাসের দল! নবভাবে অনুপ্রাণিত আমরা চারণদল! আমরা এক নতুন মানবজাতির বীজ! স্ফীত ফাঁপা বুর্জোয়া সমাজ তার সমস্ত কুসংস্কার ঝেড়ে ফেলুক এই আমাদের দাবি। অতঃপর পুণ্য বলতে আর কিছু থাকবে না! পরিবার, সম্পত্তি, সামাজিক বন্ধন, বিবাহ—এসমস্ত লোপ করে দিতে হবে! এ হ'ল আমাদের দাবী! নরনারী হবে মুক্ত বন্ধনহীন উলঙ্গ। যৌনসম্পর্ক ব্যক্তিগত না হয়ে হবে সামাজিক। যুবক যুবতী, নরনারী, শ্বাস-রোধকারী অন্ধকার প্রকোষ্ঠ থেকে বেরিয়ে এস, মুক্ত হও, সুখী হও, সূর্যালোকে দাঁড়িয়ে বন্ধনহীন বন্য জন্তুর মত আনন্দে নৃত্য কর!..."

তারপর সাপোঝকভ বলে যে, ফিউচারিস্টপন্থী একটি মুখপত্র বার করা দরকার। পত্রিকাটির নাম হবে "নৈবেদ্য"। স্থির হয় ত্তেলোগিন পত্রিকার আংশিক ব্যয়ভার বহন করবে, বাকী টাকা বুর্জোয়াদের কাছ থেকে ছিনিয়ে আনতে হবে। কাগজ বার করতে মোট তিন হাজার রুবল লাগবে।

"সংস্কারবিরোধী কেন্দ্রীয় সংস্থা" এভাবে স্থাপিত হয়। নামটা দেয় ত্তেলোগিনই। কারখানা থেকে ফিরে এসে সাপোঝকভের এই পরিকল্পনার কথা শুনে সে আনন্দে লাফিয়ে ওঠে—মুখে হাসি আর ধরে না। "নৈবেদ্য" প্রথম সংখ্যা প্রকাশের আয়োজন সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে যায়। কয়েকজন ধনী পৃষ্ঠপোষক প্রয়োজনীয় তিন হাজার রুবল দান করেন, তাঁদের মধ্যে সাশা সাকেলম্যান নিজেও আছেন। স্টেশনারী জিনিসের অর্ডার দেওয়া হয়। প্যাকিং পেপারের ওপর দুর্বোধ্য শিরোনামা ছাপা হবে, "কেন্দ্রাপসারী" লেখক যোগাড় ও অন্যান্য বিষয়বস্তু সংগ্রহের কাজ আরম্ভ হয়ে যায়। সাপোঝকভের ঘরে কাগজের অফিস বসে। চিত্রকর ভালেত প্রস্তাব করে, ঘরটাকে কতগুলি অর্থহীন ছবি দিয়ে সাজাতে হবে। দেয়ালে সে বারখানা স্ব-প্রতিকৃতি আঁকে। ঘরে আসবাবপত্র কি থাকবে তা নিয়ে একটা গুরুতর প্রশ্ন দেখা দেয়। শেষ পর্যন্ত সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। স্থির হয়, একটা বড় টেবিল ছাড়া ঘর থেকে আর সমস্ত কিছুই সরিয়ে ফেলা হবে। টেবিলটা একটা সোনালি কাগজে আবৃত থাকবে।

প্রথম সংখ্যা বেরুবার পরই "নৈবেদ্য" সকলের একটা আলোচ্য বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। কোন কোন লোক অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়, আবার একদল বলে, না, সত্যি একটা নতুন কিছু হয়েছে, আর দশটা কাগজের মত এটা নয়, পুশকিনকে এবার গিয়ে দলিলদস্তাবেজখানায় পুরনো নথিপত্রের মধ্যে আশ্রয় নিতে হবে।

সাহিত্য সমালোচক চির্ভা কি করবে ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না—"নৈবেদ্য" কাগজে তাকে বলা হয়েছে শুয়োর। একাতেরিনা দ্মিত্রেভ্না স্মোকোভ্নিকভা সঙ্গে সঙ্গে এক বছরের জন্য কাগজের গ্রাহক হয় এবং স্থির করে যে একদিন মঙ্গলবার সন্ধ্যায় তার বাড়িতে ফিউচারিস্টদের একটি মজলিস ডাকবে।

স্মোকোভ্নিকভ পরিবারের লোকদের সঙ্গে ভোজনে যোগদানের জন্য

'কেন্দ্রীয় সংস্থা' সাপোঝকভকে নির্বাচিত করে। থিয়েটারের পোষাকের দোকান থেকে ভাড়াকরা একটা ময়লা সবুজ সুতোর ফ্রক-কোট পরে আসে সে। জোর করেই সে প্রচুর খায় এবং এমন অট্টহাসি হাসে যে, তার নিজের কাছেও তা ভাল লাগে না। চির্ভার দিকে চেয়ে সে কেবলই হাসে এবং বলে, সমস্ত সমালোচকই "শেয়ালের মত গলিত মাংসভোজী।" তারপর নাকের ওপর চশমাটা একটু ঠিক করে নিয়ে সর্বাঙ্গ টান করে সিগারেট টানতে থাকে সে। প্রত্যাশা ছিল অনেক কিন্তু সকলেই কেমন যেন একটু নিরাশ হয়।

"নৈবেদ্য"র দ্বিতীয় সংখ্যা বেরুবার পর প্রকাশকগণ স্থির করে তারা সান্ধ্য মজলিসের ব্যবস্থা করবে। তার নাম দেওয়া হবে '<u>ঈশ্বরনিন্দার সান্ধ্য মজলিস</u>'।

দাশা একদিন এই মজলিসে আসে। জিরভ তাকে দোর খুলে দেয়। দাশার জন্য সে যে কি করবে ঠিক করে উঠতে পারে না, জুতো খুলে দেয়, জামা ছাড়তে সাহায্য করে, এমন কি দাশার পশমের পোষাক থেকে একটা সুতো টেনে ছিঁড়ে নেয়। ঘরে বাঁধাকপির গন্ধ পেয়ে দাশা বিস্মিত হয়ে যায়। যেখানে 'ঈশ্বরনিন্দা' হয় সেখানে দাশার পেছনে পেছনে জিরভও যায়। যেতে যেতে সে দাশাকে জিজ্ঞেসা করে:

"আপনি কোন্ সুগন্ধি ব্যবহার করেন? ভারী চমৎকার তো!"

দাশা আরেকটা জিনিস দেখে বিস্মিত হয়। এখানকার সব কিছুতেই যেন একটা অভিনবত্ব আছে, সমস্ত জিনিসই নিজেদের হাতে তৈরী। সত্যি তো, দেয়ালে ছড়িয়ে আছে কতগুলি চোখ, নাক, হাত, অশ্লীল প্রতীক, পতনোন্মুখ স্কাই-স্ক্রেপার—এক কথায় বলতে গেলে হিজিবিজি কতগুলি বস্তু, বোধ হয় ভালেতের প্রতিকৃতি আঁকবার উপাদান। পাশেই নীরবে দাঁড়িয়ে আছে ভালেত, তার গণ্ডদেশে আঁকাবাঁকা কতগুলি রেখা অঙ্কিত। তেলেগিনের দেওয়া কাঠের ব্লকগুলির ওপর আড়াআড়িভাবে পাতা অমসৃণ বোর্ডের ওপর বসে আছে আমন্ত্রণকারী ও আমন্ত্রিতবর্গ। স্মোকোভনিকভের বাড়িতে প্রতি মঙ্গলবার সন্ধ্যায় যে সমস্ত তরুণ কবি গিয়ে হাজির হয় তাদের প্রায় সকলেই আজ এখানে উপস্থিত। তারা কিরকম একটা অস্বাভাবিক করুণ সুরে কবিতা আবৃত্তি করতে থাকে। কবিতার বিষয়বস্তু—স্বর্গদ্বারে মোটর গাড়ীর সশব্দ অভিযান, স্বর্গীয় উপদংশ রোগগ্রস্তদের প্রতি নিষ্ঠীবন ত্যাগ, যৌবনের দংষ্ট্রাঘাতে গীর্জার গম্বুজকে বাদামের মত চিবিয়ে খণ্ডবিখণ্ড করণ—ওভারকোট ও চশমা পরে জানালা দিয়ে গঙ্গা ফড়িঙ-এর মত অপ্রত্যাশিতভাবে রাস্তায় লাফিয়ে পড়া এবং এই ধরনের আরো কত কি! এসমস্ত বিভীষিকার ছবি দাশার মনকে অপ্রসন্ন করে তোলে। সেখানে মাত্র একটি লোককে তার ভাল লাগে—সে তেলেগিন। এই তর্কবিতর্কের মধ্যেও সে এগিয়ে আসে দাশার কাছে। এসে স্মিতহাস্যে বলে:

"চা ও স্যান্ডউইচ দেবে? আমাদের চা ও মাংসের কাবাব কিন্তু ফিউচারিস্ট

নয়—সত্যি ভাল জিনিস।" তার গোঁফদাড়ি কামানো ও আগুনের তাপে ঝলসে যাওয়া মুখখানিতে একটা সরলতার ছাপ আছে, কিন্তু তার সকরুণ নীলাভ চোখদুটির দিকে তাকালেই বোঝা যায়, সময় বিশেষে চতুর এবং কঠোরও হতে পারে।

তেলেগিনের প্রস্তাবে সম্মত হ'লে সে যে খুশি হবে দাশা তা নিঃসন্দেহে বুঝতে পারে। কাজেই উঠে সে তার সঙ্গে খাবার ঘরে যায়। টেবিলের ওপর রয়েছে একটা থালায় কিছু স্যান্ডউইচ ও মাংসের কাবাব এবং বহুব্যবহৃত, টোল-খাওয়া একটা সমোভার। সকড়ি থালাগুলো তেলেগিন তাড়াতাড়ি টেবিল থেকে নামিয়ে ঘরের এককোণে রেখে দেয়; তারপর একটা ঝাড়ন খোঁজে, কিন্তু কোথাও তা না পেয়ে নিজের পকেট থেকে রুমাল বার করে তা দিয়ে বেশ করে টেবিলটাকে মুছে দেয়। দাশার জন্য সে খানিকটা চা ঢালে এবং খুব পাতলা এক টুকরো রুটি হাতে নেয়। সবল হাতে বেশ ধীরে সুস্থে সে একাজ করে এবং সারাক্ষণ ধরে আলাপ চালায়। মনে হচ্ছে, এই হট্টগোলের মধ্যেও দাশা যাতে স্বস্তি বোধ করে সেজন্য সে বিশেষভাবে যত্ন নিচ্ছে।

"আমাদের ঘরদোর কিরকম অগোছাল, তবে আমাদের চা ও মাংস যে উৎকৃষ্ট একথা স্বীকার করতেই হবে, এলিসিয়েভ থেকে আনা। মিষ্টিও কিছু ছিল, তবে ফুরিয়ে গেছে...এক মিনিট, কেমন!"

অধরোষ্ঠ চেপে সে দাশার দিকে তাকায়—তার নীলাভ চোখে প্রথমে কেমন যেন একটা ইতস্ততের ভাব দেখা দেয়, তার পরমুহূর্তেই সেটা কেটে যায়—"যদি কিছু মনে না করেন...?" এই বলেই সে ওয়েস্টকোটের পকেট থেকে কাগজে মোড়া দুটো মিষ্টি বার করে।

দাশা মনে মনে ভাবে, "স্ত্রীলোকের যত্ন করতে জানে এমন পুরুষও আছে।" তাকে খুশি করবার জন্য সে বলে ফেলেঃ "কি চমৎকার! এই মিষ্টিই যে আমি খেতে ভালবাসি!"

তেলেগিন দাশার বিপরীত দিকে একটু পাশ ঘুরে বসেছিল। রাইয়ের পাত্রটার দিকে সে অপলক নয়নে তাকিয়ে থাকে। তার প্রশস্ত ললাটে একটা শিরা ফুলে উঠেছে। সাবধানে সে রুমাল বার করে মুখটা মুছে নেয়।

দাশা হাসি চেপে রাখতে পারে না। এই দীর্ঘ কান্তিমান পুরুষটি লজ্জায় এতই ম্রিয়মান হয়ে পড়েছে যে পারে তো সে ঐ রাইয়ের পাত্রটার আড়ালেই গা-ঢাকা দেয়।

দাশা মনে মনে বলে, কোন মফঃস্বল শহরে হয়ত ভদ্রলোকের মা আছেন, বুদ্ধিমতী বৃদ্ধা ভদ্রমহিলা, তিনি হয়ত ছেলেকে চিঠিতে লিখেছেন যে 'যত সমস্ত বোকাকে কেন সে টাকা ধার দেয়' এবং 'একমাত্র বিনয়ী ও পরিশ্রমী হ'লেই লোকের কাছে সম্মান পাওয়া যায়'। এই লোকটি হয়ত সেই চিঠি পড়ে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে মনে মনে ভেবেছে, 'খাঁটি মানুষ আমি হ'তে পারলাম কৈ!'

দাশা যেন এরই মধ্যে তেলেগিনের প্রতি খানিকটা আকৃষ্ট হয়ে পড়েছে।

"আপনি কোথায় কাজ করেন?" জিজ্ঞেসা করে সে।

তেলেগিন অকস্মাৎ মাথা তুলে চায়, দেখে দাশা হাসছে। সে নিজেও হেসে ফেলে। জবাব দেয়ঃ

"বল্টিক এঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস্‌-এ।"

"আপনার সে কাজ ভাল লাগে?"

"জানিনে। আমার মনে হয় সব কাজই ভাল।"

"শ্রমিকরা নিশ্চয়ই আপনাকে খুব ভালবাসে?"

"আমি তো কখনো সে সম্বন্ধে ভাবিনি। আমাকে ভালবাসবে কেন? কি কারণে তারা আমাকে ভালবাসবে? আমি তো তাদের সম্বন্ধে অত্যন্ত কড়া। অবশ্য তাদের সঙ্গে আমার অসদ্ভাবও নেই—বেশ সৌহার্দ্যই আছে।"

"বলুন তো—আজ ওঘরে যা-সব হচ্ছে আপনি সত্যি তা পছন্দ করেন?"

তেলেগিনের কপালের রেখাগুলি যেন সরল হয়ে আস্তে আস্তে মিলিয়ে যায়। সে জোরে হেসে ওঠে।

"নির্বোধ এরা! বিষম উগ্র! তবে ছেলেগুলি ভাল। এদের আমার খুব ভাল লাগে, দারিয়া দ্মিত্রেভ্না! জানেন, কারখানায় কতরকম অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে, অপ্রসন্ন মন নিয়ে বাড়ি ফিরি কিন্তু বাড়িতে এসেই দেখি এরা নির্বোধের মত একটা না একটা কিছু করে বসে আছে, দেখে প্রচুর আনন্দ পাই আর হাসি।"

দাশা দৃঢ়কণ্ঠে বলেঃ "আমার কিন্তু এসমস্ত ভগবৎনিন্দা ভাল লাগে না। অত্যন্ত বিরক্তিকর।"

বিস্মিত হয়ে সে দাশার দিকে তাকায়। দাশা আবার বলেঃ "এ সমস্ত আমি মোটেই পছন্দ করিনে।"

তেলেগিন গম্ভীরভাবে বলেঃ "অবশ্য দোষ যদি দিতে হয় তবে এসমস্তের জন্য আমাকেই সবচেয়ে বেশি দোষ দেওয়া উচিত। আমিই তাদের এসমস্ত বিষয়ে উৎসাহ দিয়েছি। তবে আপনি ঠিকই বলেছেন...লোক ডেকে এনে সারা সন্ধ্যা কদর্য আলোচনা করার কোন মানে হয় না, আপনাকে এভাবে বিরক্ত করার জন্য আমি অত্যন্ত দুঃখিত।"

খুশি হয়ে দাশা তার দিকে তাকায়। জীবনে লোকটির সঙ্গে তার এই প্রথম সাক্ষাৎ, অথচ সে বোধ হয় আজ তার মনের কথা সবই তাকে খুলে বলতে পারে।

"আমার কিন্তু মনে হয়েছিল আপনি ভালবাসেন অন্য রকম জিনিস, আপনার রুচি ঠিক এরকম নয়। আপনি অত্যন্ত ভাল মানুষ বলে আমার ধারণা। আপনি যে কতখানি ভাল আপনার নিজেরও বোধ হয় সে সম্পর্কে ধারণা নেই। সত্যি আমি কিছু বাড়িয়ে বলছিনে।"

দাশা তার কনুইএর ওপর ভর দিয়ে গালে হাত রেখে বসে; ছোট ছোট আঙুলগুলি তার অধরোষ্ঠ স্পর্শ করেছে। তার চোখ দিয়ে যেন হাসি ফেটে বেরুচ্ছে. তেলেগিন কিন্তু তা দেখে সংকুচিত হয়ে পড়েছে। দাশার ধূসরবর্ণ চোখদুটো কি অপূর্ব সুন্দর, আয়ত, শান্ত, স্নিগ্ধ! তেলেগিন যেন একটু অভিভূত হয়ে পড়ে। নিজের অজ্ঞাতসারে সে একটা চায়ের চামচ আঙুলের ভেতর দিয়ে চালিয়ে একবার সোজা ও একবার বাঁকা করতে থাকে।

এমন সময় এলিজাবেতা কিয়েভনা সেই ঘরে ঢুকে যেন তাকে বাঁচিয়ে দেয়। একটা তুর্কী শাল তার কাঁধের ওপর; দুগোছা মোড়ানো চুল তার দুকানের পাশ দিয়ে ঘুরিয়ে এনে এমনভাবে রাখা হয়েছে দেখে মনে হয় যেন দুটো ভেড়ার শিং বেরিয়ে পড়েছে। সে তার লম্বা কোমল হাত দাশার দিকে এগিয়ে দেয়, নিজের নাম বলে: "বাস্তরগুয়েভা।*" তারপর সে বসে বলে:

"জিরফ-এর মুখে আপনার কথা অনেক শুনেছি। আপনার মুখের দিকে চেয়েই আজ আমি বুঝতে পেরেছিলাম আপনি বিরক্ত হয়েছেন। তা ভাল।"

তেলেগিন তাড়াতাড়ি বলে: "একটু ঠান্ডা চা খাবে, লিজা?"

"না। আপনি তো জানেন আমি চা খাইনে।" দাশার দিকে তাকিয়ে বলে: "আপনি নিশ্চয়ই ভাবছেন কি একটা অদ্ভুত মেয়ে আমার সঙ্গে কথা বলছে, না? আমি নগণ্য, অতি তুচ্ছ, কোন গুণই নেই আমার, কিন্তু দোষ আছে অনেক।"

তেলেগিন উঠে টেবিলের পাশে হতাশভাবে ঘুরে দাঁড়ায়। দাশা মুখ আনত করে। এলিজাবেতা কিয়েভনা হাসিমুখে তার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে।

"আপনি আশ্চর্য সুন্দরী, কি সুঠাম দেহ আপনার! কি লাবণ্য! অস্বীকার করবেন না। আপনি এটা ভালভাবেই জানেন। মনে হয় ডজন ডজন লোক আপনার সঙ্গে প্রেমে পড়েছে। দুঃখ হয় ভেবে, কত সাধারণ ভাবে এর সমাপ্তি – একজন পুরুষ এসে আপনার জীবনসঙ্গী হবেন, আপনি তাঁকে পুত্র-কন্যা উপহার দেবেন, তারপর আপনি মরে যাবেন। কি বিরক্তিকর!"

দাশা যেন আর সহ্য করতে পারছিল না। অধরোষ্ঠ তার ঈষৎ কেঁপে ওঠে। জবাব দেয়: "আর দশজন মেয়ে থেকে নিজেকে আমি স্বতন্ত্র করে ভাবিনে। আমি বুঝতে পাচ্ছিনে, আমার ভবিষ্যত নিয়ে আপনার এত দুর্ভাবনা কেন!"

এলিজাবেতা কিয়েভনা একটু দমে যায়, চোখে আর সে চাঞ্চল্য নেই, তবু জোর করে মুখে আরো বেশি হাসি টেনে এনে সে বলে:

"আমি তো আগেই আপনাকে বলেছি, মানুষ হিসেবে আমার কোন দামই নেই আর স্ত্রীলোক হিসেবে আমি অচল। আমার সঙ্গে লোকের বাস করা

---

* মেয়েটির ডাকনাম। তার পদবী হচ্ছে কিয়েভনা। (বাপের নাম—'কী')।

কঠিন, তবে তেলেগিনের মত লোক দয়া করে আমাকে এখানে স্থান দিয়েছেন, এই যা।"

তার দিকে না চেয়েই তেলেগিন অস্ফুটকণ্ঠে বলেঃ "কি যে বকছ, লিজা, তার কোন মাথামুণ্ড নেই।"

"আমি তো আপনাকে কিছু বলছিনে, আপনি চুপ করুন।" আবার সে দাশাকে বলেঃ "আপনি কখনো ঝড়ের মধ্যে পড়েছেন? আমি একবার পড়েছিলাম। একজন পুরুষ ছিলেন। আমি তাঁকে ভালবাসতাম—তিনি অবশ্য আমাকে ঘৃণা করতেন। আমি তখন কৃষ্ণ সাগরের তীরে বাস করতাম। একদিন ঝড় উঠল। আমি সেই লোকটিকে বললাম, চলুন আমরা সাগরের দিকে যাই। রাগের বশেই তিনি আমার সঙ্গে গেলেন। হাওয়া আমাদের সাগরের দিকে উড়িয়ে নিয়ে গেল। কি মজা! বলে কি বোঝাতে পারব আপনাকে? আমার পোষাক পরিচ্ছদ ছুড়ে ফেলে দিয়ে তাঁকে বললাম "

চোখে মুখে একটা বিরক্তির ভাব প্রকাশ করে তেলেগিন বাধা দিয়ে বলেঃ "শোন লিজা, এসব মিথ্যে কথা বলে লাভ কি? এসমস্ত কিছুই ঘটেনি। আমি জানি, এর একবিন্দুও সত্যি নয়।"

এলিজাবেতা কিয়েভ্না তার দিকে চেয়ে একটু রহস্যের হাসি হাসে। তার পর মুহূর্তেই সে একেবারে খিলখিল করে হেসে ওঠে। দুই কনুই টেবিলের ওপর রেখে দু'হাতে সে মুখ ঢেকে ফেলে. হাসিতে তার কাঁধদুটো নাচতে থাকে। দাশা দাঁড়িয়ে তেলেগিনকে বলে, সে এবার বাড়ি যাবে সম্ভব হলে কারো কাছ থেকে বিদায় না নিয়েই সে বাড়ি যেতে চায়।

ফার কোটটা পরতে তেলেগিন তাকে এমন ভাবে সাহায্য করে যে, মনে হয় কোটটাও বুঝি দাশারই একটি প্রত্যঙ্গ। অন্ধকার সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময় সে দেশলাইর কাঠি জেলে তাকে পথ দেখায় এবং সিঁড়িটা অন্ধকার ও পিছল বলে বারংবার তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে। তারপর রাস্তার ধার পর্যন্ত তার সঙ্গে হেঁটে গিয়ে সে তাকে একটা গাড়ীতে তুলে দেয়। এক বৃদ্ধ গাড়ীটা চালায় আর এক বুড়ো ঘোড়া সেটাকে টানে। তুষারে ঘোড়াটার সর্বাঙ্গ ঢেকে গেছে। তেলেগিনের মাথায় টুপিও নেই, গায়ে কোটও নেই, অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে সে গাড়ীটার দিকে চেয়ে থাকে। দাশাকে নিয়ে গাড়ীটা পীতাভ কুয়াশার মধ্যে মিলিয়ে যায়। ধীর পদক্ষেপে বাড়ী ফিরে তেলেগিন খাবার ঘরে ঢোকে। এলিজাবেতা কিয়েভ্না সেই আগের মতই গালে হাত দিয়ে টেবিলের পাশে বসে আছে। তেলেগিন নখে নিজের চিবুকটা একবার চুলকিয়ে নিয়ে ভ্রূকুটি করে বলেঃ

"লিজা!"

দ্রুত, অত্যন্ত দ্রুত সে মাথা তোলে। তেলেগিন তাকে বলেঃ "আচ্ছা লিজা,

কিছু মনে ক'রনা, সব সময়ই তুমি এমন সমস্ত কথা বল কেন যাতে লোক বিরক্ত ও লজ্জিত হয় ?"

অন্তর্ভেদী দৃষ্টি হেনে এলিজাবেতা কিয়েভনা মৃদুস্বরে তাকে বলে: "আপনি প্রেমে পড়েছেন। আমি দেখেই বুঝতে পেরেছি। অদ্ভুত !"

তেলেগিন লজ্জায় লাল হয়ে ওঠে। "মিথ্যে কথা, সম্পূর্ণ মিথ্যে কথা !"

হংসের মত কিয়েভনা উঠে দাঁড়ায়। বলে: "তবে তাই, আমি দুঃখিত।" ঘর থেকে সে বেরিয়ে যায়, ময়লা তুর্কী শালটা তার পেছনে পেছনে মেঝেতে লুটিয়ে চলে।

তেলেগিন চিন্তাকুলভাবে খানিকক্ষণ আপন মনে পায়চারি করে, এক পেয়ালা ঠান্ডা চা খায়, তারপর দারিয়া দ্মিত্রিভ্না যে চেয়ারে বসেছিল সেই চেয়ারটা নিয়ে নিজের ঘরে চলে যায়। চেয়ারটাকে সে সযত্নে ঘরের এক কোণে রাখে এবং হাতের চেটোতে নাকটাকে ধরে অত্যন্ত বিস্ময়েব সুরে বলে ওঠে:

"বাজে ! -এর কোন মানে হয় !"

দাশার পক্ষে দ্বন্দ্ব এই প্রথম নয়, এর আগেও এমন অনেক হয়েছে। দাশার সঙ্গে একজন ভদ্রলোকের দেখা হয়েছে এই পর্যন্ত। দাশার যে বয়েস, সে বয়েসের লোকের চোখ অন্ধ থাকে, শ্রবণ-শক্তি কম হয়, ধমনীতে শোণিত স্পন্দন এত জোরে হতে থাকে যে, সমস্ত কথা তখন শুনতেই পাওয়া যায় না, কারো মুখের দিকে তাকালেই নিজের প্রতিবিম্ব দেখে, যেন আয়নায় নিজের মুখ দেখছে। এই বয়েসে অস্বাভাবিকতাই কল্পনাকে খানিকটা স্পর্শ করে; সুন্দর মানুষ, মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্য এবং সহজ, সরল ও চিত্তাকর্ষক শিল্পকলা যেন এই ঊনিশ বছরের রাণীর জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মিশে আছে।

তেলেগিনের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা কিন্তু অন্য রকম। দাশা এসেছিল এক সপ্তাহেরও বেশি হয়েছে, কিন্তু এখনো সে যখন ভাবে সেই সুন্দর মেয়েটি কেমন অপ্রত্যাশিত ভাবে তাদের এই ফ্ল্যাটে এসে উপস্থিত হয়েছিল তখন তার বিস্ময়ের অবধি থাকে না। দাশার সরল সহজ ভাবটি তার সর্বদাই মনে পড়ে। সেই গোলাপের মত রং, ছেয়ে রংএর দীর্ঘ কেশ, শিশুর মত সরল মুখ, কিন্তু ব্যক্তিত্বসম্পন্ন—এ সমস্তই তার মনে পড়ে। ভেবে দুঃখ হয়, তাকে অভ্যর্থনা করবার জন্য সে গোড়ায় কেন সেখানে উপস্থিত ছিল না। দাশা এসেই তার মাফলারটি হাঁটুর ওপব রেখে যে ভাবে বসেছিল তা যেন সে কিছুতেই ভুলতে পারে না। মাংসের কাবাব নিয়ে তার সঙ্গে সে কি করে প্রথম আলাপ শুরু করল, একথা সে ভেবেই পায় না। আর পকেট থেকে দুটো মিষ্টি বার করে সে দিল দাশাকে ? অপদার্থ আর কাকে বলে !

তেলেগিনের বয়স এখন ঊনত্রিশ, এরই মধ্যে সে ছয়বার প্রেমে পড়েছে। কাজানে যখন স্কুলে পড়ত সে তখন এক পশুচিকিৎসকের বয়স্কা মেয়ের প্রতি

আকৃষ্ট হয়েছিল; তার নাম ছিল মারুসিয়া খ্ভোয়েভা। মারুসিয়া কিন্তু তাকে প্রশ্রয় দেয়নি, একদিন সে তেলেগিনকে আচ্ছা করে শুনিয়ে দেয়। দুদিন যেতে না যেতেই আবার আদা তিল্লিয়ে নাম্নী এক অভিনেত্রীর প্রণয়প্রার্থী হয় তেলেগিন।

থিয়েটার জগতের সেই তারকা মঞ্চে অবতরণ করে কাজানের লোককে পাগল করে দিয়েছিল। যখন তখন সে স্নানের পোষাক পরে ঘরে বেড়াত এবং থিয়েটারওয়ালা তার সেই ছবিটাকে বিজ্ঞাপনের কাজে লাগাতে একটুও কসুর করেনি। তার সেই ছবিযুক্ত প্রাচীরপত্রে লিখে দেওয়া হয়েছিলঃ "বিখ্যাত আদা তিল্লিয়ে, পদক্ষেপের নৈপুণ্যের জন্য স্বর্ণ পদক প্রাপ্ত।"

তেলেগিন একদিন সাহসে ভর করে সেই অভিনেত্রীর ঘরে ঢুকে পড়ে এবং শহরের পার্ক থেকে চয়ন করে আনা একটি ফুলের তোড়া তাকে উপহার দেয়। আদা তিল্লিয়ে ফুলের তোড়াটা তার কুকুরকে শুঁকতে দিয়ে বলে যে, সেখানকার রান্না খেয়ে তার অজীর্ণ হয়ে গেছে। কোন ওষুধের দোকানে গিয়ে তাড়াতাড়ি একটা ওষুধ নিয়ে আসতে তেলেগিনকে হুকুম করে সে।

তারপর পিতাসবুর্গে, ছাত্রাবস্থায় তেলেগিন প্রেমে পড়ে মেডিক্যাল কলেজের এক ছাত্রীর সঙ্গে—নাম তার ভিলবুশেভিচ। একদিন গিয়ে সে তার সঙ্গে অ্যানাটমির ক্লাসে দেখাও করে; কিন্তু প্রণয়ের ব্যাপারটা কিরকম দানা বাঁধল না। ভিলবুশেভিচ গ্রামের এক হাসপাতালে চাকরি নিয়ে চলে যায়।

তারপর তার জীবনে আসে মেয়েদের টুপির দোকানের এক তরুণী—নাম জিনচ্‌কা। প্রণয় এতই প্রগাঢ় হ'ল যে, তার দুর্বল মুহূর্তে মেয়েটি যা চাইত তাতেই সে সম্মত হ'ত। কিছুদিন বাদে দোকানটা উঠে গেল মস্কোতে—মেয়েটিও সেখানে গেল। তেলেগিন হাঁপ ছেড়ে বাঁচে। প্রেমের প্রতিদান দেবার জন্য যে একটা অতৃপ্ত বাসনা তার মনের মধ্যে সর্বদাই জেগে থাকত, তা থেকে সে অব্যাহতি পায়।

গত সনের আগের সন জুন মাসে তার প্রণয় পর্বের শেষ অধ্যায় আরম্ভ হয়। পাশের বাড়ির জানালার ধারে প্রতিদিন সন্ধ্যার পূর্বে একটি জীর্ণশীর্ণ মেয়ে এসে দেখা দিত। সে এসে জানালা খুলত, পাটলবর্ণের পুরনো জামাটা সযত্নে ঝাড়ত এবং ব্রুশ দিয়ে পরিষ্কার করত। তারপর জামাটা পরে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পার্কে গিয়ে বসত।

একদিন সন্ধ্যায় সেই পার্কে গিয়ে তেলেগিন তার সঙ্গে আলাপ জমায়। তারপর থেকে তারা দুজনে রোজ একসঙ্গে বেড়ায়, পিতার্সবুর্গের সূর্যাস্তের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে ওঠে আর আবোল তাবোল যা খুশি আলাপ করে।

তরুণীর নাম ওলিয়া কোমারোভা। সে একা থাকত। এক সাবরেজিস্টারের অফিসে সে চাকরি করত। অসুখ আর ছাড়ত না এবং সর্বদাই সে কাশত।

তার অসুখ তার কাশি নিয়ে তারা দু'জনে আলোচনা করত, আর বলত, সন্ধ্যা বেলা যাদের একা থাকতে হয় তাদের জীবন কি দুর্বহ। কোমারোভা বলত, কিরা নামে তার এক বান্ধবী একজন ভাল মানুষের সঙ্গে প্রেমে পড়ে এবং তার সঙ্গে ক্রিমিয়ায় চলে যায়। আলাপটা শেষ পর্যন্ত একঘেয়ে হয়ে উঠেছিল। ওলিয়া কোমারোভা তেলেগিনের সঙ্গ পেয়ে এতটা সুখী হয়েছিল যে, তার মনের কোন গোপন কথাই সে আর চেপে রাখতে পারত না, সবই তেলেগিনকে বলে ফেলত। একদিন তাকে সে বলেই ফেলল যে, একসময় তার মনে হয়েছিল তেলেগিন হঠাৎ তার সঙ্গে প্রেমে পড়বে এবং তাকে নিয়ে ক্রিমিয়ায় চলে যাবে।

তার জন্য তেলেগিনের দুঃখ হ'ত, তার প্রতি একটা শ্রদ্ধার ভাবও তার ছিল; কিন্তু তাকে ভালবাসতে সে অপারগ। অবশ্য মেয়েটির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হবার পর মাঝে মাঝে তেলেগিন সন্ধ্যাবেলা তার কুশানে গা এলিয়ে দিয়ে ভাবত, সে কেমন স্বার্থপর হৃদয়হীন। নিজের প্রতি তার যেন একটা অশ্রদ্ধার ভাব আসত।

শরৎকালে ওলিয়া কোমারোভা একদিন ঠান্ডা লেগে বিছানা নিল। তেলেগিন তাকে হাসপাতালে দিয়ে এল, শেষ পর্যন্ত সেখান থেকে তাকে নিয়ে যেতে হ'ল কবরখানায়। মরবার আগে সে বলল: "যদি সেরে উঠি, আমাকে বিয়ে করবে?" তেলেগিন উত্তর দিয়েছিল: "প্রতিজ্ঞা করছি, করব।"

আগের মেয়েদের প্রতি তার যে মনোভাব ছিল, দাশার প্রতি ঠিক তা নয়। এলিজাবেতা কিয়েভনা তাকে বলেছে, সে প্রেমে পড়েছে। কিন্তু একজন প্রেমে পড়তে পারে তো তারই সঙ্গে যাকে পাওয়া সম্ভব; একটা পাষাণের মূর্তি বা উড়ন্ত মেঘের সঙ্গে তো আর কেউ প্রেমে পড়তে পারে না! দাশার জন্য যে তার অনুভূতি তা ঠিক সাধারণ মাপকাঠিতে ফেলে বিচার করা যায় না, কিরকম অদ্ভুত, যেন সবটুকু ধরাছোঁয়ার মধ্যে আসছে না, কিই বা এমন হয়েছে—মাত্র কয়েক মিনিটের আলাপ, আর রয়েছে তার সেই ঘরের কোণে চেয়ারটি, যাতে দাশা এসে বসেছিল।

যাই হোক, অনুভূতিটা তার খুব তীব্র নয়। সে এখন নিজের পরিবর্তন চায়। সাধারণ লোকের স্তরে না গিয়ে নিজের মধ্যে একটু বৈশিষ্ট্য আনার অভিপ্রায় তার। প্রায়ই সে ভাবে:

"বয়েস তো ত্রিশ হতে চলল। এতদিন আমি উদ্ভিদের মতই বেঁচে এসেছি। কি ভীষণ রিক্ততা! আত্মকেন্দ্রিকতা ও অপরের সম্বন্ধে ঔদাসীন্য ছাড়া আর কিছুই ছিল না। আর নয়, এবার থেকে আমাকে সাবধান হতে হবে।"

মার্চের শেষ। বসন্ত তার আগমনবার্তা জানিয়েছে। তুষারাবৃত শহরটা যেন এতদিন গরম শীতবস্ত্রে ঢাকা ছিল। কার্নিশ ও ছাদ থেকে বরফ-গলা

ফোঁটা ফোঁটা জল মুক্তোর মত সবে ঝরে পড়তে আরম্ভ করেছে, জলনিকাশের পাইপ দিয়ে গলগল করে এসে জল পড়ছে, তার নীচে বসানো সবুজ টবে জল পড়ে উপছে যাচ্ছে; বরফ ঝেড়ে রাস্তা পরিষ্কার করা হয়েছে, রোদে তাতা পীচ-ঢালা রাস্তা থেকে বাষ্প বেরুচ্ছে, খানা ডোবা সব শুকিয়ে যাচ্ছে; মোটা কোট এখন কাঁধে বোঝা মনে হবে, যে-কোন দিকে তাকালেই দেখা যাবে, ওভার-কোট না পরে লোক সাধারণ পিরান গায় দিয়েই এখন চলতে আরম্ভ করেছে, শীতের দরুন এখন আর কাউকে মুখ ঢেকেও চলতে হয় না, সবারই মুখ আনন্দোজ্জ্বল; নিঃসীম নীল স্বচ্ছ আকাশ, কেউ যেন জল দিয়ে আকাশটাকে ধুয়ে দিয়েছে—ঠিক এমনি একটি দিনে বেলা সাড়ে তিনটায় তেলেগিন নেভস্কি তীরস্থিত তার অফিস থেকে বেরিয়ে পড়ে। ফার কোটের বোতাম খুলে ফেলে উজ্জ্বল আকাশের দিকে চেয়ে থাকে সে।

"জীবনটা তো খুব খারাপ নয়।"

ঠিক সেই মুহূর্তেই তার চোখের সামনে দাশা। রাস্তার ধার ধরে সে ধীরে হেঁটে চলেছে, বাঁ হাতে একটা পুঁটলি, সে দোলাচ্ছে সেটা। নীল রংএর বাসন্তী কোট পরেছে সে, মাথার টুপিটাও নীল। টুপিতে বাসন্তী ফুল আঁটা রয়েছে। মুখ তার বিমর্ষ ও গম্ভীর। তার পশ্চাতে মুক্ত সূর্য—অনন্ত নীলরাশি ভেদ করে তার রশ্মি এসে পড়েছে জলাশয়, ট্রাম লাইন, জানালার শার্সি, চলমান লোকের পৃষ্ঠদেশ, তার পায়ের তলার মাটি আর গাড়ীর চাকার টানাগুলির ওপর।

এই নীলিমা ও উজ্জ্বলতা থেকেই যেন দাশা অকস্মাৎ আবির্ভূত হয়েছে। চলতে চলতে দাশা ভীড়ের মধ্যে মিলিয়ে যায়। তেলেগিন অনেকক্ষণ সেদিকে চেয়ে থাকে। তার হৃদয়ে দোলা লাগে। নির্মল বাতাসে কিরকম একটা মাদকতা।

ধীর পদক্ষেপে সে এক কোণে চলে যায়, দু'হাত পেছনে রেখে একটা নোটিশবোর্ডের সামনে সে অনেকক্ষণ দাঁড়ায়। নোটিশটা পড়ে সে: "জ্যাক দি রিপার-এর নতুন ও বিস্ময়কর অবদান।" পড়ছিল সত্যি, কিন্তু একবর্ণও তার মাথায় ঢুকছিল না। কি এক অনাস্বাদিত আনন্দ আজ তার জীবনে—কেন এই আনন্দ তা সে ঠিক বুঝে উঠতে পারছিল না।

নোটিশবোর্ড থেকে চোখ ঘোরাতেই আবার দাশা তার নজরে পড়ে। সে ফিরে আসছে। তার সেই মুখের ভাব, টুপিতে ফুলগুলি এখনো রয়েছে, হাতেও যে সেই পুঁটলিটাই দেখা যাচ্ছে। সে গিয়ে টুপি খুলে তার সামনে দাঁড়ায়।

"দারিয়া দ্মিত্রেভ্না, কি মজার দিন..."

দাশা দু'এক পা এগিয়েই থাকে। তার চোখ দু'টি তেলেগিনের দিকে

তুলে ধরে। তাতে যেন সূর্যকিরণস্নাত শ্যামল আভা। দাশার মুখে মধুর হাসি। প্রীতিপূর্ণভাবেই সে তেলোগিনের করমর্দন করে।

"আপনাকে দেখে যে কি খুশিই হয়েছি। আজ ঠিক আপনার কথাই আমি ভাবছিলাম...সত্যি আমি," বলে তেলোগিন।

দাশা মাথা নাড়ে। টুপির ফুলগুলিও নড়ে ওঠে।

"কারখানায় আজ আমার কিছু কাজ ছিল, দারিয়া দ্মিত্রেভ্না, এখন সারাদিন আর কোন কাজ নেই...আজ কি মজার দিন..."

আনন্দ যেন তার উথলে উঠছে। অতি কষ্টে হাসিটাকে চেপে রাখে সে।

দাশা বলেঃ "ইভান ইলিয়িচ, আপনি তো তা হলে আমার সঙ্গে আমার বাড়িতেও দেখা করতে পারেন?"

পাশেই ছায়াচ্ছন্ন একটা ছোট রাস্তায় গিয়ে দাঁড়ায় তারা।

"ইভান ইলিয়িচ. আপনাকে আমি দু'একটা কথা জিজ্ঞেসা করব, কিছু মনে করবেন না তো? অবিশ্যি আমি জানি আপনি কিছু মনে করবেন না। আপনার সঙ্গে কথা বলার অধিকার আমার আছে। কিন্তু কোনরূপ না ভেবেচিন্তে আমার কথার সোজা জবাব দিতে হবে আপনাকে। আমি প্রশ্ন করা মাত্র আপনি উত্তর দেবেন।"

তার মুখ গুরুগম্ভীর, ভ্রূযুগল টান দেখাচ্ছে।

"এক সময় আমি ভাবতাম"—বলেই সে তার বক্তব্য স্পষ্ট করার জন্য যেন দৃষ্টান্তের অবতারণা করে—"হ্যাঁ ভাবতাম, ডাকাত, মিথ্যেবাদী, খুনী সবরকম লোকই আছে এবং সাপ, মাকড়সা, ইঁদুরের মত তারা একটু দূরেই থাকে—তাদের কথা ছেড়ে দিলে সাধারণ মানুষ দুর্বলতা, সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও সকলেই ভাল, খোলা মন তাদের। এদিকে যে মেয়েটি আসছে তার দিকে তাকান! তাকে দেখে যা মনে হচ্ছে, নিশ্চয়ই সে তাই! সারা জগৎটাই যেন অদ্ভুত রঙে চিত্রিত বলে আমার মনে হয়। বুঝতে পেরেছেন আমি কি বলতে চেয়েছি?"

"হ্যাঁ তাই। কিন্তু তাতে কি ক্ষতি, দারিয়া দ্মিত্রেভ্না!"

"রাখুন, একটু ধৈর্য ধরে শুনুন! কিন্তু এখন আমার মনে হয়, আমি যেন সেই ওপরের বর্ণাঢ্যতা ভেদ করে ভেতরের কালো কদর্য রূপটাকে দেখতে পেয়েছি। আমি তো দেখছি একজন লোক ক্ষেত্রবিশেষে কতখানি আকর্ষণীয়, কতখানি চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠতে পারে, আবার সেই লোকই এমন ঘৃণ্য কাজ করে বসে যা ভাবাও যায় না। আপনি ভাববেন না দোকান থেকে কেক চুরি করে খাওয়ার কথা আমি বলছি—আমি যার কথা বলছি তা সত্যি মহাঅপরাধ—প্রতারণা।" দাশা মুখ ঘুরিয়ে নেয়, তার চিবুক কাঁপতে থাকে। "ব্যভিচার—একটি বিবাহিতা রমণীর ব্যভিচার। আপনাকেই আমি জিজ্ঞেসা করি ইভান ইলিয়িচ, এমন কাজ করা চলে?"

"না না, কখ্খনো না!"

"কেন নয়?"

"ঠিক এক্ষুণি আপনাকে হয়ত আমি বোঝাতে পারব না, তবে এটা ঠিক যে, এমন কাজ করা মোটেই সঙ্গত নয়।"

"আপনি কি মনে করেন নিজে আমি তা বুঝতে পারছিনে? বেলা দু'টো থেকেই এ-চিন্তা আমাকে পাগলের মত ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে—কিছুতেই শান্তি পাচ্ছিনে। এমন উজ্জ্বল সুন্দর দিনে আমি যখন ভাবি এই সমস্ত বাড়িতে পর্দার অন্তরালে দুর্জনেরা লুকিয়ে আছে এবং তাদেরই মধ্যে আমাকে বাস করতে হচ্ছে তখন আমার কান্না পায়। বুঝতে পারছেন আমার মনের অবস্থা?"

"না, আমি ঠিক বুঝতে পাচ্ছিনে," দ্রুত উত্তর দেয় তেলেগিন।

"কিন্তু আমি তো বুঝতে পারছি। উঃ! আমার কি দুর্ভাগ্য! আমি তো এখনো নির্বোধ বালিকা, এই শহর বোধ হয় বড়দের জন্য, আমাদের মত বালিকাদের জন্য নয়।"

দাশা তার বাড়ির ফটকের সামনে এসে দাঁড়ায়। রাস্তায় একটা সিগারেটের বাক্স পড়ে ছিল। দাশা তার জুতোর মাথা দিয়ে বাক্সটাকে এপিঠ-ওপিঠ করে উল্টিয়ে দেখে, বাক্সের এক পিঠে একটি নারীর ছবি, তার মুখ থেকে সিগারেটের ধোঁয়া বেরুচ্ছে। দাশার পালিস করা জুতোর মাথাটা চিকচিক করছে। তেলেগিন সেদিকে খানিকক্ষণ চেয়ে থাকে; তার মনে হয় দাশা মিলিয়ে যাচ্ছে একটা কুয়াশার পর্দার আড়ালে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। ইচ্ছে হচ্ছে সে তাকে ধরে রাখে; কিন্তু তা কি করে সম্ভব? কিসের জোরে রাখবে সে? অবশ্য এমন একটা জোরও খাটানো যায় একথা সে জানে। ভাবতে তার অন্তরটা কেমন যেন মুচড়ে ওঠে, গলাটা যেন আটকে আসে। কিন্তু দাশার প্রতি যে তার অনুরাগ সে তো দেয়ালের গায়ে ছায়ার মত, কারণ তার নিজের মন নরম বলেই না এসমস্ত ভাব আসে।

"আচ্ছা, বিদায়। আপনাকে ধন্যবাদ, ইভান ইলিয়িচ। আপনি ভাল মানুষ, আপনার যথেষ্ট সম্মান আছে। মনের বোঝা আমার নামেনি, তবে নামুক না নামুক আপনার কাছে আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। আপনি আমাকে বুঝতে পেরেছেন, কি পারেননি? পৃথিবীতে এরকমই সমস্ত ঘটনা ঘটে! ভেবে আর কি হবে; মানুষকে বাঁচতেই হবে। সময় পেলে আমাদের সঙ্গে দেখা করবেন। কেমন?"

স্মিতবদনে দাশা তার হাতখানি তেলেগিনের দিকে এগিয়ে দেয়; তারপর ফটক দিয়ে প্রবেশ করে অন্ধকারে মিলিয়ে যায় সে।

॥ ছয় ॥

দোর খুলে ঘরে ঢুকেই দাশা বিস্মিত হয়ে দাঁড়ায়, ভেজা ফুলের গন্ধ আসছে। ড্রেসিং টেবিলের ওপর একটা ফুলের সাজি দেখতে পায় সে; সাজির উঁচু হাতলটায় একটা নীল রংএর ফিতে বাঁধা। দৌড়ে গিয়ে সে ফুলগুলির মধ্যে তার মুখ গুঁজে দেয়। বেগুনে রংএর পার্মা ফুল, ভেজা, ততটা টাটকা নয়।

দাশার প্রাণে যেন একটা বিদ্যুৎ খেলে যায়। সারা সকাল বেলাটা কিসের একটা অভাব সে অনুভব করছিল—এই বেগুনে রংএর ফুলগুলিই হয়তো তার মন চাচ্ছিল। কিন্তু কে এগুলি পাঠিয়েছে? সে নিজেই যা জানত না, আজ কে তার মনের কথা এমন ভাবে জানতে পারল? ফিতেটার কি দরকার? ফিতেটা খুলতে খুলতে সে আপন মনে ভাবে:

"সে অশান্ত হতে পারে, কিন্তু সত্যি তো সে খারাপ মেয়ে নয়। যার যেমন খুশি অপরাধ করুক, সে ঠিক তার নিজের পথেই চলবে। কেউ কেউ হয়তো তার সম্বন্ধে ভাবতে পারে মাথাভারী মেয়ে সব কিছুতেই নাক গলায়। কেনই বা গলাবে না?. অনেকে তো তা হৃদয়ংগম করতে পারে এবং সেজন্য তাকে পছন্দও করে।"

ফিতের মধ্যে বাঁধা একটি পুরু কাগজে বড় বড় করে দুটি শব্দ লেখা: "ভালবাসা, ভালবাসা।" অপরিচিত হস্তাক্ষর। কাগজের উল্টো পিঠে একটা ফুলের দোকানের নাম ছাপা রয়েছে, "রিভিয়েরা ফ্লাওয়ার শপ।" সেই দোকানে বসেই কেউ কাগজটায় নিজহাতে লিখে থাকবে: "ভালবাসা, ভালবাসা।" ফুলের সাজিটা নিয়ে দাশা ঘর থেকে বেরিয়ে যায় এবং ডাক দেয়:

"মোগল, কে আমাকে এই ফুল দিয়ে গেছে?"

গ্র্যান্ড মোগল ফুলের সাজিটার দিকে চেয়ে একবার দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে—এসব নিয়ে কি তার মাথা ঘামাবার কথা? তারপর বলে:

"দোকান থেকে একটা ছোকরা একাতেরিনা দ্মিত্রেভ্নার জন্য ফুলগুলি নিয়ে আসে। তিনি এগুলি তোমার ঘরে রেখে দিতে বললেন।

"কে ফুল দিয়ে তাকে পাঠিয়েছে? ছোকরা কিছু বলল?"

"না, আর কিছু বলল না। কেবল বলল, তোমার দিদিকে যেন ফুলগুলি দিয়ে দেওয়া হয়।"

দাশা আবার তার ঘরে ঢুকে জানালার ধারে গিয়ে দাঁড়ায়। জানালা দিয়ে সূর্যাস্ত দেখা যাচ্ছে: বাঁ দিকে পাশের বাড়ির ইঁটের প্রাচীরের ওধারে অস্তগামী সূর্যের শেষরশ্মির আভাসটুকু মাত্র আকাশে পরিলক্ষিত হচ্ছে। অন্ধকার প্রায় ঘনিয়ে এসেছে, মহাশূন্যে একটি মাত্র তারা দেখা দিয়েছে, তারাটি

এমন জ্বলজ্বল করছে মনে হচ্ছে কেউ বুঝি নতুন করে সেটাকে পালিস করে দিয়েছে। অকস্মাৎ অন্ধকার সরু রাস্তায় বিজলী বাতি জ্বলে ওঠে। কাছেই একটা মোটরগাড়ীর আওয়াজ শুনতে পাওয়া যায়, দাশা দেখতে পায়, সন্ধ্যার কুয়াশা ভেদ করে গাড়ীটা রাস্তা দিয়ে ছুটে চলেছে।

ঘরটা অন্ধকার হয়ে গেছে। ফুলগুলির সুগন্ধ ভেসে আসছে। যার সঙ্গে কাতিয়া পাপকার্য করেছে সেই যে ফুলগুলি পাঠিয়েছে এতে আর সন্দেহ নেই। দাশা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবে, দিদি একটা মারাত্মক রকমের ভুল করছে, পতঙ্গ যেমন মাকড়সার জালে আটকে যায়, দিদিও তেমনি কোন একটা সুক্ষ্ম জালে জড়িয়ে পড়ছে। ফুলগুলির গন্ধে, দুটি শব্দেই তো তার স্পষ্ট আভাস রয়েছে। "ভালবাসা, ভালবাসা"—দুটি কথার মধ্যে কত উন্মাদনাই না জানি রয়েছে—যেন বসন্ত সন্ধ্যায় ভ্রমরগুঞ্জন।

হঠাৎ তার হৃদয়ের স্পন্দন দ্রুত হয়ে ওঠে। তার মনে হয়, নিষিদ্ধ, গোপনীয় একটা কিছু যেন সে আঙুল দিয়ে স্পর্শ করছে চোখে দেখতে পাচ্ছে, অনুভব করছে, শুনছে সে, মাধুর্যের মধ্যে যেন একটা দহনের তীব্র অনুভূতি। অকস্মাৎ তার সমস্ত বাঁধন যেন খুলে যায়, নিজেকে উন্মুক্ত করে দেয় সে। বুঝতে পারে না কি করে এ সম্ভব হ'ল, কিন্তু একটা বড় বাধা যে সে অতিক্রম করেছে এ বুঝতে তার একটুও সময় লাগে না। সাদা টুপি পরিহিতা দুটি নারীকে নিয়ে মোটর গাড়ীটা যেমন রাস্তার শেষ প্রান্তে নিঃশব্দে অন্ধকারে অন্তর্ধান হয়, ঠিক তেমনি দাশার কঠোরতা তার ক্ষুদ্র বরফের প্রাচীরও যেন বাষ্প হয়ে উড়ে কোথায় মিলিয়ে যায়।

কেবল তার হৃদয়টা যেন আরো দ্রুত তালে নাচতে থাকে; মাথাটা ঝিম ঝিম করে; তার সর্বাঙ্গে যেন একটা সুরের লহরী স্বতঃস্ফূর্তভাবে খেলে যায়, একটা কথাই বার বার তার মনে উদিত হয়ঃ "আমি জীবন্ত, আমি ভালবাসি। আনন্দ, জীবন, সমগ্র বিশ্ব—আমার, আমার, আমার।"

দাশা তার দু'চোখ বিস্ফারিত করে উচ্চস্বরে বলে ওঠেঃ "শোন, তুমি শোন, তুমি শুধু এক দুর্বহ প্রকৃতির অনূঢ়া রমণী।"

ঘরটা পার হয়ে সে এক কোণে চলে যায়, একটা প্রকাণ্ড নরম আরাম-কেদারায় গিয়ে বসে। তারপর একটা চকোলেটের মোড়ানো কাগজ ধীরে ধীরে খোলে আর আপন মনে গত দু'সপ্তাহের ঘটনাবলী স্মরণ করতে থাকে।

বাড়িতে কোন পরিবর্তনই হয়নি। স্বামীর প্রতি কাতিয়ার দরদ যেন একটু বেড়েই গেছে। নিকলাই ইভানোভিচ আজকাল বেশ খোশমেজাজেই আছেন। ফিনল্যান্ডের কোনও গ্রামে একটি পল্লীভবন নির্মাণের পরিকল্পনা নিয়ে তিনি ব্যস্ত। এই দুটি অন্ধ প্রাণীর 'ট্র্যাজেডি' একমাত্র দাশাই অন্তরে অন্তরে উপলব্ধি করে। গায়ে পড়ে দিদির সঙ্গে কথা বলার প্রবৃত্তি আর তার নেই। কাতিয়ারও সেই আগের ভাব নেই। দাশার মনের প্রতি তার খুবই

নজর ছিল, কিন্তু এখন যেন কি রকম উদাসীন। ঈস্টারের আগে কাতিয়া দাশা ও নিজের জন্য বাসন্তী পোশাকের অর্ডার দেয়; দর্জি ও টুপি নির্মাতাদের সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে কথাবার্তা বলে; চ্যারিটি বাজারে যোগ দেয়; সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির বামপন্থী দল অর্থাৎ তথাকথিত বলশেভিকদের জন্য অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে নিকলাই ইভানোভিচের অনুরোধে সাহিত্য জলসার উদ্যোগ আয়োজন করে; মঙ্গলবারের মত বৃহস্পতিবারও বাড়িতে অভ্যাগতদের আদর আপ্যায়ন করে—মোট কথা এক মুহূর্তও তার ফুরসৎ নেই।

"এই সারাক্ষণই তুমি ভয়ে জড়সড় হয়ে আছ, কোনদিকেই মনস্থির করতে পারলে না, যা তুমি বোঝ না তা নিয়েই মাথা ঘামালে, এমন জিনিস ভাবলে যা তুমি নিছক কল্পনাজগতে বিচরণ না করলে কখনও বুঝতে পারবে না।"

দাশা আপন মনে চিন্তা করে। মুখে তার মৃদু হাসি। হ্রদের কালো জলে বরফের কতগুলি টুকরো পড়ল—তা থেকে ভালো কিছু পাবার আশা নেই—কিন্তু গত কয়েকদিন ধরে যেমন বার বার এসেছে ঠিক তেমনি তা থেকে বেরিয়ে এল বেসনভের ধূর্ত চতুর প্রতিমূর্তিটি।

দাশা হাল ছেড়ে দেয়। বেসনভ এসে তার চিন্তা জুড়ে বসে। দাশা একেবারে স্থির শান্ত হয়ে যায়। অন্ধকার ঘরে দেয়ালঘড়িটা টিক্‌টিক্‌ আওয়াজ করে চলে।

বাড়িতেই একটু দূরে একটা দরজা খোলার শব্দ পায় দাশা। দিদির কণ্ঠস্বর তার কানে আসে:

"দাশা কি অনেকক্ষণ হ'ল ফিরেছে?"

আরামকেদারা ছেড়ে উঠে দাশা বেরিয়ে হলঘরে যায়। কাতিয়া তাড়াতাড়ি জিজ্ঞেসা করে:

"কি রে, তোর মুখ অত লাল কেন?"

নিকলাই ইভানোভিচ তাঁর ওভারকোট খুলে রেখে সেই মণ্ডসেবী প্রেমিকের একটা ছড়া আবৃত্তি করেন। দাশা বিতৃষ্ণাভরে তাঁর দিকে একবার তাকিয়ে কাতিয়ার সঙ্গে তার শোবার ঘরে চলে যায়। দাশা গিয়ে একটা ড্রেসিং টেবিলের পাশে বসে। ঘরের অন্যান্য আসবাবপত্রের মতই ড্রেসিং টেবিলটাও যেন একটু অসাধারণ। বাইরে গিয়ে আজ কোন্‌ কোন্‌ বন্ধুর সঙ্গে কাতিয়ার দেখা হয়েছিল, দাশা বেশ আঁটসাঁট হয়ে সেই গল্প শুনতে বসে।

দাশা কথা বলছে আর কাতিয়া ড্রেসিং টেবিলের ড্রয়ারের জিনিসগুলি গুছোচ্ছে। দস্তানা, লেসের টুক্‌রো, পর্দা, সাটিনের চটি প্রভৃতিতে ড্রয়ারটা ভরা। সেগুলো নাড়াচাড়া করতেই ভুরভুর করে সেন্টের গন্ধ বেরিয়ে আসছে। "মনে হয় কেরেনস্কি আবার তার মামলায় হেরে গেছেন, একেবারে নিঃস্ব হয়ে পড়েছেন। তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল, তিনি বললেন, জীবনধারণ করা কঠিন হয়ে পড়ছে। তিমিরিয়াজেভদের বাড়িতে হাম হয়েছে।

শাইনবার্গ আবার সেই খ্যাপা মেয়েটার কাছে গেছে। তারা বলে, মেয়েটা বাস্তবিকই শাইনবার্গের ঘরে গুলি করে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিল। কি মধুর বসন্ত! দিনটাই বা কি চমৎকার! বসন্তের হাওয়া সবাইকে পাগল করে তুলেছে, লোক যেন মাতালের মত রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। ও, আরো একটা খবর: আকুন্দিনের সঙ্গে দেখা হয়েছিল; সে বলল, একটা বিপ্লব হতে আর দেরি নেই। গ্রাম, কারখানায়—সর্বত্র অসন্তোষ আর বিক্ষোভ। ওঃ! যত তাড়াতাড়ি হয় ততই ভাল! শুনে নিকলাই ইভানোভিচ এতটা উৎফুল্ল হ'ল যে আমাকে নিয়ে সে একটা পানশালায় চলে গেল। বিপ্লব আসন্ন, এই আনন্দে আমরা এক বোতল শ্যামপেন পান করে ফেললাম।"

দাশা চুপ করে তার দিদির কথাগুলি শুনে যায়। কাচের যে পাত্রগুলি সেখানে ছিল সেগুলির ঢাকনা সে যন্ত্রবৎ একবার খোলে, আবার বন্ধ করে। অকস্মাৎ সে বলে ওঠে:

"দিদি, শোন্, আমার এখন যে অবস্থা তাতে কারো কোনো কাজেই আমি লাগব না।" একটা রেশমের মোজা হাতে নিয়ে কাতিয়া বোনের দিকে প্রখর দৃষ্টিতে তাকায়। "আসল কথা কি জানিস, আমার নিজের কাছেই যেন নিজেকে ভাল লাগছে না। কেউ কেউ যেমন আছে কাঁচা গাজর ছাড়া আর কিছুই খায় না আর ভাবে তা খায় বলেই সে সবার ওপরে, আমারও হয়েছে সেই অবস্থা।"

"তুই কি বলতে চাচ্ছিস আমি বুঝতে পারছিনে," কাতিয়া বলে।

দাশা দিদির পিঠের দিকে চায় আর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করে।

"আমি ভাবি প্রত্যেকেই খারাপ, প্রত্যেকেরই সমালোচনা করি আমি। এ বোকা, ও বিরক্তিকর, সে নোংরা। অর্থাৎ কেবল আমিই ভাল। এটা ভাল লক্ষণ নয়, পীড়াদায়ক। আমি তোরও সমালোচনা করি, দিদি।"

না ঘুরেই কাতিয়া শান্ত ভাবে জিজ্ঞেসা করে: "কিসের জন্য সমালোচনা করিস?"

"ওঃ! দিদি, আমাকে তুই একটু বুঝতে চেষ্টা কর! আমি সব কিছুতেই নাক গলাতে যাই এবং এটাই হয়েছে আমার একমাত্র রোগ। এটা বোকামি ছাড়া আর কি! তোদের সবার মধ্যে থেকেও আমি একা—এ আর আমি সহ্য করতে পারছিনে। একটা কথা তোকে আমার না বলে উপায় নেই। একটা লোক আমাকে বড্ড ভাবিয়ে তুলেছে।"

আগাগোড়া মাথা নীচু করেই দাশা কথাগুলি বলে যায়। কাঁচের একটা গ্লাসকে সে একটা আঙুল ঢুকিয়ে দিয়েছে, খুলতে পারছে না।

"তাতে কি হয়েছে বোন? একজনকে তোর ভাল লেগেছে। তুই সুখী হবি। তুই যদি সুখী না হবি তো হবে কে?" বলেই কাতিয়া ছোট একটা নিঃশ্বাস ফেলে।

"কিন্তু দিদি, ব্যাপারটা অত সোজা নয়। আমি তো তার সঙ্গে প্রণয়ে পড়িনি।"

"তাকে যদি পছন্দ হয়ে থাকে, ভালবাসাও হবে।"

"ঐ তো মুশকিল—আমি যে তাকে পছন্দ করিনে।"

গা-আলমারীর কপাট বন্ধ করে কাতিয়া দাশার কাছে এসে দাঁড়ায়ঃ "কিন্তু এইমাত্র যে বললি, তাকে তোর ভাল লাগে...কি আশ্চর্য !"

"কথার ছল করিসনে দিদি। সেই সেন্তোরেভস্কের ইংরেজ যুবকের কথা তোর মনে পড়ে ? তাকে আমার ভাল লাগত, এমন কি তার সঙ্গে প্রেমেও পড়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু আমাতেই আমি তখন ছিলাম। আমার রাগ হয়েছিল, আমি আড়ালে গিয়েছিলাম, রাত্রে আমি কাঁদতাম। কিন্তু এই মানুষটি ...আমি জানিও না এই সেই মানুষ কিনা. হ্যাঁ, সেই, সেই. .এই লোকটা আমাকে একেবারে হতবুদ্ধি করে দিয়েছে.. আমি এখন একেবারে অন্য মানুষটি হয়ে গেছি আমূল পরিবর্তন। আমি যেন কিসের ঘ্রাণ আস্বাদন করছি .. সে যদি এখন আমার ঘরে আসে. আমি নিশ্চল হয়ে যাব ..আমাকে নিয়ে যা খুশি সে করতে পারবে—তাকে বাধা দেবার কোন শক্তিই আমার থাকবে না।"

"দাশা, তুই বলছিস কি ?"

দাশার চেয়ারের ধারে কাতিয়া বসে, তাকে টেনে কাছে নেয়. উষ্ণ হাতটা নিয়ে ঠোঁটে চুম্বন করে; দাশা কিন্তু আস্তে আস্তে নিজেকে ছাড়িয়ে নেয়, দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে এবং গালটা হাতের ওপর রেখে অনেকক্ষণ ধরে জানালা দিয়ে অন্ধকার আকাশে তারাগুলির দিকে চেয়ে থাকে।

"তার নাম কি, দাশা ?"

"আলেক্সি আলেক্সিয়েভিচ বেসনভ।"

কাতিয়া উঠে দাঁড়ায়, আর একটা চেয়ার নেয়, গলায় হাত দেয়, বসে পড়ে, অনড়, একেবারে যেন কাঠ হয়ে গেছে। অন্ধকারে দিদির মুখখানা স্পষ্ট দেখতে পায় না দাশা—তবে বুঝতে পারে তাকে সে যা বলেছে তা সাংঘাতিক। একটু ঘুরে বসে সে মনে মনে ভাবে, "আর নয়, এই যথেষ্ট।" "এই যথেষ্ট"-টুকু বলেই নিজেকে খানিকটা হাল্কা মনে হয় দাশার, যেন নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচে সে।

"আচ্ছা বল্ তো দিদি, সবাই যখন সব কিছু করতে পারে তখন আমি পারিনে কেন ? দু'বছর ধরে আমি ছ'শ' ছেষট্টিটা প্রলোভনের কথা শুনে আসছি, অথচ সারা জীবনে আমি মাত্র একবার স্কেটিং খেলার সময় কলেজের একটা ছাত্রকে চুমো খেয়েছি।"

দাশা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে, আর কিছু বলে না। কাতিয়া হাঁটুর ওপর দু'হাত রেখে দাশার দিকে একটু ঝুঁকে বলেঃ

"বেসনভ মোটেই ভাল লোক নয়। ভয়ঙ্কর মানুষ, দাশা। কি বলছি, শুনছিস ?"

"হ্যাঁ শুনছি।"

"সে তোর সর্বনাশ করে ছাড়বে।"

"হয়ত করবে, কিন্তু আমি কি করতে পারি ?

"না, আমি এ হতে দেব না। অন্য যে যা ইচ্ছে করুক, না তুই না...না না তুই না দাশা, তুই এ করতে পারবিনে!"

"না, 'যৌবনেও বয়সের রূপ কিছু নাই—অন্তর বাহির তার মলিন সদাই।' —না দিদি ? আচ্ছা, বলতে পারিস, বেসনভ খারাপ কিসে ?"

"আমি তোকে বলতে পারব না...জানিনে আমি...কিন্তু তার কথা ভাবতেই আমি কি রকম শিউরে উঠি।"

"কিন্তু এক সময় না তুইও তাকে খুব পছন্দ করতিস ?"

"কখ্খনো না! আমি তাকে ঘৃণা করি। তার হাত থেকে ভগবান তোকে রক্ষা করুন।"

"ও, তাই বল! তাহ'লে তো আমি তাঁর খপ্পরে পড়বই।"

"কি বলছিস তুই, দাশা! আমাদের দু'জনেরই মাথা খারাপ হয়ে গেছে।"

এই ধরনের আলাপ দাশার খুব ভাল লাগে, মনে হয় একটা সরু তক্তার ওপর দিয়ে যেন পা টিপে টিপে পার হওয়া। কাতিয়া এতখানি উত্তেজিত হয়েছে দেখে সে খুশি হয়। বেসনভের কথা কি দাশা একটুও ভাবে নাকি! তবু দিদিকে পরখ করে নেবার জন্য সে তার সম্বন্ধে কত কথাই না বাড়িয়ে বলে—বেসনভের জন্য তার মনটা কেমন করে, প্রথম যখন দেখা হ'ল কি ভালই লাগল তাকে, তার মুখখানাই বা দেখতে কেমন সুন্দর—এই ধরনের আরো কত কি কথা সে ফেনিয়ে ফেনিয়ে বলতে থাকে। বেসনভের জন্য তার রাত্রে ঘুম পর্যন্ত হয় না, একেক সময় মন তার এত উতলা হয়ে ওঠে যে তার কাছে ছুটে পালিয়ে যাবার কথাও সে ভাবে। এতটা বলে ফেলে যে, শেষ পর্যন্ত দাশার নিজেরই যেন সমস্ত ব্যাপারটা কিরকম বিশ্রী লাগে: ইচ্ছে হয়, দু'হাতে কাতিয়ার গলা জড়িয়ে ধরে চুমো খেয়ে তাকে বলেঃ "দিদি, তোর মত বোকা আর আমি দেখিনি!" কিন্তু হঠাৎ কাতিয়া চেয়ার ছেড়ে গালিচার ওপর বসে পড়ে এবং দু'হাতে দাশাকে জড়িয়ে ধ'রে তার দু'হাটুর মধ্যে মুখটা গুঁজে দেয়; তার সর্বাঙ্গ কাঁপতে থাকে, একটা বুকফাটা আওয়াজ বেরিয়ে আসেঃ

"আমাকে ক্ষমা কর, আমাকে ক্ষমা কর, তুই আমাকে ক্ষমা কর, দাশা!"

দাশা চমকে ওঠে। দিদির ওপর সে ঝুঁকে পড়ে। ভয় ও অনুকম্পায় চোখ দিয়ে তার জল বেরিয়ে আসে। ফোঁপাতে ফোঁপাতে সে দিদিকে জিজ্ঞেস করে, কি বুঝেছে সে, ক্ষমা করার মত কি হয়েছে ? কিন্তু কাতিয়া দাঁতে দাঁত

চেপে থাকে, কিছুই বলে না, কেবল সস্নেহে দাশার অঙ্গে হাত বুলোয় এবং তার দু'হাত টেনে নিয়ে চুম্বন করে।

আহারের সময় নিকলাই ইভানোভিচের দৃষ্টি দু'বোনের দিকেই পড়ে। তিনি বলেন :

"ভালো! এই চোখের জল কেন, জানতে পারি?"

দাশা সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেয়, "আমি একটা জানোয়ার, তাই এই চোখের জল। আপনি চুপ করুন তো মশায়, এ নিয়ে আপনাকে মাথা ঘামাতে হবে না। আপনি না বললেও আমি জানি আপনার স্ত্রীর একটি নখের যোগ্যও আমি নই।"

আহারের পর কফি পানের জন্য অভ্যাগতরা এসে সমবেত হয়। নিকলাই ইভানোভিচ ভাবেন বাড়িতে কারো মন ভাল নেই, কাজেই দোকানে গিয়ে পান করে আসাই ভাল। কুলিচভ একটি গাড়ীর জন্য ফোন করে: কাতিয়া ও দাশা বেশ পরিবর্তন করতে যায়। এই সময় চির্ভা এসে হাজির। রেস্তোরাঁয় যাওয়া হচ্ছে শুনে সে অপ্রত্যাশিতভাবে মেজাজের মাথায় বলে ফেলে :

"শেষ পর্যন্ত এমন ব্যক্তিটি কে এলেন যিনি মদ্যপানের এই অবিশ্রান্ত হৈহল্লা থেকে নিজেকে বঞ্চিত করতে চান? রুশ সাহিত্য!"

অবশ্য শেষ পর্যন্ত সকলের সঙ্গে সে গাড়ীতে গিয়ে ওঠে। 'নর্দার্ন পামিরা' হোটেলটায় লোক গিশগিশ করছে, অনবরত গুঞ্জন, একতলার প্রকাণ্ড হলঘরটা ঝাড়ের আলোয় দিনের বেলার মত আলোকিত। বহু শাখাপ্রশাখা-যুক্ত আলোকোজ্জ্বল কাচের ঝাড়লণ্ঠন; মেঝে থেকে উত্থিত সিগারেটের ধোঁয়া; ঘন সন্নিবিষ্ট ছোট ছোট টেবিল; সান্ধ্যবেশ পরিহিত পুরুষ ও অনাবৃত স্কন্ধ নারী, সবুজ, ফিকে বেগুনে, ধূসর নানা রংএর পরচুলা মাথায়; নারীদের কণ্ঠদেশে ও কর্ণে রঙিন পাখীর পালক ও হীরাজহরৎ, কমলা, নীল ও লাল জ্যোতি বেরিয়ে আসছে তা থেকে; পরিচারকবৃন্দ আলোছায়ায় এদিকে ওদিকে যাচ্ছে, গাঢ় বেগুনে রংএর পর্দার সামনে একটা কৃশ লোক দাঁড়িয়ে তার যাদুকাঠি ঊর্ধ্বে তুলে ধরে কি বলছে; বাদক দলের পেতলের বাদ্যযন্ত্রগুলি ঝকঝক করছে—চারদিকে দেয়ালের আয়নায় প্রতিফলিত হয়ে একটা দশটা বলে প্রতিভাত হচ্ছে; দেখে মনে হয়, সমগ্র মানবজাতির, সমগ্র বিশ্বের যেন এক বিচিত্র মেলা বসেছে এখানে—এর কোন আদিও নেই, অন্তও নেই।

একটা খড়ের নল দিয়ে দাশা শ্যামপেন পান করে আর কেবল টেবিলগুলির দিকে বার বার তাকায়। একটা টেবিলের ধারে বসে আছে একজন লোক, গোঁফদাড়ি কামানো, মুখে পাউডার মাখা। তার সামনে একটা মদের বোতল-ভরা বালতি, ভেতরে বরফ আছে বলে বালতির গা-টা ঘেমে উঠেছে, একটা চিংড়ির খোসাও পড়ে আছে তার সামনে। লোকটার চোখ দু'টো অর্ধনিমীলিত, অধরোষ্ঠে বিতৃষ্ণার ছাপ। দাশার মনে হয়, লোকটা বসে বসে ভাবছে, শেষ

পর্যন্ত বিজলি বাতি নিভে যাবে এবং প্রত্যেকেই মরবে—আরো হয়ত ভাবছে আনন্দ করার মত পৃথিবীতে কিই বা আছে ?

এর মধ্যে পর্দাটা নড়ে ওঠে এবং ফাঁক হয়ে দু'দিকে সরে যায়। খর্বাকৃতি একজন জাপানী লাফিয়ে এসে মঞ্চের ওপর পড়ে। তার কুঞ্চিত মুখমণ্ডলের রেখাগুলি দেখলে দুঃখ হয়। রঙিন কতগুলি বল, থালা এবং কয়েকটা টর্চ নিয়ে সে খেলা দেখাতে আরম্ভ করে; সেগুলি সে ওপরের দিকে ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারে আর ধরে। দাশা ভাবেঃ "দিদি কেন বলল: 'আমার ক্ষমা কর্' ?"

অকস্মাৎ মন হয়, কে যেন একটা কাপড়ের পটি দিয়ে তার মাথাটা জোর করে চেপে বেঁধে দিল। তার হৃদয়ের স্পন্দন যেন বন্ধ হয়ে আসছিল। "তা কি হতে পারে ?" মাথাটা সে হাল্কা করার জন্য একবার ঝাঁকুনি দিয়ে নেয় দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে, যে ধারণা থেকে তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এসেছে 'তা কি হতে পারে ?' সেই ধারণাকে সে যেন আর আমলই দিতে চায় না। দিদির মুখের দিকে সে তাকায়।

কাতিয়া টেবিলের ধারে একটু দূরেই বসেছিল। তাকে বড় ক্লান্ত দেখাচ্ছিল, বড় বিমর্ষ, কিন্তু কি সুন্দর! দাশার দু'চোখ ছাপিয়ে জল আসে। সে তার অধরোষ্ঠে অংগুলি স্থাপন করে আস্তে শিস দেয়, খুব আস্তে। কাতিয়া বুঝতে পারে। তার মুখে মৃদুহাসি দেখা দেয়।

রাত্রি প্রায় দু'টোয় তর্ক ওঠে- এর পর কোথায় যাওয়া যায় ? কাতিয়া বাড়ি যেতে চায়। নিকলাই ইভানোভিচ বলেন যে, সকলে যা বলবে তাই হবে। প্রায় সকলেই স্থির করে, অন্য কোথাও যাওয়া যাক।

ভীড় অনেকটা কমে গেছে। তার মধ্যে বেসনভকে দাশা দেখতে পায়। টেবিলের ওপর দুই কনুই রেখে সে বসেছে। তার পাশে আছে আকুন্দিন; একটা সিগারেট তার মুখে, আধখানা শেষ হয়ে গেছে। নখ দিয়ে টেবিলক্লথে রেখা কাটতে কাটতে আকুন্দিন কি বলে যাচ্ছে আর বেসনভ খুব মনোযোগের সংগে তা শুনছে। আকুন্দিনের নখ দিয়ে রেখা টানা বেসনভ লক্ষ্য করছে। তাকে একটু বিমর্ষ দেখাচ্ছে, তবে তন্ময় ভাব। গণ্ডগোলের মধ্যেও যেন দাশার কানে এই ক'টি কথা ভেসে এলঃ "শেষ, সব কিছুর শেষ।" ঠিক শেষ মুহূর্তে, তাতার দেশীয় একজন পরিচারক একটা পর্দা টেনে দুজনকেই আড়াল করে দেয়। কাতিয়া ও নিকলাই ইভানোভিচ উঠে দাঁড়িয়ে দাশাকে ডাকে, তাদের সংগে সে চলে যায়, কিন্তু তখনো তার মনে প্রচুর উত্তেজনা ও ঔৎসুক্য রয়ে গেছে।

বাইরে এসেই তারা দেখে চমৎকার আবহাওয়া, বাতাসে সুগন্ধ ভেসে আসছে। কালো আকাশে তারাগুলি জ্বলজ্বল করছে। দাশার পেছন থেকে একজন হেসে বলে ওঠেঃ "আচ্ছা! কি মধুর রজনী!" ফুটপাথের ধারে এসে একটা গাড়ী দাঁড়ায়। গাড়ীর পেছন দিক দিয়ে নিষ্কাশিত ধোঁয়া ভেদ করে

গায়ে কম্বল জড়ান একটা লোক এসে দাশার সামনে দাঁড়ায়, মাথার টুপিটা খুলে ফেলে এবং নৃত্যের ভঙ্গিতে দাশার জন্য গাড়ীর দরজাটা খুলে দেয়। গাড়ীতে উঠে দাশা তার দিকে তাকায়—লোকটা অত্যন্ত কুৎসিত, দাড়িগোঁফ কখনো কামায় না, মুখটা বাঁকা; শীতে ঠকঠক করে কাঁপছে, কনুই দুটো দিয়ে দুপাশ চেপে রেখেছে।

কে একজন তাকে পয়সা ছুঁড়ে দেয়। তাড়াতাড়ি পয়সাগুলি কুড়িয়ে নিয়েই টুপি খুলে তাকে সেলাম জানিয়ে কর্কশ কণ্ঠে বলে ওঠেঃ "বিলাস ও প্রমোদ তীর্থে সন্ধ্যাটি কাটিয়ে যে আনন্দ পেলাম তার জন্য ধন্যবাদ।" দাশার মনে হচ্ছিল, লোকটা কালো, বন্য চোখ দুটো যেন তাকে বিঁধছে।

অনেক রাত্রে এসে তারা বাড়ি পৌঁছল। দাশা চিত হয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল। এত ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল যে তার ঘুম এল, না অচৈতন্য অবস্থায় সে পড়ে রইল বোঝা গেল না—সর্বাঙ্গ যেন তার অবশ হয়ে গিয়েছিল।

অকস্মাৎ সে গোঙিয়ে উঠে গায়ের ঢাকা ফেলে দেয়, উঠে বসে, চোখ মেলেই দেখতে পায় জানালা দিয়ে রোদ এসে ঘরের মেঝেতে পড়েছে। "উঃ, ভগবান! কি ভয়ংকর!" এত ভয় পেয়েছে যে সে প্রায় কেঁদে ফেলে। তারপর একটু ভেবে সে, না কিছুই তো মনে নেই, কেবল দুঃস্বপ্নের একটা চাপা বেদনার রেশ তার বুকে রয়ে গেছে।

প্রাতরাশের পর দাশা কলেজে চলে যায়, পরীক্ষার জন্য তার নাম তালিকাভুক্ত করে, কিছু বই কেনে, মধ্যাহ্ন ভোজনের পূর্ব পর্যন্ত তার মধ্যে কেমন যেন একটা কাঠিন্য দেখা যায়, নিজেকে সে নানা কাজে ব্যস্ত রাখে। কিন্তু বিকেলের দিকে সে আবার রেশমের মোজা পরে (সকালবেলা প্রতিজ্ঞা করেছিল একমাত্র সুতির মোজাই সে পরবে), বাহুযুগলে ও গলদেশে পাউডার মাখে, চুলের প্রসাধনও করে। সে ভাবেঃ "বিনুনি করে ঘাড়ের কাছে নিয়ে একটা খোপার মত বাঁধলেই ভাল হত, কিন্তু প্রত্যেকেই বলবেঃ 'না, চুলটা আরো কায়দা করে বাঁধ'—কিন্তু যদি মাথার সমস্ত চুল অবাধ্য, তার কি করা চলে?" এক কথায় বলতে গেলে তা অত্যন্ত বিরক্তিকর কাজ। এ কি, তার আসমানী রংএর নতুন রেশমী পোষাকটার সামনের দিকে যে শ্যাম্পেনের একটা দাগ!

পোষাকটার জন্য, নিজের ক্ষয়িত জীবনের জন্য অকস্মাৎ দাশার মনে এত দুঃখ হয় যে, কলংকিত স্কার্টটা হাতে নিয়ে সে কাঁদতে বসে। নিকলাই ইভানোভিচ দরজা ফাঁক করে ঢুকতে যাবেন এমন সময় দেখেন, দাশা মাত্র একটা শেমিজ পরে বসে কাঁদছে। একটু অপ্রস্তুত হয়ে থমকে দাঁড়ান তিনি, স্ত্রীকে ডাকেন। কাতিয়া ছুটে এসে দাশার হাত থেকে জামাটা নিয়ে নেয় এবং বলেঃ "ভাবিসনি, এক মিনিটের মধ্যেই সব ঠিক হয়ে যাবে।" এই

বলেই সে গ্র্যান্ড মোগলকে ডাকে। বেনজিন ও গরম জল নিয়ে গ্র্যান্ড মোগল এসে হাজির।

তারা দুজনে মিলে জামাটাকে নিষ্কলংক করে এবং দাশাকে সেটা পরিয়ে দেয়। নিকলাই ইভানোভিচ অধৈর্য হয়ে হলঘর থেকে ডাকেন: "ভদ্রমহিলাগণ, অদ্য প্রথম রজনী, আমাদের দেরি করা চলবে না।" কিন্তু শেষ পর্যন্ত থিয়েটারে যেতে তাদের দেরিই হয়ে যায়।

থিয়েটারে গিয়ে একটা বক্সে দাশা দিদির পাশেই বসে। সে দেখতে পায়, একটা পটে আঁকা গাছের তলায় দাঁড়িয়ে কৃত্রিম দাড়িলাগানো একটা লম্বা মানুষ চোখ দুটো অস্বাভাবিক রকম বড় করে একটি মেয়ের হাত ধরে বলছে, "আমি তোমাকে ভালবাসি, ভালবাসি আমি তোমাকে।" মেয়েটির পরনে একটা উজ্জ্বল গোলাপী রংএর পোষাক। নাটকটা করুণ না হলেও দাশার যেন সারাক্ষণ চোখে জল আসছিল, গোলাপী রংএর পোষাকপরা মেয়েটার দিকে তার সহানুভূতি যাচ্ছিল এবং এই ভেবে একটু বিরক্ত হচ্ছিল যে, প্রথম অংকটা বিষাদের মধ্যে শেষ হল না কেন? দেখে মনে হচ্ছিল, মেয়েটি যুবকটিকে ভালবাসে, আবার বাসেও না। যুবকটি তাকে আলিঙ্গন করলে সে পরীর মত খিলখিল করে হেসে ওঠে এবং দৌড়ে দুর্জনের কাছে চলে যায়। পট-ভূমিতে দুর্জনের শাদা পাজামাটা বেশ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। নায়ক কপাল চাপড়ে প্রতিজ্ঞা করল, তার সারাজীবনের শ্রমার্জিত ফল পাণ্ডুলিপি ও অন্যান্য জিনিস সে বিনষ্ট করে ফেলবে —এখানেই প্রথম অংকের শেষ।

বক্সে পরস্পরের মধ্যে আলাপ পরিচয় ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে এবং জোর আলোচনা শুরু হয়ে যায়।

টেকো মাথা, দাড়ি গোঁফ কামানো, বেঁটে শাইনবার্গ বলে: "আবার সেই যৌন সমস্যা, তবে খুব জ্বলন্তভাবে তুলে ধরা হয়েছে। এই কদর্য সমস্যার হাত থেকে মানুষের শেষ পর্যন্ত মুক্তি পাওয়া দরকার।"

দীর্ঘকায়, গম্ভীর প্রকৃতির ম্যাজিস্ট্রেট বুরভ এবার মুখ খোলে। সে উদার মতাবলম্বী; গত বড়দিনের সময় তার স্ত্রী দৌড়ের ঘোড়ার এক আস্তাবলের মালিকের সঙ্গে বেরিয়ে গেছে। বুরভ বলে: "অপরের কথা আমি জানিনে, তবে আমার কাছে এ-সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে। পুরুষ বানিয়ে কথা বলে সত্য, কিন্তু মেয়েরা মিথ্যে কথা না বলেই থাকতে পারে না, ওটা তাদের স্বভাব। যৌন সমস্যা নোংরামি ছাড়া কিছু নয় আর আর্ট হল দুষ্কর্মের একটা ভদ্র আবরণ।"

নিকলাই ইভানোভিচ হো হো করে হেসে ওঠেন এবং স্ত্রীর দিকে চান। বুরভ গম্ভীরভাবে বলে যায়:

"মুরগী যখন ডিম পাড়ে মোরগ তখন তার বর্ণোজ্জ্বল পুচ্ছ তুলে দাঁড়ায়। কথাটা মিথ্যে, কারণ মোরগের পুচ্ছের রং সাধারণত ধূসর, তা বর্ণো-

জঞ্জাল নয়। বৃক্ষের শাখাই পুষ্পকে বিকশিত করে—এও একটা মিথ্যে কথা, একটা ধাপ্পা। আসল বস্তু তো থাকে মাটির নীচে বৃক্ষের অসুন্দর মূলে। কিন্তু মানুষের মত এত মিথ্যে কথা বোধ হয় আর কোন জীবই বলতে পারে না। তার ওপর ফুলও ফোটেনা আর তার পুচ্ছও নেই; সুতরাং তাকে তার রসনা ব্যবহার করতে হয় এবং মিথ্যে কথা দুদিক দিয়েই খারাপ—তথাকথিত প্রেম, আর তাকে ঘিরে যে কল্পনার জগৎ সৃষ্টি করা হয় তো—একমাত্র অপরিণত বয়েসের মেয়েদেরই এসম্বন্ধে মোহ থাকতে পারে।—দাশার দিকে সে কটাক্ষ হানে। "এই পূর্ণ ব্যর্থতার যুগেও বিচক্ষণ ব্যক্তিরা এসমস্ত বাজে জিনিস নিয়ে মাথা ঘামান আর সময় নষ্ট করেন, আশ্চর্য! হ্যাঁ, মশায়, বলছি, রুশ সাম্রাজ্য পেটুকের মত ভুগছে।"

বিকৃত মুখভঙ্গী করে সে একটা মিষ্টান্নের বাক্সের ওপর ঝুঁকে পড়ে; একে একে সেগুলি আঙুল নেড়ে দেখে, কোনটাই তার রুচি মাফিক নয়। তার গলায় একটা সুতো দিয়ে যে অপেরা-গ্লাসটা ঝুলানো রয়েছে তার দিকে সে চেয়ে থাকে।

আলোচনাটা অন্য দিকে গড়ায়। এবারের বিষয়বস্তু বর্তমান রাজনৈতিক অচলাবস্থা ও প্রতিক্রিয়া। সেদিন কোর্টে যে একটা চাঞ্চল্যকর মামলা হয়ে গেছে, কুলিচক ফিসফিস করে বলার ভঙ্গি করলেও বেশ উচ্চকণ্ঠেই তার বিবরণ বিবৃত করে।

"একটা দুঃস্বপ্ন। এটা একটা দুঃস্বপ্ন!" শাইনবার্গ চেঁচিয়ে ওঠে।

নিকলাই ইভানোভিচ দুহাতে তাঁর জানু চাপড়ে বলেন: "বিপ্লব, মশায়রা, অবিলম্বে আমাদের একটা বিপ্লব চাই! আমি জানি, তা না হ'লে আমরা ধ্বংস হয়ে যাব। —গলার স্বর একটু খাটো করে তিনি বলে—"কারখানায় কারখানায় দারুণ অসন্তোষ।"

উত্তেজনায় শাইনবার্গ তার দুহাতের আঙুলগুলি বিস্তার করে বলে:

"কিন্তু, কবে, কবে? অনির্দিষ্ট কাল তো আর আমরা বসে থাকতে পারিনে।"

"আমাদের জীবদ্দশায়ই আমরা দেখে যাব, য়াকভ আলেকজান্দ্রোভিচ," সোৎসাহে বলে ওঠেন নিকলাই ইভানোভিচ। "এবং আপনি বিচার মন্ত্রীর পদটাও পেয়ে যেতে পারেন, হুজুর!"

এই সমস্ত সমস্যা, বিপ্লব ও মন্ত্রীদপ্তরের কথা শুনে শুনে দাশা ক্লান্ত হয়ে পড়ে। একটা কনুই তার বক্সের এক পাশের মখমলে মোড়া হাতলের ওপর আর একটা হাত কাতিয়ার কটিদেশে জড়ানো। নীচে স্টলে যে সমস্ত দর্শক বসে আছে দাশা তাদের দিকে চেয়ে থাকে। তাদের মধ্যে একজনের সঙ্গে যখন আরেক জনের পরিচয় হয় তখন পরস্পরের প্রতি পরস্পর মাথা নেড়ে অভিবাদন জানায় ও হাসে। দাশা ভালভাবেই জানে সে ও তার দিদি আকর্ষণীয়। ভীড়ের মধ্যে থেকে নানারূপ আকস্মিক দৃষ্টিপাত তাদের

দিকে হয়, পুরুষদের দিক থেকে তারিফ আর মেয়েদের দিক থেকে ঈর্ষা—টুক্‌রো টুক্‌রো আলোচনা ও হাসি এসে তার কর্ণকুহরে প্রবেশ করে, মনটা একটু চাঙ্গা হয়ে ওঠে, মনে হয় বসন্তের হাওয়া বুঝি বইছে। তার কান্নার ভাবটা কেটে যায়। কাতিয়ার এক গোছা চূর্ণ কুন্তল এসে তার কোমল গালটা স্পর্শ করে।

"আমি তোকে সত্যি ভালবাসি, দিদি!" ফিসফিস করে বলে দাশা।

"আমিও তোকে ভালবাসি।"

"তোর কাছে যে আমি থাকি এতে তুই খুশি?"

"হ্যাঁ, খুশি। কত যে খুশি কি করে তোকে বোঝাব, দাশা!"

দাশার হচ্ছে হয় আরো কয়েকটা ভাল কথা কাতিয়াকে বলে, কিন্তু নীচের দিকে চোখ পড়তেই দেখে—তেলেগিন। তার গায়ে একটা কালো কোট, মাথায় একটা টুপি, হাতে থিয়েটারের একটা প্রোগ্রাম নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সে। আড়-চোখে দাশাদের বক্সের দিকে বারবার চায়, মাথা তুলে তাকায় না এই ভয়ে যে লোকের নজরে পড়বে। রোদে ও আগুনে পোড়া তার তামাটে কঠিন মুখ-খানি অন্যান্য মুখ থেকে স্বতন্ত্র—সেগুলি হয় শুকনো চোপসা নয় তো মদ্য-পানের ফলে বেশ টুসটুসে। তার চুলগুলিও বেশ হাল্কা বলেই মনে হচ্ছে দাশার—চুলের রংটা ঈষৎ রক্তাভ।

দাশার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই তেলেগিন নতজানু হয়ে তাকে অভিবাদন জানায় এবং ঘুরে দাঁড়ায়, কিন্তু হাত থেকে তার টুপিটা পড়ে যায়। উপুড় হয়ে টুপিটা তুলতে গিয়ে স্টলের জনৈক স্থূলকায়া রমণীর গায়ে ধাক্কা লাগে, তেলেগিন লজ্জায় লাল হয়ে যায় এবং মাফ চাইতে চাইতে পেছন দিকে সরতে থাকে; সরতে সরতে রূপতত্ত্বের পত্রিকা 'দি কোবাস অব দি মিউসেস' এর সম্পাদকের পা'টা সে মাড়িয়েই দেয়। দাশা কাতিয়াকে বলেঃ

"দ্যাখ্ দিদি, এই সেই তেলেগিন।"

"ও! বেশ সুন্দর তো!"

"খাসা লোক! ইচ্ছে হয় তাকে চুমো খাই। তুই তো জানিসনে, দিদি, লোকটা এমন চালাক, "

"কি?" "তাই নাকি! ভাল, দাশা, তারপর.."

কিন্তু কাতিয়া চুপ করে যায়। দাশাও বুঝতে পারে, আর কিছু বলে না। আবার তার হৃদয় ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে; ভেতরটায় যেন সমস্ত ঠিক নেই, মনে হয় একটা শামুকের খোলের ভেতরের অবস্থা তার। মুহূর্তের জন্য সে সমস্ত ভুলে গিয়েছিল, কিন্তু আবার নিজের অন্তরের দিকে তাকিয়ে দেখে সে—সমস্ত অন্ধকার এবং বিশৃংখল।

প্রেক্ষাগৃহ আবার অন্ধকার হয়, পর্দা ওঠে; দাশা একবার দীর্ঘনিঃশ্বাস

ফেলে চকোলেটের একটা খণ্ড ভেঙে মুখে দেয় এবং একাগ্রচিত্তে নাটক দেখতে আরম্ভ করে।

নকল দাড়ি লাগানো সেই লোকটা এখনো ভয় দেখাচ্ছে যে সে তার পাণ্ডুলিপি পুড়িয়ে ফেলবে; একটা পিয়ানোর ধারে বসে মেয়েটি হাসিঠাট্টা কচ্ছে। দেখে বোঝা যাচ্ছে আর দেরি না করে মেয়েটিকে বিয়ে করে ফেললেই লেঠা চুকে যায়, টেনে টেনে আর তিনটা অঙ্ক বাড়াবার কি দরকার।

দাশা তার চোখ দুটো তুলে থিয়েটারের সিলিং-এর দিকে চাইতেই নজরে পড়ে একটি সহাস্যবদন অর্ধনগ্ন রূপসী নারী মেঘের ভেতর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে। 'ও ভগবান; আমারই মত যে!' দাশা আপন মনে ভাবে। সঙ্গে সঙ্গেই আপন মানসনেত্রে সে নিজেকে দেখতে থাকেঃ একটি জীব একটা বক্সে বসে চকোলেট খাচ্ছে, বাজে বকছে, সব কিছুতেই তালগোল পাকিয়ে ফেলছে, একটা অসাধারণ কিছু ঘটবে বলে প্রতীক্ষা করছে। কিন্তু কিছুই ঘটল না।

"তার কাছে যতক্ষণ আমি না যেতে পাচ্ছি, তার কথা যতক্ষণ না শুনতে পাচ্ছি, আমার সর্বাঙ্গ দিয়ে তাকে না যতক্ষণ অনুভব করতে পাচ্ছি, ততক্ষণ আমার শান্তি নেই। আর সমস্তই মিথ্যে, সেই হ'ল একমাত্র সত্য।"

সেই সন্ধ্যার পর থেকে দাশার মনে আর কোন দ্বিধাই রইল না। সে এখন জানে যে, বেসনুভের কাছে তাকে যেতে হবে, তবে সেই মুহূর্তের কথা ভাবতেও তার ভয় হয়। একবার স্থির করে যে, সামারায় তার বাবার কাছে সে চলে যাবে; কিন্তু আবার আপন মনে ভাবে যে, হাজার হাজার মাইল দূরে গেলেও এই প্রলোভনের হাত থেকে সে অব্যাহতি পাবে না; কাজেই সে বাবার কাছে যাওয়ার সংকল্প ত্যাগ করে।

তার কুমারী জীবনের নিষ্পাপ মন একবার গর্জে ওঠে, কিন্তু কি করবে সে? তার ভেতরে যে 'আর একটা মানুষ' রয়েছে, তার দিকেই যে সব! তাছাড়া যে বেসনভ তার কথা একবারও চিন্তা করছে না, কামেনো-ওস্তভ এভেনিউর নিকটে হয়ত কোথাও নিশ্চিন্তে দিনযাপন করছে, লেস পেটিকোট সর্বস্ব কোন এক অভিনেত্রী সম্পর্কে কবিতা লিখছে, তারই কথা অহর্নিশি চিন্তা করা, এত দুঃখ পাওয়া যেন দুঃসহ অপমান বলে মনে হয় দাশার। কিন্তু বেসনভ যে দাশার অস্থিমজ্জার মধ্যে মিশে গেছে; তার চিন্তা থেকে অব্যাহতি পাবার সাধ্য দাশার কৈ?

চুলটা এখন সে ইচ্ছে করেই বেশ সাদাসিধেভাবে বাঁধে, পাকিয়ে পাকিয়ে ঘাড়ের কাছে নামিয়ে দেয়; অনেক দিন আগে সামারা থেকে স্কুলে যাবার যে পুরনো পোষাকটা সে নিয়ে এসেছিল সেটাই সে পরে, জোর করে সে রোমান আইন মুখস্থ করার চেষ্টা করে, বাইরের লোক এলে তাদের সামনে সে বেরোয় না, আমোদ-প্রমোদেও সে যোগ দেয় না। সৎ হওয়া সোজা নয়। দাশার মনে ভয় ঢুকেছে—সত্যি ভয় ঢুকেছে।

এপ্রিলের গোড়ার দিককার একটি শীতল সন্ধ্যা। অস্তরাগ মিলিয়ে গেছে, নিষ্প্রভ সবুজ আকাশে শুধু একটা আলোর আভা দেখা যাচ্ছে, তাতে কোন ছায়া পড়ে না। দাশা দ্বীপ থেকে পায়ে হেঁটে বাড়ি ফেরে।

বাড়িতে সবাইকে সে বলে গিয়েছিল যে সে কলেজে যাচ্ছে, কিন্তু আসলে সে ট্রামে চড়ে গিয়েছিল এলাগিন ব্রিজ-এ। সেখানে গিয়ে সে সারা সন্ধ্যা প্রশস্ত নিষ্পত্র রাস্তাগুলিতে ঘুরে বেড়ায়, সেতুগুলি পার হয়, নীচে জলের দিকে চেয়ে থাকে, অস্তরাগের রক্তিম আভায় সমুজ্জ্বল কিশলয়গুলির দিকে তাকায়, পথচারীদের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করে, রাস্তার দুই পার্শ্বস্থ সারি সারি শেওলাপড়া বৃক্ষকাণ্ডের মাঝখান দিয়ে চলন্ত গাড়ীগুলির আলোর দিকেও তাব চোখ পড়ে। মন তার রিক্ত, বাড়ি ফেরার তাগিদ নেই।

সে একেবারে শান্ত। সমুদ্রেব লবণাক্ত আর্দ্র বাতাস তার সর্বাঙ্গ সিক্ত ও শীতল করে দিয়েছে। ক্লান্ত চরণ, তবু বাড়ি ফেরার ইচ্ছে নেই। কামেনো-ওস্ত্রভ এভেনিউর প্রশস্ত পথে অসংখ্য ঘোড়ারগাড়ী চাকা ঘুরিয়ে চলেছে, বড় বড় মোটরগাড়ী দ্রুতবেগে ছুটে যাচ্ছে, খোস গল্প করতে করতে দলে দলে পথিক পথ অতিক্রম করছে। দাশা পাশের একটা সরু রাস্তায় গিয়ে ঢোকে।

রাস্তাটা নির্জন, নীরব। ছাদেব ওপব সবুজ আকাশটা দেখা যাচ্ছে। প্রত্যেক বাড়ির জানালা দিয়ে পর্দার আড়াল থেকে গানের সুর ভেসে আসছে। এক বাড়িতে একজন যন্ত্রের একটা গৎ তুলবার চেষ্টা করছে, আবেক বাড়িতে একটা অতি পরিচিত নাচের তাল শোনা যাচ্ছে, এক বাড়িতে চিলেরঘবেব জানালা থেকে বেহালার করুণ সুর ভেসে আসছে।

দাশার হৃদয়তন্ত্রীতেও যেন কত সুব, কত ধ্বনি ঝংকৃত হচ্ছে। তার মনটা হাল্কা হয়, খুশিতে ভবে ওঠে। সে একটা কোণে গিয়ে ঘোরে, একটা বাড়ির দরজায় লেখা নম্বরটা সে পড়ে, একটু হাসে এবং সিঁড়ি দিয়ে দরজা পর্যন্ত উঠে সে দেখে, একটা পেতলেব সিংহের মাথায় আটকানো রয়েছে একখানি ভিজিটিং কার্ড, তাতে লেখা—"এ বেসনভ"। দাশা বেশ জোরে ঘণ্টা বাজায়।

॥ সাত ॥

আগের দিন রাত্রে "ভিয়েনা রেস্তোরাঁয়" বেসনভের কোট খুলে দিতে দিতে পরিচারক বলে ঃ

"আপনার জন্য একজন অপেক্ষা করছে, আলেক্সি আলেক্সিয়েভিচ।"

"কে ?"

"একজন মহিলা।"

"কে সে ?"

"এর আগে তাকে কখনো এখানে দেখিনি।"

বেসনভ উদ্দেশ্যহীনভাবে একবার শিরসমূদ্রের ওপর দিয়ে তাকায় এবং লোকাকীর্ণ রেস্তোরাঁর একটা কোণে চলে যায়।

রেস্তোরাঁর প্রধান পরিচারক লস্কুৎকিন এসে বেসনভের পাশে দাঁড়ায়। তার গালপাট্টা এসে প্রায় বেসনভের কাঁধ ছুঁয়েছে। সে বলে, উৎকৃষ্ট ভেড়ার মাংস রান্না করা হয়েছে।

"কোন খাবার চাইনে," বেসনভ বলে। "আমি যে স্পেশাল শ্বেতসুরা পান করে থাকি তাই দাও।"

একেবারে সোজা হয়ে বসেছে সে, হাত দুটো টেবিলক্লথের ওপর রয়েছে। এই সময়ে এবং এই জায়গায় এসে সে স্বভাবতই গম্ভীর হয়ে যায়। সারা-দিনের অসংখ্য ঘটনারাশি যেন এখানে এসে সুসংবদ্ধভাবে এক মূর্তি পরিগ্রহ করে, রুমানীয় বেহালায় করুণ সুর, নানারূপ সুগন্ধির ঘ্রাণ, জনাকীর্ণ হলের শ্বাসরোধকর গরম, এসমস্ত একত্র হয়ে তার হৃদয়ের অন্তস্তলে বহির্লোকের অসংখ্য ছায়ামূর্তি জাগিয়ে তোলে; সেই ছায়া মূর্তিগুলিই তার প্রেরণার উৎস। বেসনভ ভাবে, বস্তু ও বাক্যের রহস্য উপলব্ধি করার একটা স্বাভাবিক শক্তি আছে তার।

বেসনভ গ্লাসটা তুলে দাঁতে ঠেকিয়ে সুরা পান করে। তার হৃদয়ের স্পন্দন মন্থর। নানারূপ শব্দ ও কণ্ঠস্বর এসে যেন তার সর্বাঙ্গে বিঁধছে, মন্দ লাগছে না তার।

বেসনভের বিপরীত দিকে আয়নার পাশে একটা টেবিলের ধারে বসে সাপোঝকভ, আনতোশকা আর্নলদভ এবং এলিজাবেতা কিয়েভনা এক সঙ্গে নৈশভোজন করছে। গতকাল রাত্রে এলিজাবেতা কিয়েভনা এখানে সাক্ষাতের জন্য বেসনভের এক দীর্ঘ চিঠি লিখেছিল, তাই এখন তার মধ্যে খুব চাঞ্চল্য উপস্থিত, বীটের মত লাল হয়ে উঠেছে সে। কালো ও হলুদে ডুরির একটা পোষাক পরে এসেছে কিয়েভনা, পোষাকের রংএর সঙ্গে খাপ খায় এমন একটা ফিতে দিয়ে বেঁধেছে তার চুল। বেসনভ ঘরে ঢুকতেই সে কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করে। আর্নলদভ তাকে কানে কানে বলে: "সাবধান।" কথা বলার সময় তার খয়ে যাওয়া সোনাবসানো দাঁতগুলি দেখা যায়। "সেই অভিনেত্রীর সঙ্গে হয়ে গেছে, এখন তার আর কোন মেয়ে মানুষ নেই, ক্ষুধিত বাঘের মত ভয়ঙ্কর।"

এলিজাবেতা কিয়েভনা মাথা নেড়ে হাসে এবং দুই টেবিলের মধ্যে দিয়ে বেসনভের দিকে এগোয়। লোক তার দিকে চেয়ে হাসে।

গত কয়েক মাস ধরে এলিজাবেতা কিয়েভনাকে প্রায় একাকী জীবন যাপন করতে হচ্ছে, দিনের পর দিন চলে যায়, তার কিছুই করার নেই, আশা নেই, আনন্দ নেই, নিজেকে বড় হতভাগী বলে মনে হয় তার। তার দিকে তেলেগিনের কোনই আকর্ষণ নেই, কথাবার্তায় সে অমায়িক কিন্তু কিয়েভনার সঙ্গ এড়িয়ে চলে; যাকে কিয়েভনা চাইছিল ঠিক সেই মানুষটিই যেন এসে আজ উপস্থিত।

হলে বেসনভের কণ্ঠস্বর শুনেই কিয়েভনা চনমনিয়ে ওঠে, দোরের দিকে উৎসুক নয়নে তাকায়। দুই ঘরের মধ্যবর্তী গলি দিয়ে বেসনভ ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে চলে। কিয়েভনার মনে হচ্ছে, তার হৃদ্‌যন্ত্রটা বুঝি বন্ধ হয়ে আসছে—তার চোখের সামনে দোরটা খুলে যায়—কিন্তু কোনদিকে না তাকিয়ে বেসনভ সামনের দিকে এগিয়ে যায়। একবারও যদি সে দরজায় করাঘাত করত—যদি তার কাছে দেশলাইটাও একবার সে চাইত।

জিরভ জগতের সব কিছুই নিন্দা করে, কিন্তু বেড়ালের মত সে সাবধান। দু'একদিন আগে তাকে চটাবার জন্য কিয়েভনা বেসনভের একখানা বই কিনে এনে চুল কোঁকড়াবার যন্ত্রটা দিয়ে পাতাগুলি কাটে, বার কয়েক সেগুলি সে শেষ পর্যন্ত পড়ে, কফি পড়ে পাতাগুলি বিবর্ণ হয়ে যায়, বিছানায় গুঁজে রাখতে সেগুলির অবস্থা কাহিল হয়ে ওঠে, অবশেষে একদিন আহারের সময় সে ঘোষণা করে, বেসনভ একজন প্রতিভাবান লোক। তেলেগিনের ফ্ল্যাটের বাসিন্দারা রেগে যায়। সাপোঝকভ বলে, বুর্জোয়াদের ক্ষয়িষ্ণু দেহে বেসনভ ব্যাঙের ছাতার মত গজিয়ে উঠছে। জিরভের এত রাগ হয় যে, তার কপালের শিরাগুলি ফুলে ওঠে। চিত্রকর ভালেত ঘুষি মেরে একটা থালাই ভেঙে ফেলে। একমাত্র তেলেগিনকেই নির্বিকার দেখা যায়।

কিয়েভনার ভেতরটা যেন কিরকম একটা উত্তেজনায় ভরে ওঠে; এই ভাবটাকে সে বলে "আত্মপ্ররোচনা।" বিকটভবে সে হেসে ওঠে, নিজের ঘরে যায়, অত্যুৎসাহে একটা অভাবনীয় চিঠি সে বেসনভকে লিখে ফেলে, কখন কোথায় গেলে তার সঙ্গে দেখা হতে পারে সে জানতে চায়, খাবার ঘরে ফিরে এসে নিঃশব্দে টেবিলের ওপর চিঠিটা সে ছুড়ে মারে। পাশের লোকেরা চিঠিটা চেঁচিয়ে পড়ে। তারপর তা নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা হয়। তেলেগিন বলে:
"জোর চিঠি।"

এলিজাবেতা কিয়েভনা তাড়াতাড়ি ডাকবাক্সে ফেলার জন্য চিঠিটা পাচকের হাতে দেয়। তার মনে হচ্ছে, সে যেন অতলে তলিয়ে যাচ্ছে।

এবার সে বেসনভের কাছে উপস্থিত হয়ে সোজা বলে:

"আপনাকে চিঠি লিখেছিলাম। আপনি এসেছেন। আপনাকে ধন্যবাদ।"

পায়ের ওপর পা তুলে, টেবিলের ওপর দুই কনুইয়ের ভর দিয়ে বেসনভের মুখোমুখি হয়ে সে বসে। আঙুলগুলি তার দুই গালে ছড়িয়ে আছে। অঞ্জনটানা অদ্ভুত দুটো চোখ দিয়ে সে একদৃষ্টে আলেক্সিয়েভিচের দিকে চেয়ে থাকে। বেসনভ নীরব। প্রধান পরিচারক লম্কুৎকিন দ্বিতীয় গ্লাস মদ নিয়ে আসে এবং এলিজাবেতা কিয়েভনার জন্য তা থেকে খানিকটা মদ একটা পাত্রে ঢেলে দেয়। কিয়েভনা বলে:

"আপনি নিশ্চয়ই জিজ্ঞাসা করবেন আপনার সঙ্গে আমি কেন দেখা করতে চেয়েছি ?"

"না, আমি তা জিজ্ঞেস করব না। আপনি একটু পান করুন।"

"আপনি ঠিকই বলেছেন : বলবার আমার কিছুই নেই। আপনি জীবন্ত বেসনভ, আর আমি মৃত। বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছি আমি।"

"কি করেন আপনি ?"

"কিছুই না।" সে হাসে, সঙ্গে সঙ্গে মুখটা তার রক্তিম হয়ে ওঠে। "মিঠে জিনিসও তেতো লাগে আমার কাছে। কাজেই কিছুই করিনে। আমি কেবল অপেক্ষা করছি কবে সেই ভেরী বেজে উঠবে—কবে সেই অগ্নিশিখা দেখতে পাব...অদ্ভুত ঠেকছে আপনার কাছে, না ?

"আপনি কে, বলুন তো ?"

মাথাটা একটু নত করে সে, লজ্জায় আরো লাল হয়ে যায়।

"আমি একটা ভূত," চাপাগলায় বলে সে।

বেসনভ বক্র হাসি হাসে। "কি বোকা !" ভাবে সে। তবে কিয়েভনার বাদামী চুলের ভেতর দিয়ে যে সিঁথিটা দেখা যাচ্ছে তাতে কি যেন একটা অনাস্বাদিত মাধুর্য আছে, তার অনাবৃত পুষ্ট স্কন্ধদেশটা যেন নিষ্পাপ বলে মনে হয় তার, একটু যেন সহানুভূতি জাগে তার মনে, সামান্য করুণার হাসি হাসে সে, এক চুমুকে সুরাটা নিঃশেষ করে। এই সরল প্রকৃতির মেয়েটিকে প্রহেলিকার কৃষ্ণজালে আবৃত করার আগ্রহ সহসা কেন যেন তার মনে জাগে। সে বলে, ভীষণভাবে প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য রুশিয়ার ওপর রাত্রির অন্ধকার নেমে আসছে। অবোধ্য ও অশুভ লক্ষণসমূহ দেখে সে তা উপলব্ধি করতে পারছে।

"সারা শহরে যেসমস্ত প্রাচীরপত্র এঁটে দেওয়া হয়েছে সেগুলি নিশ্চয়ই দেখেছেন : একটা মোটরের টায়ারের ওপর বসে একটা শয়তান হাসছে, দ্রুত-বেগে একটা সিঁড়ি দিয়ে সে নীচের দিকে নেমে যাচ্ছে...তার অর্থ আপনি বোঝেন ?"

তার নারীসুলভ মুখখানার দিকে এলিজাবেতা কিয়েভনা চেয়ে থাকে। চোখ দুটো বরফের মত শীতল, টানা ভ্রূ ; মদের গ্লাসের গায়ে তার আঙুলগুলি সামান্য কাঁপছে ; তৃষ্ণার্ত হয়ে সে মদ্যপান করছে। আনন্দে কিয়েভনার মাথা ঘুরছে। দূরে থেকে সাপোঝকফ তাকে ইশারা করছে। বেসনভ অকস্মাৎ ঘুরে বসে ভ্রূকুটি করে বলে :

"এরা কারা ?"

"এরা আমার বন্ধু।।"

"এরা কিভাবে ইসারা কচ্ছে সেটা আমার ভাল লাগছে না।"

কিছু চিন্তা না করেই এলিজাবেতা কিয়েভনা বলে ফেলেঃ "বলেন তো, আমরা অন্য কোথাও যাই।"

বেসনভ তার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে। কিয়েভনা একটু আড় নয়নে চায়, অধরোষ্ঠে মৃদু হাসি, ললাটে বিন্দু বিন্দু ঘাম। অকস্মাৎ এই স্বাস্থ্যবতী, অদূরদর্শী তরুণীটির জন্য বেসনভের মন লালায়িত হয়ে ওঠে, টেবিলের উপর তার উষ্ণ হাতটা চেপে ধরে সে বলেঃ

"হয় তুমি এখন যাও. .না হলে চুপ কর।. .চল যাই। যেতেই হবে।"

এলিজাবেতা কিয়েভনা ঘনঘন নিঃশ্বাস ফেলতে থাকে, মুখটা তার ফ্যাকাশে হয়ে যায়। যন্ত্রের মত সে উঠে দাঁড়ায়, বেসনভের বাহুতে বাহু রাখে, টেবিল-গুলির মধ্য দিয়ে তারা দুজনে বেরিয়ে যায়। গিয়ে একটা দ্রশকিতে চড়ে। কিয়েভনার সর্বাঙ্গে জ্বালা, শীতল বাতাসও তাকে ঠাণ্ডা করতে পারছে না।

পাথরের ওপর গাড়ীর চাকাগুলি কড়মড় করে ওঠে। সামনের দিকে একটু ঝুঁকে দু'হাতে ছড়িটা ধরে তার ওপর থুতনিটা রেখে বসেছে বেসনভ। বললেঃ

"আমার বয়েস পঁয়ত্রিশ, কিন্তু আমার জীবন শেষ হয়ে গেছে। প্রণয় আর আমাকে প্রতারণা করতে পারে না। অকস্মাৎ তুমি দেখলে, তোমার লড়াইয়ের ঘোড়া একটা কাঠের পুতুল ছাড়া আর কিছুই নয়, এর চেয়ে দুঃখের বিষয় আর কি হতে পারে বলত ? তবু এজীবনে দীর্ঘকাল ধরে মৃতদেহের মত নিজেকে আমার টেনে নিয়ে চলতে হবে ."

মুখ ঘুরিয়ে সে কিয়েভনার দিকে তাকায় এবং ওষ্ঠ বাঁকা করে একটু হাসে।

"আমার মনে হয়, 'জেরিকোর' দুন্দুভি যে পর্যন্ত না বাজছে সে পর্যন্ত আপনার মত আমাকেও অপেক্ষা করতে হবে। এই সমাধিক্ষেত্রের ওপর যদি তা অকস্মাৎ বেজে ওঠে, কেমন মজা হয়! তারপর একটা লাল অগ্নিশিখা যদি সারা আকাশটাকে উদ্ভাসিত করে তোলে, হ্যাঁ, আপনি ঠিকই বলেছেন "

শহরতলীর একটা হোটেল গিয়ে তারা ওঠে। একটা ঘর একেবারে খালি ছিল। ঝিমোতে ঝিমোতে একজন পরিচারক দুই গৃহাভ্যন্তরস্থ সরু পথ দিয়ে তাদের সে ঘরে নিয়ে যায়। ঘরটা একটু নীচু, দেয়াল লাল কাগজে মোড়া, মাঝে মাঝে ছিঁড়ে গেছে এবং দাগও লেগেছে। একটা বিবর্ণ চাঁদোয়ার তলায় একটা বড় বিছানা, তার কাছেই রয়েছে হাতমুখ ধোবার একটা স্ট্যান্ড ও আনুষঙ্গিক জিনিসপত্র। ঘরটা স্যাঁতসেঁতে, পচা তামাকের গন্ধ, মনে হয় দম আটকে আসে। এলিজাবেতা কিয়েভনা ঘরে পা দিয়েই একটু কর্কশ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করেঃ

"আমাকে এখানে নিয়ে এলেন কেন?"

"ঠিক আছে, আমাদের এখানে কোন অসুবিধেই হবে না।" সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেয় বেসনভ।

কিয়েভনার কোট ও টুপী খুলে বেসনভ একটা ভাঙ্গা আরামকেদারার ওপর রাখে। এক বোতল শ্যাম্পেন, কয়েকটা ছোট আপেল, এক থোপা আঙুর, (করাতের গুড়ো তখনো আঙুরে লেগে রয়েছে) নিয়ে প্রবেশ করে একজন পরিচারক। সেগুলো রেখে সে হাতমুখ ধোবার গামলাটা দেখিয়ে দেয় এবং গম্ভীর মুখে আবার চলে যায়।

এলিজাবেতা কিয়েভনা জানালার পর্দাটা সরিয়ে দেয়—বাইরে স্যাঁতসেঁতে জলা জমির মাঝখানে একটা গ্যাস ল্যাম্প জ্বলছে, গরুর গাঁড়ীতে করে বড় বড় পিপে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, গাড়োয়ানরা খড়ের মাদুরের ছই-এর তলায় জড়সড় হয়ে বসে আছে। সে হাসে, আয়নার কাছে যায়, কেশবিন্যাস করতে গিয়ে সে এমন একটা ভঙ্গি করে যে ভঙ্গিটা তার নিজেরই কাছে অস্বাভাবিক ঠেকে। "কাল যখন আমার জ্ঞান হবে তখন পাগল হয়ে যাব আমি," মনে মনে ভাবে সে আর ফিতেটা দিয়ে চুলে একটা গিট দেয়।

বেসনভ জিজ্ঞেস করেঃ "একটু মদ চাই?"

"হ্যাঁ।"

সে সোফায় বসে; বেসনভ বসে কার্পেটের ওপর তার পায়ের কাছে। ভাবুকের মত বলে সেঃ

"তোমার চোখ দুটো মারাত্মক; স্নিগ্ধতাও আছে আবার হিংস্রতাও আছে। ঠিক রুশদেশীয় চোখ। আমাকে তুমি ভালবাস?"

প্রশ্নটা শুনে সে একটু অপ্রস্তুত হয়ে যায়; পরমুহূর্তেই আবার ভাবেঃ "না, এ সমস্ত পাগলামি!" সুরাপূর্ণ পাত্রটি তার হাত থেকে নিয়ে সে পান করে; সঙ্গে সঙ্গে তার মাথা ঘুরতে থাকে, মনে হয় সে পড়ে যাবে।

"আপনাকে দেখে আমার ভয় করে, হয়ত আপনাকে আমি ঘৃণা করব," মুখ দিয়ে কথাগুলি বেরিয়ে আসে তার; মনে হয়, দূর থেকে বুঝি কথাগুলি অপর কেউ বলছে আর সে শুনছে।

"আপনি ওভাবে আমার দিকে তাকাবেন না," বলে সে। "আপনাকে দেখে সত্যি আমার লজ্জা করছে।"

"অদ্ভুত মেয়ে তুমি!"

"আপনি অত্যন্ত মারাত্মক লোক। আমি ধর্মভীরু পরিবারের মেয়ে, আমি বিশ্বাস করি শয়তান আছে...দোহাই ভগবানের! আপনি ওভাবে আমার দিকে তাকাবেন না! আমি জানি আপনি আমাকে কি জন্য চান, আপনাকে দেখে সত্যি আমার ভয় করছে।"

এত জোরে সে হেসে ওঠে যে সর্বাঙ্গ তার নাচতে থাকে। গ্লাস থেকে ঝলক দিয়ে মদ তার আঙুলে পড়ে।

বেসনভ তার কোলে মাথা রেখে বলেঃ "ভালবাসা, তোমার একটু ভাল-বাসার কাঙাল আমি," কথাগুলি মরিয়া হয়ে বলছে সে। কিয়েভনাকে এখন

পেলেই যেন তার জীবনের সমস্ত সমস্যার অবসান হয়। "জীবনে আমি বড় অসুখী...ভয় হয় আমার...নিঃসঙ্গ জীবনের কথা ভাবতেও ভয় হয়...বল, তুমি আমাকে ভালবাস, ভালবাস তুমি আমাকে?"

এলিজাবেতা কিয়েভনা বেসনভের মাথায় হাত রাখে আর চোখ দুটো বোজে।

বেসনভ তাকে বলে যে, প্রতিদিন রাত্রে তার মৃত্যুভয় উপস্থিত হয়। তার নিকটেই, একেবারে পাশেই একটা জীবন্ত মানুষকে চাই তার, যে তাকে দয়া করবে, আদর করবে, নিজেকে বিলিযে দেব তার কাছে। "আমি জানি, এটা নরক...কিন্তু আমি বড় অসহায়, আমার সমস্ত রক্ত জমাট হয়ে গেছে, আমার হৃদয়ের স্পন্দন নেই। আমাকে একটু উত্তাপ দাও। শুধু এইটুকু ভিক্ষা চাই তোমার কাছে। দয়া কর আমাকে, না হলে আমি মরে যাব। আমাকে একা ফেলে যেয়ো না। প্রিয়ে, প্রাণেশ্বরী..."

এলিজাবেতা কিয়েভনা নির্বাকঃ একসঙ্গে ভয ও উত্তেজনা এসে তাকে অভিভূত করে ফেলেছে। বেসনভ তাব হাত দুটো টেনে নিয়ে চেটোতে অনবরত চুম্বন করতে থাকে। তার জানুদেশেও চুম্বন কবে সে। সে চোখ দুটো আবো জোরে বোজেঃ লজ্জায় যেন তাব হৃদযন্ত্র একেবাবে নিস্পন্দ হয়ে গেছে।

অকস্মাৎ শিরায় শিরায় তার আগুন জ্বলে ওঠে। মনে হয়, বেসনভ ভালবাসা পাবার যোগ্য, বড় দুঃখী সে মাথা তুলে সে বেসনভের অধরোষ্ঠে ক্ষুধিতের ন্যায় চুম্বন করতে থাকে—সে-চুম্বনে আছে উন্মাদনা, প্রবল উত্তেজনা। এর পর আর তার কোন লজ্জাই রইল না। অনায়াসে অঙ্গবাস খুলে ফেলে সে গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ে।

কিয়েভনার অনাবৃত স্কন্ধে মাথা রেখে বেসনভ ঘুমোচ্ছে। তার পাংশু বদন, ক্লান্ত কুঞ্চিত রেখাযুক্ত ললাট, চোখের তলদেশ, চাপা অধরোষ্ঠ, সমস্তই কিয়েভনা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে। ছিল অপরিচিত মুখ, কিন্তু এখন চির-দিনের মত তার সঙ্গে ভাগ্যসূত্রে জড়িয়ে গেছে।

নিদ্রিত বেসনভের দিকে চেয়ে তার মন বেদনায় এতটা ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে যে সে কেঁদে ফেলে।

তার মনে হয়, বেসনভের ঘুম তো এখনই ভাঙবে, উঠে বিছানায় তার পাশেই দেখতে পাবে তাকে, এই বিশ্রী অবস্থায়, মেদমাংসের স্থূল দেহটা, স্ফীত দুটো চোখ, আর তার পরেই যত তাড়াতাড়ি পারে চলে যাবাব চেষ্টা করবে বেসনভ। আরো ভাবে সে, আর কেউ তাকে কখনো ভালবাসতে পারবে না, প্রত্যেকেরই দৃঢ়বিশ্বাস হবে, সে নির্বোধ, ভ্রষ্টা; কদর্য রুচির মেয়ে,—তার আচরণেই তো প্রকাশ পাবে, ভালবাসে সে একজনকে আর দেহদান করে আর একজনকে, তার সমস্ত জীবনটা হবে অসঙ্গতিপূর্ণ, ঘৃণ্য ও অত্যন্ত অসম্মানজনক। চোখের

জল আর চেপে রাখতে পারে না সে, ঠেলে ঠেলে বেরোয়, বিছানার চাদরের কোণে সে চোখ মোছে—কাঁদতেই কাঁদতেই সে ঘুমিয়ে পড়ে।

বেসনভ একবার একটা লম্বা শ্বাস ফেলেই পাশ ফেরে এবং চোখ মেলে। সমস্ত দেহটায় যেন ক্লান্তি ও জড়তা এসে গেছে। আর একটা দিন এল, আবার তাকে নতুন করে সব শুরু করতে হবে, এ ভাবতেও তার বিরক্তি বোধ হয়। খাটের একটা পেতলের বাঁধের দিকে সে অনেকক্ষণ চেয়ে থাকে; তারপর আরো একটু কাত হয়ে বাঁ পাশে তাকায়। পাশে চিৎ হয়ে শুয়ে আছে এক নারী, দুই নগ্ন বাহু দিয়ে তার মুখ ঢাকা।

"এ কে ?"

বিলুপ্ত স্মৃতিকে সে জাগিয়ে তুলবার চেষ্টা করে কিন্তু কিছুতেই তার মনে পড়ে না। সাবধানে বালিশের তলা থেকে সিগারেটকেসটা টেনে নিয়ে একটা সিগারেট ধরায়।

"কি মুশকিল! একেবারেই ভুলে গেছি। অদ্ভুত!"

একটু তোয়াজের সুরে বলে সেঃ "জেগেই আছ মনে হচ্ছে। সুপ্রভাত।" কিয়েভনা নীরব, তেমনি বাহুতে মুখ ঢেকে পড়ে থাকে। "গতকাল আমরা ছিলাম অপরিচিত, কিন্তু রাত্রিব রহস্যপূর্ণ বন্ধনে আজ আমাদিগকে এক সাথে বেঁধে দিয়েছে।" তীব্র দৃষ্টি হানে বেসনভ, সমস্ত ব্যাপাবটাই কুৎসিত। বড় কথা হলঃ মেয়েটি এখন কি করবে ঠিক কি? সে কি অনুশোচনায় নিজেকে নিজে ভর্ৎসনা করবে, কাঁদবে, না প্রেমাবেগে তাকে জড়িয়ে ধরবে? সাবধানে সে তার বাহু স্পর্শ করে, আবার হাতটা সরিয়ে আনে। এর নাম মার্গারিতা না?

"আমার ওপর রাগ করেছ, মার্গারিতা?"

কথা শুনে এবার কিয়েভনা দু'পাশের বালিশেব মাঝখানে উঠে বসে। বুক থেকে তার শেমিজটা খুলে পড়ে যাচ্ছিল, সেটাকে সে হাত দিয়ে তুলে ধরে, বড় বড় চোখ করে সে বেসনভের দিকে তাকায়। চোখ দু'টো তার ফোলা, অধরে তাচ্ছিল্যের হাসি। বেসনভের সব কথা মনে পড়ে, তার প্রতি তারা কিরকম স্নেহের উদ্রেক হয়।

"আমার নাম মার্গারিতা নয়, এলিজাবেতা কিয়েভনা," সে বলে। "আপনাকে আমি ঘৃণা করি। বিছানা থেকে উঠুন।"

বেসনভ তাড়াতাড়ি বিছানা ছেড়ে ওঠে। হাতমুখ ধোবার স্ট্যান্ডটার কাছে পর্দার আড়ালে গিয়ে সে পোশাক পরে, পর্দাটা আবার সরিয়ে দিয়ে ইলেকট্রিক আলোটা নিভিয়ে দেয়।

"এমন কতগুলি মুহূর্ত আছে যা বিস্মৃত হওয়া যায় না," অনুচ্চস্বরে বলে বেসনভ।

এলিজাবেতা কিয়েভনা বিষন্ন নয়নে লক্ষ্য করে তাকে। সোফায় বসে সে একটা সিগারেট ধরাতে যাবে এমন সময় মৃদুকণ্ঠে কিয়েভনা বলে ঃ

"বাড়িতে গিয়ে আমি বিষ খাব!"

"আমি বুঝিনে তোমার মনের ভাব এমন কেন হল, এলিজাবেতা কিয়েভনা।"

"বেশ, আর বুঝবার চেষ্টা করবেন না। আপনি বাইরে যান—আমাকে জামাকাপড় পরতে হবে।"

বেসনভ বেরিয়ে করিডরে যায়, জায়গাটা অপরিচ্ছন্ন এবং কয়লার ধোঁয়া আসছে। সেখানে অনেকক্ষণ তাকে অপেক্ষা করতে হয়। জানালার গোবরাটে বসে সে সিগারেট টানে; করিডরের শেষ প্রান্তে গিয়ে সে একবার দাঁড়ায়। সেখানে গিয়ে দেখে, ছোট একটা রান্নাঘরে একটি পরিচারক ও গেরস্ত বাড়ির দুটি ঝি গ্লাসে করে চা খাচ্ছে আর চাপা গলায় গল্প করছে। পরিচারক বলছে ঃ

"রাখ, তোমার গ্রামের কথা রাখ, অনেক শুনেছি। রুশিয়াই বটে! রুশিয়া সম্বন্ধে তোমার কত জ্ঞান! প্রতি রাত্রে এখানকার শোবার ঘরগুলিতে কি হচ্ছে চোখ দিয়ে একবার এসে দেখে যেয়ো, আসল রুশিয়ার চেহারা টের পাবে। যত সব নচ্ছার, হারামজাদা, বদমাশের আড্ডা! বেজন্মা, বেজন্মা!"

"আঃ! মুখ খারাপ করছ কেন, কুজমা ইভানিচ!"

"এই সমস্ত হোটেলে আঠার বছর চাকরি করার পর এদের সম্বন্ধে আমি যে কোনো ভাষা ব্যবহার করতে পারি!"

বেসনভ ফিরে যায়, গিয়ে দেখে তার ঘরের দরজা খোলা এবং ঘর খালি। টুপিটা তার মাটিতে পড়ে আছে।

"এপর্যন্তই ভাল," ভাবে সে। হাই তুলে একবার সে হাতপা টান করে নেয়।

আবার নতুন দিন আরম্ভ হয়। সকাল বেলা থেকেই একটা জোর হাওয়া গতকালের জলভরা মেঘগুলিকে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছিল উত্তর দিকে। মেঘগুলি সেখানে গিয়ে জমে শাদা পাহাড়ের মত দেখাচ্ছে। বর্ষাস্নাত শহর সূর্যকিরণে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। ঝকঝকে রোদ সহ্য করতে না পেরে মারাত্মক রোগ-বীজানু সব অন্ধকার ঘরে ও স্যাঁতসেঁতে জায়গায় গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে। রাস্তার শীতল বাতাস বইছে। প্রত্যেক বাড়ীর জানালাগুলি খুলে দিয়ে পরিষ্কার করা হচ্ছে। নীল শার্ট পরা ভৃত্যেরা বাড়ির রকগুলি ঝাঁট দিচ্ছে। নেভস্কির তীরে নষ্টচরিত্র বালিকারা শস্তা দামের অডি-কোলন মিশ্রিত ফুলের তোড়া কেনবার জন্য পথচারীদের হাতের কাছে তুলে ধরছে, তাদের

চোখেমুখে অসংযমের ছাপ। দোকানদারেরা তাড়াতাড়ি শীতের সামগ্রী সরিয়ে বসন্তের নানারকম পণ্যসম্ভারে দোকান সাজিয়েছে, দেখে মনে হয়, যেন শীতের হিমেল বায়ুর অবসানে বাগানে নব বসন্তের ফুল থরে থরে ফুটে উঠেছে।

বৈকালিক পত্রিকাগুলি শিরোনামা বক্ষে ধারণ করে প্রকাশিত হল: "আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে।" কতকগুলি অতি উৎকট দুর্বোধ্য কবিতাও পত্রিকাগুলিতে স্থান পেয়েছে। এককথায় বলতে গেলে লেখকরা একেবারে লাগামহীন।

এরপর সোনায় সোহাগা হল যখন দেখা গেল, ফিউচারিস্টদের কেন্দ্রীয় সংস্থার কয়েকজন দল বেঁধে রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছে আর তাদের পেছনে পেছনে ছোকরার দল বিকটভাবে শিস দিচ্ছে ও ঠাট্টাবিদ্রূপ করছে। ফিউচারিস্টদের দলে আছে তিনজন-: জিরভ, চিত্রকর ভালিয়েত এবং অপরিচিত একজন নবাগত —নাম তার আর্কাদি সেমিশবেতভ, দীর্ঘ চেহারা, মুখখানা ঘোড়ার মত লম্বা। তারা কমলা রং-এর মখমলের খাট জ্যাকেট পরেছে, তাতে রয়েছে কালো রং-এর আঁকাবাঁকা ডোবা, কোমরবন্ধ নেই, মাথায় টপ-হ্যাট। প্রত্যেকেরই এক চোখে একটা চশমা, গালে আঁকা একটা মাছ, একটা তীর এবং 'আর' অক্ষর। বেলা পাঁচটার সময় পুলিশ তাদের গ্রেপ্তার করে গাড়ীতে তুলে থানায় নিয়ে যায় তাদের পরিচয় জানবার জন্য।

সারা শহরের লোক রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছে। মোরস্কায়া স্ট্রীট, নেভার তীরবর্তী রাস্তা এবং কামেনো-অস্ত্রভ্স্কি এভেনিউ ধরে অসংখ্য গাড়ী ও মানুষের স্রোত চলেছে নতুন শহরের দিকে। অনেকেরই ধারণা, সেদিন অসাধারণ একটা কিছু ঘটবে: হয় 'উইন্টার প্যালেস' থেকে একটা ইস্তাহার প্রচারিত হবে, নয়ত একটা বোমা মন্ত্রীসভার অধিবেশন লণ্ডভণ্ড করে দেবে, আর তা না হলে অন্য কোথাও একটা কিছু শুরু হয়ে যাবে।

কিন্তু দেখা গেল, নগরীর ওপর থেকে গোধূলির ম্লান আলো ক্রমশ মিলিয়ে গেল; রাস্তা ও খালের দুই ধারে আলোগুলি জ্বলে উঠল, কালো জলে আলো প্রতিফলিত হয়ে কম্পমান সূঁচের মত অনবরত কাঁপতে লাগল। নেভা ব্রিজ থেকে অন্যান্য দিনের মতই লোক দেখল, জাহাজের কারখানার চিমনিগুলি ছাড়িয়ে ধূমরাশি ও মেঘমালার ঊর্ধ্বে ডুবন্ত সূর্যের শেষ উজ্জ্বল বর্ণচ্ছটা। অঘটন কিছুই ঘটল না। পিটার-পল দুর্গচূড়ায় শেষ আলোকরশ্মি বিকিরণ করে দিবাকর বিদায় নিল, রাত্রির কালো পর্দা ধীরে ধীরে নেমে এল।

বেসনভ সেদিন অনেক কাজ করল এবং ভালই কাজ করল। প্রাতরাশের পর একটু তরল নিদ্রায় দেহ ও মন তার বেশ চাঙ্গা হয়ে উঠল। অনেকক্ষণ ধরে সে গ্যেটের রচনা পড়ল এবং অন্যান্য দিনের মতই আজো এই পুস্তক পাঠ তাকে উৎফুল্ল, অনুপ্রাণিত করে তুলল।

বুককেসের পাশ দিয়ে চিন্তাকুলভাবে সে বার কয়েক পায়চারি করল; তারপর গিয়ে নিজের ডেস্কের পাশে বসে কি লিখতে লাগল। যে বৃদ্ধা পরিচর্যাকারিণী তার ঘরদোর গুছিয়ে রাখে সে চীনেমাটির একটা পাত্রে করে ফুটন্ত কফি নিয়ে এসে হাজির।

বেসনভ খুব খোশমেজাজে আছে। সে লিখে যায়, রুশিয়ার ওপর রাত্রির অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে; বিষাদান্ত নাটকের পর্দা উঠতে আর দেরি নেই; ভগবদ্ভক্ত জাতি ভয়ংকর মুখোস পরে গগল-এর 'টেরিবল রিভেঞ্জ'-এর কসাকের মত ঈশ্বরবিরোধী সৈনিকে রূপান্তরিত হবে। সমগ্র দেশব্যাপী তামসিকতার এক মহোৎসব উদযাপনের আয়োজন চলেছে। রসাতলে যাবার পথ উন্মুক্ত. আর রক্ষা নেই। চোখ বুজে সে কল্পনায় ছবি দেখল, জন-মানবহীন প্রান্তর, ছোট ছোট পাহাড় ডিঙিয়ে যেতে হচ্ছে, ঝড়ে বাড়ীর ছাদ উড়ে গেছে দূরে, পাহাড়গুলি পেরিয়ে প্রচণ্ড অগ্নিশিখা। দু'হাতে নিজের মাথাটা একটু ঝেঁকে নিয়ে আপন মনে বলে, যদিও এই দেশটাই হল তার সেই প্রিয় দেশ, তবু বই আর ছবির মধ্যেই যে ছিল এসম্পর্কে তাব জ্ঞান সীমাবদ্ধ। তার কপালের রেখাগুলি গভীর হয়ে ওঠে, একটা ভীষণ অমঙ্গলের আকাঙ্ক্ষায় তার বুকটা ঢিপ ঢিপ করতে থাকে। তারপব বাঁ হাতের আঙুলেব ফাঁকে একটা জ্বলন্ত সিগারেট রেখে ডান হাতে বড় বড় অক্ষরে অনর্গল সে লিখে চলে এবং লেখা পাতাগুলি শবশর কবে ওলটায়।

অন্ধকার হয়ে আসতেই সে কুশনে নিজের দেহটা এলিয়ে দেয়, আলোটাও জ্বালে না, এখনো তার উত্তেজনা যায়নি, মাথায় ভীষণ জ্বালা, হাত দুটো ঘামে ভিজে গেছে; তবে তার দিনের কাজ সে শেষ করেছে।

ক্রমশ তার মন শান্ত হয়ে আসে, হৃদয়ের কম্পনও স্বাভাবিক হয়। ভাবে সে আজকের সন্ধ্যা ও রাত কিভাবে কাটাবে। কেউ তাকে টেলিফোন করেনি, কেউ তার সঙ্গে দেখা করতেও আসেনি। এই ভাঙ্গা মনের সঙ্গে একা তাকে লড়তে হবে। উপরতলার ফ্ল্যাটে একটি ইংরেজ পরিবার বাস করে, তাদেরই একজন কে পিয়ানো বাজাচ্ছে, সুর ভেসে আসে তার কানে, সঙ্গীত তার মনে আবছা, অসম্ভব বাসনা জাগিয়ে দেয়।

অকস্মাৎ সামনের দরজায় ঘন্টা বেজে উঠে ঘরেব স্তব্ধতা ভঙ্গ করে। বৃদ্ধা পরিচর্যাকারিণীর চটির শব্দ শুনতে পায় সে। একটি নারীকণ্ঠ উচ্চস্বরে দৃঢ়ভাবে বলছে ঃ

"আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাই।"

তারপর মৃদুমন্থর পদক্ষেপ দোরের কাছে এসে থামে। বেসনভ একটুও নড়ে না ঃ তার মুখে ঈষৎ হাসি। নিঃশব্দে দোরটা খুলে যায়, একটি লম্বা মেয়ে তার ঘরে ঢোকে, দোহারা গড়ন, মাথায় একটা বড় টুপী, টুপীর ওপরে ডেজি ফুল আটকান, পেছন দিক থেকে হলের আলো পড়ে তাকে বেশ স্পষ্টই

দেখাচ্ছে। অন্ধকারেই আন্দাজে আন্দাজে সে ঘরের মধ্যে এগিয়ে আসে, মাঝ-খানে এসে দাঁড়ায়; বেসনভ নীরবে কুশান থেকে উঠে দাঁড়াতেই সে যেন চলে যাবার জন্য একটু ঘুরে দাঁড়ায়, তারপর হঠাৎ মাথাটা ঘুরিয়ে বেপরোয়া ভাবে তেমনি উচ্চকণ্ঠে সে বলেঃ

"একটা দরকারী কাজে আপনার কাছে আমি এসেছি।"

বেসনভ্ টেবিলের ধারে গিয়ে সুইচ টিপে আলোটা জ্বেলে দেয়। বই ও পাণ্ডুলিপির স্তূপের ফাঁকের মধ্যে দিয়ে নীল শেডের আলো বেরিয়ে এসে সারা ঘরটায় যেন আলোছায়ার এক মায়াজাল সৃষ্টি করেছে।

"বল, আমি কি করতে পারি?" বেসনভ্ জিজ্ঞেস করে। বসবার জন্য মেয়েটির দিকে সে একটি চেয়ার এগিয়ে দেয়, নিজে তার আরাম কেদারায় বসে, হাত দুটো হাতলের ওপর রাখে। মুখখানা তার একেবারে ফ্যাকাশে, চোখের নীচে কালি পড়েছে। ধীরে ধীরে সে চোখ দুটো মেয়েটির দিকে তোলে, তুলেই দেখতে পায় মেয়েটি তার পরিচিত। তার হাত দুটো কাঁপতে থাকে। শান্ত ভাবে বলে সেঃ

"আমি তোমাকে প্রথম চিনতে পারিনি, দারিয়া দ্মিত্রেভ্না!"

ঘরে ঢুকবার সময় যেমন দৃঢ়তা দেখিয়েছিল ঠিক তেমনি দৃঢ়তার ভাব নিয়েই দাশা চেয়ারে বসে। দস্তানাপরা হাত দুটো হাঁটুর ওপর রেখে সে চোখ দুটো বড় বড় করে তাকায়।

"দারিয়া দ্মিত্রেভ্না, তুমি আমার এখানে আসায় আমি যে কত খুশি হয়েছি, তা আর কি বলব! আমার ভাগ্য বলতে হবে।"

বাধা দিয়ে দাশা বলেঃ

"তা বলে আপনি মনে করবেন না, আমি আপনার একজন গুণগ্রাহী। আপনার কতগুলি কবিতা আমার ভাল লাগে, আবার কতগুলি লাগে না, সেগুলি আমি বুঝিনে বা বুঝবার চেষ্টাও করিনে। কবিতা নিয়ে আলোচনা করতে আমি আসিনি, আমি এসেছি, কারণ আপনি আমাকে বড় অশান্ত করে তুলেছেন।"

বলেই ঘাড় হেঁট করে। বেসনভ্ দেখতে পায় দাশার গ্রীবাদেশ এবং কালো জামার আস্তিন ও দস্তানার মধ্যস্থিত কব্জি দুটো লাল হয়ে উঠেছে। নীরব নিশ্চল অবস্থায় বসে থাকে বেসনভ্।

"জানি, আমার কি হল না হল তাতে আপনার কিছু এসে যায় না। অবশ্য আপনার সম্বন্ধেও উদাসীন থাকতে পারলে আমি খুশিই হতাম। কিন্তু কি জানেন, ইচ্ছে করলেই সব সময় দুশ্চিন্তার হাত থেকে অব্যাহতি পাওয়া যায় না..."

দ্রুত মাথা তুলে সে অপলক নয়নে বেসনভের দিকে চেয়ে থাকে। বেসনভ ধীরে ধীরে চোখের পাতা নামিয়ে বলেঃ

"রোগবীজাণুর মত তুমি আমার রক্তের সঙ্গে মিশে গেছ। আমি অহর্নিশি তোমারই চিন্তায় ডুবে আছি। আর সহ্য করতে পারছিলাম না। কেবলই মনে হত, তোমার কাছে গিয়ে তোমাকে সমস্ত খুলে বলি। আজ আর আমার কোন সংশয় নেই। বলেই ফেলি, আমি তোমাকে ভালবাসি "

দাশার অধরোষ্ঠ কাঁপতে থাকে। হঠাৎ মুখ ঘুরিয়ে সে দেয়ালটাকে নিরীক্ষণ করে। সেখানে দেখা যাচ্ছে পিটার দি গ্রেট-এর মুখাবয়ব, নীচের আলো গিয়ে পড়েছে তার ওপর। তখনকার দিনের কবিদের কাছে তার খুব সমাদর ছিল। নিমীলিত নেত্রে তিনি যেন মুখ টিপে টিপে দাশাকে লক্ষ্য করে বিদ্রূপের হাসি হাসছেন। সেবাড়ির ওপরের তলায় যে ইংরেজ পাদ্রীর পরিবার বাস করে তাদের চারজন এক সঙ্গে গেয়ে ওঠেঃ

"আমরা মরব।
না, স্বচ্ছ আকাশপথে
উড়ে যাব মোরা
অনন্ত, অসীম আনন্দলোকে।"

"আপনি যদি আমাকে বোঝাতে চান যে ঠিক একই ভাবে আপনিও আমার কথা ভাবেন, তবে এক্ষুনি আমি চলে যাব"—দাশা উত্তেজিত হয়ে দ্রুত কথাগুলি বলে যায় "অবশ্য আমি জানি এরপব আমার প্রতি আপনার আর কোন শ্রদ্ধাই থাকতে পারে না। কোন ভদ্র মেয়ে এমন কাজ করে না কিন্তু আমি আপনার কাছে কিছু চাইনে, বা আপনাকে কিছু করতেও বলিনে। আপনাকে আমার কেবল বলা দরকার ছিল যে, আপনাকে কতখানি ভালবাসি আমি, প্রাণ দিয়ে ভালবাসি, আমার সমস্ত ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে গর্ব করার মত আমার আর কিছুই নেই .."

আপন মনে ভাবে সেঃ "আর কেন ? ওঠ। বিদায় নাও এবার!" কিন্তু সে বসেই থাকে, সেই মুখাবয়বটার দিকেই বারবার চায়। এতটা দুর্বল বোধ করে সে যে, একটা হাত তুলবার সাধ্যও তার থাকে না, সর্বাঙ্গ যেন একেবারে অবশ হয়ে গেছে। স্বপ্নাবিষ্টের মত সে নিজেকে নিজে প্রশ্ন করে, "কৈ তিনি তো কোন উত্তর দিলেন না ?" বেসনভ দুহাতে মুখখানা ঢেকে গীর্জায় লোক যেরকম চাপা গলায় কথা বলে সেভাবে বলেঃ

"আমার প্রতি তোমার এই যে আকর্ষণ এজন্য আমি তোমাকে সর্বান্তঃকরণে ধন্যবাদ দিচ্ছি। যে শুভমুহূর্ত, যে সৌরভ আজ তুমি বয়ে এনেছ, তা কি কখনো ভোলা যায় ?"

দাশা দাঁত চিবিয়ে বলেঃ "থাক, কাজ নেই আপনার এগুলি মনে রেখে।"

বেসনভ চুপ করে যায়, চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়, দাশার কাছ থেকে একটু দূরে গিয়ে বুককেসটায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে বলেঃ

"দারিয়া দ্মিত্রেভ্না, তোমার কাছে নতজানু হয়ে আমি কেবল একথাই

বলতে পারি যে, তোমার কথা শোনবার যোগ্য আমি নই। এমন অভিশপ্ত জীবন বোধ হয় আর আমার কখনো হয়নি। নিজেকে আমি ক্ষয় করে ফেলেছি, একেবারে অসাড় হয়ে গিয়েছি। কিছুই নেই আমার। কি উত্তর দেব আমি তোমাকে? চল না, আমার সঙ্গে শহরতলীর কোন একটা হোটেলে? দারিয়া দ্মিত্রেভ্না, আমার কাছে কোন কপটতা তুমি পাবে না। ভাল আর আমি বাসতে পারব না। কয়েক বছর আগেও আমি ভাবতাম, যৌবনের ভান্ডার বুঝি আমার অফুরন্ত। আমি তোমাকে যেতে দেব না।"

তার কথাগুলি যেন সূচের মত এসে দাশাকে বিঁধছিল। অনেক দিনের চাপা বেদনা প্রকাশ পাচ্ছিল সেগুলিতে।

"এখন একমাত্র পারি এই দামী মদটুকু ঢেলে ফেলে দিতে। তাতে আমার কি ক্ষতি হবে তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পার। আর পারি আমি আমার বাহু বিস্তার করে বুকে টেনে নিতে..."

"না, না," দাশা চুপে চুপে বলে।

"ও, আচ্ছা। তুমি নিজেই জান, মূল্যবান জিনিসের অপচয় করা অপরাধ হলেও তার মত আনন্দ আর কিছুতেই নেই। নিজেকে নিঃশেষ করে দেওয়া নিজেকে ক্ষয় করে ফেলায় কি অপার আনন্দ! তুমিও কি সেজন্যই আমার কাছে আসনি? এক পাত্র খাঁটি সুরা ফেলে দিয়ে কত যে আনন্দ......সেই সুরাপূর্ণ পেয়ালা হাতেই যে তুমি আজ আমার কাছে উপস্থিত..."

ধীরে ধীরে সে ভ্রূযুগল কুঞ্চিত করে। দাশার যেন নিশ্বাস ফেলতে কষ্ট হচ্ছে। ভয়ার্ত চোখে সে তার দিকে চেয়ে থাকে।

"দারিয়া দ্মিত্রেভ্না, তোমাকে খুলেই বলি। তোমার বোনের সঙ্গে তোমার এতোটা মিল আছে যে প্রথমে আমি ভাবলাম..."

"কি? কি বলছেন আপনি?" দাশা চীৎকার করে ওঠে।

চেয়ার ছেড়ে সে লাফিয়ে ওঠে এবং বেসনভের মুখোমুখি দাঁড়ায়। তার ক্রোধটা বেসনভ ধরতে পারেনি, সে ভেবেছে অন্য রকম। তার মাথা যেন ঝিম-ঝিম করছে। দাশার অঙ্গের সুঘ্রাণ প্রবেশ করছে তার নাসারন্ধ্রে শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে. নারীদেহের সুগন্ধিসেবিত ত্বক থেকে যে প্রাণমাতানো সৌরভ ভেসে আসে তার মাদকতা কোন্ পুরুষের হৃদয়কে না উদ্বেলিত করে তোলে।

"এটা পাগলামি...আমি জানি...কিন্তু আর আমি পারিনে..." চাপা কণ্ঠে বলে বেসনভ দাশার হাত ধরবার চেষ্টা করে।

দাশা ছুটে পালায়। দরজার কাছে গিয়ে একবার সে ক্রুদ্ধনয়নে ফিরে তাকায়, তারপরই অদৃশ্য হয়। সামনের দরজাটা সশব্দে বন্ধ হয়ে যায়। বেসনভ ধীরে টেবিলের কাছে যায়, একটা সিগারেট বার করে এবং নখ দিয়ে স্বচ্ছ সিগারেটকেসটা ঠুকতে থাকে। তারপর সে হাত দিয়ে নিজের চোখ দুটো চেপে ধরে। সমস্ত কল্পনা দিয়ে সে যেন একথাটাই উপলব্ধি করতে

চায়, চূড়ান্ত সংগ্রামের জন্য জ্যোতির্লোকের যে শক্তিবর্গ প্রস্তুত হচ্ছে তারাই তার কাছে পাঠিয়েছিল এই সুঠাম, সুন্দর, তন্বী তরুণীটিকে তাকে জীবনের পথে ফিরে আসবার জন্য ডাক দিতে। কিন্তু সে যে আগেই অসহায়ের মত তমসা-শক্তির কাছে আত্মসমর্পণ করে বসে আছে; এখন মুক্তির আর কোন উপায় নেই। শিরা উপশিরায় বিষ ছড়িয়ে পড়ার মত ক্রমশ একটা দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা ও অনুশোচনা তার দেহের সমস্ত শোণিতে সঞ্চারিত হয়।

॥ আট ॥

"কে, দাশা? ভেতরে আয়।"

কাতিয়া একটা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে তার বডিসের ফিতে বাঁধছে। দাশাকে দেখে সে একটু অন্যমনস্কভাবে হাসে। তারপর টাইট ফিটিং-এর চটিজোড়া পরে কার্পেটের ওপর ব্যস্ত হয়ে ঘোরে। একবার পিছিয়ে যায়, একবার এগিয়ে আসে। নামমাত্র গাত্রাচ্ছাদন ছিল তার অঙ্গে, ফিতে ও লেস সার; তার সুন্দর বাহুযুগল ও দুই স্কন্ধ পাউডার মাখা, চূড়ায় সুদৃশ্য মুকুটের মত করে চুল বাঁধা। কাছেই একটা নীচু টেবিলে এক বাটি গরম জল; চারদিকে ছড়ানো রয়েছে নখকাটার কাঁচি, ছোট ছোট ফাইল, লিপস্টিক ও পাউডার পাফ। আজ সন্ধ্যায় কোথাও যাওয়া বা কারো এবাড়িতে আসার কথা নেই, সুতরাং আজকের দিনে তার যে প্রসাধন পারিপাট্য তাকে বলা যায় "পালক গুছিয়ে সাজিয়ে নেওয়া," অন্তত তার পরিবারের লোকেরা তাই বলে।

মোজা বাঁধতে বাঁধতে সে বলেঃ "দ্যাখ্, আজকাল আর কেউ কষে বডিস পরে না। মাদাম দুসলের দোকান থেকে এই হাল ফ্যাশানের বডিস বেরিয়েছে। কেমন চমৎকার ফিট করেছে দ্যাখ্ তো। পরলে মানায়ও ভাল। পছন্দ হয় তোর এটা?"

"না, আমি পছন্দ করিনে," উত্তর দেয় দাশা। পিঠে হাত রেখে দেয়ালটায় হেলান দিয়ে দাঁড়ায় সে। কাতিয়া বিস্ময়ে ভ্রূ তোলে।

"পছন্দ করিসনে? কেন? এত আরামদায়ক এটা।"

"কি আরামদায়ক, দিদি?"

"লেসটা বুঝি তোর পছন্দ হয় না? তার বদলে অন্য জিনিসও দেওয়া যায়। কিন্তু কি আশ্চর্য! তোর এ জিনিসটা পছন্দ হয় না কেন?" আবার সে আয়নার সামনে এপাশ ওপাশ ঘুরে দাঁড়ায়।

দাশা বলেঃ "তোর বডিস আমার পছন্দ হয় কিনা, দয়া করে একথা তুই আমাকে আর জিজ্ঞেস করিসনে।"

"বহুৎ আচ্ছা। কিন্তু নিকলাই ইভানোভিচ এসমস্ত বিষয়ে কিছুই বোঝে না।"

"থাক, তাঁকে আর এর মধ্যে টানিস না।"

"দাশা, কি হয়েছে বল তো?"

কাতিয়া বিস্ময়ে হাঁ করে চেয়ে থাকে। এতক্ষণে সে বুঝতে পারে যে, দাশা আর আত্মসংবরণ করতে পারছে না, দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করে সে কথা বলছে এবং তার গণ্ডদেশ রক্তিম হয়ে উঠেছে।

"আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ঘুরে ঘুরে নিজেকে দেখাটা বোধ হয় এখন বন্ধ করলেই ভাল হয়, দিদি।"

"কিন্তু আমাকে পরিপাটি করতে হবে তো!"

"কার জন্য?"

"তোর কি হয়েছে? কেন, আমার নিজেরই জন্য।"

"মিথ্যে কথা!"

এর পর দুই বোন অনেকক্ষণ চুপ করে থাকে। নীল রেশমী কাপড়ের লাইনিং দেওয়া ক্যামেল-হেয়ার ড্রেসিং-গাউনটা চেয়ারের ওপর থেকে নিয়ে কাতিয়া গায়ে দেয় এবং কোমরবন্ধটা আস্তে আস্তে বাঁধতে থাকে। দাশা মনোযোগের সঙ্গে তার হাবভাব লক্ষ্য করে এবং অবশেষে বলেঃ

"জামাইবাবুর কাছে তুই যা এবং তাঁকে সব খুলে বল।"

কাতিয়া স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, কেবল কোমরের ফিতেটার ওপর তার আঙুলগুলি নড়ছে। দাশা দেখে, দিদির গলার ভেতর পিণ্ডবৎ কি একটা যেন বারবার ফুলে ফুলে উঠছে, একটা শক্ত কিছু যেন সে গেলার চেষ্টা করছে।

"দাশা, তুই কি কিছু আবিষ্কার করে ফেলেছিস?" শান্তভাবে জিজ্ঞেস করে কাতিয়া।

"আমি এইমাত্র বেসনভের কাছ থেকে এলাম।" কাতিয়া দাশার দিকে ফ্যালফ্যাল করে চায়, হঠাৎ সে একেবারে বিবর্ণ হয়ে যায় এবং কাঁধদুটোকে নাচায়। "ভয় নেই তোর, আমার সেখানে কিছু হয়নি। সময় থাকতে তিনি আমাকে বলেছেন, "

দাশা এক পা থেকে আরেক পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়ায়।

"আমি অনেক আগেই অনুমান করেছিলাম যে তুই...ব্যাপারটা তাঁরই সঙ্গে...। কিন্তু এটা বিশ্বাস করতেও যেন কিরকম লাগছিল...তুই দেখছি ভীরু এবং মিথ্যেবাদী......এরকম নোংরামির মধ্যে আমি বাস করতে চাইনে। স্বামীর কাছে যা এবং তাঁকে গিয়ে সব বল..."

এর বেশি আর দাশার মুখ দিয়ে বেরোয় না; কাতিয়া মাথা হেঁট করে তার সামনে দাঁড়িয়ে থাকে। দাশা ভাবতেই পারেনি যে এতখানি নম্র হয়ে কাতিয়া অপরাধীর মত অবনত মস্তকে তার সামনে এভাবে দাঁড়াবে।

"তুই কি আমাকে এখনই তার কাছে যেতে বলিস?" প্রশ্ন করে কাতিয়া।

"হ্যাঁ, এই মুহূর্তে...তোর নিজেরই বোঝা উচিত..."

ছোট একটা নিশ্বাস ফেলে কাতিয়া দরজার কাছে যায়। সেখানে গিয়ে একটু থামে, তারপর আবার বলেঃ

"না, আমি পারব না, দাশা।"

দাশা একটি কথাও বলে না।

"বেশ, আমি যাব এবং তাঁকে সবই বলব," বলে কাতিয়া।

নিকলাই ইভানোভিচ ড্রইং রুমে বসে আছেন; হাতীর দাঁতের একটা কাগজকাটা ছুরি দিয়ে তিনি দাড়ির জট ছাড়াচ্ছেন আর 'রাশিয়ান রিভিউ' পত্রিকায় প্রকাশিত আকুন্দিনের একটা প্রবন্ধ পড়ছেন। কাগজটা এইমাত্র এসেছে। বাকুনিনের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে প্রবন্ধটা লেখা হয়েছে।* নিকোলাই ইভানোভিচ প্রবন্ধটা পড়ে খুব আনন্দ পাচ্ছেন। স্ত্রী ঘরে ঢুকতেই তিনি তাকে ডেকে বলেনঃ

"এস, বসো কাতিয়া! শোনঃ 'এই মানুষটির'—অর্থাৎ বাকুনিনের—'দর্শন বা তাঁর আদর্শনিষ্ঠা ততখানি আকর্ষণ করে না যতখানি করে গভীর অনুভূতি দিয়ে তাঁর ভাবধারাকে বাস্তবে পরিণত করার জন্য প্রতিনিয়ত সংগ্রাম, প্রুধোঁর† সঙ্গে রাত্রির পর রাত্রি জেগে আলোচনা, সংগ্রামের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ার দুর্জয় সাহস, এমন কি অস্ট্রিয়ার বিদ্রোহীরা কিসের জন্য কার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছে তা পর্যন্ত ভালভাবে না জেনে ভবিষ্যতদ্রষ্টার মত তাদের সাহায্য করতে এগিয়ে যাওয়া। বাকুনিনের আদর্শকে সামনে রেখেই নতুন শ্রেণীসমূহ প্রবল শক্তি নিয়ে সংগ্রামে অবতীর্ণ হচ্ছে।/চিন্তাকে কার্যে পরিণত করাই আগামী যুগের প্রধান কাজ। ঘটনাস্তূপ ঘেঁটে এমন কতগুলি তত্ত্ব বার করা নয় যা জীবনকে নিষ্ক্রিয়তার দিকে ঠেলে দেয়। শুধু ভাবরাজ্যে বিচরণ করলে চলবে না, ভাবজগৎ দিয়ে বস্তুজগৎকে জয় করতে হবে। বাস্তব হচ্ছে দাহ্য বস্তুর স্তূপ, ভাব হচ্ছে স্ফুলিঙ্গ। বিচ্ছিন্ন ও প্রতিকূল এই দুই জগৎকে এক বিশ্ব-বিপ্লবের বহ্নিশিখায় মিলিয়ে দিতে হবে ..' কাতিয়া, তোমার কি মনে হয়? একথাই লিপিবদ্ধ আছে—বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক। সাবাস ছেলে, আকুন্দিন! একথা খুবই সত্যি—আজকাল কেউ বড় জিনিস নিয়ে ভাবেও না বা সেই প্রেরণাও নেই। সরকার বাহাদুরের মাথায় কেবল এক চিন্তা—ভবিষ্যতের জন্য ভয় ও আতঙ্ক। বুদ্ধিজীবীরা অতিভোজন ও পানে মত্ত। আমরা আর কিছুই করিনে, কাতিয়া, কেবল বকি, বকি আর বকি। আমরা পাঁকে আকণ্ঠ ডুবে আছি। লোক যেন জীবন্মৃত অবস্থায় আছে। কদর্য যৌনব্যাধি

---

* মিখাইল আলেকজান্দ্রোভিচ বাকুনিন (১৮১৪-১৮৭৬)—একজন নৈরাজ্যবাদী মত-বাদপ্রচারক, মার্ক্সবাদের ঘোর পরিপন্থী।

† পিয়ের জোসেফ প্রুধোঁ (১৮০৯-১৮৬৫)—পেটিবুর্জোয়া ফরাসী সমাজতন্ত্রী—নৈরাজ্যবাদী।

আর ভদকা গোটা রুশ জাতকে খেয়ে ফেলছে। রুশিয়া মরে যাচ্ছে। একটা ফুৎকার দাও দেখবে ধূলিকণার মত উড়ে যাবে। এ'ভাবে আর চলে না। আমাদের অগ্নিপরীক্ষার প্রয়োজন, আগুনে পুড়ে আমাদের খাঁটি হতে হবে..."

বেশ ভারী গলায় পড়ছিলেন তিনি। পড়তে পড়তে উত্তেজিত হয়ে উঠছিলেন, চোখ দুটো তার বিস্ফারিত দেখাচ্ছিল, শব্দের ছন্দের সঙ্গে তাল মিলিয়ে তিনি মাঝে মাঝে হাতের কাগজকাটা ছুরিটা হাওয়ায় আন্দোলিত করছিলেন। একটা আরাম কেদারার পেছনে হেলান দিয়ে তারই কাছে দাঁড়িয়ে আছে কাতিয়া। প্রবন্ধটা পড়া শেষ করে তিনি যখন পত্রিকাটার নতুন পাতা কাটতে শুরু করেছেন তখন কাতিয়া আরো কাছে গিয়ে তার চুলে হাত রাখে।

"ওগো, শোন, আমি তোমাকে আজ যেকথা বলব তাতে তুমি অত্যন্ত আঘাত পাবে। ভেবেছিলাম তোমাকে বলবই না, কিন্তু এমন একটা ব্যাপার ঘটে গেছে যাতে তোমাকে আর না বলে পারছিনে.."

কাতিয়ার হাতের নীচ থেকেই মাথা তুলে নিকলাই ইভানোভিচ উৎসুক নয়নে তার দিকে তাকান।

"বল, কাতিয়া, আমি শুনছি।"

"মনে আছে, একদিন ঝগড়ার সময় রাগের মাথায় তোমাকে আমি বলে ফেলেছিলাম, আমাকে তুমি অত বিশ্বাস ক'র না তার পরেই আমি কথাটা ফিরিয়ে নিয়েছিলাম ."

"হ্যাঁ মনে পড়ছে।" পত্রিকাটা বন্ধ করে তিনি চেয়ারে একেবারে ঘুরে বসেন। কাতিয়া স্থির নয়নে চেয়ে আছে, প্রশান্ত ও সরল তার দৃষ্টি। চোখে চোখ পড়তেই নিকলাই ইভানোভিচ যেন একটু অপ্রস্তুত হয়ে একপাশে চোখ ঘুরিয়ে নেন।

"শোন, আমি তখন তোমাকে মিথ্যে কথা বলেছিলাম। .আমি সত্যি ব্যাভিচারিণী। ."

বেদনাহতের মত একবার চেয়েই নিকলাই ইভানোভিচ আবার হাসবার চেষ্টা করলেন। তাঁর মুখ শুকিয়ে গেছে। আর যখন চুপ করে থাকা সম্ভব হল না তখন তিনি ধরা গলায় বললেন:

"বলে ভালই করলে, কাতিয়া। তোমাকে ধন্যবাদ।..."

একথা বলতেই কাতিয়া স্বামীর হাতটা টেনে নিয়ে চুম্বন করে এবং নিজের বুকের ওপর হাতটা জোরে চেপে ধরে। কিন্তু হাতটা তার মুঠো থেকে ফসকে যায়, সেটাকে আর ধরবার চেষ্টা সে করে না। শান্তভাবে সে কার্পেটের ওপর বসে পড়ে এবং চেয়ারের চামড়ামোড়া হাতলটায় মাথা রাখে।

"তুমি কি আমার আর কোন কথাই শুনতে চাও না?"

"না, কাতিয়া। তুমি এখন যাও।"

কাতিয়া উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। খাবার ঘরের দরজায় দাশা হঠাৎ

ছুটে এসে দিদিকে জড়িয়ে ধরে, দু'বাহুর বেষ্টনীতে ফেলে তাকে ভীষণভাবে চাপতে থাকে, তার কেশ, কণ্ঠ ও কর্ণদ্বয় চুম্বন করে সে চুপে চুপে বলে ঃ

"আমাকে ক্ষমা কর্, ক্ষমা কর্ আমাকে! তুই অসাধারণ, আমাকে বিস্মিত করে দিয়েছিস তুই!...আমি শুনেছি সবই।...আমাকে কি ক্ষমা করতে পারিস তুই, আমাকে কি ক্ষমা করবি তুই, দিদি?"

দাশার বাহুবন্ধন থেকে কাতিয়া নিজেকে সাবধানে মুক্ত করে, টেবিলের ধারে যায় এবং টেবিলক্লথটা টান করে দিয়ে বলে ঃ

"তুই আমাকে যা করতে বলেছিলি, দাশা আমি তাই করেছি।"

দিদি, তুই কি কখনো আমাকে ক্ষমা করতে পারবি?"

"তুইই ঠিক, দাশা। যা যা হয়েছে ভালই হয়েছে।"

"না, আমি মোটেই ঠিক নই।...রাগের বশে...শুধু রাগের বশে...কথাটা আমি বলে ফেলেছিলাম।...কিন্তু এখন দেখছি তোর বিচার করার অধিকার কারো নেই। এজন্য যদি আমাদের সবাইকে কষ্ট পেতে হয় পাব, ক্ষতি নেই, কিন্তু তোর কোন দোষ নেই, দিদি। আমি বুঝতে পারছি তুই সম্পূর্ণ নিষ্পাপ। আমাকে ক্ষমা কর, দিদি।"

দাশার দুই গণ্ড বেয়ে অশ্রুর বন্যা নেমেছে। দিদির ঠিক পেছনে দাঁড়িয়ে আর একটু উচ্চকণ্ঠে সে বলে ঃ

"তুই যদি আমাকে ক্ষমা না করিস, দিদি, আমি তবে প্রাণ এ জীবন রাখবো না।"

কাতিয়া সহসা তার দিকে ঘুরে দাঁড়ায়।

"তুই আমার কাছ থেকে আর কি চাস? তুই কি আশা করিস আর আমরা সরল মনে সুখী জীবন যাপন করতে পারব? ...আচ্ছা, তোকে বলি। কিছু না জানিয়ে আমি মিথ্যে কথা বলেছিলাম, কারণ নিকলাই ইভানোভিচের সঙ্গে আরো কিছুকাল ঘর করার সেটাই ছিল একমাত্র পথ। কিন্তু এখন —সব শেষ, বুঝলি? নিকলাই ইভানোভিচের প্রতি আমার ভালবাসা অনেক-দিন আগেই চলে গেছে, বহুদিন থেকেই আমি তার প্রতি অনাসক্ত। জানিনে সে আমাকে ভালবাসে কিনা—কিন্তু আমার কাছে সে পর হয়ে গেছে। বুঝতে পাচ্ছিস তা? এসমস্ত ভয়ংকর জিনিস যাতে দেখতে না হয় সেজন্য তুই উট পাখীর মত বালিতে মুখ গুঁজে থাকতে চাস। এ সমস্তই আমার দেখা এবং জানিও সবই, তবু যে এই নরককুণ্ডে আমি বাস করছিলাম তার কারণ আমি দুর্বল নারী। আমি দেখতে পারছিলাম, এই পাপজীবন তোকেও খেতে বসেছে। তোকে বাঁচাবার চেষ্টা করেছি; বেসনভকে আমি বলেছিলাম সে যেন আমাদের বাড়িতে আর না আসে। সে আসার আগেই তো...উঃ! কি আর হল তাতে...এখন সব শেষ, আর উপায় নেই।..."

কাতিয়া হঠাৎ মাথাটা তুলে কান পাতে। দাশার মনে হচ্ছে সর্বাঙ্গ যেন

তার বরফের মত ঠাণ্ডা হয়ে গেছে, হিমে যেন তার মেরুদণ্ডটা শিরশির করছে। নিকলাই ইভানোভিচকে দোরের কাছে দেখা যায়, দুই পর্দার মাঝখান দিয়ে পাশের দিকে যান তিনি। হাতদুটো রয়েছে তাঁর পেছনে।

"বেসনভ?" মাথা নেড়ে হাসতে হাসতে বলেন তিনি; তারপর খাবার ঘরে এসে ঢোকেন।

কাতিয়া নিরুত্তর। গালে রক্ত যেন চাপ ধরে উঠেছে। চোখ দুটো জ্বলছে তার। অধরোষ্ঠ সে চেপে রাখে।

"তুমি বুঝি ভেবেছ, কাতিয়া, যে আমাদের কথাবার্তা সমস্ত শেষ হয়ে গেছে? কিন্তু তা নয়।" তখনো তিনি হাসছেন। তারপর বলেনঃ

"দাশা, আমাদের দুজনের একটু নিরালা দরকার। তুমি এখান থেকে যাবে?"

"না, আমি যাব না।"

"হ্যাঁ, আমি যখন বলছি, তোমাকে যেতেই হবে।"

"না, আমি যাব না।"

"তা হলে আমাকেই এ বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে হয়।"

"বেশ, তাই যান।" চটে গিয়ে জবাব দেয় দাশা।

নিকোলই ইভানোভিচ একটু লাল হয়ে ওঠেন, কিন্তু পরমুহূর্তেই তাঁর চোখমুখে দেখা দেয় সেই আগেকার মত উন্মাদের হাসি।

"আর কথা বাড়িয়ে কাজ নেই—থাকো, তোমার সামনেই বলছি। শোন, কাতিয়া, যেকথা তোমাকে আমি বলতে এসেছি। তুমি চলে আসার পর এতক্ষণ আমি সেখানেই বসে ছিলাম; তোমাকে বলতে কি, এই কয়মিনিট আমাকে যে কি অসহ্য যাতনা ভোগ করতে হয়েছে! আমি ঠিক করেছি তোমাকে আমি খুন করব। হ্যাঁ, আমাকে তাই করতে হবে।"

একথা শোনামাত্র দাশা এগিয়ে গিয়ে দিদির গা ঘেঁষে দাঁড়ায় এবং দুহাতে তাকে জড়িয়ে ধরে। ঘৃণায় কাতিয়ার অধরোষ্ঠ কাঁপতে থাকে।

"আবার মাথা খারাপ!...তোমার ওষুধ খাওয়া উচিত।"

"না, কাতিয়া। এবার মাথা খারাপ নয়।..."

"তা হলে যা করবে বলে এসেছ তাই কর," চেঁচিয়ে ওঠে কাতিয়া। ধাক্কা দিয়ে দাশাকে একপাশে সরিয়ে দিয়ে সোজা সে নিকলাই ইভানোভিচের সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। "কৈ কর, খুন কর! আমি তোমার মুখের ওপরই বলছি—আমি তোমাকে ভালবাসি না।"

পেছনে একটু সরে গিয়ে তিনি ছোট একটা রিভলবার বার করেন। সেটা তাঁর হাতেই ছিল। টেবিলের ওপর রিভলবারটা রেখে তিনি দাঁতে হাতের আঙুল কামড়াতে থাকেন। তারপর ঘুরে তিনি দরজার দিকে চলে যান।

তাঁর চলে যাওয়া কাতিয়া ভাল করে নিরীক্ষণ করে। না ঘুরেই সে চীৎকার করে বলে ওঠেঃ

"কি আঘাত! উঃ কি প্রচণ্ড আঘাত!"

ছুটে সে নিকলাই ইভানোভিচের কাছে যায়, স্বামীর কাঁধ দু'টো ধ'রে তাঁর মুখটা নিজের দিকে ঘুরিয়ে বলেঃ

"মিথ্যেবাদী! তুমি সব সময়ই মিথ্যে কথা বল! এখনো তুমি মিথ্যে কথাই বলছ।"

নিকলাই ইভানোভিচ কিন্তু একবার মাথা নেড়েই ঘর থেকে বেরিয়ে যান। কাতিয়া টেবিলের ধারে বসে পড়ে।

"এবার বুঝলি দাশা, তৃতীয় অঙ্ক থেকেই আমাদের গুলির দৃশ্য শুরু। আর তার সঙ্গে থাকা চলে না।"

"দিদি, আমার মাথার দিব্যি, তুই এ করিসনি!"

"না, আমাকে যেতেই হবে। আমি আর এরকম জীবন যাপন করতে চাইনে। আর পাঁচ বছরে আমি বুড়ী হয়ে যাব—তখন যাওয়ার পথ থাকবে না। এ জীবন আমার কাছে দুর্বহ হয়ে উঠেছে .অসহ্য!"

এই বলে দু'হাতে সে মুখ ঢাকে তারপর সামনের দিকে একটু ঝুঁকে কনুই দু'টো টেবিলের ওপর রাখে। দাশা তার পাশেই বসে। সহসা সে দিদির স্কন্ধদেশে চুম্বন করে, অবশ্য একটু ভয়ে ভয়েই করে। কাতিয়া টেবিলের পাশে বসে পড়ে।

"তুই কি ভাবিস তার জন্য আমার কোন দুঃখ নেই? তার জন্য সর্বদাই আমার দুঃখ হয়। কিন্তু আমি যদি এখন তার কাছে যাই তবে এত কথা উঠবে যে তা আর শেষ হবে না এবং গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত সমস্ত কথাই হবে কপটতায় ভরা। আমাদের দু'জনের কাঁধে যেন ভূত চাপে এবং সেই যেন আমাদের মুখ দিয়ে যত ছলনাপূর্ণ কথা বলায়। নিকলাই ইভানোভিচের সঙ্গে কথা বলা আর একটা বেসুরো পিয়ানো বাজানো একই কথা।. না, আমাকে যেতেই হবে। দাশা, তুই যদি জানতিস আমি কত অসুখী!"

এত কিছুর পরও দেখা গেল সন্ধ্যা বেলা কাতিয়া তার স্বামীর পড়ার ঘরে গিয়ে হাজির। স্বামীর সঙ্গে তার অনেকক্ষণ ধরে আলোচনা হল, দু'জনেই শান্ত ও বিষণ্ণভাবে আলাপ করল, দুজনেই দু'জনের কাছে সরল হবার চেষ্টা করল; তবে কেউ কাউকে ছেড়ে কথা বলল না, আলোচনা শেষে দু'জনেরই এই ধারণা হল যে, ফয়সালা কিছুই হল না, মনের মেঘও কাটল না এবং লাভ হল না কিছুই।

নিকলাই ইভানোভিচ টেবিলের পাশে একা বসে সারারাত কাটালেন। কাতিয়া পরে জানতে পারল যে, সেই ক'ঘন্টা বসে তিনি তাঁর সমস্ত অতীত

জীবন স্মরণ ও পর্যালোচনা করেছেন। তারই ফলে তিনি স্ত্রীকে একখানি দীর্ঘ চিঠি লিখে ফেলেন। সেই চিঠির শেষের দিকে আছে ঃ

"নৈতিক দিক দিয়ে আমরা সকলেই সংকীর্ণ পথে বিচরণ করছি, কাতিয়া। গত পাঁচ বছরে আমার জীবনে কোন একটা বড় রকমের প্রেরণা আসেনি বা কোন একটা বড় কাজও করিনি। এমন কি তোমার প্রতি আমার ভালবাসা, আমাদের বিবাহও যেন এই হুল্লোড় ও হট্টগোলের একটা অংশ। ক্ষুদ্রতা, ক্ষিপ্ততা, জড়তায় যেন জীবন আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। দু'টো পথ খোলা আছে—হয় আমার নিজের জীবন শেষ করে দেওয়া, নয়ত আমার চিন্তারাশি, আমার অনুভূতিসমূহ, আমার চেতনা যে মানসিক আবরণে ঢাকা পড়েছে তা ছিন্ন করে ফেলা। কিন্তু এই দু'টোর কোনটাই করতে আমি অসমর্থ..."

এই পরিবারের ওপর দুর্ভোগ এত আকস্মিক ভাবে নেমে এল এবং এত সহজে ও এমন শোচনীয় ভাবে ঘর ভেঙে গেল যে দাশা একেবারে হতবুদ্ধি হয়ে গেল, নিজের কথা ভাববার মত মনের অবস্থাও তার নেই। তার নিজের ধ্যানধারণাগুলি এখন তার কাছে ছেলেমানুষি বলে মনে হয়ঃ ছেলেবেলায় তাকে ও কাতিয়াকে তাদের ধাত্রী যেমন দেয়ালের গায়ে ছায়া দেখিয়ে ভয় দেখাত এও যেন তাই।

দিনের বেলা দাশা কয়েকবার কাতিয়ার ঘরের সামনে গিয়ে এক আঙুলে আস্তে আস্তে দোরে টোকা মেরেছে। কাতিয়া প্রতিবারই জবাব দিয়েছে ঃ

"দয়া করে আমাকে একটু একা থাকতে দিবি, দাশা ?"

এই সপ্তাহে নিকলাই ইভানোভিচের আদালতে একটা মামলা পড়েছে। ঘুম থেকে উঠেই তিনি বেরিয়ে যান, প্রাতরাশ ও মধ্যাহ্ন ভোজন একটা রেস্তোরাঁয় সারেন, এবং বেশ রাত্রি করে বাড়ি ফেরেন। আসামী পক্ষের উকীল তিনি, মক্কেল শুল্ক বিভাগের জনৈক কর্মচারীর স্ত্রী নাম জয়া ইভানোভনা লাদনিকাভা। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ একদিন রাত্রে নিজের বিছানায় সে তার প্রণয়ীকে খুন করেছে। নিহত যুবকটি একটি ছাত্র, সেন্ট পিতার্সবুর্গের একজন বাড়ীওলার ছেলে। নিকোলাই ইভানোভিচ আসামীর পক্ষে এমন সওয়াল করেন যা শুনে বিচারকমণ্ডলী ও সর্বসাধারণ একেবারে অভিভূত হয়ে যায়। স্ত্রীলোকেরা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে, জয়া ইভানোভনা কাঠগড়ার রেলিং-এ কপাল কুটতে থাকে —আসামী বেকসুর খালাস পেয়ে যায়।

বিষণ্ণ বদনে ও উদাস দৃষ্টিতে নিকলাই ইভানোভিচ যখন আদালত থেকে বেরিয়ে আসছেন, একদল মেয়ে গিয়ে তাঁকে ঘিরে দাঁড়ায়, পুষ্প বর্ষণ করে, মিহি সুরে কলকল করে ওঠে এবং তাঁর হস্ত চুম্বন করে। আদালত থেকে সোজা তিনি বাড়ী চলে আসেন এবং বেশ নরম সুরে কাতিয়াকে এসমস্ত কথা বলেন।

কাতিয়ার লটবহর বাঁধা হয়ে গেছে। নিকলাই ইভানোভিচ বেশ সরল

চিত্তেই কাতিয়াকে দক্ষিণ ফ্রান্সে যাবার পরামর্শ দেন এবং খরচ বাবদ বার হাজার রুবলও তাকে দেন। কাতিয়ার সঙ্গে আলাপ করতে করতে নিজের সম্বন্ধে তিনি বলেন যে, মামলাগুলির দায়িত্ব তাঁর সহকারীর হাতে দিয়ে তিনি ক্রিমিয়ায় ছুটি উপভোগ করতে যাবেন এবং সেখানে জীবন সম্পর্কে নতুন করে ভাববেন।

এই বিচ্ছেদ সাময়িক কি স্থায়ী, দুজনের কেউ তা জানে না। কে কাকে ছেড়ে যাচ্ছে তাও তারা বলতে পারে না। বিদায়ের ব্যস্ততার মধ্যে এই গুরুতর বিষয়গুলি চাপা পড়ে যায়।

দাশার কথা তারা দুজনেই একেবারে ভুলে যায়। একেবারে শেষ মুহূর্তে দাশার কথা কাতিয়ার মনে হয়। ভ্রমণের জন্য তৈরী ধূসর বর্ণের পোষাকটা পরে, অবগুণ্ঠনযুক্ত একটা সুন্দর টুপী মাথায় চড়িয়ে, বেশ ফিটফাট হয়ে বিষন্নবদনে কাতিয়া হলে ঢুকে দেখে, দাশা একটা ট্রাঙ্কের ওপর বসে আছে। সে পা নাচাচ্ছে এবং মোরব্বা দিয়ে রুটি খাচ্ছে। সেদিন যে কারো খাওয়া দাওয়া আছে, একথা তারা ভুলেই গেছে।

"দাশা বোনটি আমার," বলে কাতিয়া, অবগুণ্ঠনের মধ্য দিয়েই দাশাকে চুম্বন করে সে। "তুই কি করবি? আমার সঙ্গে যাবি?"

দাশা বলে, গ্র্যান্ড মোগলের সঙ্গে একাই সে এই ফ্ল্যাটে থাকবে এবং পরীক্ষা দেবে। তারপর মে মাসের শেষ ভাগে গরমের ছুটিতে সে তার বাবার কাছে চলে যাবে।

॥ নয় ॥

দাশা একাই বাড়িতে থেকে যায়। বড় বড় সব ঘর নিরানন্দময়, আসবাবপত্রগুলি বাহুল্য বলে মনে হয়। গৃহকর্ত্রী ও গৃহস্বামী চলে যাওয়ায় এমন কি ড্রইং রুমের কিউবিক পদ্ধতিতে আঁকা ছবিগুলিও যেন নিষ্প্রভ হয়ে গেছে, সেগুলিকে আর ততটা ভয়ংকর বলে মনে হয় না। পর্দাগুলি গুটানো রয়েছে, সেগুলি নিষ্প্রাণভাবে ঝুলছে। যদিও প্রতিদিন সকালবেলা গ্র্যান্ড মোগল চুপচাপ গম্ভীরভাবে এসে তার পালকের ঝাঁটা দিয়ে একবার করে ঘরগুলি ঝাঁট দিয়ে যায় তবু মনে হয় কোথা থেকে অদৃশ্য ধূলি এসে ক্রমশ সমস্ত জিনিসের ওপর যেন পুরু হয়ে জমে উঠছে।

কাতিয়ার ঘরে প্রবেশ করলেই তার জীবনচিত্র চোখের সামনে ভেসে ওঠে: মনে হয় যেন একটি বইএর পাতায় তার জীবন কাহিনী লেখা রয়েছে। এক কোণে একটা অসমাপ্ত চিত্র বক্ষে ধারণ করে একটি চিত্রফলক দাঁড়িয়ে আছে—একটি তরুণী, মাথায় সাদা ফুলের মালা, মুখের প্রায় অর্ধেক জুড়ে দুটো চোখ। কাতিয়া এই আশায় চিত্রফলকটাকে আঁকড়ে ধরেছিল যে, হয়ত তার জীবনের প্রচন্ড ঘূর্ণিবাত্যায় এটাকে অবলম্বন করে সে বাঁচতে পারবে,

কিন্তু এটাও তাকে রক্ষা করতে পারেনি। আরেক দিকে দেখা যাচ্ছে পুরনো ধরনের একটা টেবিলে, তার ওপর অসমাপ্ত সূঁচের কাজ করা নানাবিধ জিনিস এবং বিভিন্ন রংএর বস্ত্রখন্ড ইতস্তত বিন্যস্ত। এসমস্ত দিয়ে কাতিয়া চেয়েছিল তার মনকে ভুলিয়ে রাখতে, কিন্তু তাও সে পারেনি। বুককেসটার অবস্থাও শোচনীয়, বইগুলি রয়েছে বিশৃংখল অবস্থায়। এ সমস্ত দেখে বোঝা যায়, নিজের মনকে শান্ত করবার জন্য কাতিয়া এক একটা জিনিস আঁকড়ে ধরেছে এবং বিফল হয়ে আবার সেটাকে ছেড়ে দিয়েছে। বইগুলির প্রায় অর্ধেক পাতাই কাটা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে আছে অথবা যেখানে সেখানে গুঁজে রাখা হয়েছেঃ যোগ সম্বন্ধীয় বই, নৃতত্ত্ব সম্পর্কে বহুসমাদৃত পুস্তিকা, কবিতা, উপন্যাস... সমস্ত রকম বইই আছে।...সৎ জীবন যাপনের জন্য কত চেষ্টা, কত ব্যর্থ সংগ্রামের স্বাক্ষর বহন করছে এগুলি! ড্রেসিং টেবিলের ওপর রূপালী রংএর একটা রাইটিং-প্যাড দেখতে পায় দাশা। তাতে লেখা রয়েছেঃ ২৪টা শেমিজ, ৮টা বডিস, ৬টা লেসবসানো বডিস...কেরেনস্কির দলকে অর্থসাহায্য করার জন্য আংকল ভানিয়া'র টিকিট খরিদ।..."* অবশেষে ছেলেমানুষের মত বড় বড় হাতের অক্ষরে লেখাঃ "দাশার জন্য একটা আপেলের কচুরি।"

দাশার মনে পড়ে, সেই আপেলের কচুরি আর কেনা হয়নি। একথা ভাবতেই দিদির জন্য তার এত কষ্ট হয় যে, সে কেঁদে ফেলে। দরদী, স্নেহশীলা কাতিয়ার কাছে এ জীবন অসহ্য হয়ে উঠেছিল, কত কিছু দিয়ে সে নিজেকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করেছে, স্রোতের মুখে না ভেসে যেতে হয় সেজন্য কত তুচ্ছ জিনিসকেই না সে আঁকড়ে ধরেছে, ধ্বংসের হাত থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্য কত কিছুকেই সে অবলম্বন করবার প্রয়াস পেয়েছে, কিন্তু কোন বস্তু বা কোন মানুষই তার সাহায্যে আসেনি।

দাশার একটা অভ্যাস ছিল খুব সকালে ঘুম থেকে উঠেই বই নিয়ে বসা। তার ফলে এযাবৎ প্রায় সমস্ত পরীক্ষায়ই সে সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়ে এসেছে।... পড়ার ঘরে প্রায়ই টেলিফোন বেজে ওঠে। গ্র্যান্ড মোগলকে সে টেলিফোন ধরতে বলে। গ্রান্ড মোগল টেলিফোনে সবাইকে একই জবাব দেয়ঃ "কর্তা গিন্নী বাইরে গেছেন; মিস দাশা টেলিফোন ধরবার জন্য আসতে পারবেন না।"

সন্ধ্যা বেলাটা দাশা পিয়ানো বাজিয়েই কাটায়। সঙ্গীত আর তাকে সেই আগের মত উদ্বুদ্ধ করে না, তার প্রাণে আর কোন অব্যক্ত আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তোলে না বা তাকে কোন স্বপ্ন জগতেও নিয়ে যায় না। আগে সঙ্গীত তাকে সময় সময় এমন এক কল্পনা-জগতে নিয়ে যেত যখন মনে হত তার শ্বাস বুঝি শান্তভাবে পিয়ানোর সামনে বসে সে, মোমের আলোতে দেখা যায় স্বরলিপিটা,

* আংকল ভানিয়া—শেখভের একটি নাটক।

পিয়ানোর সুরে যখন ফাঁকা বাড়িটা গম গম করে ওঠে তখন ভাবে সে, এই পবিত্র শব্দেই হচ্ছে তার আত্মশুদ্ধি।

সংগীতের মাঝেও সময় সময় ছোট ছোট স্মৃতি এসে শত্রুরূপে তাকে বড় বিব্রত করে, রীড থেকে সে হাত তুলে তখন বিস্ফারিত নয়নে তাকায়। বাড়িটা সেসময় এমনই নিস্তব্ধ হয়ে যায় যে, মোম গলে ফোঁটা ফোঁটা করে পড়ার শব্দও তার কানে আসে, একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে আবার সে পিয়ানোর ঠাণ্ডা রীডগুলির ওপর হাত দেয়, স্মৃতিরূপী সেই শত্রুগুলি তখন ধূলিকণা বা শুষ্ক পত্র যেমন হাওয়ায় উড়ে যায় ঠিক সেভাবেই অদৃশ্য হয়, মনে হয় অন্ধকার গলিতে, থালাবাসন রাখার তাকের আড়ালে এবং পোষাক রাখার কাগজের বাক্সগুলির পেছনে গিয়ে বুঝি সেগুলি আশ্রয় নেয়। বেসনভের দোরে গিয়ে যে ঘণ্টা বাজিয়েছিল, অসহায়া কাতিয়াকে যে অত বড় কথা শুনিয়েছিল, সেই দাশা আর নেই। সেই আধপাগলা মেয়েটা যেন একেবারে মুষড়ে পড়েছে। এমন যদি কাবে, হয় যে মনে করেছিল জগতে প্রেমের আলোই একমাত্র আলো, অথচ সে দেখতে পেল আসলে এ জগতে যথার্থ প্রেম কোথাও নেই সেটা কি তার পক্ষে কম আশ্চর্যের কথা!

রাত এগারটায় দাশা যথারীতি পিয়ানো বন্ধ করে মোমের বাতি নিভিয়ে দেয়। তারপর সে গিয়ে শুয়ে পড়ে। কোনরূপ ইতস্তত না করেই বেশ চটপট সে এগুলি করে যায়। যত শিগগির সম্ভব সে স্বাধীনভাবে জীবনযাপন আরম্ভ করবে বলে সংকল্প করে। নিজের জীবিকা সে নিজেই অর্জন করবে এবং দিদিকে বলবে এসে তার সঙ্গে থাকতে।

পরীক্ষা দিয়েই মে মাসের শেষ ভাগে দাশা পিতর্সবার্গ ছেড়ে বাড়ী রওনা হয়। ভল্গার পথে বিবিনস্ক হয়ে যাবে বলে সে ঠিক করে। সন্ধ্যাবেলা ট্রেন থেকে নেমে একটা ধুলা স্টীমারে গিয়ে সে আরোহণ করে। বাইরে অন্ধকারে জলের ওপর পড়ে স্টীমারের আলোগুলি জ্বল জ্বল করছে।

পরিচ্ছন্ন কেবিনটায় সে তার জিনিসগুলি খোলে, চুলগুলি খোঁপা করে বাঁধে। সে ভাবে তার স্বাধীন জীবনটা বেশ আনন্দের মধ্যেই শুরু হল। ভাবতে ভাবতে একটা বাহুতে মাথা রেখে এঞ্জিনের তালে তালে সে ঘুমিয়ে পড়ে।

পায়ের দুপদাপ শব্দ এবং ডেকের ওপর লোকের এদিকে ওদিকে ছুটো-ছুটিতে সে জেগে যায়। খড়খড়ির ভেতর দিয়ে এসে সূর্যের আলো ভেতরে পড়েছে মেহগনি কাঠের ওয়াশস্ট্যান্ডের ওপর যেন রঙিন আলোর তরঙ্গ খেলে যাচ্ছে। হাওয়ায় জানালার রেশমী পর্দাটা ফুলে উঠছে, বাতাস নিয়ে আসছে বুকে মধু ভরা ফুলের গন্ধ। খড়খড়িগুলি একটু খুলে দেয় দাশা। শূন্য তীরের কাছে দাঁড়িয়ে আছে স্টীমারটা। কাঠের প্যাকিং-বাক্স বোঝাই কয়েকটা গরুর গাড়ী দেখা যাচ্ছে নদীতটে। সম্প্রতি ভাঙনের ফলে সেখানে পাড়টা

খাড়া উঠে গেছে; ভাঙগাচোরা মাটি আর দেখা যাচ্ছে গাছের শিকড়। পিঙগল বর্ণের একটা খচ্চরের বাচ্চা সরু পা দুটো ফাঁক করে দাঁড়িয়ে জল খাচ্ছে। উঁচু পাড়টার ওপর রয়েছে বড় রেড-ক্রসের আকারে একটা আলোর সংকেত।

দাশা তার শয়নস্থান থেকে লাফিয়ে ওঠে, স্নানের টবটা টেনে নেয়, গাত্র-মার্জনীটা জলে ভিজিয়ে নিয়ে সেটা দিয়ে গা'টাকে বেশ করে রগড়ায়। শীতে সে ঠকঠক করে কাঁপছে, কিন্তু মুখে তার হাসি; শুধু পা দুটোকে সে চেপে নেয়। তারপর আগের দিন যে পোশাকটা ছেড়ে রেখেছিল সেই পোশাকটা পরে—সাদা মোজা, সাদা জামা এবং সাদা টুপী। পোশাকটা তাকে মানিয়েছে খুব। একটা মুক্তির আস্বাদ পায় সে। কক্ষ থেকে বেরিয়ে সে ডেকের ওপর যায়, বাইরে ঠান্ডা কিন্তু ভেতরে অপার আনন্দের উষ্ণতা।

সাদা স্টীমারটার সর্বাঙ্গে যেন তরল রোদের তরঙ্গ খেলে যাচ্ছে। সূর্য-কিরণ পড়ে নদীর জল এমন চিকচিক করছে যে তার দিকে চাওয়া যায় না, চোখ ঝলসে যায়। নদীর অপর তীরে দেখা যাচ্ছে সাদা রং-এর একটা প্রাচীন গীর্জার ঘড়িঘর, অর্ধেক তার ভুর্জবৃক্ষে ঢাকা।

স্টীমার ছেড়ে দেয়, অর্ধবৃত্তাকারে ঘুরে সেটা ভাঁটির দিকে চলতে শুরু করে, মনে হয় নদীর দুই তীর বুঝি স্টীমারটার দিকে ধীরে ধীরে চলে আসছে। দূরে পাহাড়ের গা থেকে কালো খড়ের চালাগুলি উঁকি মারছে। আকাশে মেঘ রয়েছে, মেঘের গোড়ার দিকটা নীল, নীল জলে সাদা মেঘের প্রতিবিম্ব পড়েছে।

পায়ের ওপর পা রেখে দাশা একটা ডেক-চেয়ারে বসেছে; হাত দুটো রয়েছে জানুর ওপর। ঝলমলে নদীর বাঁক, মেঘ ও জলে তার সাদা প্রতিবিম্ব, ভুর্জ-বৃক্ষ শোভিত গিরিশ্রেণী, তৃণক্ষেত্র, জলার ঘাসের গন্ধযুক্ত দমকা হাওয়া, সদ্য চষা মাটির গন্ধ, ত্রিপত্রতৃণ ও সোমরাজবৃক্ষ সংবলিত ভূমি—এ সমস্ত যেন অতি দ্রুত একটার পর একটা এসে তার অনুভূতিকে নাড়া দিয়ে যাচ্ছে, আনন্দে তার হৃদয় ভরপুর।

একটি পুরুষ ধীরে তার দিকে এগিয়ে আসে, একটু দূরে রেলিং-এর ধারে সে দাঁড়ায়। মনে হচ্ছে যেন তার দিকে তাকাচ্ছে সে। কে লোকটা? যেন চিনি চিনি মনে হচ্ছে? নাঃ, মনে পড়ছে না তো! কিন্তু যতবার দাশা সেদিকে চায়, দেখে লোকটা ঠিক একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। সেদিকে আর মুখ ঘোরাবে না বলে দাশা মনে মনে সংকল্প করে, কিন্তু এসব ক্ষেত্রে একেবারে নিঃস্পৃহ হওয়া তার ধাত নয়—তার রাগ হয়, সে লাল হয়ে ওঠে। এ কি! একটা খুঁটি ধরে তার সামনে যে তেলেগিন দাঁড়িয়ে! লোকটা ঠিক করতে পারছে না যে এগিয়ে এসে তার সঙ্গে কথা বলবে, না চলে যাবে।

দাশা না হেসে পারে না—তাকে দেখে দাশার মনে একটা অনির্বচনীয় আনন্দই হয়েছে। নদীর এই প্রশান্ত পরিবেশে শুভ্র পোশাক পরিহিত বলিষ্ঠ,

প্রশস্তবক্ষ, নম্র ইভান ইলিয়িচকে পেয়ে তার ভালই হল। তেলেগিনের দিকে হাত বাড়িয়ে দেয় সে।

তেলেগিন বলে: "আমি আপনাকে স্টীমারে উঠতে দেখেছি। পিতার্সবুর্গ থেকে তো আমরা একই গাড়িতে এলাম। কিন্তু আমি ভাবছিলাম আপনার সঙ্গে আলাপ করা ঠিক হবে কিনা। আপনাকে বড় উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছিল।... বিরক্ত করলাম না তো?"

তার দিকে একটা ডেক-চেয়ার ঠেলে দিয়ে দাশা বলে: "বসুন। বাবার কাছে যাচ্ছি আমি। আপনি কোথায় যাবেন?"

"সত্যি কথা বলতে কি, কোথায় যে যাবো, এখনো ঠিক জানিনে। আপাতত কিনেশমায় আমার আত্মীয়স্বজনের কাছে গিয়ে উঠব।"

তেলেগিন চেয়ারে উপবেশন করে এবং মাথা থেকে টুপীটা নামায়। তার ভ্রূযুগল কুঞ্চিত এবং ললাটের রেখাগুলি সুস্পষ্ট। জল কেটে স্টীমারটা চলেছে পেছনে ফেনা তুলে, অর্ধনিমীলিত নয়নে, তেলেগিন তার দিকে চেয়ে থাকে। ওপরে সরু ডানা মেলে উড়ছে ঝাঁকে ঝাঁকে গাঙচিল, এক একবার সেগুলি ছোঁ মেরে জল পর্যন্ত নেমে আসে আবার কর্কশ কণ্ঠে ডাকতে ডাকতে ওপরে ওঠে, মনে হয় যেন আর্তনাদ করছে। তারপর দেখা যায় সেগুলি একটু পেছনে পড়ে গেছে; চক্রাকারে উড়ছে তারা আর ভাসমান একটা রুটির টুকরো নিয়ে ঝগড়া বাধিয়ে দিয়েছে।

"দিনটা বড় চমৎকার, দারিয়া দমিত্রেভ্না।"

"অপূর্ব দিন, ইভান ইলিয়িচ, সত্যি অপূর্ব দিন! এখানে বসে আমার মনে হচ্ছিল, আমি যেন নরক থেকে উদ্ধার পেয়েছি! রাস্তায় একদিন আমাদের যে আলাপ হয়েছিল, আপনার মনে আছে?"

"প্রত্যেকটি কথাই আমার মনে আছে, দারিয়া দমিত্রেভ্না।"

"তারপর ভয়ানক কান্ড ঘটে গেছে। আর এক সময় বলব আপনাকে।" বিমর্ষভাবে সে মাথাটা নাড়ে। "আমার মনে হয় পিতার্সবুর্গে একমাত্র আপনিই আছেন যাঁর মাথা খারাপ হয়নি।" হাসতে হাসতে সে তেলেগিনের আস্তিনটায় হাত দেয়। তেলেগিনের চোখের পাতা শঙ্কায় কেঁপে ওঠে, অধরোষ্ঠ সে চেপে রাখে। "আপনার ওপর আমার খুব বিশ্বাস আছে, ইভান ইলিয়িচ। আপনি বেশ শক্ত মানুষ, না?"

"আপনি আমাকে অত শক্ত মনে করছেন কেন?"

"নির্ভরযোগ্যও বটে।" দাশার ধারণা তার নিজের চিন্তা সৎ, সরল ও হৃদ্যতাপূর্ণ এবং ইভান ইলিয়িচও সেই প্রকৃতির লোক বলেই তার বিশ্বাস। এজন্যই সে তার সঙ্গে প্রাণ খুলে কথা বলে আনন্দ পাচ্ছে, তার অন্তরে যে আনন্দের তরঙ্গ খেলে যাচ্ছে, তার কাছে সে তা সোজাসুজি প্রকাশ করতে পারছে। "আমার মনে হয়, ইভান ইলিয়িচ, আপনি যদি কাউকে ভালবাসেন,

সাহস ও বিশ্বাস নিয়েই তাকে ভালবাসবেন এবং আপনার ঈপ্সিত বস্তুকে আপনি কখনো হাতছাড়া হতে দেবেন না।"

ইভান ইলিয়িচ একথার কোন জবাব দিল না ; শুধু পকেট থেকে একটুকরো রুটি বার ক'রে পাখীগুলির দিকে ছুড়ে মারল। রুটির টুকরোটা ধরবার জন্য সাদা গাঙচিলগুলি একসঙ্গে বিকটভাবে চীৎকার করে জলের দিকে ধাওয়া করল। দাশা ও ইভান ইলিয়িচ চেয়ার ছেড়ে উঠে রেলিং-এর ধারে গিয়ে দাঁড়াল।

দাশা বলেঃ "ওটাকে একটুকো দিন। দেখছেন, ওটা কিরকম ক্ষুধার্ত।"

তেলেগিন রুটির বাকী অংশটা আকাশে ছুড়ে মারে। বড় মাথার হৃষ্ট-পুষ্ট একটা গাঙচিল ডানা দুটো স্থির করে ছুরির মত নেমে আসে তীরবেগে নীচের দিকে রুটির টুকরোটা ধরবার জন্য, কিন্তু ব্যর্থ হয় সে। সঙ্গে সঙ্গে দশবারটা পাখী ছুটে আসে সেটা ধরবার আশায়। স্টীমারের নীচ থেকে ফুটন্ত জলের মত অসংখ্য বুদ্বুদ বেরিয়ে এসে পাশে জলের ওপর যে ফেনারাশি সৃষ্টি করেছে, রুটির টুকরোটা বুঝি গিয়ে তারই ওপর পড়ে।

দাশা বলেঃ "জানেন, আমার মনের বাসনা কি ? আগামী সালে আমি গ্র্যাজুয়েট হয়ে প্রচুর অর্থ উপার্জন করতে থাকব এবং দিদিকে আমার কাছে নিয়ে আসব। আপনি দেখবেনই, ইভান ইলিয়িচ।"

দাশার কথা শুনে তেলেগিন একবার তার দিকে কটাক্ষ করে, আবার সঙ্গে সঙ্গেই নিজেকে সামলে নেয়। তারপর দাঁত বার করে সে এমন হাসিই হাসে যে চোখ দিয়ে তার জল বেরিয়ে আসে। দাশা লজ্জা পায়, কিন্তু গাল দুটোয় তার টোপ পড়ে, তারপর অকারণেই সেও তেলেগিনের মতই হো হো করে হেসে ওঠে।

হাসির ফোয়ারাটা একটু কমে এলে তেলেগিন বলেঃ "খাসা লোক আপনি, দারিয়া দ্মিত্রেভ্না। আমি আপনাকে বড্ড ভয় করতাম।..কিন্তু এখন দেখছি আপনি সত্যি খাসা লোক!"

"আসুন, প্রাতরাশটা সারা যাক," বলে দাশা।

"তাতে আর আপত্তি কি।"

ডেকের ওপর একটা টেবিল এনে দেবার জন্য ইভান ইলিযিচ হুকুম করে। তারপর পরিষ্কার কামানো থুত্নিটা চুলকাতে চুলকাতে ভোজ্যবস্তুর তালিকাটা ভাল করে দেখে সে।

"এক বোতল হাল্কা সাদা মদ হলে কেমন হয়, দারিয়া দ্মিত্রেভ্না ?"

"অল্প একটু হলে মন্দ হয় না।"

"সাদা না লাল ?"

দাশাও তেমনি বিশেষণহীন ভাবেই বলেঃ "যা হয় একটা হলেই হল।"

"তাহলে একটু ফেনিল পানীয়ই গ্রহণ করা যাক!"

স্টীমারে বসে দেখা যাচ্ছে তীরের গম, যব, জোয়ার ইত্যাদির ক্ষেত। হরিত ও শ্যামল শীষগুলি এক অপূর্ব শোভা ধারণ করেছে সেখানে। নদীর বাঁকটার কাছে আসতেই নজরে পড়ে উঁচু তীরের ওপর নীচু খড়ের চালাঘর, মাটির দেয়ালের গোড়ায় রয়েছে গোবরের ছোট ছোট স্তূপ; জানালাগুলি রোদে ঝলমল করছে। আর একটু গেলে দেখা যায় একটা গ্রাম্য সমাধিস্থলে দশবারটা ক্রুশ, আর খেলনার মত রয়েছে একটা হাওয়া-কল, হাওয়া আটকাবার জন্য ছটা পাল, কলটার এক দিক ভাঙ্গা। একদল বালক তীরের ওপর দিয়ে ছুটে চলেছে স্টীমারটার সঙ্গে সঙ্গে; তারা ঢিল ছোড়ে, কিন্তু সেগুলি জল পর্যন্তও এসে পৌঁছায় না। স্টীমারটা বাঁক ঘুরে আরো এগিয়ে যায়। এবার নদী-তীরে কতগুলি ঝোপঝাড় ছাড়া আর কিছু নজরে পড়ে না। কেবল দেখা যায় আকাশে গোটা কয়েক চিল উড়ছে।

মনে হচ্ছে হাওয়া টেবিল-ক্লথটাকে উড়িয়ে নিয়ে যাবে। দাশার স্কার্টটাও হাওয়ায় খানিকটা ফুলে ওঠে। কাচপাত্রে সোনালি সুরা, মনে হয় দেবতাদের আশীর্বাদ। ইভান ইলিয়িচকে দাশা বলে যে, তাকে দেখে তার ঈর্ষা হয় —তার রোজগারের একটা পথ আছে, অনেকখানি নিশ্চিন্ত, কিন্তু দাশাকে আরো দেড় বছর বই নিয়ে পড়ে থাকতে হবে—তাও ত আবার দুর্ভাগ্যক্রমে নারী হয়ে সে জন্মেছে।

তেলেগিন হাসতে হাসতে জবাব দেয়ঃ "কিন্তু আমি ত চাকরি থেকে বরখাস্ত হয়েছি।"

"কি? সত্যি!"

"এবং কোন নোটিশ না দিয়েই আমাকে বরখাস্ত করা হয়েছে। মাত্র চব্বিশ ঘণ্টা সময় দেওয়া হয়েছিল আমাকে। না হ'লে কি ভল্গার এই স্টীমারে এসে আমি উঠি? আমাদের কারখানায় কি চলেছে আপনি কিছু শোনেননি?"

"না, আমি তো কিছুই শুনিনি।"

"অবশ্য আমি সহজেই চলে এসেছি। ও, হ্যাঁ..." একটু থেমে একটা কনুই টেবিলের ওপর রাখে সে। "আপনি বোধ হয় কল্পনাও করতে পারবেন না যে, প্রত্যেকটি কাজে কত নির্বুদ্ধিতা ও অযোগ্যতার পরিচয় দিই আমরা। আমাদের মানে রুশ জাতির যে কতখানি সুনাম আছে একমাত্র ভগবানই তা বলতে পারেন। এসমস্ত দেখে আমার রাগও হয়, আবার লজ্জাও করে। মনে করুন তো—একটা প্রতিভাশালী জাতি, প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদ, কিন্তু আমরা কি করছি? একদল বাকসর্বস্ব কেরাণী ছাড়া আর কি? জীবনকে বাদ দিয়ে সার করেছি কালি আর কাগজ। আপনি ধারণাই করতে পারবেন না যে, আমরা কত কাগজ কালির অপচয় করছি। পিটার দি গ্রেটের সময় আমাদের এই আমলাতান্ত্রিকতা আরম্ভ হয় এবং সেই থেকে একইভাবে এটা চলে

আসছে। আপনি জানেন, কালি সময় সময় কতটা মারাত্মক হয়ে উঠতে পারে!"

মদের গ্লাসটা এক পাশে সরিয়ে রেখে তেলেগিন একটা সিগারেট ধরায়। পরিষ্কার বোঝা গেল, কাহিনীর বাকী অংশটা বলতে সে প্রস্তুত নয়।

দাশা ও তেলেগিন সারা দিনটাই ডেকের ওপর কাটায়। বাইরের কেউ দেখলে মনে করবে তারা দুজনে বাজে গল্প করছে কিন্তু আসলে তারা আড়েঠারে সমস্ত কথাই বলছে। সাধারণ কথাও এমনভাবে ঘুরিয়ে বলা হচ্ছিল যার দুরকম অর্থই হতে পারে। একটি স্থূলাঙ্গী তরুণীর দিকে দৃষ্টি পড়ে দাশার, তার কাঁধের ওপর লাল রঙের স্কার্ফটা হাওয়ায় উড়ছে, তারপরই দুনম্বর মেটকে তার পাশে বিমুগ্ধভাবে পায়চারি করতে দেখা যায়। তাদের দেখে দাশা বলেঃ "দেখুন, ইভান ইলিয়িচ, মনে হয় এদের মধ্যে মিলটা অতি সহজভাবেই হয়ে গেছে"—অর্থাৎ সে বলতে চায়ঃ "আমাদের দুজনের মধ্যে যদি কিছু হয়, তবে ব্যাপারটা গিয়ে দাঁড়াবে অন্য রকম।" উভয়ের মধ্যে কে কাকে কি বলেছে কারোই ঠিক মনে নেই; কিন্তু আলাপ করে তেলেগিনের ধারণা হয়েছে যে, দাশা তার চেয়ে অনেক বেশি চালাক, চাপা, এবং তার দৃষ্টিও সূক্ষ্ম; আবার দাশারও মনে হয়েছে তার চেয়ে ইভান ইলিয়িচ সহস্র গুণ বেশি দরদী, মানুষ হিসেবে অনেক বেশি উন্নত আর বুদ্ধির দিক দিয়ে তার ধারে-কাছেও সে যেতে পারে না।

কয়েকবারই মনে হয়েছে দাশার বেসনভের কথাটা সে তেলেগিনকে বলেই ফেলে, কিন্তু আবার ভেবেছে থাক, না বলাই ভাল। তার হাঁটুর ওপর এসে একঝলক উষ্ণ রোদ পড়েছে। অঙ্গের অনাবৃত অংশে বাতাস লেগে তার মনে হচ্ছে বুঝি কারো কোমল হস্তের অঙ্গুলিস্পর্শ। দাশা আপন মনে ভাবেঃ "না, আগামীকাল তাঁকে বলব। যখন বৃষ্টি নামবে—তখন বলব আমি তাঁকে।"

দাশার সমস্ত জিনিস খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখার অভ্যাস। তাছাড়া নারী-সুলভ ঔৎসুক্য তার খুব বেশি। দিনের শেষে যখন দেখা গেল স্টীমারের যাত্রীদের কথা দাশা প্রায় সমস্তই জেনে ফেলেছে তখন তেলেগিন একেবারে বিস্মিত হয়ে গেল।

কোনো একটা কারণে দাশার দৃঢ়বিশ্বাস হয়েছে যে, রঙিন চশমা ও ঢিলে কোর্তা-পরা বিরসবদন লোকটা অর্থাৎ পিতার্সবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডীন, একজন পাকা তাসের জুয়াড়ী। ইভান ইলিয়িচও জানে যে, ইনি সত্যি বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ডীন, কিন্তু তারও যেন সন্দেহ হয়েছে যে, হয়ত লোকটা তাসের জুয়া খেলে। বাস্তব সম্পর্কে সত্যি সেদিন তার চোখ খানিকটা খুলে যায়। মাথাটা যেন একটু অস্থির হয়েছে তার, যেন দিবাস্বপ্ন দেখছে সে। চারপাশে সে যা কিছু দেখছে সবই যেন ভাল লাগছে তার। মনে মনে ভাবছে সে, ঐ ছোট করে চুল ছাঁটা মেয়েটা যদি এই মুহূর্তে জলে পড়ে যায় তবে তাকে

উদ্ধার করার জন্য জলে ঝাঁপিয়ে পড়তে কি অসীম আনন্দ হবে তার—এমন চিন্তাও তার মাথায় আসে, পড়ুক না মেয়েটা জলে!

রাত্রি প্রায় একটার সময় দাশার এমন ঘুম পায় যে কোনরকম সে টলতে টলতে গিয়ে তার কেবিনের দরজার সামনে উপস্থিত হয়। হাই তুলতে তুলতে সে তেলেগিনকে বলে:

"আচ্ছা আসি। ভাল কথা, জুয়াড়ীটা সম্পর্কে সাবধান।"

ইভান ইলিয়িচ সোজা প্রথম শ্রেণীর ডেক-কেবিনে চলে যায়। সেখানে গিয়ে দেখে ডীন ডুমার গ্রন্থাবলী পড়ছেন। ডীনের অনিদ্রা রোগ আছে। ইভান ইলিয়িচ খানিকক্ষণ তার দিকে চেয়ে থাকে, তার মনে হয় জুয়াড়ী হলেও লোকটা ভাল। তারপর করিডরে সে ফিরে আসে, করিডরটায় প্রচুর আলো; সেখানে মেশিনের তেল ও বার্নিশের গন্ধ এবং দাশার অঙ্গসুবাস সমস্তই এক সঙ্গে মিশে গেছে। দাশার কেবিনের পাশ দিয়ে পা টিপে টিপে সে নিজের কেবিনে চলে যায়, চিৎ হয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ে, চোখ বোজে, মনে হয় তার অন্তর্লোকে যেন এক আনন্দের হিল্লোল খেলে যাচ্ছে, শব্দ, গন্ধ, সূর্যকিরণের উষ্ণতা সব কিছু যেন একসঙ্গে সে অনুভব করছে—আনন্দের আতিশয্যে সে যেন হৃদয়ে একটা বেদনা অনুভব করছে।

সকাল সাতটায় স্টীমারের বাঁশীর আওয়াজে তার ঘুম ভেঙে যায়। স্টীমারটা কিনেশমায় এসে গেছে। তেলেগিন তাড়াতাড়ি বেশভূষা করে করিডরটার দিকে তাকায়। সবগুলি দোরই বন্ধ: সকলেই ঘুমোচ্ছে। দাশাও ঘুম থেকে ওঠেনি। "আমাকে এখানেই নামতে হবে, না হলে ব্যাপারটা বিশ্রী হয়ে দাঁড়াবে," এই ভেবে সে ডেকের ওপর যায়। কিনেশমা তার দৃষ্টিপথে আসে, দূরে উচ্চ তীরের ওপর দেখা যাচ্ছে কাঠের ঘরগুলি, কাঠের সিঁড়িগুলি ওপর দিকে উঠে গেছে, মিউনিসিপ্যাল পার্কে লেবুগাছের শীর্ণ সবুজ পাতাগুলি ভোরের আলোতে জ্বলজ্বল করছে, শহরের চড়াই উতরাই ভেঙে গরুর গাড়ীগুলি চলেছে চারদিক ধুলোয় অন্ধকার করে। স্টীমারের একজন খালাসী তেলেগিনের ফিকে বাদামী রং-এর সুটকেশটা নিয়ে খালি পায়ে ডেকের ওপর দিয়ে দৃঢ়পদে হেঁটে এসে তার সামনে দাঁড়ায়।

"না না, আমি এখানে নামব না।" একটু উত্তেজিত হয়ে বলে তেলেগিন। "আমি নিজ্‌নিতে গিয়ে নামব, বুঝলে? কিনেশমায় আমার বিশেষ কোন কাজ নেই। এখানে, এই বাংকের তলায় এটা রেখে দাও। তোমাকে ধন্যবাদ।"

তেলেগিন তার কেবিনে বসে তিনঘণ্টা ভাবে, তার এরকম অভদ্রভাবে থেকে যাওয়ার কি কৈফিয়ৎ দেবে সে দাশাকে? কাজটা মোটেই ভাল হল না। না, কোন কৈফিয়ৎই দেওয়া চলবে না: তার কাছে সে মিথ্যে কথাও বলতে পারবে না, আবার সত্য কথা বলাও সম্ভব নয়।

নিজের প্রতি তার কিরকম একটা ধিক্কার এসে গেছে। বেলা এগারটার

সময় অত্যন্ত মনস্তাপ নিয়ে পেছনে দু'হাত রেখে অদ্ভুত ভঙ্গীতে সে গিয়ে ডেকের ওপর দাঁড়ায়, তার চোখমুখে একটা অস্বাভাবিক ভাব। মনে ভাবে সে, বড় কুরুচির পরিচয়ই দেওয়া হল। সারা ডেকটা একবার ঘুরে আসে সে, কিন্তু দাশা কোথাও নেই। ভাবনা হয় তার, সর্বত্র তন্ন তন্ন করে খুঁজতে থাকে। কিন্তু দাশা কৈ? তাকে যে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না কোথাও! উৎকণ্ঠায় তার জিভ শুকিয়ে আসে। তা হলে কিছু ঘটে থাকবে।

হঠাৎ দেখা হয়ে যায় দাশার সঙ্গে। গত রাত্রে যেখানে বসে তারা দু'জনে গল্পসল্প করেছিল সেখানেই একটি ডেক-চেয়ারে বসে আছে দাশা। তাকে শান্ত ও বিমর্ষ দেখাচ্ছে; তার কোলের ওপর দেখা যাচ্ছে একখানি বই ও একটা ন্যাসপাতি ফল। ইভান ইলিচের দিকে ধীরে ধীরে মাথাটা ঘুরিয়ে চোখ দু'টো বড় বড় করে এমনভাবে সে তাকায় তার দিকে যেন তাকে দেখে সে ভড়কে গেছে, কিন্তু একটা আনন্দের দীপ্তিও আছে সে দৃষ্টিতে; তার গণ্ডদেশ রক্তিম হয়ে ওঠে, ন্যাসপাতিটা কোল থেকে গড়িয়ে পড়ে যায়।

"আপনি এখানে? কিনেশমাতে আপনি নামেননি?" শান্তভাবে বলে দাশা।

তেলেগিন তার মনের আবেগ চেপে যায়, দাশার পাশেই একটা চেয়ারে বসে এবং মূঢ়ের ন্যায় বলেঃ

"জানিনে আমার সম্বন্ধে আপনি কি ভাববেন, কিন্তু কিনেশমায় আমি নামতে পারলাম না।"

"আপনার সম্বন্ধে কি ভাবব আমি? না, কিছুতেই তা আমি আপনাকে বলব না!" এই বলে দাশা এমন অপ্রত্যাশিতভাবে হেসে ওঠে যে, তেলেগিনের মাথা ঘুরে যায়। হাসতে হাসতে দাশা নির্বিকারভাবে তার হাতটা তেলেগিনের হাতের ওপর তুলে দেয়—বড় মমতামাখানো হাত।

দাশার হাসির রোল সারাদিনেও তেলেগিনের মাথা থেকে নামল না—অনুভূতির তীব্রতা আগের দিনের চাইতেও বেশি।

॥ দশ ॥

তেলেগিনের এঞ্জিনিয়ারিং কারখানায় যা ঘটেছিল তা হচ্ছে এইঃ একদিন সন্ধ্যাবেলা বৃষ্টি নেমেছে, ঝড়ো মেঘ সারা আকাশটাকে তোলপাড় করে তুলেছে, একটা শিফ্‌ট্‌ শেষ হওয়ায় শ্রমিকেরা কারখানা থেকে বেরিয়ে বাড়ি রওনা হয়েছে, সেই ভীড়ের মধ্যে বর্ষাতি গায়ে একটা অপরিচিত লোক এসে প্রবেশ করে, মাথার ঢাকনাটা নীচের দিকে ফেলা। একটা সরু রাস্তা ধরে চলেছে শ্রমিকেরা। কয়লার ছাই ও লোহার আবর্জনা দিয়ে তৈরী হয়েছে রাস্তাটা, যেকোন বড় কারখানার ধারে গেলেই এই ধরনের রাস্তা নজরে পড়ে। দু'পাশের নর্দমা থেকে পচা গন্ধ বেরুচ্ছে ভরভর করে।

অপরিচিত লোকটা শ্রমিকদের সঙ্গে হে'টে খানিকটা এগিয়ে যায়। তারপর এক জায়গায় গিয়ে দাঁড়িয়ে দু'হাতে অনবরত ইস্তাহার ছড়াতে থাকে, অনুচ্চ-কণ্ঠে বলে সে ঃ

"কেন্দ্রীয় সমিতির ইস্তাহার। পড়ুন কমরেডগণ।"

শ্রমিকগণ হাঁটতে হাঁটতেই ইস্তাহারগুলি নিয়ে নেয়; কেউ তা পকেটে কেউ বা টুপীর নীচে রাখে।

বর্ষাতি-পরা লোকটা তার ইস্তাহার বিলির কাজ প্রায় শেষ করে এনেছে। ঠিক এই সময় কারখানার একজন পাহারাওয়ালা ধাক্কাধাক্কি করে ভীড়ের মধ্যে ঢোকে এবং পেছন দিক থেকে লোকটার বর্ষাতিটা ধরে বলেঃ "এই, দাঁড়াও এখানে।" বৃষ্টিতে ভিজে বর্ষাতিটা পিছল হয়ে গিয়েছিল; তাই পাহারাওয়ালার মুঠো থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে তার একটুও কষ্ট হ'ল না। খসে পড়েই সে চম্পট দেয়। বাঁশীটা জোরে বেজে ওঠে, দূর থেকে আর একটা বাঁশী বেজে তাতে সাড়া দেয়। ক্রমঅপসৃয়মান ভীড়ের মধ্যে একটা মৃদু গুঞ্জন ওঠে। কিন্তু কাজ যা হবার হয়ে গেছে, বর্ষাতি-পরা লোকটা সরে পড়েছে।

দু'দিন যেতে না যেতেই কারখানার যন্ত্রনির্মাণ বিভাগের সমস্ত শ্রমিক ধর্মঘট করে বসে। কারখানার কর্তৃপক্ষ একেবারে বিস্মিত হয়ে যান।। শ্রমিকেরা দাবীদাওয়া উপস্থিত করেছে, অসম্ভব দাবী অবশ্য কিছু করেনি, কিন্তু দাবীগুলি অত্যন্ত সুস্পষ্ট। ধূলিমলিন জানালার শার্সি এবং ধোঁয়ায় কালো ছাদের কাচ দিয়ে সামান্য আলোই আসে কারখানাব অভ্যন্তরে। কারখানার লম্বা চালাটার নীচে এখানে সেখানে ফিসফাস, জল্পনাকল্পনা, কথা-কাটাকাটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মত ছড়িয়ে পড়েছে। সকলেই ভাবছে, কি হয় কি হয়।

সিনিয়র ফোরম্যান পাভলক একজন গুপ্তচর, কর্তৃপক্ষের কানে সে সব কথা তোলে। হাইড্রলিক প্রেসের সামনে দাঁড়িয়ে সে কি কাজ করতে যাচ্ছিল, হঠাৎ একটা জ্বলন্ত লাল লৌহপিণ্ড তার পায়ের ওপর পড়ে। ভীষণভাবে আর্তনাদ করে ওঠে সে। তার চীৎকার শুনে সারা কারখানাময় গুজব রটে যায়, একজন লোক মারা গেছে। বেলা ন'টায় দেখা যায়, চীফ এঞ্জিনিয়াবের সুরক্ষিত বিরাট মোটর গাড়ীটা ঝড়ের মত কারখানার মধ্যে এসে প্রবেশ করে।

ইভান ইলিয়িচ তেলেগিন যথাসময়ে কারখানায় উপস্থিত হয়। ঢালাই কারখানার বিরাট বাড়ীটা বৃত্তাকারে ঘুরে গেছে, এখানে সেখানে জানালাগুলি ভাঙ্গা, ক্রেনের তারগুলি ঝুলে রয়েছে, দেয়াল ঘে'ষে রয়েছে সব ফারনেস, মেঝেটা মাটির। ভোরবেলার শীতে তেলেগিন কাঁপছে, দরজার কাছে যেতেই ফোরম্যান পুংকো তার দিকে এগিয়ে আসে। তেলেগিন হাসিমুখে তার সঙ্গে করমর্দন করে।

এঞ্জিনের মাউন্টিং তৈরীর একটা জরুরী অর্ডার পেয়েছে এই কারখানা।

পুংকোর সঙ্গে তা নিয়ে তেলেগিন বিশদভাবে আলোচনা করে। যে যে বিষয় তারা খুব ভালভাবে জানে কেবল সেগুলিই তাদের মধ্যে পুঙ্খানুপুঙ্খ-রূপে আলোচিত হয়। পনের বছর আগে পুংকো একজন সাধারণ শ্রমিক হয়ে এই কারখানায় ঢুকেছিল, এখন সে সিনিয়র ফোরম্যানের পদে উন্নীত হয়েছে। নিজের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সম্পর্কে তার উঁচু ধারণা। তেলেগিন একটা চাল হিসেবে তার সঙ্গে এই যে আলোচনাটুকু করে তাতেই সে খুব খুশি। তেলেগিনও জানে যে, পুংকো যখন খুশি হয়েছে তখন কাজটা বেশ তাড়াতাড়িই হয়ে যাবে।

কারখানা ঘুরে তেলেগিন ঢালাই মিস্ত্রী ও মোল্ডারদের মিষ্টকথায় তুষ্ট করে। সবাইকে সে বন্ধুত্বপূর্ণভাবে বলেঃ আমরা সবাই ত একই কাজ করি, আমরা সহকর্মী, তবে আমি স্টাফ এঞ্জিনিয়ার আর আপনারা শ্রমিক, আসলে সম্পর্কটা আদাকাঁচকলা। তবু অমরা পরস্পর পরস্পরকে ভালবাসি, শ্রদ্ধা করি। আর একটা কাজ আমরা অনায়াসেই করতে পারি—একত্রে বসে হাসি-তামাসা করতে আমাদের আটকায় না।

একটা চলমান ক্রেন একটা ফারনেসের কাছে এসে ইস্পাতের রশিগুলি নামিয়ে দেয়। দু'জন শ্রমিক ফিলিপ শুবিন ও ইভান ওরেশনিকফ সঙ্গে সঙ্গে কাজে লেগে যায়। দু'জনেই লম্বা ও বলিষ্ঠ; একজনের রং ময়লা, চুল ধূসরবর্ণ, চোখে গোল রঙিন চশমা। অপর জন অত্যন্ত পরিশ্রমী, কোঁকড়ানো দাড়ি, নীল চোখ, তার পরিষ্কার চুলগুলি একটা চামড়ার ফিতে দিয়ে বাঁধা। শেষোক্ত লোকটি তেলেগিনের খুব সুনজরে আছে।

শুবিন সাবল দিয়ে ফারনেসের মুখটা খুলে ফেলে আর ওরেশনিকফ আঁড়াশি দিয়ে ক্রেনের রশির সঙ্গে গলিত ধাতুপূর্ণ মৃৎপাত্রটা আটকে দেয়। ক্রেনের রশি কড়কড় করে ওঠে, পাত্রটা ফারনেস থেকে বেরিয়ে আসে, তারপর ফুটন্ত ধাতুপূর্ণ পাত্রটা ধাতব আভা বিস্তার করে শূন্যপথে কারখানার মাঝা-মাঝি চলে যায়।

"থাম!" চীৎকার করে বলে ওরেশনিকফ। "নামাও।"

আবার তারের রশিটা কড়কড় করে ওঠে; পাত্রটা নেমে এসে কাত হয়ে গলিত ব্রঞ্জের ধারা ঢালতে থাকে, ধারার পতনস্থল থেকে সবুজ রং-এর তারার মত অসংখ্য স্ফুলিঙ্গ ঊর্ধ্বদিকে উত্থিত হচ্ছে আর খিলান ছাদটায় গিয়ে পড়েছে ময়লা রং-এর উজ্জ্বল প্রভা। তরল ব্রঞ্জের ধারা পড়ছে এসে মাটিতে। তামা পোড়ার গন্ধটা মন্দ লাগছে না।

এমন সময় কারখানার অন্য বিভাগে যাবার ভেজানো দোরটা হঠাৎ খুলে যায়। অল্পবয়সী একটি শ্রমিক দ্রুত ও দৃঢ়পদে ঢালাই বিভাগে এসে প্রবেশ করে। রাগে যেন ফেটে পড়ছে সে।

"কাজ বন্ধ কর! চলে যাও!" কঠোরকণ্ঠে সে চীৎকার করে ওঠে।

তেলেগিনের দিকে একবার আড়নয়নে চেয়েই আবার সে বলে ওঠেঃ "শুনছ? না, শুনতে পাচ্ছ না তোমরা?"

"হ্যাঁ, শুনেছি, চীৎকার ক'র না," ক্রেনের দিকে মুখ তুলে শান্তভাবে উত্তর দেয় ওরেশনিকফ। "দিমিত্রি, ঘুমিয়ে প'ড় না!"

"বেশ, তোমরা যদি শুনেই থাক দ্বিতীয়বার আর তোমাদের বলব না," বলে শ্রমিকটি। সে তার পকেটে হাত ঢুকিয়ে দেয় এবং দ্রুতপদে চলে যায়। তেলেগিন নতুন ঢালাইর কাছে উপুড় হয়ে বসে একটা তার দিয়ে মাটিটা ছাড়িয়ে দিতে থাকে। দোরের কাছে টেবিলটার পাশে একটা টুলের ওপর বসে পুংকো মাথা চুলকাচ্ছে আর ভয়ে ভয়ে এদিকে ওদিকে তাকাচ্ছেঃ

"তুমি চাও না চাও, কাজ তোমাকে বন্ধ করতেই হবে! কিন্তু তোমাকে যদি কারখানা থেকে ছাঁটাই করে, ছেলেপিলে নিয়ে বাঁচবে কি করে? আশ্চর্য! এসব মাথাগরম ছেলেরা যদি তা একবারও ভাবে!"

"এ সমস্যার মধ্যে না যাওয়াই ভাল, ভাসিলি স্তেপানোভিচ," ভারী গলায় উত্তর দেয় ওরেশনিকফ।

"কেন ভাল?"

"ভাল বলেই ভাল। খোলাখুলি আলোচনার জন্য ম্যানেজারের কাছে না গেলেও চলবে। একটু চুপ করে থাক তো!"

অবশেষে তেলেগিন জিজ্ঞেস করেঃ "কিজন্য ধর্মঘট? কি কি দাবী জানান হয়েছে?"

ওরেশনিকফের দিকে চায় সে, কিন্তু কোন জবাব না দিয়েই সে মুখ ঘুরিয়ে নেয়।

জবাব দেয় পুংকোঃ "যন্ত্রনির্মাণ ঘরের লোকেরা কাজ বন্ধ করেছে। গত সপ্তাহে টুকরো কাজে পরীক্ষামূলকভাবে ৬০টা মেশিন লাগানো হয়। ফলে শ্রমিকদের রোজগার কমে যায় এবং ওভারটাইম খাটতে হয়। ৬নং বাড়ির দরজায় এখন তারা দাবীসমূহের এক তালিকা টাঙিয়ে দিয়েছে—সমস্ত রকম দাবীই আছে, তবে খুব বড় রকমের দাবী কিছু নয়।"

তেলেগিন ক্রুদ্ধ হয়ে কলমটা দোয়াতে একবার চুবিয়ে দেয় এবং তারপর রিপোর্ট করার জন্য অনেকের নাম লিখতে থাকে। একটু বাদেই সে পেছনে হাত রেখে ফারনেসগুলির ধার দিয়ে পদচারণা করে এবং ছিদ্রপথে উঁকি মেরে দেখে চোখ-ঝলসান সাদা অগ্নিশিখায় ফুটন্ত ব্রঞ্জ কিভাবে সর্পিল আকারে নাচছে। সে বলেঃ

"ওরেশনিকফ, ফারনেসে এই পদার্থটা অনেকক্ষণ রয়েছে না?"

ওরেশনিকফ কোন উত্তর না দিয়ে চামড়ার অ্যাপ্রনটা গা থেকে খুলে ফেলে এবং একটা পেরেকে সেটা ঝুলিয়ে রাখে। তারপর ভেড়ার চামড়ার টুপীটা সে মাথায় দেয় এবং মোটা লম্বা কোটটা পরে। বেশ গম্ভীর গলায় বলে সেঃ

"কাজ বন্ধ কর, কমরেডগণ! মাঝখানের প্রবেশপথে ৬নং বাড়ীতে ও।"

তার গলার আওয়াজটা যেন সারা কারখানায় প্রতিধ্বনিত হয়। বলেই া বেরুবার দরজায় যায়। একটি কথাও না বলে শ্রমিকগণ যে যার কাজ বন্ধ রে। কেউ কেউ ক্রেন থেকে নেমে আসে, কেউ বা খাদ থেকে হামাগুড়ি দিয়ে ঠে আসে; সমগ্র জনতা ওরেশনিকফের পশ্চাদনুসরণ করে। দোরের কাছে ঠাৎ একটা কি ঘটে যায়, রাগে একজন চীৎকার করে বলে ওঠেঃ

"তুমি লিখছ? কুত্তার বাচ্চা, লিখছ তুমি? বেশ, আমার নাম লেখ..., ানেজারের কাছে আমার নামে রিপোর্ট কর!"

চীৎকার করছিল একজন মোল্ডার, নাম তার আলেক্সি নোসভ। পুংকোকে ুখে সে চেঁচামেচি করছিল। এবড়োখেবড়ো মুখ, খোঁচাখোঁচা দাড়ি, নিষ্প্রভ ৃষ্টি, রেগে আগুন, গলার শিরা ফুলে উঠেছে। টেবিলে ঘুষি মেরে সে বিকট াওয়াজ করে বলতে থাকেঃ "রক্তশোষকের দল!.....অত্যাচারীরা সব! তামাদের জন্যও আমরা অস্ত্র শানাচ্ছি!"

ওরেশনিকভ পেছন হতে নোসভকে ধরে অনায়াসেই টেবিলের পাশ থেকে ানে নিয়ে যায় এবং দোরের দিকে ঠেলে দেয়। নোসভ তৎক্ষণাৎ চুপ করে ায়। ঢালাইর কারখানা জনমানবশূন্য হয়ে পড়ে।

দুপুরের দিকে সারা কারখানার লোক ধর্মঘট করে। ওবুখফ এবং যান্ত্রিক এঞ্জিনিয়ারিং কারখানায়ও বিক্ষোভের কথা শুনতে পাওয়া যায়। ারখানার এলাকার মধ্যেই দলে দলে শ্রমিক দাঁড়িয়ে ম্যানেজার ও ধর্মঘট মিটির আলোচনার ফলাফল জানবার জন্য অপেক্ষা করতে থাকে।

আফিস ঘরে আলোচনা চলেছে। কর্তৃপক্ষ ভয় পেয়ে দাবীগুলি প্রায় মস্তই মেনে নিতে স্বীকৃত হন। কেবল একটা বিষয় নিয়ে জটিলতার সৃষ্টি য়। শ্রমিকগণের পক্ষ থেকে দাবী আসে যে, কাঠের বেড়ার ফটকটা যদি ুলে দেওয়া হয় তবে কয়লার ছাই ও পোড়ালোহার আবর্জনা দিয়ে তৈরী াস্তায় সিকি মাইল হাঁটার কষ্ট তাদের লাঘব হয়ে যায়. ফটকটা অবশ্য বন্ধ করলেও চলে. কিন্তু প্রশ্নটা দাঁড়ায় কর্তৃপক্ষের মর্যাদা নিয়ে; তাঁরা জিদ রে বসেন, ফটক খোলা যাবে না এবং এ নিয়ে অনেকক্ষণ ধরে তর্কবিতর্ক লে। ইতিমধ্যে স্বরাষ্ট্র দপ্তর থেকে ফোনে নতুন নির্দেশ আসেঃ কর্তৃপক্ষকে মিকদের সমস্ত দাবী প্রত্যাখ্যান করতে হবে এবং আর কোন নির্দেশ না াওয়া পর্যন্ত ধর্মঘট কমিটির সঙ্গে আলোচনা করা চলবে না।

এই আদেশের ফলে পরিস্থিতি এত খারাপ হয়ে দাঁড়ায় যে, সমস্ত অবস্থা ুঝিয়ে বলার জন্য চীফ এঞ্জিনিয়ার অবিলম্বে মোটরে করে শহরে ছুটে যান। মিকগণ হতবুদ্ধি হয়ে যায়; তারা বেশ শান্ত মনোভাব নিয়েই অপেক্ষা রতে থাকে। কোন কোন এঞ্জিনিয়ার ভীড়ের মধ্যে গিয়ে যা ঘটেছে তা

শ্রমিকদের বোঝাবার চেষ্টা করেন এবং এ ব্যাপারে তাদের যে কোন হাত নেই তাও তাঁরা জানান। এখানে সেখানে লোককে হাসতেও দেখা যায়। অবশেষে বুলাবিন নামে একজন স্থূলকায়, পলিতকেশ এঞ্জিনিয়ার অফিস থেকে বেরিয়ে এসে সিঁড়ির ওপর দাঁড়ান এবং উচ্চৈঃস্বরে বলেন যে, আগামীকাল পর্যন্ত আলোচনা স্থগিত রাখা হল।

তেলেগিন সন্ধ্যা অবধি কারখানায় থেকে যায়; কিন্তু শেষ পর্যন্ত যখন দেখে যে ফারনেসগুলি জ্বালিয়ে রাখার আর কোন উপায়ই নেই তখন মাথা চুলকাতে চুলকাতে বাড়ি চলে যায় সে। ভবিষ্যৎমার্গীরা (ফিউচারিস্টগণ) খাবার ঘরেই বসে ছিল। কারখানায় কি ঘটেছে না ঘটেছে তা জানবার জন্য তারা উৎসুক হয়ে আছে। কিন্তু তেলেগিন তাদের কিছুই বলল না; এলিজাবেতা কিয়েভনা তার থালায় যে স্যান্ডউইচ ক'খানা দেয় নিঃশব্দে অন্য-মনস্কভাবে তেলেগিন তা গলাধঃকরণ করে এবং তারপর নিজকক্ষে গিয়ে দোর বন্ধ করে ঘুমিয়ে পড়ে।

পরদিন সে যথারীতি কারখানায় যায়। কিছু দূরে থাকতেই সে টের পায়, কারখানার অবস্থা ভাল নয়। সারা রাস্তায় শ্রমিকগণ দলে দলে দাঁড়িয়ে পরস্পর বলাবলি করছে। ফটকের সামনে একটা বড় ভীড়, কয়েক শত লোক হবে, ক্রুদ্ধ মৌমাছির ঝাঁকের মত তাদের গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে।

তেলেগিন অফিসের পোশাক পরে যায়নি। তার দিকে কেউ লক্ষ্যই করল না। শ্রমিকদের কথাবার্তা থেকে জানতে পারল সে, আগের দিন রাত্রে ধর্মঘট কমিটির সমস্ত সভ্যকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে; এখনো শ্রমিকদের ধর-পাকড় করা হচ্ছে; নতুন এক ধর্মঘট কমিটি নির্বাচিত হয়েছে এবং এখন যে-সমস্ত দাবী পেশ করা হয়েছে সেগুলি রাজনৈতিক; কারখানার অভ্যন্তরে বহু কসাক সৈন্য আমদানী করে জনতা ছত্রভঙ্গ করার জন্য তাদের হুকুম করা হয়েছিল, কিন্তু তারা তা করতে অস্বীকার করেছে; এবং শেষ পর্যন্ত ওবুখফ, নেভস্কি জাহাজের কারখানা, ফরাসী কারখানা এবং আরও কয়েকটি ছোট কারখানায় ধর্মঘট ছড়িয়ে পড়েছে।

তেলেগিন স্থির করে, কোনরকমে অফিসে ঢুকে সে খবরটা জানবে, কিন্তু ফটক পর্যন্ত পৌঁছাতেই তার অত্যন্ত কষ্ট হয়। ফটকে দাঁড়িয়ে আছে ভেড়ার চামড়ার মোটা কোট গায়ে সেই পরিচিত দরোয়ান আর তার পাশে রয়েছে দু'জন কসাক, মাথার এক পাশে কানের কাছে নিয়ে পরেছে তারা গোল টুপী, তাদের দাড়ি মাঝখানে দু'ভাগ করা। শ্রমিকদের সারারাত ঘুম হয়নি। তাদের বিশীর্ণ শুষ্ক মুখগুলির দিকে উদ্ধতভাবে চেয়ে কসাক দু'জন হাসছে; তাদের মুখ লাল টুকটুকে, দেখেই বোঝা যায় খেয়েদেয়ে তারা ভালই আছে, মারমুখো ভাব এবং খুব স্ফূর্তি।

"হ্যাঁ, এদের কোন্ বিবেকের দংশন নেই..." মনে মনে ভাবে তেলেগিন।

ফটক দিয়ে কারখানায় প্রবেশের চেষ্টা করে সে; কিন্তু কাছেই যে কসাকটি দাঁড়িয়ে ছিল সে তার পথরোধ করে এবং তার দিকে কটমট করে চেয়ে অভদ্রভাবে বলে ঃ

"কোথায় যাচ্ছ তুমি? ফিরে যাও!"

"আমাকে অফিসে যেতে হবে—আমি এখানকার একজন এঞ্জিনিয়ার।"

"চলে যাও বলছি!"

ভীড় থেকে চীৎকার ওঠে ঃ "হারামজাদারা! জারের যত সব ডালকুত্তা!"

"আমাদের রক্ত খেয়ে পেট ভরেনি তোদের?"

"যত সব জানোয়ার! পা-চাটা কুলাকের দল!"

এমন সময় একটি বেঁটে যুবক ভীড় ঠেলে সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। তার মুখে ব্রণ, নাকটা চোখা, একটা অস্বাভাবিক রকমের বড় কোট গায়ে, কোঁকড়া চুলের ওপর একটা লম্বা টুপী অদ্ভুতভাবে বসানো। সে তার ক্ষীণ বাহুটা তুলে অস্ফুটস্বরে বলে ঃ

"কসাক বন্ধুগণ! আমরা সকলেই রুশ, কি, আমরা কি তা নই?" আপনারা কাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেছেন? নিজের ভাইদেরই বিরুদ্ধে। আমরা কি আপনাদের শত্রু যে আপনারা আমাদের গুলি করবেন? আমরা কি চাই? আমরা চাই প্রত্যেকটি রুশ সুখী হোক। আমরা চাই সকলের মুক্তি। আমরা অত্যাচারের অবসান চাই"

একজন কসাক ঘৃণাভরে যুবকটির আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে এবং তারপর ঘুরে গিয়ে ফটকের মধ্যে এদিক ওদিক করে প্রহরীর মত পায়চারি করতে থাকে। অপরজন গলার স্বর অত্যন্ত গম্ভীর করে বলে ঃ

"আমরা দাঙ্গা হতে দিতে পারি না, কারণ আমরা শপথ গ্রহণ করেছি।"

প্রথম কসাকটি এতক্ষণে যেন যুবকের কথার উত্তর খুঁজে পেয়েছে। সে চীৎকার করে বলে ঃ

"ভাইসব, পাতলুন সামলাও, খুলে পড়ছে।"

দুজনেই হো হো করে হেসে ওঠে।

তেলেগিন ফটকের মুখ থেকে সরে আসে, ভীড়ের চাপ তাকে বেড়ার পার্শ্বস্থিত পুরনো লোহার একটা স্তূপ পর্যন্ত ঠেলে নিয়ে যায়। স্তূপের ওপর সে উঠতে যাবে এমন সময় দেখতে পায় মেষের চামড়ার টুপীটা মাথার প্রায় পেছনে ঠেলে দিয়ে ওরেশনিকফ শান্তভাবে এক টুকরো রুটি চিবোচ্ছে। তেলেগিনকে দেখে সে চোখে ইশারা করে এবং গম্ভীরভাবে বলে ঃ

"বড় মজার ব্যাপার, ইভান ইলিয়িচ!"

"সুপ্রভাত, ওরেশনিকফ! শেষ পর্যন্ত কি হবে বলতে পার?"

"আমরা আর খানিকক্ষণ চেঁচামেচি করব, তারপর সেই আগের মতই টুপী খুলে কর্তাদের সামনে গিয়ে আবার সব হাজির হব। বিদ্রোহ করার তো

এই পরিণতি! কসাক আমদানী করা হয়েছে। তাদের সঙ্গে আমরা কি দিয়ে লড়ব? আমি এই প্যাঁজটা ছুঁড়ে মারলেই কি তারা দু'জন মরে যাবে?"

ভীড়ের মধ্যে একবার গুঞ্জন ওঠে, আবার তা মিলিয়ে যায়। ফটকের সামনে নিস্তব্ধতা ভেদ করে একজনকে রাশভারী গলায় বলতে শোনা যায়ঃ

"আমার অনুরোধ আপনারা সব বাড়ি চলে যান। আপনাদের দাবী সম্পর্কে বিবেচনা করা হবে। দয়া করে শান্তভাবে চলে যান আপনারা।"

জনতা বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে, একটু পেছনে ও দু'পাশে সরে দাঁড়ায়। কেউ কেউ চলে যায়, আবার অনেকে এগিয়ে আসে। গলার আওয়াজ চড়তে থাকে। ওরেশনিকফ বলেঃ

"এই তৃতীয়বার তারা আমাদের মোলায়েম সুরে বলল।"

"লোকটা কে?"

"কসাকদের ক্যাপ্টেন।"

উত্তেজিতভাবে একজন চীৎকার করে বলে ওঠেঃ "কমরেডগণ, আপনারা কেউ যাবেন না।" এই বলেই একটা লোক ইভান ইলিয়িচের পেছনে ভাঙ্গা লোহার স্তূপটার ওপর লাফিয়ে ওঠে। অত্যন্ত উত্তেজিত, মুখটা তার পাণ্ডুবর্ণ, মাথায় একটা বড় টুপী, মুখে অপরিপাটি কালো দাড়ি, দাড়ির নীচে কোটের কলারটা সেফ্‌টিপিন দিয়ে আঁটা। দুই বদ্ধমুষ্টি উর্ধে তুলে উদাত্তকণ্ঠে বলে সেঃ

"যে অবস্থাই আসুক না, কমরেডগণ, আপনারা কেউ যাবেন না। আমরা নির্ভরযোগ্য সূত্রে খবর পেয়েছি কসাকরা গুলি চালাতে অস্বীকার করেছে। কারখানার কর্তৃপক্ষ মধ্যস্থ মারফৎ ধর্মঘট কমিটির সঙ্গে আলোচনা চালাচ্ছেন। কেবল তাই নয়, রেল কর্মীরাও সাধারণ ধর্মঘট করার কথা ভাবছেন। সরকার বাহাদুর ভয় পেয়ে গেছেন।"

"সাবাস!" একজন উত্তেজিতভাবে চেঁচিয়ে ওঠে। জনতার মধ্যে পরস্পর কানাকানি করতে থাকে। বক্তা ছুটে গিয়ে ভীড়ের মধ্যে মিলিয়ে যায়। লোক রাস্তায় ছুটোছুটি করতে থাকে।

তেলেগিন একবার ওরেশনিকফকে দেখবার চেষ্টা করে; কিন্তু এরই মধ্যে সে অনেকখানি তফাতে চলে গেছে, ফটকের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছে সে। বার কয়েক 'বিপ্লব' কথাটি তেলেগিনের কানে আসে।

তেলেগিনের ভয় ও আনন্দ দু'টোই হচ্ছে। আবেগে তার দেহটা কাঁপতে থাকে। ভাঙ্গা লোহার স্তূপটার ওপর আবার উঠে সে জনতার দিকে তাকায়, লোকের সংখ্যা আগের চেয়ে বেড়ে গেছে। হঠাৎ সে দেখতে পায়, আকুন্দিন প্রায় তার হাতের কাছেই দাঁড়িয়ে আছে। তার চোখে চশমা, গায়ে কালো রংএর জ্যাকেট এবং মাথায় উঁচু চুড়োর একটা টুপী। বাউলারদের টুপী

মাথায় একটা লোক ভীড় ঠেলে তার দিকে এগিয়ে যায়। তেলোগিন লক্ষ্য করে লোকটার অধরোষ্ঠ কাঁপছে। আকুন্দিনকে সে বলে ঃ

"আসুন, ইভান আবাকুমোভিচ, আপনার জন্যই তাঁরা অপেক্ষা করছেন।"

"আমি যাচ্ছিনে,' অত্যন্ত ক্রুদ্ধভাবে সংক্ষেপে উত্তর দেয় আকুন্দিন।

"কমিটির সমস্ত সভ্যই উপস্থিত। আপনাকে ছাড়া তাঁরা কোন সিদ্ধান্তই করতে চান না।"

'আপনারা সকলেই আমার মত খুব ভালভাবে জানেন।

"আপনার কি মাথা খারাপ হয়েছে? কি অবস্থা দাঁড়িয়েছে আপনি দেখতে পাচ্ছেন না! যে কোন মুহূর্তে গুলি চলতে পারে। লোকটির অধরোষ্ঠ দ্রুত কম্পিত হতে থাকে।

'প্রথম কথা হল, আপনি চেঁচাবেন না, বলে আকুন্দিন। আপনি যান এবং গিয়ে আপস প্রস্তাব গ্রহণ করুন। এরকম বিশ্বাসঘাতকতার কাজে আমি যোগ দেব না।

'আশ্চর্য! পাগল আর কাকে বলে!" এই বলেই লোকটি আবার ভীড়ের মধ্যে মিলিয়ে যায়। আগের দিন তেলেগিনের বিভাগে যে শ্রমিকটি সবাইকে কাজ বন্ধ করতে বলেছিল সে আকুন্দিনের কাছে এসে উপস্থিত হয়। আকুন্দিন তাকে কি বলে সে একটু ঘাড় নেড়েই আবার চলে যায়। তারপর আর একটি শ্রমিক এসেও ঠিক ঐ রকম করে কি একটু সামান্য কথা হয়, ঘাড় নাড়ে এবং চলে যায়।

এরই মধ্যে জনতার দিক থেকে সাবধান সাবধান রব ওঠে হঠাৎ পর পর তিনটে গুলির আওয়াজ। পরমুহূর্তেই সমস্ত চুপ। দম আটকে আসার মত যেন একটা গোঙানি শুনতে পাওয়া যায় 'আ—আ—আঃ! জনতা ফটক থেকে পেছনে সরে আসে। বহু লোকের পায়ে পায়ে যে জায়গাটা কাদাময় হয়ে গেছে দেখা যায় সেখানে একজন কসাক হাঁটু গেড়ে বসে উপুড় হয়ে কি করছে তার মাথাটা কাদার দিকে ঝুঁকে আছে। ফটকটা ধীরে ধীরে খুলে যেতে থাকে সঙ্গে সঙ্গে চারদিক থেকে চীৎকার ওঠে ঃ না! ও কর না!" এমন সময় একপাশ থেকে আবার একটা রিভলবারের গুলির আওয়াজ হয়। লোহার ফটকটার ওপর ইটপাটকেল পড়তে থাকে। জনতা ছত্রভঙ্গ হয়ে ছুটতে আরম্ভ করে ঠিক সেই মুহূর্তে তেলোগিন দেখে জনতার সম্মুখভাগে মুখ হা করে একা দাঁড়িয়ে আছে ওরেশনিকফ মাথায় তার টুপী নেই। মনে হয়, আতঙ্কে যেন তার বিরাট বুটজোড়ার তলায় শিকড় গজিয়ে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে রাইফেলের আওয়াজ—এক, দুই তিন এবং অসংখ্য—ওরেশনিকফ তাড়াতাড়ি হাঁটু গেড়ে বসে এবং তারপর সোজা একেবারে মাটিতে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ে।

কারখানার এই ঘটনা সম্পর্কে এক সপ্তাহ ধরে তদন্ত চলে। শ্রমিকদের প্রতি সহানুভূতিশীল বলে যাদের নামের তালিকা প্রস্তুত হয় তাদের মধ্যে তেলেগিনও আছে। তাকে অফিসে ডাকিয়ে আনা হয়। সেখানে কর্তৃপক্ষকে সে যেভাবে সমস্ত কড়া জবাব দেয় তাতে সকলে বিস্মিত হয়ে যায়। পদত্যাগ-পত্রে সই করতে বললে তৎক্ষণাৎ সে তা করে।

॥ এগারো ॥

দাশার বাবা ডক্টর দ্মিত্রি স্তেপানোভিচ বুলাভিন তাঁর খাবার ঘরে বসে স্থানীয় পত্রিকা 'সামারা হেরাল্ড' পড়ছেন। কাছেই সামোভার থেকে প্রচুর ধোঁয়া উঠছে। তাঁর সিগারেটটা পুড়ে পুড়ে যখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে তখন তিনি ঠাসা সিগারেট-কেসটা থেকে আর একটা সিগারেট বার করে মুখে দেন এবং আগের জ্বলন্ত সিগারেটটা থেকেই তা ধরান। কাসতে কাসতে মুখটা তাঁর লাল হয়ে ওঠে; শার্টের বোতামের ফাঁক দিয়ে রোমশ বুকটা তিনি চুলকান। কাগজ পড়তে পড়তে তিনি সসার থেকে হাল্কা চা ধীরে ধীরে চুমুক দিয়ে পান করেন, কাগজ, শার্ট ও টেবিলক্লথের ওপর সিগারেটের পোড়া ছাই পড়ে।

পাশের ঘরে একটা বিছানার ক্যাঁচকোঁচ শব্দ শুনতে পাওয়া যায়, তারপর পায়ের শব্দ—নৈশ পোশাকের ওপর একটা সাদা ড্রেসিং-গাউন চড়িয়ে দাশা খাবার ঘরে ঢোকে, তার ঘুমের আবেশ ও মুখের গোলাপী আভা তখনো কাটেনি। দ্মিত্রি স্তেপানোভিচ তাঁর ভাঙা চশমার ওপর দিয়ে মেয়ের দিকে তাকান, দাশার মত তাঁর দৃষ্টিও প্রশান্ত এবং কৌতুকপূর্ণ। মেয়ের দিকে তিনি গাল বাড়িয়ে দেন। দাশা বাবার গন্ডদেশে চুম্বন করে এবং তাঁর দিকে মুখ করে বসে রুটি ও মাখন কাছে টেনে নেয়।

"আজো জোর হাওয়া বইছে," বলে দাশা।

আগের দিন থেকেই প্রবল গরম বাতাস বইছিল। শহরের ওপর একটা সাদা ধূসর পর্দা পড়ে সূর্যকে ঢেকে দিয়েছে। দমকা হাওয়া রাশি রাশি ধুলো উড়িয়ে নিচ্ছে, রাস্তায় লোকজন কম, যখন এক একটা ধুলোর ঝাপটা আসছে, লোক তখন পেছন দিয়ে দাঁড়াচ্ছে। প্রতি রন্ধ্র ও জানালার ফ্রেমের ভেতর দিয়ে ধূলিকণা প্রবেশ করছে, জানালার গোবরাটের ওপর ধুলোর একটা পাতলা স্তর পড়ে গেছে, মানুষের দাঁতের ফাঁকের মধ্যেও গিয়ে ধূলিকণা প্রবেশ করছে। জোর বাতাসে জানালাগুলি খটখট করে আওয়াজ করছে এবং টিনের চালার ঝন্‌ঝন্‌ শব্দ শোনা যাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে গরম পড়েছে, বেশ একটা গুমোট ভাব, ঘরে বাইরে প্রায় একই অবস্থা।

"চোখের ব্যামো খুব হচ্ছে—মন্দ নয়," বলেন দ্মিত্রি স্তেপানোভিচ।

দাশা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে।

দু'সপ্তাহ আগে সে স্টীমারে তেলেগিনের কাছ থেকে বিদায় নিয়েছে। সামারা পর্যন্ত সারাটা রাস্তা সে তার সঙ্গে এসেছিল। সেই থেকে সে তার বাবার নতুন ফ্ল্যাটে এসে বাস করছে, কিন্তু এখানে তার কিছুই করবার নেই। ফ্ল্যাটটা প্রায় খালি বললেই চলে; হলের বুককেসগুলিতে বোধ হয় কারো হাতও পড়ে না, কোন জানালায় পর্দা নেই, এবং এখানকার যা কিছু ব্যাপার সবই দুটো আর সাতটার মধ্যে শেষ; সুতরাং দেখবার কিছু নেই বা কোন জায়গায় বসেও মোটেই আরাম পাওয়া যায় না। মনে হচ্ছে, রাস্তার কোন একটা সরাইতে এসে যেন সে বাস করছে।

গ্লাসের চা নাড়তে নাড়তে দাশা জানালা দিয়ে বিষণ্ণভাবে বাইরে রাস্তায় মেঘের মত উড়ন্ত ধুলোরাশির দিকে তাকায়। সে ভাবে, দু'টো বছর স্বপ্নের মত কেটে গেছে, আবার সে বাড়ি এসেছে, মুখর নগরী পিতার্সবুর্গে অসংখ্য লোকের সান্নিধ্যলাভের স্মৃতি, তার আশা আকাঙ্ক্ষা ও উন্মাদনার যা কিছু অবশিষ্ট আছে তা যেন এই বাত্যাবিতাড়িত ধূলিপুঞ্জ।

খবরের কাগজের পৃষ্ঠা উল্টিয়ে দাশার বাবা বলেন ঃ

"আর্কডিউক নিহত হয়েছেন।"

"সে কে?"

"ভালো! জানিসনে, 'সে কে'? অস্ট্রিয়ার আর্কডিউক ফার্দিনান্দ! সারাজিবোর্তে তাঁকে হত্যা করা হয়েছে।"

"তিনি কি যুবক ছিলেন?"

"জানিনে। দে, আর এক গ্লাস চা দে আমাকে।"

দাশার বাবা এক টুকরো মিছরি তাঁর মুখে পুরে দেন। মুখে মিছরি রেখেই তিনি চা পান করেন। কৌতুকপূর্ণভাবে তিনি দাশার দিকে তাকান এবং সসারটা মুখে তুলে বলেন ঃ

"বল দেখি তুই, কাতিয়া কি তার স্বামীকে চিরদিনের মত ত্যাগ করে গেছে?"

"আমি ত তোমাকে বলেছিই, বাবা।"

"ও, হ্যাঁ হ্যাঁ! " আবার তিনি কাগজটা খুঁটিয়ে পড়তে আরম্ভ করেন।

দাশা জানালার ধারে যায়। কিছুই তার ভাল লাগছে না। সেই সাদা স্টীমার, উজ্জ্বল দিবালোক, নীল আকাশ, নদী, পরিচ্ছন্ন ডেক, সমস্তই তার মনে পড়ে: সূর্যকিরণ, আর্দ্রতা, সর্বত্র একটা নির্মল সজীবতা। সেই ক'টা দিন তার মনে হয়েছে, প্রদীপ্ত প্রশস্ত নদীপথ, মৃদু সমীরণ, ফেনদন্তরেভঙ্গিক স্টীমার, সে নিজে এবং তেলেগিন সমস্ত যেন নীল সীমাহীন, আলোময় এক আনন্দসাগরের দিকে ধাবিত হচ্ছে।

দাশার দিক থেকে কোন তাড়া ছিল না, তেলেগিনের মনোভাবও সে জানত

এবং তার সেই মনোভাবের বিরুদ্ধে দাশার কোন অভিযোগ ছিল না। যাত্রার প্রতিটি মুহূর্তই যখন প্রীতিপদ, যেভাবেই হোক, তারা যখন এক আনন্দসাগরের দিকে ভেসে চলেছে, তখন ব্যস্ততা থাকবেই বা কেন!

তারা যতই সামারার নিকটবর্তী হচ্ছিল ততই যেন ইভান ইলিয়িচের মুখখানি লম্বা হয়ে যাচ্ছিল; হাস্যপরিহাসও আর সে করছিল না। দাশা ভাবছিল: "আমরা সুখসাগরের দিকে ভেসে চলেছি।" ইভান ইলিয়িচকে দেখে তার মনে হচ্ছিল, যেন একটা শক্ত ও সুখী লোক তার দিকে চেয়ে আছে, কিন্তু তার ওপর দিয়ে যেন একটা গাড়ীর কতগুলি নিষ্ঠুর চাকা চলে গেছে। তার জন্য দাশার দুঃখ হচ্ছিল, কিন্তু সে কি করতে পারে? তাকে যদি সে আরো কাছে আসতে দেয় তবে যে এই যাত্রার আনন্দটুকু আগেই নিঃশেষ হয়ে যাবে, ধৈর্যের বাধ ভেঙ্গে গিয়ে মাঝপথেই তাদের থেমে যেতে হবে, সে জন্যই ইভান ইলিয়িচের প্রতি সে ছিল সখ্যভাবাপন্ন, তার বেশি নয়।

ইভান ইলিয়িচ ভাবছিল, কেন যে তার চাররাত্রি ধরে ঘুম নেই, ঘুণাক্ষরেও সে যদি দাশাকে তা জানতে দেয় তবে সে বড় মর্মাহত হবে। অর্ধেক বাস্তব অর্ধেক স্বপ্ন, এমনই এক বিচিত্র জগতে যেন ছিল সে, বহির্লোকের সমস্ত কিছুই এক ঘন নীল কুয়াশার পর্দায় মিলিয়ে যাচ্ছে আর তার ভেতর দিয়ে যেন দাশার ধূসর চোখ দুটি জ্বল জ্বল করে ফুটে উঠছে; সৌরভ, সূর্যালোক আর তার হৃদয়ের অন্তহীন বেদনা ছাড়া আর কিছুর অস্তিত্বই যেন সে উপলব্ধি করতে পারছিল না।

সামারায় ইভান ইলিয়িচ স্টীমার বদল করে যে পথে এসেছিল আবার সেপথেই ফিরে যায়। দাশার সেই আনন্দসাগর কোথায় মিলিয়ে গেছে, তার সামনে এখন শুধু বাত্যাতাড়িত রাশি রাশি ধূলি আর জানালার খটাখট শব্দ।

ডক্টর বুলাভিন তাঁর চশমা খুলে খবরের কাগজটার ওপর রাখেন আর বলেন:

"অস্ট্রিয়ার লোক সার্বদের এর সমুচিত জবাব দেবে। আচ্ছা বল দেখি, মা, এই স্লাভ সমস্যা সম্পর্কে তোর মত কি?"

দাশা তখনো জানালার ধারে দাঁড়িয়ে। সে শুধু একবার কাঁধ নাড়ে এবং তারপর ক্লান্তভাবে জিজ্ঞেস করে:

"তুমি কি দুপুরে খেতে আসবে বাবা?"

"অসম্ভব! শহরের বাইরে পোস্তনিকোভোতে একটা হাম-জ্বরের রোগী আছে আমার।"

ডকটর বুলাভিন ধীরে উঠে দাঁড়ান, শার্টের নকল বুকটা পরেন এবং তসরের জ্যাকেটটার বোতাম লাগান, পকেটে হাত দিয়ে দেখেন দরকারী জিনিসগুলি সব আছে কি না এবং তারপর একটা ভাঙ্গা চিরুণী দিয়ে তাঁর পাকা কোঁকড়া চুল আঁচড়াতে থাকেন।

"হ্যা রে, বললি না ত স্লাভ সমস্যার কি হবে?"

"আমি তার কি জানি বাবা! আমাকে খামোকাই এসব প্রশ্ন করছ তুমি।"

"তোর কোন মতামত না থাকলেও এসম্বন্ধে আমার কিন্তু নিজস্ব একটা মত আছে, দারিয়া দ্‌মিত্রেভ্‌না।"

পোস্ত্‌নিকোভোতে যাবার ইচ্ছে যে তাঁর নেই এটা বেশ স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে। যাই হোক না কেন, সকাল বেলা চায়ের টেবিলে রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করতে তাঁর বড় ভাল লাগে। "স্লাভ সমস্যাই হ'ল—শুনছিস?—বিশ্ব সমস্যার মূল। এই খবরে অনেকেই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠবে। এজন্যই বলা হয়, বল্কান অর্থাৎ স্লাভদের আদিভূমি হ'ল ইওরোপের এপেন্‌ডিসাইটিস। তুই বলবি, কেন? আচ্ছা, তোকে বলছি. ." এক একটা মোটা আঙুল বাঁকা করে এক একটা বিষয় তিনি বোঝাতে আরম্ভ করেন—"প্রথমে দ্যাখ, বিশ কোটিরও বেশি স্লাভ আছে, তারা ইঁদুরের মত বাড়ছে। দ্বিতীয়ত, রুশ সাম্রাজ্যের মত এতবড় সামরিকশক্তিসম্পন্ন একটা রাষ্ট্র গঠনে তারা সক্ষম হয়েছে। তৃতীয়ত, স্লাভদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশগুলি, যদিও অন্য জাতের সঙ্গে তারা মিশে গেছে, তথাপি স্বতন্ত্র ভাবে সংগঠিত হবার চেষ্টা করছে এবং তথাকথিত এক প্যান-স্লাভনিক ইউনিয়ন গঠনেরও প্রয়াস দেখা যাচ্ছে। চতুর্থত—এবং এটাই হচ্ছে সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে, স্লাভদের মধ্যে সম্পূর্ণ নতুন ধরনের একটা নীতি-বোধ জেগেছে, এবং তা যে ইউরোপীয় সভ্যতার কাছে একটা বড় রকমের বিপদ তা অস্বীকার করবার উপায় নেই। ইউরোপীয় সভ্যতার ধ্বজাধারীরা তো পরমেশ্বরবাদী এবং পরমেশ্বরবাদী হওয়ার অর্থ হ'ল—শুনছিস, মা?—সম-সাময়িক সমস্ত সভ্যতাকে অস্বীকার ও বিনাশ করা। আমিও ভগবৎবিশ্বাসী, তবে তা হ'ল নিজের মধ্যে সত্যকে উপলব্ধি করা। তা করতে হলে আমাকে সম্পূর্ণ মুক্ত হতে হবে। যে নৈতিক কাঠামো আমাকে সমাধি দেয় তাকে ভেঙ্গে ফেলতে হবে, যে রাষ্ট্র আমার হাতে শৃংখল পরায় তাকে ধ্বংস করতে হবে।"

"পোস্ত্‌নিকোভোতে তুমি যাও বাবা," বিরক্ত হয়ে বলে দাশা। সে যেন খানিকটা হাঁপিয়ে উঠেছে।

"না, সত্যকে তোমার খুঁজে বার করতেই হবে।" এই বলে তিনি নীচের দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করেন, যেন সেখানে কোন রত্নভাণ্ডার লুক্কায়িত আছে। অকস্মাৎ থেমে যান তিনি এবং দরজার দিকে তাকান। সদর দরজায় জোরে ঘণ্টা বেজে ওঠে। "যা, দোরটা খুলে দে, দাশা।"

"না, আমি পারব না। দেখছ না, আমি কি পরে আছি!"

"মাত্রিয়োনা!" চীৎকার করে ওঠেন ডক্টর বুলাভিন। "কোথায় গেল হতচ্ছাড়ী।" নিজেই গিয়ে দোর খুলে দেন এবং হাতে একখানি চিঠি নিয়ে ফেরেন।

"কাতিয়া চিঠি দিয়েছে", বলেন তিনি। "রাখ্‌, একটু অপেক্ষা কর, ব্যস্ত

হবার কি আছে ঃ আমি যেকথা বলছিলাম আগে তা শেষ করতে দে।... বলছিলাম ঃ প্রথমত, ধ্বংস দিয়েই পরমেশ্বরবাদের সূচনা এবং এই সময়টা বড় মারাত্মক ও সংক্রামক। রুশিয়া এখন ঠিক এই রোগে ভুগছে। তুই নিজেই দ্যাখ না, যে কোনদিন সন্ধ্যাবেলা তুই বড় রাস্তায় যা, আর কিছু তোর কানে আসবে না, কেবল শুনতে পাবি ঃ 'সাহায্য কর' অথবা 'পুলিশ!' রাস্তায় যত সব গলাকাটার দল, পুলিশ গুণ্ডামী দমন করতে পারছে না। এসমস্ত লোকের কোন নীতির বালাই নেই, এরা পরমেশ্বরবাদী। বুঝছিস, মা? আজ তারা শহরের বড় রাস্তায় গুণ্ডামী করে বেড়াচ্ছে, কাল দেখবি সারা রুশ সাম্রাজ্যে তারা ছড়িয়ে পড়েছে আর এরকম দুষ্কার্য করছে। পরমেশ্বরবাদের সবে শুরু এদেশে, অর্থাৎ ভিৎ ধরে নাড়া দিয়েছে।" এই বলে ডাক্তার বুলাভিন একবার জোরে নিশ্বাস টানেন এবং একটা সিগারেট ধরান।

বাবার হাত থেকে কাতিয়ার চিঠিটা নিয়ে দাশা তার ঘরে চলে যায়। ডাক্তার বুলাভিন আরো খানিকক্ষণ আপন মনে যুক্তিতর্ক চালিয়ে যান এবং পুরনো ভাঙা বাড়ির ধূলিপড়া ফ্ল্যাটটায় এঘর ওঘর করেন। অবশেষে তিনি পোস্‌ত্‌নিকোভোর দিকে রওনা হন।

কাতিয়া তার চিঠিতে লিখেছে ঃ

"প্রিয় বোন দাশেংকা, আজ পর্যন্ত তোর অথবা নিকলাইব কোন খবব পাইনি। আমি প্যারিসে আছি। এখানে এখন পূর্ণ বসন্ত। সকলেই স্কার্ট বেশ আঁটসাঁট করে পরে, সৌখীন লোকেরা রেশমী বস্ত্রটাই সব চেয়ে বেশি পছন্দ করে। প্যারিস বড় মনোবম নগরী, এখানে প্রত্যেকেই, গোটা প্যারিসই টাংগো নাচ নাচে, তোর এ দেখা উচিত। তারা খাবার সময় নাচে, চা-পানের সময় নাচে, এক কথায় বলতে গেলে, উঠতে বসতে অর্থাৎ প্রায় সব সময়ই নাচে। এখানকার সঙ্গীত এমন মধুর ও হৃদয়স্পর্শী যে তা থেকে আমি কখনো নিজেকে দূরে রাখতে পারিনে। স্বল্পবসনা অঙ্কিত-নয়না এসমস্ত নারী ও তাদের সাথী পুরুষদের দিকে আমি যখন তাকাই তখন মনে হয় আমার যৌবন বুঝি সমাধিপ্রাপ্ত হচ্ছে, এমন একটা কিছু চলে গেছে যাকে আর ফিরিয়ে আনা যাবে না। মোট কথা, আমার মনে আনন্দ নেই। আমার কেবলি মনে হচ্ছে কে যেন মরতে চলেছে। বাবার জন্য আমার বড় দুর্ভাবনা হয়। বয়েস তো তাঁর কম হল না। এখানে বহু রুশ আছে—আমরা প্রত্যেকেই প্রত্যেককে চিনি; রোজই আমরা সকলে কোনও না কোন একটা জায়গায় মিলিত হই, মনে হয় যেন পিতার্সবুর্গেই আছি। ভাল কথা, এখানে একজন আমাকে বলল যে, নিকলাই নাকি একজন বিধবাকে নিয়ে আছে এবং সেই মহিলার তিনটি সন্তান, কোলেরটি একেবারেই কাঁচ। বুঝতে পারছিস, কথাটা শুনে প্রথমে আমি কতটা আঘাত পেয়েছিলাম? তারপরই কেন জানিনে, সেই বাচ্চাটার জন্য আমার অত্যন্ত কষ্ট হতে থাকে। ...দাশা, সময় সময় আমার

নে হয় আমার যদি একটা ছেলে থাকতো। কিন্তু আমি যদি কাউকে ভাল-বাসি তবেই না তার কাছ থেকে ছেলে প্রত্যাশা করতে পারি। বিয়ে হলে যেন তার ছেলেও হয়, দাশা,...বুঝতে পাচ্ছিস?”

দাশা বার বার চিঠিটা পড়ে আর তার দু'চোখ দিয়ে জল গড়ায়, বিশেষ করে সেই শিশুটার জন্য বড় দুঃখ হয়, কারণ তার তো কোন দোষ নেই। তারপর সে চিঠির উত্তর লিখতে বসে এবং খাবার সময় না হওয়া অবধি লিখে যায়। একাই সে খেতে বসে, খেতে ভাল লাগে না, খাবারগুলি নাড়াচাড়া করে এবং সামান্য কিছু মুখে দিয়েই উঠে যায়। পড়ার ঘরে গিয়ে সে একগাদা পুরোনো সাময়িকপত্র ওল্টাতে পাল্টাতে থাকে। ঘাটতে ঘাটতে একটা বড় উপন্যাস নজরে পড়ে। উপন্যাসটা হাতে নিয়ে সে সোফায় দেহটাকে এলিয়ে দেয়। তার চারপাশে বইপত্র ছড়ান রয়েছে। সন্ধ্যা পর্যন্ত সে উপন্যাসটা পড়ে যায়। ক্লান্ত দেহে তার বাবা ফিরে আসেন, সর্বাঙ্গ তাঁর ধূলিধূসর। বাবার সঙ্গে দাশা রাত্রিবেলা একত্র খেতে বসে, কিন্তু সে যতবার প্রশ্ন করে ততবারই তিনি অন্যমনস্কভাবে শুধু 'হুঁ' বলে কর্তব্য সারেন। অনেক করে শেষ পর্যন্ত দাশা জানতে পারে যে, তিন বছরের যে শিশুটির হামজ্বর হয়ে-ছিল সে মারা গেছে। একথা বলেই তিনি একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করেন এবং চশমা খুলে রেখে শুতে যান। দাশাও গিয়ে চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ে এবং কাঁদতে থাকে।

দু'দিন কেটে যায়। ধূলিঝড়ের পরে মুষলধারে বৃষ্টি ও বজ্রপাত হয়, টিনের চালে সারা রাত ঝমঝম করে আকাশ ভেঙে জল পড়ে। পরদিন রবি-বার সকালবেলা ঝড়বৃষ্টি থেমে যায়, তবে সেঁতসেঁতে ভাবটা আছে, মনে হয় সব কিছু যেন স্নান করে উঠেছে।

সকালবেলা দাশা ঘুম থেকে উঠতে না উঠতেই সেমিয়ন সেমিয়োনোভিচ গভিয়াদিন নামে একটি লোক আসে দাশার সঙ্গে দেখা করতে। সে এই পরিবারের সঙ্গে অনেকদিন থেকেই পরিচিত, জেম্স্তভো অফিসে পরিসংখ্যান বিভাগে কেরানীর কাজ করে। ছিপছিপে চেহারা, বিমর্ষ ভাব, দাড়ি ও চুলের রং বাদামী, চুলগুলি পেছন দিকে আঁচড়ানো। মুখে কটুগন্ধের ক্রীম মেখেছে সে, মদ মাংস তামাক কিছুই স্পর্শ করেনা। তার প্রতি পুলিশের নজর আছে। দাশাকে প্রীতি সম্ভাষণ জানিয়েই কোন কারণ না থাকা সত্ত্বেও একটু রসিকতা করে সে বলে ঃ

“ওগো, আমি তোমাকে নিতে এসেছি। চল, ভল্গায় বেড়াতে যাই।”

দাশা ভাবে ঃ “তাতে আর কি হয়েছে, পরিসংখ্যান বিভাগের কেরানী গভিয়াদিন না হয় একটু রসিকতাই করেছে।” সাদা ছাতাটা নিয়ে সে সেমিয়ন সেমিয়োনোভিচের সঙ্গে নদীতীরে নৌকাঘাটে যায়। বহু নৌকা সেখানে নোঙর ফেলে আছে।

কাষ্ঠনির্মিত লম্বা গুদামগুলি খাদ্যশস্য, কাঠ, প্যাকিং বাক্স, রেশম ও তুলোর গাঁট প্রভৃতিতে ভরতি। সেগুলির ফাঁকে ফাঁকে ডকশ্রমিক ও মুটেরা ঘোরাফেরা করছে। তাদের মধ্যে কিছু বালকও আছে। শ্রমিক ও মুটেদের খালি পা, খালি মাথা, চওড়া কাঁধ, ন্যুব্জ পৃষ্ঠ। কেউ কেউ লোফালুফি খেলছে আবার অনেকে বস্তা ও তক্তার ওপর ঘুমোচ্ছে। দূরে দেখা যাচ্ছে প্রায় জন ত্রিশ লোক বস্তা কাঁধে করে জাহাজে উঠবার কাঠের সিঁড়ির ওপর দিয়ে দৌড়ে যাচ্ছে, পদভরে সিঁড়িটা কাঁপছে। গরুর গাড়ীগুলির মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে একজন মাতাল: তার সর্বাঙ্গে ধুলিকাদা, গাল বেয়ে রক্ত পড়ছে; পাতলুন খুলে যাবে বলে দুহাতে সে সেটাকে ওপরের দিকে টেনে ধরে রেখেছে আর অশ্রাব্য ভাষায় গালাগালি করছে।

"এসমস্ত লোক ছুটির দিন বা বিশ্রাম কিছুই জানে না," বেশ ভারিক্কী চালে বলে সেমিয়ন সেমিয়োনোভিচ। "আর আমাদের শিক্ষা ও বুদ্ধি আছে বলেই আমরা দুজনে যাচ্ছি ছুটির দিনে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করতে।"

বেশ চওড়া ছাতি, পুরু ঠোঁট, হৃষ্টপুষ্ট, খালি পায়ে চিত হয়ে শুয়ে আছে একটি বালক। সেমিয়ন সেমিয়োনোভিচ তাকে টপকে যায়, আর একজন একটা কাঠের গুঁড়িতে বসে রুটি খাচ্ছে। দাশা যেতে যেতে শায়িত বালকটিকে বলতে শোনে:

"ফিলিপ, ভাল মাল যাচ্ছে রে!"

অপর জন ভরা মুখে জবাব দেয়: "সুবিধে হবে না। বড্ড পোষাকী।"

প্রশস্ত পীতাভ নদীর বালুতটের দিকে নাক বাড়িয়ে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে নৌকাগুলি। নদীজলে সূর্যকিরণের প্রতিফলন গিয়ে পড়ছে সেগুলির ওপর। গভিয়াদিন একটি নৌকা ভাড়া করে দাশাকে বলে হাল ধরতে। সে নিজে স্রোতের বিরুদ্ধে দাঁড় টানতে আরম্ভ করে। তার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দেয়।

"ব্যায়াম করা খুব ভাল," এই বলে সে তার জ্যাকেটটা খুলে ফেলে, পাতলুনের ফিতের বোতামও একটু সলজ্জভাবে খুলে দুটোকেই নৌকার গলুইতে রেখে দেয়। তার সরু দুর্বল বাহু দুটো লোমে ভরা, রবারের কাপ পরা। দাশা তার ছাতা খুলে নদীর প্রশস্ত বক্ষের দিকে তাকিয়ে থাকে।

"বেয়াদপি মাফ করবে, দারিয়া দ্মিত্রেভনা, শহরে লোক বলাবলি করছে তোমার নাকি বিয়ে। সত্যি?"

"না, সত্যি নয়।"

উত্তর শুনে সে হাসে—কিন্তু তার মুখে হাসিটা কেমন যেন বেখাপ্পা মনে হচ্ছে। "ভল্গার ধারা বয়ে চলে" গানটি সে অকস্মাৎ গেয়ে ওঠে, আবার এই ভেবে থেমে যায় যে এখানে এগান গাওয়া ঠিক হবে না। খুব জোরে সে দাঁড় টানতে থাকে।

লোকবোঝাই একটা নৌকা তাদের দিকে আসছে। সবুজ ও লাল কাশ্মীরি পোষাকপরা তিনটি সাধারণ শ্রেণীর রমণী নৌকায় বসে সূর্যমুখী ফুলের বীজ ছাড়াচ্ছে এবং খোসাগুলি তাদের কোঁচড়েই পড়ছে। তাদের সামনে একটা অন্ধ মাতাল খঞ্জনী বাজিয়ে যাযাবরী নাচ নাচছে। অতিশয় সাধারণ শ্রেণীর নাক, কোঁকড়া চুল, কালো দাড়ি, এমন ভাবে চোখ দুটো ঘোরাচ্ছে সে যে, মনে হয় তার মৃত্যু আসন্ন। আর একটি যুবক প্রাণপণ দাঁড় টানছে, এত জোরে টানছে যে, নৌকাটা এপাশে ওপাশে দুলছে। তৃতীয় যুবকটি একটা দাঁড় উঁচিয়ে চীৎকার করে সেমিয়ন সেমিয়োনোভিচ বলেঃ

"ডান দিক ধরে যাও, শুয়োরের বাচ্চা।"

একটাকে ঘেঁসে আর একটা নৌকা চলে যায়। দাশাকে দেখে তারা খানিকটা অশ্লীল অঙ্গভঙ্গী ও খিস্তি করে। অবশেষে নৌকাটা এসে তীরে ঠেকে। দাশা বালির ওপর লাফিয়ে পড়ে। সেমিয়ন সেমিয়োনোভিচ তার পাতলুন ও জ্যাকেট পরে নেয়।

"যদিও আমি শহরবাসী তবু প্রকৃতিকে আমি বড় ভালবাসি," চোখ দুটোকে উজ্জ্বল করে বলে সেমিয়ন, "বিশেষত কোন তরুণী যখন সঙ্গে থাকে তখন তো সোনায় সোহাগাঃ সেই অবস্থায় আমার মনে হয় আমি যেন কোন গন্ধর্বলোকে আছি। চল, আমরা ঐ বনের মধ্যে যাই।"

এক হাঁটু গরম বালু ভেঙ্গে তারা এগুতে থাকে। গভিয়াদিন বার বার ঘেমে রুমালে মুখ মোছে এবং বলেঃ "দেখছ কি চমৎকার জায়গা।"

অবশেষে বালুতট শেষ হয়ে যায় এবং একটা খাড়া জায়গা দিয়ে তারা ওঠে। সেখান থেকেই তৃণভূমি আরম্ভ হয়েছে। জায়গায় জায়গায় ঘাস কেটে লম্বা স্তূপের মত করে রোদে শুকোতে দেওয়া হয়েছে। মধুভরা ফুলের সৌরভ চারদিক আমোদিত করে তুলেছে। একটা সংকীর্ণ গিরিসংকটের মধ্যে যে জলপ্রণালী দেখা যাচ্ছে তার গোড়ার দিকে জলের ওপর একটা বাদাম গাছের জটপাকান ডালপালা এসে ঝুঁকে পড়েছে। সবুজ ঘাসে পূর্ণ একটি গর্তে এসে একটা ঝরণার জল পড়ছে, সেখান থেকে আরো নীচে ধারা নেমে এসে সৃষ্টি করেছে একটি ক্ষুদ্র গোল হ্রদ। তার তীরে রয়েছে প্রাচীন লাইম বৃক্ষ ও একটা রুক্ষ চেহারার দেবদারু গাছ, হ্রদের ওপর সে গাছটা তার একটা শাখা বাহুর ন্যায় বিস্তার করে আছে। হ্রদটা ছাড়িয়ে গিয়ে একটা উঁচু জায়গায় দেখা যায় থরে থরে সাদা গোলাপ ফুটে রয়েছে। কাদাখোঁচা পাখীর দল ঋতু পরিবর্তনের সময় যখন এক স্থান থেকে আর একস্থানে যায় তখন তারা এ জায়গাটাকে বড় পছন্দ করে। দাশা ও সেমিয়ন সেমিয়োনোভিচ ঘাসের ওপর বসে পড়ে। তাদের নীচে গিরিসংকটে যে জল রয়েছে তাতে নীল আকাশ ও বৃক্ষশাখার সবুজ পাতা প্রতিবিম্বিত হচ্ছে। দাশার অদূরেই ধূসর বর্ণের দুটো ছোট পাখী একটা ঝোপের মধ্যে এ শাখা থেকে ও শাখায় ফুরুৎ ফুরুৎ

উড়ে যাচ্ছে আর কেবলই কিচিরমিচির করছে। আর একটা গাছের ডালে বসে একটি বনকপোতী অতি করুণ সুরে তার ছেড়ে আসা দয়িতকে খালি ডাকছে। দাশা পা মেলে বসেছে, হাত দুটো রয়েছে তার হাঁটুর ওপর। বৃক্ষশাখে সেই বিরহিনী পাখীর ডাক সে কান পেতে শুনছে আর তার মনে হচ্ছে পাখীটা তাকে বলছেঃ "দারিয়া দ্মিত্রেভ্না, দারিয়া দ্মিত্রেভ্না, তোমার কি হয়েছে—কেন এত বিষন্ন বদন, তোমার কান্না পাচ্ছে কেন? এখনো তো কিছুই হয়নি, অথচ তুমি দুঃখ করছ জীবন তোমার শেষ হয়ে গেল, আর কিছুই নেই, সবই মিলিয়ে গেল। তুমি সত্যি একটি ছিঁচকাঁদুনে।"

"আমি তোমার সঙ্গে সরল ভাবেই কথা বলব, দারিয়া দ্মিত্রেভ্না" বলে গভিয়াদিন। "ধর, এই লোকে যাকে বলে সংস্কার, তা যদি আমি না মানি..."

"বেশ তো, যা খুশী বলুন না— আমার তাতে কিছু এসে যাবে না," বলে দাশা। মাথার পেছনে দু'হাত দিয়ে সে চিত হয়ে ঘাসের ওপর শুয়ে পড়ে এবং আকাশের দিকে তাকায়। গভিয়াদিনের ছোট চতুর চোখ দুটো পড়ে আছে দাশার সাদা মোজা জোড়ার দিকে। দাশার সেদিকে ভ্রূক্ষেপও নেই।

"তুমি গর্বিতা সাহসী মেয়ে। তুমি সুন্দরী তরুণী, প্রাণশক্তির প্রাচুর্যে পরিপূর্ণ..."

"বেশ, না হয় তাই হলাম আমি। কিন্তু তাতে কি হ'ল?" প্রশ্ন করে দাশা।

"এও কি সম্ভব, তোমার শিক্ষা ও পারিপার্শ্বিক তিলে তিলে তোমার মধ্যে যে মামুলী নীতিবোধের প্রাচীর গড়ে তুলেছে, তোমার মন কখনো তা ভেঙে ফেলতে চায়নি? যে নৈতিক বিধানকে বিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রই প্রত্যাখ্যান করেছেন তারই জন্য সত্যি কি তুমি তোমার সুন্দর প্রবৃত্তিগুলিকে দমন করে রাখবে?"

"বেশ—আমি যদি আমার সুন্দর প্রবৃত্তিগুলি দমন না করি তা হলে কি হবে?" জিজ্ঞেসা করে দাশা, তবে জবাব শুনবার তেমন আগ্রহ তার নেই।

রোদ এসে পড়েছে দাশার সর্বাঙ্গে। সূর্যকিরণে উদ্ভাসিত অনন্ত নীল আকাশটার দিকে চেয়ে তার চোখ দুটো যেন জুড়িয়ে যাচ্ছে, কিছু ভাববার বা নড়বার মত মনের অবস্থা নেই তার।

সেমিয়ন সেমিয়োনোভিচ নীরব, নখ দিয়ে সে মাটিতে আঁচড় কাটছে। দাশা জানে ধাত্রী মারিয়া দেভিদোভ্নাকে সে বিয়ে করেছে। আরো জানে সে যে, বছরে বার কয়েক সেই ভদ্রমহিলা তার তিনটি শিশু সন্তানকে নিয়ে রাস্তার অপর ধারে তার মায়ের বাড়ি চলে যায়। এই পারিবারিক কলহের কথা সেমিয়ন সেমিয়োনোভিচ যখন তার অফিসে সহকর্মীদের কাছে তোলে তখন এই বলে মারিয়া দেভিদোভ্নার ঘাড়ে সমস্ত দোষ চাপায় যে, সে বড় অশান্ত ও কোপন স্বভাবের মেয়ে।

অপর দিকে জেম্স্তভো হাসপাতালে মারিয়া দেভিদোভ্না বলে যে, তার স্বামী কোন নারীর সংগ পেলেই তার প্রতি অবিশ্বস্ত হতে পারে; কারণ চব্বিশ ঘণ্টা সে এই চিন্তাই করে, তবে কাপুরুষতা ও উদ্যমহীনতার জন্যই সে মনের বাসনাকে চরিতার্থ করতে পারে না; সে যদি কার্যত লম্পট হত তাও ছিল ভাল, কিন্তু এ অসহ্য; তার ঐ লম্বা নিরামিষাশী মুখখানা আর সে বরদাস্ত করতে পারে না। এই বিচ্ছেদের সময় সেমিয়ন সেমিয়োনোভিচ খালিমাথায় প্রতিদিন বার কয়েক সেই রাস্তায় হাঁটাহাটি করে। তারপর স্বামীস্ত্রীর মধ্যে আবার আপস হয়ে যায় এবং মারিয়া দেভিদোভ্না তার ছেলেপিলে ও বালিশ নিয়ে আবার পতিগৃহে ফিরে আসে।

শেষ পর্যন্ত সেমিয়ন সেমিয়োনোভিচ কেসে গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে বলে ঃ

"কোন রমণী যখন কোন পুরুষের কাছে একা থাকে তখন স্বভাবতই সেই রমণীর ইচ্ছে হয় সেই পুরুষ তাকে অধিকার করুক এবং পুরুষের মনেও বাসনা জাগে দৈহিক বলে সেই রমণীকে অধিকার করার। সত্যি বল তো হয় কিনা? তোমার অন্তরকে তুমি জিজ্ঞেসা কর, দেখবে সমস্ত কুসংস্কার ও মিথ্যার আবরণের নীচে সুস্থ যৌনসম্ভোগের এক স্বাভাবিক কামনানল তোমার মধ্যে জ্বলছে।"

"আমি যদি বলি যে, আমার মধ্যে এই মুহূর্তে তেমন কোন কামনা নেই, তবে আপনি কি বলবেন?" প্রশ্ন করে দাশা। মজা মন্দ নয়, ভাবে সে; তবে কথা শোনবার মত তেমন উৎসাহও তার নেই। তার মাথার ওপরেই রয়েছে মলিন বন্য গোলাপগুলি, একটা মৌমাছি একটি গোলাপের পীতবর্ণ রেণুতে গিয়ে বসেছে। সেই বিরহিনী পাখীটা এখনো গাছের ডালে বসে ডাকছে ঃ "দারিয়া দমিত্রেভ্না, দারিয়া দমিত্রেভ্না, সত্যি করে বলত, তুমি কি প্রেমে পড়নি? প্রেমে পড়েছ, সত্যি তুমি প্রেমে পড়েছ, সেজন্যই তুমি এত বিমর্ষ।" দাশা বনকপোতীর ডাক শোনে আর হাসে।

"মনে হচ্ছে তোমার জুতোর ভেতরে বালি ঢুকেছে। আচ্ছা, বালিটা আমি ঝেড়ে ফেলে দিচ্ছি," কিরকম একটা অদ্ভুত ফাঁকা গলায় কথা বলে সেমিয়ন সেমিয়োনোভিচ। গোড়ালি ধরে দাশার একটা জুতো খুলবার চেষ্টা করে সে। দাশা হঠাৎ উঠে বসে, সেমিয়ন সেমিয়োনোভিচের হাত থেকে জুতোটা কেড়ে নেয় এবং তা দিয়ে তার গালে কষে এক ঘা বসিয়ে দেয়।

"ইতর কোথাকার!" বলে দাশা। "তুমি এমন জানোয়ার আমি কখনো ভাবতে পারিনি।"

দাশা জুতো পরে উঠে দাঁড়ায়, ছাতাটা তুলে নেয় এবং গভিয়াদিনের দিকে ভ্রূক্ষেপও না করে আবার সোজা নদীর দিকে ফিরে যায়।

"আমি কি নির্বোধ! তাঁকে যে একটা চিঠি লিখব তারও উপায় নেই,

তার ঠিকানাটা পর্যন্ত জিজ্ঞেসা করিনি," আপন মনে বলে দাশা। "হয় কিনেশমা, নয়ত নিজ্নি। এখন আর কি করতে পারি আমি!...যাও, গভিরা-দিনের পাশে গিয়ে আরো বসে থাক! উঃ, ভগবান!..."

ঘুরে সে দেখতে পায় সেমিয়ন সেমিয়োনোভিচ ঘাসের মধ্য দিয়ে নীচের দিকে নেমে আসছে। দাশা আবার মনে মনে বলেঃ "আমি দিদিকে চিঠিতে লিখবঃ ভাবতে প্যারিস, দিদি, আমি প্রেমে পড়েছি; হ্যাঁ, প্রেমেই পড়েছি!" কি যেন কান পেতে শুনবার চেষ্টা করে সে, তারপর চাপা স্বরে বলেঃ "প্রিয়, প্রিয়, প্রিয় ইভান ইলিয়িচ!"

ঠিক সেই মুহূর্তে তার কাছেই একজনকে সে বলতে শোনেঃ "আমি জলে নাবব না, না আমি জলে নাবব না; আমাকে ছেড়ে দাও, আমার স্কার্ট ছিঁড়ে যাবে যে।" এক হাঁটু জলের মধ্য দিয়ে একটা বয়স্ক উলঙ্গ লোক ছুটে চলেছে। খাট দাড়ি, বক্ষের পাঁজরগুলি ঈষৎ পীতবর্ণ, বক্ষদেশে কালো সুতোয় একটা ক্রুশ ঝুলান। এমন অশ্লীল যে তার দিকে চাওয়া যায়না। নিঃশব্দে অত্যন্ত কুৎসিতভাবে স্ত্রীলোকটিকে ধরে সে টানছে। সে কিছুতেই জলে নামবে না, সেও তাকে জোর করে জলে নামাবেই। স্ত্রীলোকটি আবার বলে ওঠেঃ "আমাকে ছেড়ে দাও, আমার স্কার্টটা যে ছিঁড়ে ফেলছ।"

দাশা প্রাণপণ ছুটে নৌকার কাছে যায়; লজ্জায় ও ঘৃণায় তার যেন বাক্‌শক্তি রোধ হয়ে আসছিল। দাশা যখন নৌকাটা ঠেলে জলে ভাসাচ্ছে গভিয়াদিন তখন ঊর্ধশ্বাসে ছুটে এসে হাজির। বাড়ি ফেরার সময় দাশা সারাক্ষণ নৌকার পশ্চাদ্ভাগে ছাতা আড়াল দিয়ে বসে থাকে, গভিয়াদিনের সঙ্গে সে একটি কথাও বলেনা বা একবার ফিরেও তাকায় না।

সেদিন সেই বেড়াতে যাবার পর থেকে তেলেগিনের ওপর দাশার কেমন একটা রাগ হয়। কেন রাগ হয় সে নিজেই বুঝতে পারে না; তবে তার মনে হয় এই রৌদ্রদগ্ধ ধূলিময় প্রাদেশিক শহরে তার নিরানন্দময় জীবনের জন্য সেই দায়ী। এখানকার বাক্সের মত ইটের বাড়ি, পূতিগন্ধময় ভাঙ্গাচোরা বেড়া; অসুন্দর প্রবেশদ্বার, বৃক্ষহীন রাস্তার ধারে টেলিগ্রাফ ও ট্রামের থাম্বা, সমস্তই বিরক্তিকর এবং এগুলির জন্যও তেলেগিনই দায়ী বলে তার মনে হয়। এমন কি দুপুরের অসহ্য গরম এবং সেই গরমে ধূলাকীর্ণ ছায়াহীন রাস্তায় রোদে ঝলসান একটা স্ত্রীলোক যে কাঁধে বাঁকে ঝুলিয়ে ধুমে শুষ্ক মাছ নিয়ে এসে ধূলোপড়া জানালার ধারে দাঁড়িয়ে হাঁক দেয়ঃ "শুকনো মাছ নেবে গো!"—আর ঠিক সে সময় প্রায় তারই মত রোদে-পোড়া একটা খ্যাপা কুকুর তার কাছে এসে সেই মাছের গন্ধ শুঁকতে থাকে এবং দূরে কোন একটা অর্গ্যানে সেই পুরনো একঘেয়ে সুর বেজে ওঠে—এসমস্তর জন্যও তেলেগিনই দায়ী।

এই বৈচিত্র্যহীন জীবন দাশার আর ভাল লাগে না, তার চারদিকে যেন

একটা কবরখানার নীরবতা, এই স্তব্ধতা যেন আর শেষ হবার নয়, সে যদি রাস্তায় ছুটে গিয়ে গলা ফাটিয়ে চীৎকার করে বলে: "আমি বাঁচতে চাই বাঁচতে চাই আমি!" তবু বুঝি কেউ সাড়া দেবে না। এর জন্যও কি তেলেগিনই দায়ী নয়?—ভাবে দাশা।

তেলেগিন কেন এত লাজুক, কেন এত শিষ্ট, এজন্যও তার ওপর রাগ হয় দাশার। শেষ পর্যন্ত দাশা তাকে একথাটা কিছুতেই বলতে পারল না: "দেখছ না, আমি তোমাকে ভালবাসি?" সে কেন দাশাকে তার মনের কথা খুলে বলে গেল না; এজন্যও তার ওপর অভিমান হয় দাশার। পৃথিবীতে সে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল, তার কথা হয়ত সে একেবারেই ভুলে গেছে।

একদিন অন্ধকার রাত্রে শুয়ে আছে দাশা। এত গরম যে ঘরটাকে মনে হয় একটা পাঁউরুটীর চুল্লী। তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় দাশা একটা স্বপ্ন দেখে, সেই পিতার্সবুর্গের স্বপ্নের মত, জেগে ওঠে সে, তার চোখে জল, আবার সেই আগেকার মতই একটা কাচের গ্লাসের গায়ের বাষ্পের ন্যায় স্বপ্নটা মিলিয়ে যায়। কিন্তু কেন যেন তার মনে হয়, এই ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্ন নিশ্চয়ই কোন অমঙ্গলের পূর্বলক্ষণ। ডাক্তার বুলাভিন মেয়েকে বলেন: "তুই একটা টনিক খা।"

এর পর কাতিয়ার কাছ থেকে দ্বিতীয় চিঠি আসে। চিঠিতে লেখা আছে:

"প্রিয় বোন দানিয়ুশা,—আমার বাড়ির জন্য মন কেমন করছে। তোকে ছেড়ে, আমার বন্ধুবান্ধবদের ছেড়ে, রুশিয়া ছেড়ে আমার ভাল লাগছে না। যতদিন যাচ্ছে ততই আমার মনে হচ্ছে, নিকলাইর সঙ্গে ছাড়াছাড়ির জন্য আমিই বেশি দায়ী। প্রতিদিন ঘুম থেকে উঠে অবধি সারাদিন আমার নিজেকে কেমন অপরাধী ব'লে মনে হয়, কি রকম একটা মানসিক অবসাদ আসে। তোকে আগে লিখেছি কিনা মনে নেই—এখানে ক'সপ্তাহ যাবৎ একটা লোক আমার পেছন নিয়েছে। তার জ্বালায় বাড়ি থেকে বেরুবার উপায় নেই। একদিন একটা অফিসে আমি লিফ্ট্-এ চড়েছি, লিফ্ট্টা ওপর দিকে উঠতে আরম্ভ করেছে, সেই লোকটা চলন্ত লিফ্ট্-এ লাফিয়ে উঠলো! কাল আমি লুভর্-এ গিয়েছিলাম; ক্লান্ত হয়ে আমি একটা বেঞ্চে বসে আছি, হঠাৎ মনে হ'ল কে যেন আমার পিঠে হাত দিল—ঘুরে দেখি অদূরেই সে লোকটা বসে আছে। লোকটা কৃশ এবং গায়ের রং ময়লা, চুল খুব কালো ছিল, এখন সাদা হয়ে যাচ্ছে, দাড়ি দেখে মনে হয় সেগুলি বুঝি কেউ আলগা ভাবে তার গালের ওপর বসিয়ে দিয়েছে। ছড়ির মাথায় হাত রেখে একদৃষ্টে সে আমার দিকে চেয়ে থাকে। সে কখনো আমাকে কিছু বলে না বা উৎপাতও করে না, তবু তাকে দেখে আমার কেন যেন ভয় করে। মনে হয়, লোকটা আমার চারদিকে জাল ফেলছে।..."

দাশা তার বাবাকে চিঠিখানি দেখায়।

পরদিন খবরের কাগজ পড়ার পর ডাক্তার বুলাভিন কোন ভূমিকা না করেই বলেন :

"মা, তুই একবার ক্রিমিয়ায় যা।"

"কেন, বাবা ?"

"সেখানে গিয়ে নিকলাই ইভানোভিচকে খুঁজে বার কর আর তাকে বল যে, সে একটা গাধা। সে প্যারিসে তার স্ত্রীর কাছে চলে যাক।...অবশ্য তার যেমন খুশি তেমনই সে করতে পারে, এ হ'ল তাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার।"

ডাক্তার বুলাভিন ক্রুদ্ধ ও বিচলিত হন, অবশ্য মনের ভাবটাকে চেপে রাখারই চেষ্টা করেন তিনি। দাশা আকস্মিক খুব খুশি হয়ে যায়, ক্রিমিয়ার নীলাভ সুন্দর ছবি তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে, সমুদ্রকল্লোল যেন সে শুনতে পায়। একটা লম্বা গাছের ছায়া, একটা পাথরের বেঞ্চ, মাথার চারদিকে একটা রুমালের পৎপৎ শব্দ আর তারই জন্য ব্যাকুল দুটি চঞ্চল আঁখি—এসমস্ত কল্পনা করে তার অপার আনন্দ।...

তাড়াতাড়ি লটবহর বেঁধে সে ইউপাতোরিয়া রওনা হয়। সমুদ্রতীরে সেই গ্রীষ্মাবাসেই আছেন নিকলাই ইভানোভিচ।

॥ বারো ॥

সেবার গ্রীষ্মকালে উত্তরাঞ্চল থেকে বহু লোক ক্রিমিয়ায় বেড়াতে আসে। সমুদ্রসৈকতে দেখা যায়, পিতার্সবুর্গের অসংখ্য কেতাদুরস্ত লোক, তারা একটু উন্নাসিক এবং কথাবার্তায় বেশ মার্জিত, তবে সর্দিকাসি তাদের নিত্যসহচর; মস্কো থেকে যারা এসেছে তাদের উস্কোখুস্কো চুল, মুখর এবং তারা একটানা সুরে কথা বলে; কিয়েভের লোকদের চোখ কালো, 'এ' এবং 'ও' স্বরবর্ণের উচ্চারণের পার্থক্য তারা ধরতে পারে না; সাইবেরিয়ার ধনাঢ্য ব্যক্তিরাও এসেছে, রুশদের এসমস্ত গোলমাল তাদের ভাল লাগে না, অতএব সকলের প্রতিই তাদের একটা অবজ্ঞার ভাব; এছাড়া আছে তরুণী ও দীর্ঘকায় তরুণের দল, ধর্মযাজকগণ, সরকারী কর্মচারীবৃন্দ, সম্ভ্রান্ত ঘরের নববিবাহিত দম্পতিবর্গ—গোটা রুশিয়ার তখন যে নৈতিক অধঃপতন হয়েছে সেই খাতেই এই সমস্ত লোকের জীবনধারা প্রবাহিত, মনে হয় এদের যেন নৈতিক মেরুদণ্ড আর নেই; একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে এখানে এসে রোদে ভাজা ভাজা হওয়া।

গ্রীষ্মকালের মাঝামাঝি এখানকার লোনা জল, গরম ও সূর্যতাপে এসমস্ত লোক তাদের শালীনতা হারিয়ে ফেলেছে, সাধারণ পোষাকপরিচ্ছদ যেন এখন এদের কাছে বাহুল্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। মেয়েরা শুধু টার্কিশ তোয়ালে দিয়ে কোনরকমে অঙ্গ আবৃত করে বালুকাময় বেলাভূমিতে আসতে আরম্ভ করেছে,

পুরুষদের দেখে মনে হয় যেন কোন চিত্রিত মৃৎপাত্রের উলঙ্গ ছবি।

এই অনভ্যস্ত পরিবেশে—নীল সমুদ্রের তরঙ্গরাশি, উত্তপ্ত বালুতট এবং সর্বত্র নগ্ন নরনারীর অবাধ ভ্রমণ—এই অবস্থায় পারিবারিক জীবনের ভিত্তি শিথিল হয়ে যায়। এখানে সবই সহজ ও সম্ভব বলে মনে হয়। এর পর তো আবার আছেই উত্তরাঞ্চলে নিজ নিজ জায়গায় ফিরে গিয়ে সেই ফ্ল্যাট, সেই বর্ষা, সেই টেলিফোনের ক্রিং ক্রিং আওয়াজ, সেই পারস্পরিক কর্তব্য সম্পাদন, সেই উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা—এখানে এসে সে সমস্ত চিন্তা করার কি কোন অর্থ হয়! এখানে এসে তারা হাত পা ছড়িয়ে চোখ বুজে বালির ওপর শুয়ে পড়ে, কলকল করে সমুদ্রের জল এসে তাদের পদস্পর্শ করে, একটা তরল, উষ্ণ আনন্দের অনুভূতি তাদের শিরায় উপশিরায় খেলে যায়। সমুদ্রবারি স্পর্শে অতি ভয়ংকর বস্তুও হাল্কা এবং মধুর ঠেকে।

সে বছর আগন্তুকদের চপলতা ও নির্লজ্জতা যেন শতগুণ বেড়ে যায়, মনে হয় জুন মাসের এক সকালে লাল উত্তপ্ত সূর্যের একটা প্রকাণ্ড উদ্গতাংশ যেন এই হাজার হাজার শহুরে লোকের স্মৃতিশক্তি ও বুদ্ধি বৃত্তিকে একেবারে লোপ করে দিয়েছে। সমুদ্রতীরে এমন একটা বাংলো নেই যার বাসিন্দাদের বলা যায় যে তারা সুস্থ মস্তিষ্কে আছে। নরনারীর পারস্পরিক সম্পর্ক অপ্রত্যাশিতভাবে ছিন্নভিন্ন। সমগ্র আবহাওয়াই কামলালসাপূর্ণ ফিসফিসানি, চাপা হাসি ও লোকের অর্থহীন প্রলাপে দূষিত। বহু প্রাচীন নগরীর ধ্বংসাবশেষ ও বহু বিলুপ্ত জাতির কংকালে আকীর্ণ এই উষ্ণ ভূমিকে এরা ক্লেদাক্ত করে তুলেছে। মনে হয়, এদের সকলের বিচারের দিন সমাগত, আগামী শরতের বৃষ্টির সংগে এদের চোখ দিয়েও অনেক দুঃখের জল ঝরবে।

মধ্যাহ্নের পরেই দাশা ইউপাতোরিয়ায় এসে পৌঁছয়। লবণাক্ত জলা এবং তৃণরাশির মাঝখান দিয়ে একটা ধূলিময় সরু রাস্তা ফিতের মত চলে গেছে। সেই রাস্তা দিয়ে সে যখন শহরের কাছে এগিয়ে এসেছে তখন দেখতে পায় সোমরাজে ঢাকা তৃণভূমির ওপর দিয়ে যেন একটা বড় কাঠের জাহাজ ধীরে ধীরে চলেছে, সমস্ত জাহাজটায় আগে পাছে অনেকগুলি কালো রংএর পাল খাটান হয়েছে। দেখে দাশা আনন্দে লাফিয়ে ওঠে। গাড়ীতে তার পাশেই যে আর্মেনিয়ানটি বসেছিল সে হেসে বলেঃ "আর এক মিনিটের মধ্যেই আপনি সমুদ্র দেখতে পাবেন।"

লবণ তৈরীর একটা চতুষ্কোণাকৃতি জলাধার ঘুরে গাড়ীটা গিয়ে একটা বালির ঢিবিতে ওঠে, সেখান থেকে সমুদ্র দেখা যায়। ঘন নীল অম্বু, তদুপরি শুভ্র ফেনরাশি; মনে হয় সেই ঢিবিটার চেয়েও যেন সমুদ্রটা উঁচু। বাতাসের শোঁ শোঁ শব্দ শোনা যায়, দাশা তার কোলের ওপরকার চামড়ার সুটকেসটা জোরে চেপে ধরে আর মনে মনে বলেঃ "এই তো এসে পড়েছি, আর দেরি নেই!"

ঠিক সেই মুহূর্তে সমুদ্রতীরে একটি তাঁবুতে সেই মণ্ডসেবী তার্কিক

প্রেমিকপ্রবরের সংগে বসে নিকলাই ইভানোভিচ স্মোকোভনিকভ একত্র কফি পান করছেন। গ্রীষ্মে যারা এখানে বেড়াতে এসেছে, খাওয়া দাওয়ার পর তারা এই তাঁবুতে এসে ছোট ছোট টেবিলের ধারে বসে হৈ-হল্লা করে, সমুদ্রস্নান, স্ত্রীলোক ও আইওডিন চিকিৎসার উপকারিতা সম্পর্কে জোর আলোচনা শুরু করে দেয় তারা।

তাঁবুর অভ্যন্তর বেশ ঠান্ডা। সাদা টেবিলক্লথের ধারগুলি ও মেয়েদের স্কার্ফসমূহ বাতাসে উড়ছে। একটিমাত্র পাল তুলে একখানি প্রমোদতরণী ভেসে চলেছে, তার আরোহীরা আনন্দে চীৎকার করছে। মস্কোর বিশ্ববিখ্যাত কয়েকজন ব্যক্তি একটি বড় টেবিলের চারপাশে বসেছেন। সেই তার্কিক প্রেমিক-প্রবর তাঁদের দেখেই ভ্রূকুটি করেন এবং যে বিষয়বস্তু নিয়ে তিনি একটা নাটক লিখবেন বলে ভেবেছেন তা বিবৃত করতে থাকেন।

"সমস্ত বিষয়টা আমি বেশ ভাল করে ভেবে রেখেছি, তবে একমাত্র প্রথম অঙ্কটাই লেখা হয়েছে," স্মোকোভ্‌নিকভের দিকে আগ্রহভরে চেয়ে বলেন তিনি। "তোমার মাথা খুব পরিষ্কার, কোলাইয়া, আমি যা বলতে চাই তুমি তা বুঝতে পারবেঃ একটি সুন্দরী যুবতী তার চতুস্পার্শ্বস্থ সামান্যতার মধ্যে অসুখী ও অশান্ত হয়ে ওঠে। মানুষ মাত্রই ভাল, তবে মদে ও পংকল আবর্তে পড়ে তারা খারাপ হয়ে যায়।...আমি কি বলতে চাইছি, তুমি নিশ্চয়ই তা জান।.. হঠাৎ একদিন সেই যুবতীটি বলেঃ 'আমাকে যেতে হবে, এই জীবনের ইতি করে আমাকে কোথাও যেতে হবে, আলোর দিকে যেতে হবে।..' এবং তখন তার স্বামী ও তার পুরুষ বন্ধু..উভয়েরই কষ্ট। কোলাইয়া, বুঝতে পারছ, জীবনের ঘূর্ণাবর্তে পড়ে তারা হাবুডুবু খাচ্ছে।...সে চলে যায়, কার কাছে যায় বলব না—তার কোন প্রণয়ী নেই, কেবল এজীবন তার ভাল লাগছিল না বলেই সে চলে যায়।...তার স্বামী আর সেই পুরুষ বন্ধুটি একটা রেস্তোরাঁয় নীরবে বসে সুরা পান করে, ব্রান্ডির সংগে তাদের চোখের জল মিশে যায়, তাই তারা গলাধঃকরণ করতে থাকে।..আর চিমনীতে বাতাস ঢুকে এমন একটা আওয়াজ হয় যেন অন্ত্যেষ্টিকালের শোকসংগীত ..শূন্যতা..নিস্তব্ধতা.. অন্ধকার।..."

"আপনি কি এসম্বন্ধে আমার মতামত জানতে চান?" জিজ্ঞেস করেন নিকলাই ইভানোভিচ।

"হ্যাঁ, জানতে চাই বই কি। তুমি খালি আমাকে একবার বলঃ 'মশায়, এ-নাটকটা লেখা বন্ধ করুন,' আর দেখবে আমি লেখা বন্ধ করেছি।"

"আপনার নাটক চমৎকার। জীবনের প্রতিচ্ছবি," নিকলাই ইভানোভিচ চোখ বুজে ঘাড় নাড়েন। "হ্যাঁ মশায়, সুখের দিনকে আমরা উপলব্ধি করতে পারিনি, সেদিন তো চলে গেছে। আর আপনি ও আমি—আশাহীন, উদ্দেশ্য-হীন—বসে পান করছি। আমাদের কবরের ওপর বাতাস আর্তনাদ করছে...

আপনার নাটক যে আমাকে কিভাবে মুগ্ধ করেছে তা আমি বলে বোঝাতে পারব না।”

থিয়েটার-পাগলা লোকটির চোখের নীচের ঝুলে-পড়া ত্বক একবার নেচে ওঠে; গলা বাড়িয়ে তিনি নিকলাই ইভানোভিচকে চুম্বন করেন। তারপর তিনি উভয়ের জন্য এক গ্লাস করে মদ ঢালেন। পরস্পরের কল্যাণ কামনা করে তাঁরা সেই সুরা পান করেন; অতঃপর টেবিলে দুই কনুইতে ভর দিয়ে তাঁরা আবার প্রাণখোলা গল্প জুড়ে দেন।

মঞ্চসেবী তাঁর সঙ্গীর দিকে একবার বিষণ্ণভাবে চেয়ে নিয়ে বলেন:

“কোলাইয়া, তুমি কি জান যে তোমার স্ত্রীকে আমি দেবীর মত দেখতাম?”

“হ্যাঁ, আমার সেরকমই মনে হ'ত।”

“আমি তীব্র যন্ত্রণা বোধ করেছি, কোলাইয়া। কিন্তু তুমি আমার বন্ধু।... কতবার যে তোমার বাড়ি থেকে আমি প্রতিজ্ঞা করে চলে গেছি যে তোমাদের বাড়ির দোরগোড়া আর আমি মাড়াব না।...কিন্তু আবার আমি গিয়েছি—ভাঁড় সেজেছি।...কিন্তু, নিকলাই, তার কোন দোষ নেই—” দন্তে দন্ত চাপেন তিনি।

“মশায়, সে আমার সঙ্গে নিষ্ঠুরের মত ব্যবহার করেছে।”

“হবে। কিন্তু তার সঙ্গে যে আমরা সবাই অসদ্ব্যবহার করেছি, সবাই।... কোলাইয়া, একটা জিনিস আমি বুঝতে পারি না যে, এমন স্ত্রীর সঙ্গে বাস করে তুমি সোফিয়া ইভানোভনার মত একটা বিধবার সঙ্গে মিশতে কি করে! কি করে তুমি পারতে?”

“সে বড় জটিল প্রশ্ন।”

“বাজে বক না। আমি তাকে দেখেছি—অতি সাধারণ, বন্য কুক্কুরীর মত দেখতে!”

“কি আর করা যাবে বলুন; যা হবার তা তো হয়েই গেছে। তবে একটা কথা জানেন? সোফিয়া ইভানোভনার স্বভাবটি বড় মধুর। অনেক সময়ই আমাকে সে বড় আনন্দ দিত কিন্তু প্রতিদান কিছুই চাইত না। আর বাড়িতে সমস্তই ছিল জটিল, কঠিন, দুর্বোধগম্য।...একাতেরিনা দমিত্রিভ্নার সঙ্গে পেরে ওঠার মত যথেষ্ট মনোবল আমার ছিল না।...”

“কিন্তু, কোলাইয়া, এ কি কখনো হতে পারে যে, আবার আমরা যখন পিতার্সবুর্গে ফিরে যাব এবং থিয়েটারের শো শেষ হবার পর সেই মঙ্গলবার তোমার বাড়ি গিয়ে হাজির হব তখন তোমার স্ত্রীকে সেখানে দেখতে পাব না? আমি তা সহ্য করব কি করে? শোন...তোমার স্ত্রী এখন কোথায়?”

“প্যারিসে।”

“চিঠিপত্র দাও?”

“না।”

“প্যারিসে যাও। এস না, আমরা দু'জনেই যাই।”

"গিয়ে লাভ হবে না।"

"কোলাইয়া, এস না, তার শুভকামনা করে আমরা একবার সুরা পান করি।"

"বেশ, করুন।"

এমন সময় হঠাৎ অভিনেত্রী চারোদায়েভা তাঁবুতে এসে উপস্থিত। একটা ফিনফিনে সবুজ পোশাক প'রে এবং বড় একটা টুপী মাথায় দিয়ে টেবিলগুলির মাঝখানে এসে সে দাঁড়ায়। সাপের মত লিকলিকে চেহারা তার, চোখের নীচে কালি পড়ে গেছে; এমনভাবে নুয়ে পড়েছে যে মনে হয় শিরদাঁড়া বুঝি তার নেই। 'কোরাস অব দি মিউজেস' সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদক উঠে দাঁড়িয়ে তাকে সম্বর্ধনা জানান এবং তার হাতটা টেনে নিয়ে ধীরে কনুইতে চুম্বন করেন।

"অপূর্ব রমণী!" দাঁত চিবিয়ে বলেন নিকলাই ইভানোভিচ।

"না, কোলাইয়া, তা নয়! চারোদায়েভা এক টুকরো গলিত মাংস মাত্র। কি আছে তার মধ্যে?...বেসনভের সঙ্গে তিন মাস ছিল, ক্ষয়িষ্ণু চিন্তাধারার কবিতা সে কন্সার্টের সময় আবৃত্তি করে।..চেয়ে দেখ না তাকে—আকর্ণ মুখের হাঁ দাঁড়ির মত গলা। স্ত্রীলোক তো না, যেন বাঘিনী।"

কিন্তু চারোদায়েভা যখন দক্ষিণে ও বামে মাথা হেলিয়ে বিশাল অধরে হাসতে হাসতে তাদের টেবিলের কাছে এসে দাঁড়ায় অভিনেতা তখন মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় ধীরে ধীরে উঠে পড়েন, হাত দু'টো একবার বাড়িয়ে দিয়েই আবার চিবুকের নীচে নিয়ে রাখেন।

"নিনচকা.. প্রাণাধিকে..আহামরি, কি সুন্দর বেশ! না না, দোহাই তোমার! ডাক্তার আমাকে পূর্ণ বিশ্রামের ব্যবস্থা দিয়েছেন, প্রিয়ে!"

চারোদায়েভা তার অস্থিচর্মসার হাত দিয়ে আদর করে অভিনেতার গালে টোকা মারে এবং নাসিকা কুঞ্চিত করে বলে ঃ

"গত রাত্রে আমার সম্বন্ধে রেস্তোরাঁয় তুমি কি বলেছিলে, এ্যাঁ?"

"তোমার সম্বন্ধে গতকাল রেস্তোরাঁয় আমি বলেছি? নিনচকা, তুমি তা বিশ্বাস কর?"

"কিছুই বলনি?"

"না, আমাকে বিশ্বাস কর। কেউ আমার সম্বন্ধে বানিয়ে বলে থাকবে।"

চারোদায়েভা হাসে আর তার একটা ছোট আঙুল অভিনেতার অধরে রাখে ঃ

"তুমি জান তোমার ওপর রাগ করে আমি বেশিক্ষণ থাকতে পারিনে।" তারপর গলার স্বর পরিবর্তন করে অভিনয়ের ভঙ্গীতে নিকলাই ইভানোভিচকে সে বলে ঃ

"আপনার ওখানে আমি গিয়েছিলাম ঃ মনে হ'ল আপনার কোন আত্মীয়া এসেছেন—খুব সুন্দরী।"

স্মোকোভনিকভ একবার বন্ধুর দিকে তাকিয়েই সসার থেকে জ্বলন্ত চুরুটটা তুলে নিয়ে এমনভাবে টানেন যে মনে হয় তার সমস্ত দাড়ি থেকেই ধূম নির্গত হচ্ছে।

"তাজ্জব ব্যাপার," বলেন তিনি। "এর কি অর্থ হতে পারে? এক্ষুনি গিয়ে দেখতে হচ্ছে ব্যাপরটা কি।" চুরুটটা তিনি সমুদ্রের জলে ছুড়ে ফেলে দেন। তারপর টুপীটা মাথার পেছন দিকে একটু সরিয়ে কাঠের সিঁড়ি দিয়ে নামেন এবং রূপোয়-বাঁধান ছড়িটা ঘুরোতে ঘুরোতে তীরের দিকে গিয়ে ওঠে না হোটেলে পা দিয়েই তিনি একেবারে অবাক হয়ে যান।

"এ কি দাশা, তুমি এখানে! কিছু হয়েছে নাকি?" পিঠের দিকে কপাট ভেজিয়ে তিনি প্রশ্ন করেন। দাশা মেঝেতে তার খোলা স্যুটকেসের পাশে বসে একটা মোজা রিপু করছে। ভগ্নীপতি ঘরে ঢুকতেই সে ধীরে উঠে দাঁড়ায়, চুম্বনের জন্য গাল বাড়িয়ে দেয় এবং অন্যমনস্কভাবে বলে:

"আপনাকে দেখে খুব খুশি হলুম। বাবা ও আমি ঠিক করেছি, আপনার প্যারিসে যাওয়া উচিত। দিদির দু'খানা চিঠি আমি সঙ্গে নিয়ে এসেছি। এই নিন। দয়া করে পড়ুন।"

নিকলাই ইভানোভিচ চিঠি দুটো দাশার হাত থেকে কেড়ে নেন এবং জানালার ধারে গিয়ে বসেন। দাশা ড্রেসিংরুমে চলে যায়। সেখানে গিয়ে সে পোশাকটা বদলাচ্ছে এমন সময় শুনতে পায় চিঠির পাতা ওল্টাবার খস্ খস্ শব্দ আর আর ভগ্নীপতির বুকভাঙ্গা দীর্ঘনিঃশ্বাস। তারপর আর কোন শব্দ নেই। দাশা কাণ খাড়া করে থাকে।

"তোমার খাওয়া দাওয়া হয়েছে?" অকস্মাৎ জিজ্ঞেস করেন তিনি। "খিদে পেয়ে থাকে তো চল তাঁবুতে।"

"দিদিকে তবে আর তিনি ভালবাসেন না," ভাবে দাশা। দু'হাতে মাথার টুপীটা সে ঠিক করে নেয় এবং স্থির করে আজ আর প্যারিস সম্বন্ধে সে কিছু বলবে না।

তাঁবুতে যাবার পথে নিকলাই ইভানোভিচ একটি কথাও বলেন না, মাটির দিকে চেয়ে তিনি পথ চলেন, কিন্তু দাশা যখন তাঁকে প্রশ্ন করে, তিনি সমুদ্র-স্নান করেন কিনা, তখন খুশি হয়ে তিনি মুখ তোলেন এবং বলেন যে, "স্নানের পোশাক" বন্ধ করার জন্য যে সমিতি গঠন করা হয়েছে প্রধানত স্বাস্থ্যের কথা বিবেচনা করেই তা করা হয়েছে।

"এক মাস সমুদ্রস্নান করলে দেহ যে আইওডিন টেনে নেয়, কৃত্রিম উপায়ে একমাসে কারো দেহে তা দেওয়া সম্ভব হয় না। এখন ভাব দেখি অবস্থা। তাছাড়া রোদ এবং উত্তপ্ত বালি থেকে দেহ তাপ গ্রহণ করে। আমরা পুরুষরা খালি শর্টস্ পরি, তা মন্দ নয়, কিন্তু মেয়েদের দেহের প্রায় দশআনাই ঢাকতে

হয়। আমরা এর বিরুদ্ধে আন্দোলন আরম্ভ করেছি।...আগামী রবিবার এসম্পর্কে আমার একটা বক্তৃতা দেবার কথা আছে।"

জলের ধারে হলদে রংএর নরম, মসৃণ বালির ওপর দিয়ে তারা দুজনে হেঁটে চলে. সমুদ্রতরঙ্গে অনেক ঝিনুক এসে এখানে বালির সঙ্গে মিশে আছে। অদূরে একটা চড়ার মত পড়েছে, সেখানে ছোট ছোট ঢেউ এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ছে আর ফেনা তুলছে, স্নানের লাল-টুপী-পরা দুটি তরুণী তার মধ্যে শোলার মত ডুবছে আর ভাসছে।

"ওরা আমাদের দলের," খুব সহজভাবে বলেন নিকলাই ইভানোভিচ। কিন্তু দাশার মধ্যে যেন ক্রমশ একটা উত্তেজনা ও অস্থিরতার ভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে। সেই প্রান্তরের মাঝে কৃষ্ণবর্ণের জাহাজটা দেখার পর থেকেই তার মধ্যে এভাবটা চলছে।

দাশা থেমে দাঁড়ায় এবং দেখতে থাকে কিভাবে সমুদ্রের জল পাতলা ফেনার মত বালির ওপর উঠে এসে আবার নেমে যাচ্ছে আর পেছনে রেখে যাচ্ছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলধারা; তটের সঙ্গে সাগরের এই মিলন দাশার কাছে এতটা আনন্দদায়ক ও শাশ্বত বলে মনে হয় যে, সে বসে পড়ে জলে হাত ডুবিয়ে না দিয়ে আর পারে না। পাশেই একটা ছোট কাঁকড়া ভয় পেয়ে খানিকটা বালি ছিটিয়ে গর্তের মধ্যে ঢুকে যায়। একটা ঢেউ এসে দাশার বাহু পর্যন্ত ভিজিয়ে দেয়।

"তোমার খানিকটা পরিবর্তন হয়েছে," দাশার দিকে স্পষ্টভাবে চেয়ে বলেন নিকলাই ইভানোভিচ। "হয় তুমি আরো সুষমামণ্ডিত হয়ে উঠেছ নয় তো একটু রোগা হয়ে গেছ, আর তা না হলে তোমার বিয়ের সময় হয়েছে।"

মুখ ফিরিয়ে দাশা বিস্মিতভাবে ভগ্নীপতির দিকে তাকায় এবং উঠে দাঁড়ায়। হাতের জল না মুছেই সে তাঁবুর দিকে চলে যায়; অভিনেতা সেখান থেকে তাঁর ঘাসের টুপী নেড়ে ডাকছিলেন। দাশাকে তাঁরা মাছ ও দই খাওয়ান এবং শ্যাম্পেনও আনিয়ে দেন; অভিনেতা মাঝে মাঝে বাড়াবাড়ি করে ফেলেন, তিনি যেন একেবারে মোহিত হয়ে গেছেন, আপন মনে বলেন তিনিঃ "আহা! কি সুন্দর!" তারপর নাট্য বিদ্যালয়ের কয়েকজন তরুণ ছাত্রকে এনে তিনি দাশার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। কথা বলতে গিয়ে তাদের গলার আওয়াজ এমনভাবে চেপে আসছিল মনে হচ্ছিল তারা বুঝি স্বীকারোক্তি করছে। নিকলাই ইভানোভিচ "তাঁর দাশেংকার" এই সাফল্যে গর্ব বোধ করেন।

দাশা সুরা পান করে, হাসে, চুম্বনের জন্য হাতটা এগিয়ে দেয় কিন্তু তার চোখ পড়ে থাকে উজ্জ্বল, ঘন নীল, অশান্ত সাগরের দিকে। সে মনে মনে বলে, "এই তো আনন্দ।"

দিনের বেলা স্নান ও ভ্রমণের পর রাত্রে তারা ভোজন করতে হোটেলে যায়। খাবার ঘরটা কোলাহলপূর্ণ। প্রচুর আলো রয়েছে সেখানে এবং যারা উপস্থিত তারা সকলেই বেশভূষায় পরিপাটি। অভিনেতা প্রেম সম্পর্কে

বেশ উত্তেজিতভাবে অনেক কথাই বলেন। নিকলাই ইভানোভিচ দাশার দিকে বার বার চান, একটু বেশিমাত্রায় মদ্যপান করেন এবং কিরকম বিষণ্ণ হয়ে পড়েন। কিন্তু পর্দার ফাঁক দিয়ে সারাক্ষণ দাশার চোখ পড়ে থাকে জলের ওপর যেখানে আলোর স্বচ্ছ ঝিলিক দেখা যাচ্ছে, মনে হচ্ছে তা বেশি দূরে নয় এবং একবার দেখা দিচ্ছে আবার মিলিয়ে যাচ্ছে।

অবশেষে টেবিল ছেড়ে উঠে সে সমুদ্রতটে নেমে যায়। দেখে সে, তারকাহীন নির্মল আকাশের নিম্নদেশে বিরাজ করছে পূর্ণচন্দ্র, নীচে দিকচক্রবালের এক-প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত সমুদ্রের ওপর দিয়ে চলে গেছে এক আলোর প্রদীপ্ত পথ, মনে হয় তা মাছের আঁশে আবৃত। দাশা তার এক হাতের আঙুল আর এক হাতের আঙুলের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে কর ফুটায়।

নিকলাই ইভানোভিচের কণ্ঠস্বর তার কাণে আসে, মনে হয় তিনি এগিয়ে আসছেন। স্বপ্নাতুরের মত জল যেখানে এসে তটকে চুম্বন করছে তার ধার দিয়ে দাশা দ্রুত আরো খানিকটা এগিয়ে যায়। তার নজরে পড়ে একটি রমণী বালির ওপর বসে আর তার জানুতে মাথা রেখে একটি পুরুষ শুয়ে আছে। তারপর দেখে গাঢ় ধূমলবর্ণ জলের ওপর যে চঞ্চল আলোর খেলা চলেছে তাতে একটি মানুষের মুখ, লোকটি তার মাথা ভাসিয়ে রেখেছে। চন্দ্রালোকে তার চোখ-দুটো জ্বলজ্বল করছে। দাশার দিকে সে তাকায় এবং অনেকক্ষণ পর্যন্ত তার গমন নিরীক্ষণ করে। তারপর সে দেখতে পায়, দুটি নরনারী নিবিড়ভাবে আলিঙ্গনাবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে; যেতে যেতে একটা দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ও চুম্বনের শব্দ তার কানে আসে।

দূরে কে একজন চীৎকার করে ডাকছেঃ "দাশা, দাশা!" উত্তর দিল না সে। পা গুটিয়ে সে বালির ওপর বসে, জানুর ওপর কনুই দুটো স্থাপন করে চিবুকের তলায় হাত রাখে। সে-মুহূর্তে তেলেগিন এসে যদি তার পাশে বসে, তার কটিদেশ বাহুতে বেষ্টন করে সে যদি তার শান্ত সংযত কণ্ঠে বলে "তুমি কি আমার?"—সে উত্তর দেবেঃ "হ্যাঁ।"

কাছেই ছোট একটা বালির ঢিবির ওপাশে একটা লোক মাথা নীচু করে পড়ে ছিল। সে গাঝাড়া দিয়ে উঠে বসে, সাগরবক্ষে যে আলোপথ পড়েছে, যেখানে মনে হচ্ছে চাঁদের আলো শিশুর মন ভুলোবার জন্য খেলা করছে, সেদিকে সে অবনত মস্তকে অনেকক্ষণ চেয়ে থাকে; তারপর সে উঠে দাঁড়ায় এবং একটা ঔদাসীন্যের ভাব দেখিয়ে মাথা নীচু করে দাশার পাশ দিয়ে চলে যায়। দাশা দেখে, এ যে বেসনভ। তার বুক দুরদুর করে কেঁপে ওঠে।

পুরাতন জগতের শেষ ক'টা দিন দাশার কাছে এভাবে এসে দেখা দেয়। আর মাত্র কয়েকটা দিনই অবশিষ্ট আছে, সে-দিনগুলি আনন্দপূর্ণ, নির্ঝঞ্ঝাট এবং শেষ গ্রীষ্মের উত্তাপে পরিপূর্ণ। লোক সাধারণত একথাই ভাবতে অভ্যস্ত যে, আগামী কালও দূরবর্তী গিরিমালার নীলাভ প্রান্তরেখার মতই পরিষ্কার

হবে—এমন কি বিজ্ঞ এবং তীক্ষ্মবুদ্ধিসম্পন্ন লোকও তাদের জীবনের এই মুহূর্তের পর কি আছে তা দেখতে পায় না। বর্ণে, গন্ধে পরিপূর্ণ, জীবনের সর্বপ্রকার মূল রসে অভিসিঞ্চিত এই রঙীন মুহূর্তের পরে রয়েছে এক সূচীভেদ্য অন্ধকার। দৃষ্টি, স্পর্শ, কল্পনা, কিছু দিয়েই সেই পর্দা ভেদ করা যায় না; একমাত্র দুর্যোগের আগে জন্তুজানোয়ার যেমন তা টের পায় তেমনি একটা অজ্ঞাত সহজাত প্রবৃত্তিবলে কেউ কেউ হয়ত আভাস পায় যে কি আসছে এবং তদনুসারে তাদের মধ্যে প্রতিক্রিয়া হয় ও একটা অস্পষ্ট অস্বস্তির ভাব দেখা দেয়।

পৃথিবীর দিকে নেমে আসার জন্য এক অদৃশ্য মেঘপুঞ্জ যেন সর্বদাই প্রস্তুত থাকে, প্রবল ঘূর্ণীবাত্যায় অসংখ্য রূপ নেয় সে, কোথাও প্রচন্ড ভীমরূপ, আবার কোথাও ক্লান্ত রিক্ত। কিন্তু তার একমাত্র আভাস হচ্ছে সূর্যালোকে একখন্ড ছায়া, দক্ষিণ-পূর্ব থেকে উত্তর-পশ্চিম পর্যন্ত, পৃথিবীর সমস্ত পুরনো লম্পট ও পাপপূর্ণ জীবনের ওপর পড়েছে সে ছায়া।

॥ তেরো ॥

বেসনভ সমুদ্রতীরে হাতপা ছড়িয়ে শুয়ে দিনের পর দিন কাটায়। জ্বলন্ত সূর্যের তাপে দগ্ধ ও হাসিতে ভরা রমণীবদন এবং পুরুষদের রোদে-পোড়া তামাটে ও উদ্দীপিত মুখমন্ডলের দিকে চেয়ে চেয়ে তার মনে হয়েছে বুকের ভেতরে তার হৃদপিন্ডটা বুঝি একটা বরফের খন্ড হয়ে গেছে। সাগরের দিকে চেয়ে সে ভাবে হাজার হাজার বছর ধরে ঐ তরঙ্গরাশি তীরে এসে সশব্দে আঘাত করছে। একসময় এই বেলাভূমি ছিল নির্জন—আর এখন লোকজনে পরিপূর্ণ; তারা মরে যাবে এবং এই বেলাভূমি আবার নির্জন হবে, কিন্তু এই সাগরের জল তখনো বালির ওপর দিয়ে ছুটে ওপরের দিকে আসবে। একথা চিন্তা করতে করতে করতে বেসনভ একবার ভ্রূভঙ্গি করে এবং তারপর ছোট ছোট ঝিনুক কুড়িয়ে স্তূপীকৃত করে। অবশেষে তার নিভে-যাওয়া সিগারেটের অবশিষ্ট অংশটা সেই ঝিনুকগুলির মধ্যে ঠেসে গুঁজে দেয়। এরপর সে স্নান করবে, ধীরেসুস্থে খাবে এবং তারপর গিয়ে শোবে।

একদিন সন্ধ্যাবেলা একটি তরুণী এসে তার অদূরেই বালির ওপর বসে এবং অনেকক্ষণ ধরে চাঁদের জ্যোৎস্নার দিকে চেয়ে থাকে। তার অঙ্গ থেকে একটা মৃদু সুগন্ধ ভেসে আসে। একটা স্মৃতি তার অসাড় মস্তিষ্ককে নাড়া দেয়। ঘুরে বসে বেসনভ আপন মনে বলেঃ "নাঃ, ঐ প্রলোভনে আমি আর ভুলব না, চুলোয় যাক।" উঠে দাঁড়ায় সে এবং আবার হোটেলের দিকে চলে যায়।

এই অবাঞ্ছিত লোকের সঙ্গে অপ্রত্যাশিত সাক্ষাতে দাশা ভয় পেয়ে যায়।

সে ভেবেছিল তার পিতার্সবুর্গের জীবন ও সেই দুর্যোগরজনীসমূহের বুঝি চিরতরে অবসান হয়েছে। সে আরো ভেবেছিল, যে বেসনভ একসময় তার চিন্তাকে জুড়ে বসেছিল এতদিনে সে নিশ্চয়ই বিস্মৃতির অতলগর্ভে ডুবে গেছে।

কিন্তু তার প্রথম দর্শনেই, চন্দ্রালোকে কালো ছায়ামূর্তির ন্যায় যে মুহূর্তে সে তার পাশ দিয়ে চলে যায় সে মুহূর্তেই সে সমস্তই যেন নতুন শক্তি নিয়ে আবার তার কাছে এসে হাজির হয়, এবার আর আবছা বা অপরিজ্ঞাত আবেগ নয়, এবার জেগেছে মধ্যাহ্নতাপের মত সুস্পষ্ট জ্বলন্ত আকাঙ্ক্ষা; লোকটাকে অনুভব করতে চায় সে। তাকে ভালবাসার জন্য নয়, তার জন্য নিজেকে ক্ষতবিক্ষত করার জন্যও নয়, সংকোচ দ্বিধার মধ্যে থাকার জন্যও নয়—লোকটার স্পর্শ অনুভব করতে চায় সে।

জ্যোৎস্নালোকিত সাদা ঘরে ধলা খাটটায় বসে আছে দাশা। ক্ষীণকণ্ঠে সে আপন মনে বার বার বলছেঃ

"উঃ, ভগবান! হে পরমেশ্বর! এ কি হ'ল আমার?..."

পরদিন সকাল সাতটায় দাশা সমুদ্রের ধারে চলে যায়, পোশাকপরিচ্ছদ ছাড়ে এবং এক হাঁটু জলে নেমে থমকে দাঁড়ায়, কি ভাবে। সমুদ্রের আর সেই ঔজ্জ্বল্য নেই; এখন তার রং নিষ্প্রভ নীল, কেবল দূরে এখানে সেখানে মুক্তার ন্যায় সামান্য বীচিমালা দেখা যাচ্ছে। সমুদ্রের জল ধীরে তার হাঁটুর ওপর পর্যন্ত উঠে আবার নেমে যায়। দাশা দুহাত বাড়িয়ে সেই স্বর্গীয় সুশীতল ক্রোড়ে ঝাঁপ দেয় এবং সাঁতার কাটতে থাকে। তার সর্বাঙ্গ জুড়িয়ে যায়, দেহ লবণাক্ত হয়ে ওঠে। জল থেকে উঠে তার টার্কিশ তোয়ালের স্নানাবরণ দেহটাকে আবৃত করে সে বালির ওপর শুয়ে পড়ে। বালিটা উষ্ণ।

"আমি একমাত্র ইভান ইলিয়িচকেই ভালবাসি," তার শীতল ও স্নিগ্ধ বাহুর ওপর গাল রেখে ভাবে সে। "আমি ভালবাসি, ইভান ইলিয়িচকেই ভালবাসি। তার চিন্তা আমাকে নির্মল করে, সজীবতা এনে দেয়, আনন্দদান করে। ভগবানকে ধন্যবাদ যে আমি ইভান ইলিয়িচকে ভালবাসি। আমি তাকে বিয়ে করব।"

তার নাড়ীর স্পন্দনের তালে তালে যেন সমুদ্রের ছোট ছোট ঢেউ ওঠানামা করছে, এই ভাবতে ভাবতে সে চোখ বোজে এবং ঘুমিয়ে পড়ে।

বড় সুখনিদ্রা। বালির ওপর শুয়ে সারাক্ষণ তার নিজের দেহটা উষ্ণ ও হাল্কা বলে বোধ হয়। ঘুমের মধ্যে নিজেকে বড় ভাল লাগে তার।

সেদিনই সন্ধ্যাবেলা। নির্মেঘ রক্তিম, আভার মধ্যে থালার মত সূর্যটা ডুবে যাচ্ছে। সোমরাজ বাগানের ভেতর দিয়ে এঁকে বেঁকে যে রাস্তাটা গিয়েছে তারই ধারে একটি প্রস্তরের ওপর বসে আছে বেসনভ। দাশা বেড়াতে বেড়াতে গিয়ে সেখানে উপস্থিত। বেসনভকে দেখেই সে থেমে যায়, ভাবে ঘুরে ছুটে

পালাবে; কিন্তু সকালবেলার সেই মনের হাল্কা অবস্থা আর তার নেই, আবার পাদু'টো তার ভারী হয়ে গেছে, মনে হয় মাটিতে শিকড় গেড়ে বসেছে তারা। সচকিতভাবে দেখে সে বেসনভ তার দিকে এগিয়ে আসছে, তাকে এখানে দেখে সে যেন মোটেই বিস্মিত হয়নি। বেসনভ তার ঘাসের টুপী মাথা থেকে নামিয়ে বিনয়াবনত হয়ে সজ্জনের মতই তাকে অভিবাদন জানায়।

"গতকাল আমি তাহলে ভুল করিনি, দারিয়া দ্মিত্রেভ্না—তুমিই সমুদ্রের ধারে ছিলে?"

"হ্যাঁ, আমি..."

বেসনভ একটু থামে এবং চোখ দু'টো নামায়। তারপর দাশাকে ছাড়িয়ে তার দৃষ্টি পড়ে গিয়ে দূরের তৃণপ্রান্তরটার ওপর।

"সূর্যাস্তের সময় এই জায়গায় থাকলে মনে হয় এটা একটা মরুভূমি। এদিকে লোক কদাচিৎ আসে। চারদিকে কেবল সোমরাজ বৃক্ষ আর প্রস্তর-রাশি। এই গোধূলির আলোতে এখানে কল্পনা করতে একটুও কষ্ট হয় না যে, এই পৃথিবীতে আর একটি লোকও অবশিষ্ট নেই।"

বেসনভ হাসে, তার শুভ্র দন্তরাজি ধীরে ধীরে বিকশিত হয়। ফাঁদে-পড়া জংলা পাখীর ন্যায় দাশা তার দিকে একবার তাকায়। তারপর লম্বা লম্বা সোমরাজ গাছের ঝোঁপের মধ্য দিয়ে যে রাস্তা গিয়েছে সেই রাস্তা ধরে সে বেসনভের সঙ্গে হাঁটতে থাকে। গাছগুলি থেকে তীব্র কটু গন্ধ বেরুচ্ছে, উঠন্ত চাঁদের আলোতে শুষ্ক মাটির ওপর ঝোপগুলির আবছা ম্লান ছায়া পড়েছে।

"লোভ, লোভ—তা থেকে মুক্তি নেই," বলে বেসনভ। "লোভই তোমাকে প্রলুব্ধ করে, ভুলিয়ে নিয়ে যায় এবং আবার তুমি ফাঁদে পড়। কি কৌশলে এই মায়াজালের সৃষ্টি হয়েছে দ্যাখ।"—অনূর্ধ্ব আকাশে গোল চাঁদের দিকে সে ছড়ি তুলে নির্দেশ করে—"সমস্ত রজনী এ জাল বুনবেঃ এই রাস্তাটিকে মনে হবে একটি ক্ষুদ্র তটিনী, প্রতিটি ঝোপকে মনে হবে লোকালয়, এমন কি শবও সুন্দর হয়ে উঠবে আর রমণীর আনন মনে হবে রহস্যে পরিপূর্ণ। হয়ত তাই হওয়া উচিত, হয়ত এই প্রতারণার মধ্যেই রয়েছে সমস্ত বিজ্ঞতা।.. কত ভাগ্যবতী তুমি, দারিয়া দ্মিত্রেভ্না, তুমি কত ভাগ্যবতী..."

"কিন্তু এ প্রতারণা হবে কেন? এতে তো আমি প্রতারণার কিছু দেখছিনে। আমি তো দেখছি শুধু চাঁদের আলো," জোর দিয়ে বলে দাশা।

"হ্যাঁ, ঠিক তাই, দারিয়া দ্মিত্রেভ্না, ঠিক তাই। 'তোমরা শিশুর মত সরল হও।' প্রতারণা হ'ল সেখানে যে আমি এর কিছুই বিশ্বাস করিনে। আবার একথাও আছেঃ 'সর্পের মত ক্রূর হও!' আমরা এ দু'এর মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান কি করে করি? কি করতে হবে তার জন্যে? তাঁরা বলেন প্রেমের মধ্যে রয়েছে এর সমাধান। তোমার কি মনে হয়?"

"জানিনে আমি। আমার কিছুই মনে হয় না।"

"কোন্ জগৎ থেকে প্রেম আসে? কোন্ ছলে তাকে এখানে আনা যায়? কি ব'লে তাকে ডাকা যায়? ধুলোয় লুটিয়ে কি একজনকে চীৎকার করে বলতে হবেঃ 'হে ভগবান, আমাকে কিছু প্রেম পাঠিয়ে দাও?'..." দাঁত বার করে বেসনভ মৃদু হাসে।

"আমি আর যাব না," বলে দাশা। "এবার সমুদ্রের ধারে আবার ফিরে যাব।"

ঘুরে তারা সোমরাজের ঝোপের ভেতর দিয়ে বালির ঢিবির দিকে হেঁটে চলে। অকস্মাৎ বেসনভ কোমল-ভীরু কণ্ঠে বলেঃ

"পিতার্সবুর্গে তুমি আমাকে যা বলেছিলে তা সমস্তই আমার মনে আছে—প্রত্যেকটি কথা। আমি তোমাকে ভয় পাইয়ে দিয়েছিলাম।" দাশা সোজা সামনের দিকে তাকায় এবং আরো দ্রুতপদে চলে। "একটা তীব্র অনুভূতি তখন আমাকে চঞ্চল করে তুলেছিল। তোমার অপরূপ সৌন্দর্য দেখে নয়, না তা নয়। তোমার সুললিত কণ্ঠস্বর আমার কাণের ভেতর দিয়ে গিয়ে মর্ম-স্পর্শ করেছিল, তাতে আমি অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম। তোমার দিকে চেয়ে চেয়ে আমি ভাবছিলামঃ আমার মুক্তি রয়েছেঃ তোমাকে আমার হৃদয় দেওয়া, কাঙাল হয়ে যাওয়া, তুচ্ছ হয়ে যাওয়া, তোমার আলোয় নিজেকে মিলিয়ে দেওয়া, আর হয়ত তোমার হৃদয় জয় করা, অতুল ঐশ্বর্যের অধিকারী হওয়ার মধ্যে। তুমি এখানে এসেছ, দারিয়া দ্মিত্রেভ্না, বুঝলে, এবং আমাকে এখন সেই কূটপ্রশ্নের সমাধান করতেই হবে।"

বেসনভকে পেছনে ফেলে দাশা দৌড়ে গিয়ে একটা বালির ঢিবির ওপর ওঠে। সে দেখতে পায়, দীর্ঘ একফালি আলোর মধ্যে যেখানে আকাশ এসে সমুদ্রে ছুয়েছে এবং যার ওপর একটা ম্লান আভা দেখা যাচ্ছে, সুবিস্তীর্ণ অম্বুরাশির চিকচিকে আঁশগুলির ওপর দিয়ে চন্দ্রালোকের একটা প্রশস্ত পথ সেখানে গিয়ে শেষ হয়েছে। দাশার হৃদপিণ্ডের স্পন্দন এত দ্রুত হচ্ছে যে চোখ না বুজে সে পারে না।

"ভগবান, তার হাত থেকে আমাকে রক্ষা কর," মনে মনে বলে সে। বেসনভ হাতের ছড়িটা দিয়ে বারকয়েক বালি খোঁচায়।

"কিন্তু এখন একটা সিদ্ধান্তে আসতেই হবে, দারিয়া দ্মিত্রেভ্না। এই আগুনে একজনকে পুড়ে মরতেই হবে। সে কি তুমি মরবে? না আমি? ভেবে দ্যাখ, এবং তারপর আমাকে উত্তর দাও।"

"আমি বুঝিনে," চট করে উত্তর দেয় দাশা।

"তুমি যখন নিঃস্ব হও, নিজেকে ক্ষয় করে দাও, পুড়ে ছাই হয়ে যাও, এক-মাত্র তখনই এই চাঁদের আলো, মোহ সৃষ্টির এসমস্ত উপাদান ছাড়াও তোমার প্রকৃত জীবনকে তুমি খুঁজে পাবে। সেখানেই আসবে তোমার বিচক্ষণতা।

তা পেতে হলে তোমার একমাত্র করণীয় হ'ল, তোমার কৌমার্যের বাঁধন খুলে দেওয়া..."

বেসনভ তার তুষারহিম হাতের মধ্যে দাশার হাতটাকে টেনে নেয় এবং তার চোখে চোখ রাখে। দাশা কিছু বলে না, কেবল একটা ঘৃণার দৃষ্টিতে ভ্রূ দুটো কুঞ্চিত করে। বেশ খানিকক্ষণ মৌন থাকার পর সে বলে :

"আমাদের এখন যার যার বাড়ি ফিরে শুয়ে পড়াই ভাল। যা বলার আমরা বলেছি, সমস্ত দিক থেকেই বিষয়টা আলোচনা করেছি—আর নয়, দেরি হয়ে যাচ্ছে..."

বেসনভ দাশার সঙ্গে তার হোটেল পর্যন্ত যায়, বিনীতভাবে তার কাছ থেকে বিদায় নেয় এবং টুপীটা মাথার পেছন দিকে ঠেলে দিয়ে সমুদ্রতীর ধরে হাঁটতে থাকে। সঞ্চরণশীল অস্পষ্ট লোকগুলির দিকে সে কেবল তাকায়। হঠাৎ থেমে ঘুরে একটি দীর্ঘাঙ্গী স্ত্রীলোকের দিকে সে এগিয়ে যায়। একটি সাদা শাল গায়ে একেবারে স্থিরভাবে সে দাঁড়িয়ে আছে। বেসনভ কাঁধে ছড়ি তুলে তার দুমাথা দুহাতে ধরে এবং বলে :

"সুসন্ধ্যা, নিনা।"

"সুসন্ধ্যা।"

"সমুদ্রের ধারে একা একা দাঁড়িয়ে কি করছ ?"

"এমনি এখানে দাঁড়িয়ে আছি।"

"একা যে ?"

"একা বলেই একা," চারোদায়েভা কথাটা আস্তেই বলে, তবে তাতে উষ্মা আছে।

"আমার ওপর কি এখনো সত্যি তুমি রেগে আছ নাকি ?"

"নাগো, মশায় ; রাগ আমার অনেকদিন আগেই চলে গেছে।"

"নিনা, চল না আমার ঘরে।"

মুখটা পেছনে সরিয়ে নিয়ে চারোদায়েভা অনেকক্ষণ চুপ করে থাকে। তারপর অস্পষ্ট, কম্পিত কণ্ঠে সে বলে :

"তোমার কি মাথা খারাপ ?"

"তুমি কি আজ জানলে নাকি ?"

বেসনভ তার বাহু ধরে টানে, কিন্তু বিদ্যুৎগতিতে সে তার হাতটা সরিয়ে নেয় এবং তারপর ধীরে বেসনভের পাশাপাশি হেঁটে চলে। তৈলাক্তকৃষ্ণ নীর চন্দ্রালোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে।

পরদিন প্রত্যূষে নিকলাই ইভানোভিচ দাশার ঘরের সামনে এসে দোরে মৃদু করাঘাত করে।

"দানিয়ুশা, ওঠ লক্ষ্মীটি আমার, চল কফি খেতে যাই।"

দাশা বিছানা ছেড়ে ওঠে এবং জুতোমোজার দিকে চেয়ে দেখে, তার ওপর ধূসর ধূলি জমে আছে। কিছু ঘটে থাকবে। না আবার সেই বিশ্রী স্বপ্নটা দেখছে সে? না, এ যে তার চেয়েও খারাপ—এ স্বপ্ন নয়। কোন রকমে অঙ্গ বস্ত্রাবৃত করে সমুদ্রস্নানের জন্য বেরিয়ে পড়ে সে। কিন্তু জল দেখে দেখে তার ক্লান্তি এসে গেছে, রোদে গা পুড়ে যায়। স্নানের পোশাক-পরা অবস্থায় সে বালির ওপর বসে পড়ে এবং গোটানো অনাবৃত হাঁটুদুটোকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে। মনে মনে ভাবে দাশা, এখানে ভাল কিছুর প্রত্যাশা করা যায় না।

"আমার না আছে মাথা, না আছে সাহস, না আছে অধ্যবসায়। আমি একটা নিষ্কর্মা ভবঘুরে। কল্পনাবিলাসী। কি যে আমি চাই নিজেই জানিনে। সকালবেলা চাই এক জিনিস, সন্ধ্যাবেলা চাই আর এক জিনিস। এটাকে আমি অত্যন্ত ঘৃণা করি।"

ঘাড় হেঁট করে সে সমুদ্রের দিকে তাকায়। এতটা বিভ্রান্ত ও ম্রিয়মান হয়ে পড়েছে সে যে, তার দুচোখ জলে ভরে ওঠে।

"কেউ হয়ত ভাবতে পারে কি মহামূল্যবান বস্তুই না আমি সযত্নে রক্ষা করছি। কে চায় এ? পৃথিবীতে কেউ চায় না। আমিও তো সত্যি কাউকে ভালবাসিনে। তাহলে বেসনভ যা বলেছে তাই তো ঠিক—সমস্ত পুড়িয়ে ফেল, ছাই হয়ে যাও এবং তারপর শান্ত হও। সে আমাকে তার কাছে যেতে বলেছে। আজই সন্ধ্যাবেলা কেন যাও না এবং ওঃ, নাঃ!"

দাশাব সর্বাঙ্গে এত জ্বালা হয়েছে যে সে তাব সুশীতল জানুদ্বয়ের ওপব মুখ রাখে। স্পষ্ট বুঝতে পেরেছে সে যে, এই দ্বন্দ্বপূর্ণ জীবন আর তার পক্ষে বহন করা সম্ভব হচ্ছে না। যে কৌমার্যের বোঝা তার পক্ষে দুর্বহ হয়ে উঠেছে হয় যে-কোনভাবে তা নামিয়ে হাল্কা হতে হবে, আর তা না হলে তাব অদৃষ্টে কি দুঃখ আছে কে জানে।

ব্যথাতুব হৃদয়ে সেখানে বসে সে ভাবতে থাকে: "আচ্ছা আমি যদি এখান থেকে আমার বাবাব কাছে ফিরে যাই। সেই মশামাছি ও ধুলোভরা শহবে। শরৎকাল পর্যন্ত রইলাম। পড়াশুনো চালিয়ে গেলাম। দিনে বার ঘণ্টা খাটলাম। শুকিয়ে চেহারাটা একেবারে খারাপ হয়ে গেল। আন্তর্জাতিক আইন আদ্যোপান্ত মুখস্থ করে ফেললাম। বেশ রুচিসম্মত পোশাকপরিচ্ছদ পরলাম এবং খ্যাতনাম্নী মহিলা আইনবিশারদ 'বুলাভিনা' হলাম।..নিশ্চয়ই, এটাই তো শ্রেয়ঃ পথ!"

গায়ের ধুলো ঝেড়ে ফেলে দাশা বাড়ি ফিরে যায়। নিকলাই ইভানোভিচ রেশমী পায়জামা পরে গাড়ী-বারান্দায় একটা দোলন-চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে আনাতোল ফ্রাঁস-এর একখানি নিষিদ্ধ উপন্যাস পড়ছেন। দাশা এসে দোলন-চেয়ারের হাতলে বসে পা দুলায় এবং বিষণ্ণ কণ্ঠে বলে:

"দিদির সম্পর্কে তো আমরা আলোচনা করব বলেছিলাম, বলিনি?"

"হ্যাঁ, বলেছিলাম বই কি।"

"জানেন, জামাইবাবু, স্ত্রীলোকের জীবনটা সব সময়ই বড় কঠিন। এমন কি উনিশ বছর বয়সেও একজন জানে না যে, নিজেকে নিয়ে সে কি করবে।"

"তোমার এখন যে বয়েস, দাশেংকা, তাতে তোমার উচিত বেশি দার্শনিক না হয়ে বেপরোয়াভাবে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়া। বেশি ভাবলে কূল পাবে না। ভাল কথা, তোমাকে দেখে না বলেও তো আর পারছিনে—তুমি কি জান যে কি অপূর্ব সুন্দরী তুমি?"

"আমি জানতাম আপনি একথাই বলবেন! আপনার সঙ্গে কথা বলে লাভ নেই, জামাইবাবু। কখন কিভাবে কথা বলতে হয় আপনি জানেন না, যা মুখে আসে তাই বলেন। এজন্যই দিদি আপনাকে ছেড়ে চলে গেছে।"

নিকলাই ইভানোভিচ হেসে আনাতোল ফ্রাঁস-এর উপন্যাসটি পেটের ওপর রাখেন এবং নিজেব পুষ্ট হাতদু'খানি মাথার পেছনে দেন।

"বৃষ্টি নামলে ছোট পাখী নিজের গরজেই কুলায় ফেবে। তোমার মনে আছে তো কাতিয়া কিভাবে সাজগোছ করতো? ..সব কিছু সত্ত্বেও কাতিয়াকে আমি ভালবাসি। যেভাবেই হোক, আমরা এখন মুক্ত।"

"আপনি এখন একথা বলছেন! দিদি না হয়ে যদি আমি হতাম তবে আমিও ঠিক আপনার সঙ্গে এরকম ব্যবহারই করতাম।" রাগতভাবে সে গাড়ী-বারান্দার রেলিং-এর ধারে চলে যায়।

"তোমার যখন আবো বয়েস হবে তখন বুঝতে পারবে জীবনের উত্থান-পতনকে খুব বেশি গুরুত্ব দেওয়া বোকামি ও অনিষ্টকব," বলেন নিকলাই ইভানোভিচ। "এটা তোমাদের বংশের ধারা—সব কিছুকেই জটিল করে তোলা। আরো সহজ, স্বাভাবিক হওয়া ভাল।"

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেন তিনি এবং নিঃশব্দে হাতের নখগুলি দেখতে থাকেন। ঘর্মাক্ত-কলেবর একটি ছাত্র শহর থেকে ডাকেব চিঠিপত্র নিয়ে সাইকেলে চড়ে গাড়ী-বারান্দার পাশ দিয়ে চলে যায়।

"আমি গ্রামে শিক্ষিকার কাজ নেব," মুখ ভারী করে বলে দাশা।

নিকলাই ইভানোভিচ তৎক্ষণাৎ জানতে চান: "কোথায়?"

কোন জবাব না দিয়ে দাশা তার নিজের ঘরের দিকে চলে যায়। গিযে দেখে তার নামে দুটো চিঠি; একটা কাতিয়ার আর একটা তার বাবার।

ডাক্তার বুলাভিন লিখছেন:

"কাতিয়ার একখানি চিঠি তোকে পাঠালাম। চিঠিখানি আমি পড়েছি, আমার ভাল লাগেনি। তবে তোর ভাল লাগলেও লাগতে পারে। এখানে চলছে একরকম। গরম এখনো কমেনি। একমাত্র খবর হ'ল এই যে, গতকাল মিউনিসিপ্যাল পার্কে কয়েকজন গুণ্ডা সেমিয়ন সেমিয়োনোভিচ গভিয়াদিনকে ধরে খুব উত্তমমধ্যম দিয়েছে, তবে কেন যে মার খেল সে বলবে না। ও, ভাল কথা, তেলেগিন নামে কে একজন একখানা ছবিওয়ালা পোস্টকার্ডে তোকে

চিঠি লিখেছে, চিঠিটা কোথায় রেখেছি মনে নেই। যতদূর মনে পড়ে, সেও বোধ হয় এখন ক্রিমিয়ায়ই আছে।"

শেষের ক'টা ছত্র দাশা মনোযোগ দিয়ে বার বার পড়ে আর সঙ্গে সঙ্গে তার ভেতরটা তোলপাড় করতে থাকে। তারপর রাগে সে মাটিতে পদাঘাত করেঃ "একটা ভাল খবর আছে! ক্রিমিয়ায়...যতদূর মনে পড়ে।..." তার বাবা সত্যি কি অদ্ভুত প্রকৃতির লোক, এত অসাবধান, এত স্বার্থপর! চিঠিটা সে হাতের মুঠোতে কুঁচকে ফেলে এবং দু'হাতে চিবুক রেখে অনেকক্ষণ টেবিলের পাশে বসে থাকে। তারপর কাতিয়ার চিঠি পড়তে আরম্ভ করে সেঃ

"তোর হয়ত মনে আছে, দাশা, আমি তোকে লিখেছিলাম একটা লোক আমার চারপাশে ঘুরঘুর করছে। গতকাল সন্ধ্যাবেলা লুক্সেমবুর্গ উদ্যানে সে এসে আমার পাশে বসে। গোড়ায় একটু ভয় পেয়ে গেলাম, কিন্তু আমি বসেই রইলাম। সে তখন আমাকে বললঃ 'আমি তোমার পেছনে পেছনে ঘুরছি, তোমার নাম জানি আমি এবং তোমাকে চিনিও। এমন হতভাগা আমি যে, তোমাকে আমি ভালবেসে ফেলেছি।' তার দিকে চেয়ে দেখি বেশ গম্ভীর-ভাবে সেখানেই সে বসে আছে, তার মুখ কঠিন, মলিন ও ঈষৎ পীতবর্ণ। "আমাকে ভয় করবার কিছু নেই—আমি বৃদ্ধ এবং নিঃসঙ্গ। আমার 'এ্যাঞ্জিনা পেকটরিস' আছে, যে-কোন মুহূর্তে আমার মৃত্যু হতে পারে। আর তার মধ্যে—এই দুর্ভাগ্য!' গণ্ড বেয়ে তার অশ্রুধারা নেমে এল। তারপর মাথা ঝাড়া দিয়ে সে বললঃ 'আহা, তোমার মুখখানা কি সুন্দর, কি সুন্দর!' আমি বললামঃ 'আর আপনি আমার পেছনে ঘুরবেন না।' চলে যেতে চাইলাম, কিন্তু পারলাম না, তার জন্য এত দুঃখ হ'ল যে আরো খানিকক্ষণ বসে তার সঙ্গে কথা বললাম। চোখ বুজে সে শুনে গেল আর খালি মাথা নাড়ল। আচ্ছা ভাবতে পারিস, দাশা, আজই মেয়েছেলের হাতের লেখা একখানি চিঠি পেয়েছি আমি, বৃদ্ধ যে-বাড়িতে থাকতো সে-বাড়িরই পরিচারিকা লিখেছেন।..'তারই নির্দেশক্রমে' স্ত্রীলোকটি আমাকে জানিয়েছে যে, গতরাত্রে সেই বৃদ্ধ মারা গেছে।..কি সাংঘাতিক! .আমি এখন জানালা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে আছিঃ রাস্তায় হাজার হাজার আলো, গাড়ীগুলি এদিকে সেদিকে যাচ্ছে এবং গাছের সারির ভেতর দিয়ে লোক চলেছে। বৃষ্টি পড়ছে এবং একটা কুয়াশার ভাব হয়েছে। আমার কি মনে হচ্ছে জানিস? মনে হচ্ছে, এসমস্তই যেন অতীতের বস্তু, সব কিছুই মৃত, মানুষগুলিও মৃত, আমার মনে হচ্ছে যা-কিছু দেখছি তার কোনটারই যেন অস্তিত্ব নেই—আমি এখানে দাঁড়িয়ে দেখেও ঠিক দেখতে পাচ্ছিনে কি ঘটে যাচ্ছে, কেবলমাত্র একথাই জানি যে সব শেষ হয়ে গেছে, আর কিছুই বাকী নেই। আমার যেন কি হয়েছে। সময় সময় শুয়ে আমি এই দুঃখে কাঁদি যে আমার জীবন শেষ হয়ে গেছে। খুব বেশি না থাকলেও কিছু সুখ ছিল, ছিল বই কি, এমন

মানুষ ছিল যাকে আমি ভালবাসতাম—আর এখন তার লেশমাত্রও নেই।... হৃদয় আমার একেবারে শুষ্ক, ভেতরটা ফাঁকা হয়ে গেছে। জানি, দাশা আরো দুঃখ কপালে আছে, আমরা যে কদর্য জীবনযাপন করতাম এ সমস্ত হচ্ছে তারই শাস্তি।..."

দাশা চিঠিটা নিকলাই ইভানোভিচকে দেখায়।

চিঠিটা পড়তে পড়তে তিনি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেন এবং কাতিয়া সম্পর্কে সর্বদাই তাঁর কিরূপ বিবেকের দংশন হয় তাও তিনি বলেন।

"আমি দেখতে পেতাম আমাদের জীবনযাপনের ধারাটা ছিল সম্পূর্ণ ভুল; এই যে নিয়ত সম্ভোগ-লালসা, একদিন এর পরিণতি হবে গিয়ে প্রচণ্ড নৈরাশ্যের মধ্যে। কি করব আমি, আমাদের সকলের জীবনেরই—আমার, কাতিয়ার এবং আমাদের আশেপাশে যারা ছিল তাদের সকলেরই—একমাত্র লক্ষ্য ছিল আত্ম-তৃপ্তি। সময় সময় এখানে বসে আমি সমুদ্রের দিকে চেয়ে ভাবিঃ আর একটা রুশিয়া আছে যে জমি চষে, গরু চরায়, কয়লা কাটে, কাপড় বোনে, হাতুড়ি চালায়, সব কিছু গড়ে তোলে; আর এক শ্রেণীর লোক আছে যারা তাকে সেকাজ করতে বাধ্য করে; আর আমরা, বুদ্ধিজীবীরা, দেশের শিক্ষিত অভিজাতশ্রেণী, কেবলমাত্র দর্শকের ভূমিকায় অভিনয় করি, যে রুশিয়া আমাদের বাঁচিয়ে রাখে তার সঙ্গে কোন যোগই নেই আমাদের। আমরা প্রজাপতির দল। আমাদের জীবনের এটা বিড়ম্বনা। ধর, আমি যদি তরিতরকারী বা অন্য কোন প্রয়োজনীয় দ্রব্য উৎপাদনের চেষ্টা করি—কিছুই হবে না। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত এই প্রজাপতির মতই গুঞ্জন করে যাব, এমনই অভিশপ্ত জীবন! অবশ্য আমরা বই লিখি, বক্তৃতা দেই, রাজনীতি করি, কিন্তু সে সমস্তই তো অবসর সময়ের চিত্তবিনোদন, এমন কি বিবেকের তাড়নায় আমরা যখন তা করি তখনো তাই। আত্মতৃপ্তির এই দুর্নিবার লালসাই কাতিয়া'র মনোজগতে এক বিপর্যয় সৃষ্টি করে। তা রোধ করার উপায় ছিল না।.. উঃ, তুমি যদি জানতে দাশা, কত মধুর কত কোমল, কত নম্র ছিল কাতিয়া! আমি তাকে নষ্ট করেছি, আমিই তার সর্বনাশ করেছি। ..হ্যাঁ, তুমি ঠিকই বলেছ .. তার কাছে আমাকে যেতেই হবে..."

ঠিক হয় তারা দু'জনেই প্যারিসে যাবে এবং পাসপোর্ট পাওয়ামাত্রই রওনা হবে। খাওয়া-দাওয়ার পর নিকলাই ইভানোভিচ শহরে বেরোন আর দাশা রাস্তায় প'রে যাবার জন্য তার ঘাসের টুপিটাকে অন্য আকার দিতে বসে—কিন্তু তার হাতে পড়ে টুপির অবস্থা শোচনীয় হয়ে দাঁড়ায়। কি আর করে, ঝিকে ডেকে তখন সে টুপিটা দিয়ে দেয়। তারপর বাবাকে সে একখানা চিঠি লেখে এবং এর পরই হঠাৎ সে এত ক্লান্ত বোধ করে যে, সেই গোধূলির আলোতে হাতে মাথা রেখে তার বিছানায় সে শুয়ে পড়ে। সমুদ্রের শব্দ সে কান পেতে শোনে, মনে হয় তা যেন ক্রমশ দূরে বিলীন হয়ে যাচ্ছে আর যত-

দূরে যাচ্ছে ততই যেন তা আরো শ্রুতিমধুর হয়ে উঠছে। সমুদ্রের এই সঙ্গীত শুনতে শুনতে সে ঘুমিয়ে পড়ে।

ঘুমন্ত অবস্থায় দাশার মনে হয় কে যেন তার ওপর ঝুঁকে পড়েছে। তার মুখের ওপর থেকে একগোছা চূর্ণকুন্তল সরিয়ে দিয়ে লোকটা তার চোখের পাতা, গণ্ডদেশ, অধরোষ্ঠের কোণে চুম্বন করছে—নিঃশ্বাসের মত হাল্কা সে-চুম্বন। চুম্বনের এই মাধুরী যেন তার সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে। ক্রমে দাশার ঘুম ভেঙ্গে যায়। খোলা জানালা দিয়ে কয়েকটা নিঃসঙ্গ তারা দেখা যাচ্ছে আর হাওয়ায় চিঠির পাতাগুলি ফরফর করে উড়ছে। তারপর জানালায় ভেসে ওঠে একটা মানুষের অবয়ব, বাইরে থেকে দু'কনুইয়ে জানালার ওপর ভর দিয়ে সামনের দিকে ঝুঁকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে লোকটা দাশার দিকে।

দাশার ঘুম এতক্ষণে সম্পূর্ণ ভেঙ্গে গেছে। উঠে বসে সে এবং তার জামার বুকের বোতামটা খোলা বলে একটা হাত সে বুকে দেয়।

"কি চাও তুমি?" দাশা প্রায় অশ্রুত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে। জানালায় বেসনভের কণ্ঠস্বর শোনা যায়। উত্তর দেয় সেঃ

"সমুদ্রের ধারে আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করছিলাম। তুমি গেলে না কেন? ভয় পেয়েছ তুমি?"

একটু সময় নিয়ে দাশা বলেঃ "হ্যাঁ।"

বেসনভ জানালা টপকে ঘরে ঢোকে, টেবিলটাকে ধাক্কা দিয়ে এক পাশে সরিয়ে দেয় এবং দাশার বিছানার কাছে এসে দাঁড়ায়।

"উঃ! কি যন্ত্রণাদায়ক এই রাত! ইচ্ছে হচ্ছিল গলায় দড়ি দিয়ে মরি। আমার জন্য কি তোমার একটুও টান আছে?"

দাশা তার ঘাড় নাড়ে, কিন্তু অধরোষ্ঠ চেপে থাকে।

"শোন, দারিয়া দ্মিত্রেভ্না, আজ হোক, কাল হোক, কি এক বছর পরেই হোক, এক সময় না এক সময় এ হতেই হবে। তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচতে পারিনে। এমন কোরনা যাতে আমাকে অমানুষ হয়ে যেতে হয়, যাতে সমস্ত ভদ্রতা ভুলে যেতে হয়।" চাপা অথচ কর্কশ কণ্ঠে সে কথাগুলি বলে এবং দাশার দিকে এগিয়ে যায়। দাশার চোখ দুটো সারাক্ষণ রয়েছে বেসনভের মুখের দিকে। চট্ করে সে একটা গাঢ় নিঃশ্বাস নেয় এবং বেসনভের মুখের দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে থাকে।

"কাল আমি যা বলেছি তা সবই মিথ্যে।...বড় যন্ত্রণা পাচ্ছি আমি।...আমার মন থেকে তোমাকে কিছুতেই সরাতে পারছিনে। ..আমার অনুরোধ তুমি আমার পত্নী হও।..."

দাশার ওপর সে ঝুঁকে পড়ে, তার অঙ্গের সুঘ্রাণ নেয়, গলা জড়িয়ে ধরে আর অধরোষ্ঠ দিয়ে তার দেহ স্পর্শ করতে থাকে। দাশা তাকে দূরে ঠেলে দেবার চেষ্টা করে, কিন্তু তার বাহু দুটি মনের আদেশ পালন করে না। তারপর তার অসাড় চেতনার মধ্যে একটা শান্ত চিন্তা খেলে যায়ঃ "এই সেই

—আমি যার ভয় করেছি এবং যার কামনা করেছি এ হ'ল সেই—কিন্তু এ তো খুনের সামিল।..." বেসনভের দিক থেকে সে মুখ ঘুরিয়ে নেয়; সে তার কানের কাছে বিড়বিড় করে কি বলে। তার শ্বাস প্রশ্বাসে মদের গন্ধ। দাশা ভাবে: "বেসনভ এবং দিদির মধ্যেও ঠিক এরকমই হয়েছিল।" হঠাৎ তার সর্বাঙ্গ যেন হিম হয়ে যায়। মদের গন্ধটা তীব্রতর হয়ে ওঠে—বেসনভের অস্পষ্ট কথাগুলি শুনলে গা জ্বালা করে।

"আমাকে য়েতে দাও," বলে দাশা। গায়ের সমস্ত জোর দিয়ে ধাক্কা মেরে বেসনভ্‌কে সে সরিয়ে দেয় এবং দরজার দিকে এগিয়ে যায়। পোশাকের গলার দিককার ফিতেটা সে কোন রকমে এ'টে নেয়।

বেসনভ্‌ আর স্ববশে নেই। দাশার হাত দু'টো সে চেপে ধরে আর সামনের দিকে টেনে নিয়ে তার কণ্ঠদেশে চুম্বন করতে থাকে। দাশা তার অধরোষ্ঠ চেপে রাখে এবং নিজেকে মুক্ত করার জন্য নিঃশব্দে সংগ্রাম করে। কিন্তু জোর করে তুলে ধরে বেসনভ যখন তাকে বিছানার দিকে নিয়ে যেতে থাকে তখন তাড়াতাড়ি চাপাগলায় বলে সে:

"না না, কখ্‌খনো না, কখ্‌খনো না, তোমার জীবন রক্ষা করার জন্যও না।..."

প্রাণপণ সংগ্রাম করে অতি কষ্টে দাশা নিজেকে মুক্ত করে এবং দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়ায়। হাঁপাচ্ছে সে। তারপর অবসন্ন দেহে একটা চেয়ারে সে বসে পড়ে; একেবারে নিশ্চল। দাশার বাহুতে বেসনভের আঙুলের দাগ বসে গেছে; দাশা সে জায়গায় আস্তে তার হাত বুলোয়।

"এতটা তাড়াতাড়ি করা আমার ঠিক হয়নি," বলে বেসনভ।

দাশা বলে: "তোমাকে দেখলে বমি আসে।"

কথাটা শুনে বেসনভ তার মাথাটা চেয়ারের পেছনে হেলিয়ে দেয় এবং অসহ্য ব্যথায় যেমন লোক ছটফট করে ঠিক তেমনিভাবে মাথাটাকে এদিক ওদিক নাড়তে থাকে।

"তুমি উন্মাদ," বলে দাশা। "চলে যাও..." বারকয়েক একথা বলে সে।

অবশেষে বেসনভ বুঝতে পারে, উঠে দাঁড়ায় সে এবং মন্থরভাবে অদ্ভুত ভঙ্গিতে আবার জানালা টপকে বেরিয়ে যায়। জানালার খড়খড়ি বন্ধ করে দেয় দাশা; অন্ধকার কক্ষে সে পায়চারি করতে থাকে। সে রাত্রে আর তার ঘুম হল না।

ভোরের আলো দেখা না দিতেই নিকলাই ইভানোভিচ ঘুমে ঢুলতে ঢুলতে খালি পায়ে দাশার দোরের সামনে এসে জিজ্ঞেস করেন:

"তোমার দাঁত ব্যথা হয়েছে নাকি, দাশা?"

"না।"

"তবে যে রাত্রে গলার আওয়াজ পেলাম?"

"জানিনে।"

"অপূর্ব!" আস্তে বলে চলে যান তিনি।

শুয়ে বসে কোনভাবেই দাশার শান্তি নেই। মনের গ্লানি দন্তশূলের মতই তাকে পীড়া দিচ্ছে; সেটাকে ঝেড়ে ফেলবার জন্য একবার জানালার কাছ থেকে দোরের দিকে এবং দোরের কাছ থেকে জানালার দিকে পদচারণা করতে থাকে। ভাবে সে, বেসনভ যেপথে নিতে চেয়েছিল এর চেয়ে বোধহয় সেপথে যাওয়াই ছিল ভাল। এই সুতীব্র বেদনার মধ্যে মনে পড়ে তার সেই রৌদ্রস্নাত সাদা স্টীমারটার কথা; আর মনে পড়ে কিভাবে সেই ঝোপের মধ্যে বসে বিরহিণী কপোতী ডেকে ডেকে মিথ্যেকথা বলছিল যে, দাশা প্রেমে পড়েছে।

কিভাবে সেসমস্ত শেষ হয়ে গেল? তরল অন্ধকারে যে সাদা ধপধপে বিছানাটা দেখা যাচ্ছে সেদিকে দাশা তাকায়—ঐ মারাত্মক স্থানটায়ই কিছুক্ষণ আগে একটা মানুষের মুখ পশুর মুখে রূপান্তরিত হয়েছিল—মনের মধ্যে এই ছবি পুষে রেখে বেঁচে থাকা অসম্ভব বলে মনে হয় দাশার। যা ভাবতে তার গা ঘিন ঘিন করে তা থেকে মুক্তি পাবার জন্য যেকোন পীড়নও তার কাছে বড় বলে মনে হবে না। তার কপাল দিয়ে যেন আগুন বেরুচ্ছে। মনে হয় তার মুখ, তার কন্ঠ, তার সর্বাঙ্গ যেন মাকড়সার জালে আবৃত হয়ে গেছে। সেগুলি ঝেড়ে না ফেলতে পারলে সোয়াস্তি পাচ্ছে না সে।

অবশেষে খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে পরিষ্কার আলো দেখা দেয়। অন্যান্য ঘরের দোর খোলার শব্দ শোনা যায়। একটি স্পষ্ট নারীকন্ঠের ডাক কানে আসে: "মাত্রিয়েশা, জল এনেছি, হাতমুখ ধোও!" নিকলাই ইভানোভিচ ঘুম থেকে উঠে দাঁত মাজছেন, তাঁর ব্রাশের আওয়াজ দেয়ালের এপাশ থেকেই শুনতে পাওয়া যায়। দাশা তার মুখ ধোয়, টুপী পরে, টুপীটা সামনের দিকে প্রায় চোখ পর্যন্ত টেনে নামিয়ে দেয় এবং তারপর হেঁটে সমুদ্রের ধারে চলে যায়। সমুদ্র দেখে মনে হয় কে যেন দুধ ঢেলে রেখেছে, বালি ভেজা, বাতাসে সামুদ্রিক উদ্ভিদের একটা গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। দাশা ঘুরে মাঠের দিকে যায় এবং রাস্তা ধরে হাঁটতে থাকে। বিপরীত দিক থেকে একরাশি ধুলো উড়িয়ে একটা এক্কা তার দিকে আসছে। গাড়োয়ান একজন তাতার, আর আরোহী একটা সাদা পোশাক পরে বসে আছে, তার কাঁধদুটো বেশ পুরু। রোদে ও ক্লান্তিতে দাশা ভাল করে চোখ মেলে চাইতে পারছিল না। একবার চোখ তুলে এক্কার দুজনের দিকে তাকায়, তারপর ঝিমোতে ঝিমোতে ভাবে: "আর একজন সুখী, ভাল মানুষ যাচ্ছে—না হয় সে সুখী ও ভাল মানুষই হল, তাতেই বা কি!" রাস্তা থেকে একটু নেমে দাঁড়ায় সে। হঠাৎ এক্কা থেকে একটা চমকা ডাক তার কানে আসে:

"দারিয়া দ্মিত্রেভ্না!"

গাড়ী থেকে একজন লাফিয়ে পড়েই তার দিকে ছুটতে থাকে।

গলার আওয়াজ শুনেই দাশার হৃদয় তড়াক করে নেচে ওঠে, পা দুটো টলতে থাকে। ঘুরে সে দেখে তেলেগিন তার দিকে দৌড়ে আসছে। তাকে

রৌদ্রদগ্ধ ও উত্তেজিত দেখাচ্ছে। অপ্রত্যাশিতভাবে তাকে কাছে পেয়ে দাশার এত ভাল লাগে যে, সে তেলেগিনের বুকে হাত রেখে তাতে মুখ গোঁজে এবং শিশুর মত জোরে কাঁদতে আরম্ভ করে।

তেলেগিন তাকে শক্ত করে কাঁধে চেপে ধরে। দাশা যখন বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে তাকে সব কথা বলতে যায়, সে বলে:

"আচ্ছা আচ্ছা, দারিয়া দ্মিত্রেভ্না, শুনব, পরে শুনব। তাতে কি হয়েছে..."

দাশার চোখের জলে তেলেগিনের লিনেনের জ্যাকেটের বুকটা ভিজে যায়। অনেকখানি স্বস্তি বোধ করছে দাশা।

"তুমি কি আমাদের সঙ্গে দেখা করতেই আসছিলে?" জিজ্ঞেস করে দাশা।

"হ্যাঁ, আমি তোমাদের কাছে বিদায় নিতে এসেছি, দারিয়া দ্মিত্রেভ্না। মাত্র গতকালই জানতে পারলাম যে তুমি এখানে আছ, কাজেই...এলাম তোমার সঙ্গে দেখা করে বিদায় নিতে।"

"বিদায় নিতে?"

"কি করব—আমার ডাক পড়েছে।"

"ডাক পড়েছে?"

"কেন, তুমি শোননি?"

"নাঃ।"

"যুদ্ধ বেধে গেছে। আসল ব্যাপারটা হ'ল এই, বুঝলে?"

দাশা চোখ দুটো বড় বড় করে তার দিকে তাকায়, তখনো কিন্তু সে বুঝতে পারেনি।

॥ চোদ্দ ॥

নামকরা উদারনৈতিক পত্রিকা 'জনমত'-এর কার্যালয়ে সম্পাদকের কক্ষে সম্পাদকমণ্ডলীর জরুরী বৈঠক চলেছে। আগের দিন এক সরকারী আদেশ-বলে স্পিরিট জাতীয় মদ্য পান নিষিদ্ধ হওয়ায় সম্পাদকীয় চায়ের টেবিলে রীতির ব্যতিক্রম করে 'ব্রান্ডি' ও 'রাম' পরিবেশিত হয়েছে এবং পরিমাণে একটু বেশিই পড়েছে।

শ্মশ্রুযুক্ত বড় বড় সব উদারনৈতিক নেতা নরম আরামকেদারায় বসে ধূম-পান করছেন, মনে হয় তাঁরা যেন দিশেহারা হয়ে পড়েছেন। সম্পাদকমণ্ডলীর অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক সভ্যরা জানালার গোবরাটে এবং বিরোধী পক্ষের দৃঢ় ঘাঁটি চামড়ায় মোড়া বিখ্যাত সোফায় বসেছে। একজন খ্যাতনামা গ্রন্থকার অবিবেচকের মত বলে ফেলেছিলেন যে, সোফাটা ছারপোকায় ভরা।

সম্পাদকের পলিত কেশ, রক্তিম আনন, হাবভাব অনেকটা ইংরেজের মত। সমস্ত উদারনৈতিক পত্রিকাকে পথনির্দেশের উদ্দেশে প্রদত্ত তাঁর প্রসিদ্ধ

বক্তৃতাগুলির একটি তিনি দিলেন, প্রতিটি শব্দের ওপর জোর দিয়ে তিনি তাঁর বাগ্মিসুলভ কণ্ঠে বলে গেলেন। কার্যত তিনি উদারনৈতিক পত্রিকাগুলিকে পথনির্দেশ করতেও পেরেছিলেন।

"কর্তব্য পথে আজ আমরা এক জটিল অবস্থার সম্মুখীন, সমগ্র রুশ সাম্রাজ্য যখন বিপন্ন তখন সেই সরকারের সঙ্গে আমাদের হাত মেলাতে হবে, তা বলে এই নয় যে সম্রাটের সরকারের বিরোধিতা থেকে আমরা এক চুলও সরে দাঁড়াব। সরল ও অকপট ভাবেই সহযোগিতার জন্য আমাদের হাত বাড়াতে হবে। রুশিয়াকে কেন সরকার যুদ্ধে টেনে নামাল এ প্রশ্ন এখন বড় নয় বা তা নিয়ে সরকারকে গালাগালি করার সময়ও এ নয়। প্রথমে আমাদের যুদ্ধে জয়লাভ করতে হবে, তারপর কে দোষী কে না-দোষী তার বিচার করব। ভদ্রমহোদয়গণ, আমরা যখন এখানে বসে কথা বলছি ঠিক এই মুহূর্তে ক্রাস্নোস্তাভের নিকটে রক্তাক্ত সংগ্রাম চলেছে, সেখানে আমাদের ব্যূহে যে ভাঙ্গন ধরেছে তা বন্ধ করবার জন্য রক্ষী সেনা প্রেরিত হয়েছে। কি নিয়ে যুদ্ধ হচ্ছে এখনো কেউ তা জানে না, কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে যে কিয়েভ বিপন্ন। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, যুদ্ধ তিনচার মাসের অধিক স্থায়ী হতে পারে না, আর ফল যাই হোক না কেন আমরা সগর্বে সম্রাটের সরকারকে বলতে পারব ঃ বিপদের সময় আমরা আপনাদের পাশে দাঁড়িয়েছিলাম, এখন আমরা আপনাদের কাছে কৈফিয়ৎ চাই..."

সম্পাদকমণ্ডলীর পুরনো সদস্য বেলোস্ভেতভের আর সহ্য হচ্ছিল না। তিনি চিৎকার করে বলে উঠলেন ঃ

"জারের সরকাব যুদ্ধ করছে—তাতে আমাদের কি ? আমি ত ঠিক বুঝতে পারছিনে আমরা কেন যাব এতে যোগ দিতে! সাধারণ যুক্তি বলে আমাদের এবং আমাদের সঙ্গে এমস্ত বুদ্ধিজীবীর উচিত এই পাগলামি থেকে দূরে থাকা। সম্রাটেরা যদি চান একজন আর একজনের ঘাড় মটকাতে—তাতে আমাদের লাভ ছাড়া লোকসান কোথায়!"

"আমারও তাই মত। সত্যি, ভদ্রমহোদয়গণ, আপনারা জানেন দ্বিতীয় নিকলাসেব সঙ্গে হাত মেলানো একটু কঠিন," থালা থেকে এক টুকরো কেক হাতে নিয়ে অস্পষ্টভাবে বলেন সম্পাদকীয় লেখক 'আলফা'।

তারপর কয়েকজন একসঙ্গে বলে ওঠেন ঃ

"না, কোনভাবেই না, কোন শর্তে আমরা আপস করতে পারিনে। .."

"তার মানে কি ? আত্মসমর্পণ ? আমি জিজ্ঞাসা করি আপনাদের!"

"সমগ্র প্রগতিশীল আন্দোলনকে ঘৃণিত ভাবে কবর দেওয়া!"

"আমার দিক থেকে আমি বলতে পারি ভদ্রমহোদয়গণ, আমি খুশি হব যদি কেউ আমাকে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেন যে এই যুদ্ধের লক্ষ্য কি।"

"অপেক্ষা করুন, জার্মানরা এসে যখন আপনার টুঁটি চেপে ধরবে তখনই টের পাবেন সব।"

"আপনি তা হলে, মশায়, জাতীয়তাবাদী ?"
"না, তবে পরাজিত হবার সখ আমার নেই।"
"কিন্তু পরাজয় ত হবে দ্বিতীয় নিকলাসের। আপনার তাতে কি ?"
"বটে ? পোলাণ্ডের কি অবস্থা ? ভলিনিয়া ? কিয়েভ ?"
"যত আমাদের পরাজয় হবে, বিপ্লব তত তাড়াতাড়ি আসবে।"
"আপনার সেই বিপ্লবের জন্য আমি কিয়েভ ছেড়ে দিতে রাজী নই।"
"পিয়তর পেত্রোভিচ মশায়, নিজের জন্য আপনার লজ্জিত হওয়া উচিত।"

অতি কষ্টে সবাইকে শান্ত করে সম্পাদক বুঝিয়ে বলেন যে, আপৎকালীন অবস্থা ঘোষিত হয়েছে, সরকারের বিন্দুমাত্র সমালোচনা করলে সামরিক সেন্সরশিপ কাগজ বন্ধ করে দেবে এবং এত কষ্ট করে সংবাদপত্রের যে সামান্য স্বাধীনতাটুকু অর্জিত হয়েছে তাও আবার হারাতে হবে।

"এজন্যই আমার প্রস্তাব হচ্ছে, এই সভায় এমন একটা পন্থা বার করা হোক যাতে উভয় কূল রক্ষা পায়। একটু বেসুরো শোনালেও আমার দিক থেকে আমি বলবই: ফলাফল সমেত সামগ্রিকভাবেই আমাদের এই যুদ্ধকে গ্রহণ করতে হবে। আপনারা ভুলে যাবেন না যে, এই যুদ্ধে সর্বসাধারণের অসম্ভব সমর্থন রয়েছে। মস্কোতে একে বলা হয়েছে দ্বিতীয় স্বদেশপ্রেমাত্মক যুদ্ধ—" ঈষৎ হেসে তিনি চোখদুটি আনত করেন। "মস্কোতে সম্রাট বেশ সাদর সম্বর্ধনাই পেয়েছেন বললে অত্যুক্তি করা হবে না। সাধারণ লোক এমনভাবে সৈন্যদলে নাম লেখাচ্ছে যা কেউ আশাই করতে পারেনি, ধারণার অতীত "

"ভাসিলি ভাসিলিয়েভিচ, আপনি কি মশকরা করছেন ?" চীৎকার করে বলে ওঠে বেলোসভেডভ। তার প্রায় কান্না পাচ্ছে। "আমাদের সমস্ত আদর্শের মূলে আপনি কুঠারাঘাত করছেন কেন ? আপনি আমাদের বলছেন সরকারকে সাহায্য করতে ? কিন্তু সাইবেরিয়ায় যে রুশিয়ার হাজার হাজার রত্নছেলে পচে মরছে তাদের কথা আপনি ভেবেছেন কি ? ধর্মঘটী শ্রমিকদের ওপর গুলিচালনার কথা আপনি ভুলে গেছেন নাকি ? তাদের তাজা রক্ত তো এখনো শুকোয়নি।"

কথাগুলি শুনতে ভাল এবং প্রাণস্পর্শী, কিন্তু প্রত্যেকেই এটা ভালভাবে জানে যে, সরকারের সঙ্গে একটা রফা না করে উপায় নেই। সুতরাং কম্পোজঘর থেকে যখন প্রধান সম্পাদকীয় প্রবন্ধের প্রুফ এল যা আরম্ভ করা হয়েছে এই বলে: "জার্মান আক্রমণের মুখে নিজেদের ভেদাবিভেদ ভুলে গিয়ে আমাদের একসঙ্গে দাঁড়াতে হবে .." সভায় উপস্থিত সকলে তখন নীরবে গ্যালিগুলি দেখে। কেউ বা চাপা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে, আবার কাউকে বিশেষ জোর দিয়ে বলতে শোনা যায়: "অবশেষে আমরা এখানে এসে পৌঁছেছি !" বেলোসভেডভ উঠে দাঁড়িয়ে দ্রুত তার কালো ফ্রক-কোটটার বোতাম আঁটতে থাকে, সারা কোটটায় ছাই লেগেছে; তবে সে চলে গেল না, তার আরামকেদারায় আবার সে বসে পড়ল। কাগজের পরবর্তী সংখ্যা এই শিরোনামা নিয়ে বেরোল:

"পিতৃভূমি বিপন্ন। অস্ত্র ধর!"

সকলের মনেই একটা দ্বিধা ও শংকার ভাব। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে গোটা ইওরোপের স্থায়ী শান্তি যে এক ফুৎকারে আকাশে মিলিয়ে গেছে, ইওরোপের যে মানবিক সভ্যতার বড়াই 'জনমত' করত এবং যা আদর্শরূপে সামনে রেখে উক্ত পত্রিকা সরকারকে আক্রমণ করে সাধারণ লোককে উদ্বুদ্ধ করার প্রয়াস পেত—তা যে তাসের ঘরের মত ভেঙে পড়েছে, একথা ভাবতে ও স্বীকার করতে সম্পাদকমণ্ডলীর একটু কষ্ট হয় বই কি। ইওরোপ মুদ্রণযন্ত্র, বিদ্যুৎ, এমন কি রেডিয়ামও আবিষ্কার করেছে, কিন্তু সময় যখন এসেছে তখনই কড়া ইস্ত্রি-করা শার্টের ভেতর থেকে সেই আদিম বন্য গুহাবাসী রোমশ লোকটা ডাণ্ডা হাতে বেরিয়ে পড়েছে।

একটা থমথমে নীরবতার মধ্যে সভা শেষ হয়। প্রধান লেখকগণ মধ্যাহ্ন-ভোজনের জন্য একটা সৌখীন রেস্তোরাঁয় চলে যান আর অপ্রধানগণ বার্তা সম্পাদকের কক্ষে গিয়ে বসে। স্থির হয়, যুদ্ধ সম্পর্কে সমাজের বিভিন্ন স্তরের লোকের মনোভাব বিশদভাবে জানবার চেষ্টা করা হবে। সামরিক সেন্সরকর্তৃপক্ষের কার্যালয়ে আন্‌তোশ্‌কা আর্নল্‌দভকে পাঠান হয়। অগ্রিম বেতন নিয়ে সে একটা ভাল ঘোড়ার গাড়ীতে চড়ে নেভস্কি প্রসপেকট্‌ ধরে সেনানীমণ্ডলের প্রধান কার্যালয়ে চলে যায়।

জনসংযোগ অফিসার কর্নেল সোলন্ত্‌সেফ তাঁর কার্যালয়ে আন্‌তোশ্‌কা আর্নল্‌দভের সঙ্গে দেখা করেন এবং খুব নম্রভাবে তার সমস্ত কথা শোনেন। তাঁর উজ্জ্বল, প্রফুল্ল, আয়ত চোখদুটি দিয়ে তিনি আন্‌তোশ্‌কার মুখ বেশ ভাল করে অবলোকন করেন। আন্‌তোশ্‌কা ভেবেছিল যার সঙ্গে সে দেখা করতে যাচ্ছে সে হবে একটা অসাধারণ কিছু, রক্তবর্ণ মুখ, বাঘা জেনারেল, স্বাধীন সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধকারী—কিন্তু তার সামনে যিনি বসে আছেন তিনি তো বেশ চালাক, স্বচ্ছল অবস্থার ভদ্রলোক, কর্কশ কণ্ঠে চীৎকারও করলেন না বা কোনরূপ দণ্ডদান বা কণ্ঠরোধের বিন্দুমাত্র অভিপ্রায়ও প্রকাশ করলেন না। জারের পদলেহীগণ সম্পর্কে যা শোনা যায় তার সঙ্গে তো এঁর কোনো মিল নেই।

"আচ্ছা, কর্নেল, আশা করি আমি যেসমস্ত প্রশ্ন করব সেগুলি সম্বন্ধে সরকারী মতামত আপনি চেপে যাবেন না," জার প্রথম নিকলাইর পূর্ণাবয়ব চিত্রের দিকে বক্রদৃষ্টিতে তাকিয়ে বলে আর্নলদভ। ছবিটা যেন নির্দয়ভাবে সংবাদপত্রের প্রতিনিধির দিকে চেয়ে আছে আর বলবার চেষ্টা করছেঃ "তোমার জামাটা ছোট, জুতোজোড়া হলদে, নাকের ওপর ঘাম, কি কুৎসিত দেখতে। ভয় পেয়েছ, কুত্তার বাচ্চা!"

আর্নলদভ বলে চলেঃ "অবশ্য এ সম্বন্ধে আমার একটুও সন্দেহ নেই যে আগামী বৎসরের মধ্যেই আমাদের সৈন্যরা গিয়ে বার্লিনে উপস্থিত হবে,

কিন্তু আমাদের কাগজ এসম্পর্কে নিশ্চিতরূপে কতকগুলি বিষয় বিস্তারিতভাবে জানতে চায়।..."

কর্নেল সোলন্তসেভ খুব ভদ্রভাবে তাতে বাধা দিয়ে বলেন:

"বর্তমান যুদ্ধের গুরুত্ব সম্পর্কে রুশ জনমত সম্পূর্ণ সচেতন বলে আমার মনে হয় না। আমাদের বীর সৈন্যরা বার্লিনে প্রবেশ করতে পারে বলে আপনি যে আশা প্রকাশ করেছেন তা প্রশংসনীয় এবং সেজন্য আপনাকে আমি অভিনন্দিত করছি: কিন্তু আমার ধারণা আপনারা যা ভাবছেন কাজটা তার চেয়ে অনেক বেশি কঠিন। আমি মনে করি, বর্তমানে সংবাদপত্রের প্রধান কাজ হচ্ছে আমাদের দেশের সামনে যে আজ ভয়ঙ্কর বিপদ উপস্থিত এবং তার জন্য যে আমাদের চরম ত্যাগ স্বীকার করতে হবে, লোককে সে-সম্পর্কে সচেতন করা।"

আনতোশকা আর্নলদভ তার নোটবই নামিয়ে বিস্মিতভাবে কর্নেলের দিকে চেয়ে থাকে।

সোলন্তসেভ বলে চলেন: "আমরা এই যুদ্ধ চাইনি এবং আপাতত আমরা খালি আত্মরক্ষা করছি। গোলন্দাজ শক্তিতে জার্মানরা আমাদের চেয়ে প্রবল এবং আমাদের তুলনায় তাদের রেলপথও অনেক বেশি। সে যাই হোক না, শত্রু যাতে আমাদের সীমান্ত অতিক্রম করতে না পারে তার জন্য আমরা সমস্ত শক্তি দিয়ে লড়ব। রুশবাহিনী তাদের কর্তব্য পালন করবেই। কিন্তু সর্ব-সাধারণের মধ্যেও আজ এই বোধ জাগ্রত হওয়া একান্ত আবশ্যক যে, দেশের প্রতি তাদেরও একটা কর্তব্য আছে।" সোলন্তসেভ ভ্রূযুগল ঊর্ধ্বে তোলেন। "আমি বুঝি যে, কোন কোন শ্রেণীর লোকের মনে অন্যান্য ভাব থাকায় তাদের দেশাত্মবোধটা একটু জটিলতা লাভ করেছে। আমার কিন্তু নিশ্চিত বিশ্বাস, এরকম একটা সাংঘাতিক বিপদের সময় সমস্ত বিবাদবিসম্বাদ ও পুরনো তিক্ততা আপাতত সকলেই ভুলে যাবে; তারপর আবার যখন সুদিন আসবে তখন বোঝাপড়া হবে। এমন কি ১৮১২ সালেও রুশ সাম্রাজ্যকে এতটা বিপদের সম্মুখীন হতে হয়নি।* এই সমস্ত কথাই আপনাকে আমি লিখে নিতে বলছি। সর্বসাধারণকে আরো জানান দরকার যে, যেরকম লোক হতাহত হবে বলে মনে হয় তাতে সামরিক হাসপাতালের সংখ্যা পর্যাপ্ত হবে না। সুতরাং এদিক দিয়েও যতপ্রকারে সম্ভব সাহায্য করার জন্য দেশের লোককে প্রস্তুত হতে হবে।"

"মাফ করবেন, কর্নেল, আমি ঠিক বুঝতে পারছিনে হতাহতের সংখ্যা কত হতে পারে?"

সোলন্তসেভ তাঁর ভ্রূদুটো আরো বেশি কপালে তোলেন।

---

* ১৮১২ সালে নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ করা হয়েছিল তার কথা বলা হচ্ছে।

"আমার ধারণা আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে আড়াই লক্ষ থেকে তিন লক্ষের মত লোক আহত হবে।

আর্নলদভ ঢোক গিলে সংখ্যাটা লিখে নেয় এবং এবার সম্পূর্ণ অন্যভাবে জিজ্ঞাসা করে ঃ

"তা হ'লে কত লোক মারা যেতে পারে বলে মনে হয়?"

"আহতদের মধ্যে শতকরা দশজনের মৃত্যু হবে বলে আমরা সাধারণত ধরে নিই।"

"ও! আচ্ছা, ধন্যবাদ আপনাকে।"

সোলন্তসেভ উঠে দাঁড়ান ঃ আর্নলদভ তাড়াতাড়ি বিদায় নেয়। দোর খুলতেই ধাক্কা লাগে অপরিচ্ছন্ন, ক্ষয়রোগী সাংবাদিক আৎলান্তের সঙ্গে। লোকটা একটা কোঁচকানো জ্যাকেট গায়ে দিয়েছে। দু'দিন ধরে ভদকা পান না করতে পেরে তার অবস্থা যেন আরো শোচনীয় হয়ে উঠেছে। তার শার্টের সামনের দিকটা ময়লা, হাত দিয়ে সেটা ঢাকবার চেষ্টা করে সে বলে ঃ

"এই যুদ্ধ সম্পর্কে জানবার জন্য আপনার কাছে এসেছি, কর্নেল। আচ্ছা, আপনি কি মনে করেন? বার্লিন নিতে আমাদেব কতদিন লাগবে?"

সেনামন্ডলের প্রধান কার্যালয় থেকে বেরিয়ে এসে আর্নলদভ প্যালেস স্কোয়ারে ঢোকে। টুপীটা মাথায় দিয়ে খানিকক্ষণ সে সেখানে আড়চোখে দাঁড়িয়ে থাকে।

"যুদ্ধে চূড়ান্ত জয়লাভ করতেই হবে," দাঁত চিবিয়ে চিবিয়ে আপনমনে বলে সে। "পুরনো বাসি চিন্তা নিয়ে এখনো তোমরা থাকতে চাও থাক। বুঝবে, 'পরাজিতসুলভ মনোভাব' নিয়ে থাকার অর্থ কি!"

পরিষ্কার বিশাল স্কোয়ারে দেখা যাচ্ছে স্ফটিকপ্রস্তরে নির্মিত বিরাট আলেকজান্দার স্তম্ভ। স্কোয়ারের সর্বত্র ঘুরে বেড়াচ্ছে দলে দলে কৃষক, দেখতে তারা কুরূপ এবং মুখভরা দাড়ি। মাঝে মাঝে কড়া আদেশ শুনতে পাওয়া যায়। কৃষকেরা সারি দিয়ে দাঁড়ায়, আদেশমত দৌড়য়, শুয়ে পড়ে। এক জায়গায় প্রায় পঞ্চাশ জন লোক পাকা শানের রাস্তা থেকে বিশ্রীভাবে "হুর্‌রে" চীৎকার করে উঠে দাঁড়ায়, জোর কদমে ছুটতে গিয়ে তারা হোঁচট খায়।..."হল্ট্!" "এটেনশন্!" .."কুত্তার দল, কুত্তার বাচ্চা সব!" একটা কর্কশ কণ্ঠে তাদের ধমকাতে শোনা যায়। আর্নলদভ আর এক দিকে শুনতে পায় ঃ "...তাদের সামনে গিয়ে যখন তুমি হাজির, তাদের পেটে তোমার বেয়নেট ঢুকিয়ে দাও, তোমার বেয়নেট যদি ভেঙ্গে যায়, বন্দুকের কুঁদো দিয়ে মার তাদের।"

এক মুখ দাড়ি, পায়ে গাছের বাকলে তৈরী জুতো, গায়ে ঘামের দাগ-লাগা তাঁতের ছিটের শার্ট—এরা হচ্ছে সেই অমার্জিত চাষীর দল যারা দু'শ' বছর আগে এই জলা তটে নগরী তৈরী করতে এসেছিল। আজ আবার সাম্রাজ্যের কম্পমান স্তম্ভগুলিকে কাঁধ দিয়ে ঠেকিয়ে রাখবার জন্য তাদের ডাক পড়েছে।

নেভস্কি প্রসপেক্টের দিকে আর্নলদভ যায়। যে প্রবন্ধটা তাকে লিখতে

হবে সে-সম্পর্কে সে সারাক্ষণ চিন্তা করছে। পূর্ণ রণপোশাক পরিহিত দুই কোম্পানী সৈন্য রাস্তার মাঝখান দিয়ে মার্চ করে চলেছে; তাদের সঙ্গে আছে গার্টার, খাদ্যভরা টিনের কৌটা আর পরিখা খননের যন্ত্রপাতি। বাঁশীর সুরের সঙ্গে তালরেখে তারা পদক্ষেপ করছে। শরৎকালের বাতাসের মত যেন বাঁশীগুলি কেঁদে কেঁদে উঠছে। লোকগুলির গণ্ড-অস্থি উঁচু। ধুলোয় আবৃত তাদের মুখের দিকে তাকালেই বোঝা যায় তারা ক্লান্ত। নতুন চামড়ার ক্রস-বেল্ট চাপানো সবুজ রোমান পরিচ্ছদ পরিহিত একজন ছোট অফিসার কয়েক মিনিট পর পর আঙুলের ওপর জোর দিয়ে ঘুরে দাঁড়ায় এবং চোখ ঘুরিয়ে চীৎকার করে বলেঃ "লেফ্‌ট! রাইট! লেফট! রাইট!" পথের রমণীয় অসংখ্য গাড়ী ও কাচের ঝলমলে পরকলাসম্বলিত মুখর ও উজ্জ্বল নেভস্কি প্রসপেক্টকে যেন স্বপ্নপুরী বলে মনে হয়। "লেফট্‌! রাইট! লেফট্‌! রাইট!" ছোট অফিসারের পেছনে ভারী বুট-পরা নিরীহ কৃষকেরা ছন্দের দোলা দিয়ে মার্চ করে চলেছে। পেছন থেকে একটা গাড়ী ছুটে আসে তাদের পাশে, একটা তেজীয়ান কালো ঘোড়া জোর কদমে টেনে নিয়ে এসেছে গাড়ীটাকে। ঘোড়াটার মুখ দিয়ে ফেনা উঠছে। জোয়ান গাড়োয়ান বল্গা টেনে চট করে থামিয়ে দেয় ঘোড়াটাকে। একটি সুশ্রী মহিলা গাড়ীর মধ্যে দাঁড়িয়ে চলমান সৈন্যদের দেখতে থাকে এবং সাদা দস্তানা-পরা হাতে তাদের উদ্দেশে ক্রুশ চিহ্ন তুলে ধরে মঙ্গলকামনা করে।

সৈন্যরা মার্চ করে এগুতে থাকে এবং ক্রমশ রাস্তার গাড়ীঘোড়া ও জনতার প্রবাহের মধ্যে মিলিয়ে যায়। শান-বাঁধানো রাস্তা গরম ও জনাকীর্ণ; সকলেই যেন কি একটা প্রত্যাশা করছে। পথচারীরা থামে এবং আলোচনা ও চীৎকার শোনে, আবার ভীড় ঠেলে তারা পথ করে নেয়, প্রশ্ন করে, আবার অন্য দলে যোগ দেবার জন্য তারা উত্তেজিত অবস্থায় চলে যায়।

লক্ষ্যহীন জনতার গতি অল্পক্ষণের মধ্যেই একটা নির্দিষ্ট দিক নেয়; নেভস্কি প্রসপেক্ট থেকে জনতা মোরস্কায়া স্ট্রীটে যায়। সেখানে লোকের অসম্ভব ভীড়। সামনে দিয়ে কয়েকটা খাটো ছোকরা নিঃশব্দে দৌড়ে চলে যায়, মনে হয় তাদের একটা মতলব আছে। রাস্তার মোড়ে লোক টুপীগুলি আকাশের দিকে ছুঁড়ে মারতে থাকে, ছাতাগুলি ঊর্ধ্বে তুলে আন্দোলিত করে। মোরস্কায়া স্ট্রীটে সবার মুখে হুর্‌রে। ছোকরার দল কর্ণপটাহবিদারী শিস দিতে থাকে। সারা রাস্তায় সুবেশা রমণীগণ স্থির গাড়ীগুলিতে দাঁড়িয়ে আছে। জনতা ইসাকিয়েভ্‌স্কি স্কোয়ারে গিয়ে ঢোকে, সারা বাগে তারা ছড়িয়ে পড়ে, অনেকে গিয়ে বাগানের রেলিংএর ওপর চড়ে বসে। প্রতি জানালায়, ছাদে, গীর্জার পাথরের সিঁড়িতে লোক, লোকে লোকারণ্য। ম্যাড়মেড়ে লাল যে বিরাট বাড়িটায় জার্মান দূতাবাস ছিল তার উপরতলার জানালা দিয়ে ধূম্ররাশি নির্গত হচ্ছে আর হাজার হাজার লোক দাঁড়িয়ে তাই দেখছে। লোককে ভেতরে ছুটোছুটি করতে দেখা যাচ্ছে। বাণ্ডিল বাণ্ডিল কাগজ এনে তারা

ভাঙ্গা জানালা দিয়ে জনতার দিকে ফেলে দিচ্ছে; কাগজগুলি ছড়িয়ে ধীরে নীচে এসে পড়ছে। যখনি পাকখেয়ে ধোঁয়া বেরোয় বা জানালা দিয়ে নীচে এসে কিছু পড়ে তখনই জনতা উল্লাসে হৈ হৈ করে ওঠে। বাড়িটার সামনের দিকে এবার সেই ছোকরাদের আরো বেশি তৎপর দেখা যায়। ঘোড়ার লাগাম-ধরা দুটো বিরাট ব্রঞ্জের মূর্তি রয়েছে সেখানে। জনতা শান্ত হয়ে যায়। ধাতব দ্রব্যে হাতুড়ির ঘা পড়ার ঠন্ ঠন্ শব্দ আসে কানে। ডান দিকের মূর্তিটা একবার কেঁপে উঠে হুড়মুড় করে পড়ে শান-বাঁধানো রাস্তার ওপর। জনতা হৈ হৈ করে ওঠে, ভূপাতিত মূর্তিটার দিকে লোক তরঙ্গের মত ছুটে যায়, চারদিক থেকে সকলে ঝুঁকে পড়ায় ভীড়ের চাপে লোক পিষ্ট হবার উপক্রম।

"ময়কায় ফেলে দাও! এসমস্ত ঘৃণ্য বস্তুকে 'ময়কায়' ফেলে দাও!" দ্বিতীয় মূর্তিটাও ভেঙ্গে পড়ে। স্প্রিং-এর চশমাপরা স্থূলকায়া একটি মহিলা আনতোশকা আর্নলদভের কাঁধে হাত রাখে এবং তার কানের কাছে চেঁচিয়ে বলেঃ "আমরা এগুলি সব জলে বিসর্জন দেব, বুঝলে!" জনতা 'ময়কার' দিকে রওনা হয়। দমকলের ঘণ্টা তখন শুনতে পাওয়া যায়, দূরে পিতলের শিরস্ত্রাণগুলিও চকচক করে ওঠে। রাস্তায় ঘোড়সওয়ার পুলিশ এসে হাজির হয়। জনতার হল্লা ও হুড়োহুড়ির মধ্যে আর্নলদভ

"তুমি সেখানে ছিলে?" প্রশ্ন করে বেসনভ। "শুনে মনে হচ্ছিল যেন তার, বড় বড় চোখ করে স্থির স্বচ্ছ দৃষ্টিতে চেয়ে আছে সে।...বেসনভ! বেসনভকে চিনতে পেরে সে তার কাছে যায়।

"তুমি সেখানে ছিলে?" প্রশ্ন করে বেসনভ। "শুনে মনে হচ্ছিল যেন কাউকে খুন করা হচ্ছে।"

"কেউ খুন হয়েছে নাকি? কে সে?"

"জানিনে।"

ঘুরে বেসনভ স্কোয়ারটা পার হয়ে যায়। তার শিথিল চরণে হাঁটা দেখে মনে হয় সে বুঝি চোখে দেখতে পাচ্ছে না। ভীড়ের অবশিষ্ট লোক এবার ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে নেভস্কি প্রসপেক্টের দিকে যায়। সেখানে লোক জড়ো হয়ে একজন জার্মানের একটি কফিখানা ভেঙ্গে দিচ্ছিল।

সেদিনই সন্ধ্যায় সংবাদপত্রের ধূমাচ্ছন্ন একটি সম্পাদকীয় কক্ষে একটা উঁচু ডেস্কের পাশে দাঁড়িয়ে সরু সরু কাগজে অতি দ্রুত লিখে চলেছে আর্নলদভঃ

"...আজ আমরা জনসাধারণের ক্রোধ প্রত্যক্ষ করেছি, তার শক্তি ও সৌন্দর্য দুই-ই দেখেছি। লক্ষ্য করবার বিষয়, জার্মান দূতাবাসের ভূগর্ভস্থ ভাণ্ডারে এক বোতল মদও কেউ পান করেনি—সমস্ত ভেঙ্গে 'ময়কায়' ফেলে দেওয়া হয়েছে। আপসের কোন প্রশ্নই ওঠে না। আমাদের যত ত্যাগ স্বীকারেরই প্রয়োজন হোক না—আমরা জয়লাভ না করা পর্যন্ত সংগ্রাম চালিয়ে যাব। জার্মানরা ভেবেছিল রুশিয়া ঘুমিয়ে আছে. কিন্তু 'পিতৃভূমি বিপন্ন,' এই বজ্র-

নির্ঘোষ আহ্বানে জাতি এক হয়ে জেগে উঠেছে। জাতির এই ক্রোধ হবে ভয়ংকর। 'পিতৃভূমি' মাভৈঃ মন্ত্র, কিন্তু আমরা তা ভুলে গিয়েছিলাম। জার্মানদের কামান থেকে প্রথম গোলা বর্ষিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই আবার তার আদি সৌন্দর্য নিয়ে সে জীবন্ত হয়ে উঠেছে এবং আমাদের প্রত্যেকের অন্তরে অগ্নি-অক্ষরে জ্বলজ্বল করছে।.."

আন্তোশকা চোখ বোজে, তার রক্ত যেন জমে আসছে। এই তাকে আজ লিখতে হচ্ছে!' পনের দিন আগে তাকে যখন গ্রীষ্মের আমোদ-প্রমোদ সম্পর্কে লিখতে বলা হয়েছিল, তখনকার সেই লেখা আর আজকের লেখায় কত তফাৎ। মনে পড়ে তার, একটা লোক শূকরছানার মত পোশাক পরে 'বুফে'র কোনও এক মঞ্চে এসে কিভাবে গান গাইছিলঃ

"ছোট্ট শূকরছানা আমি, গরব করি ভাই,
নামের তরে আমার কোন লাজের কারণ নাই।
মাও ছিল শূকরী মোর, বলে সর্বজনে
আমিও নাকি মায়েরই মতন এখন রূপে গুণে।"

"আমরা এক শৌর্যের যুগে পা দিয়েছি। বহুদিন আমরা জীবন্মৃত অবস্থায় ছিলাম। যুদ্ধ আমাদের শুদ্ধ করবে," লেখে আর্নলদভ, তার কলম থেকে কালি ছিটকে পড়ে।

পরাজিতসুলভ মনোভাব নিয়ে যারা ছিল তাদের প্রবল বিরোধিতা সত্ত্বেও আর্নলদভের প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এই দলের নেতৃত্ব করছিল বেলোসতভ। পুরনো নীতি একটু রক্ষা করার জন্য প্রবন্ধটা কাগজের তৃতীয় পৃষ্ঠায় "যুদ্ধের সময়" এই মামুলী শিরোনামা দিয়ে প্রকাশ করা হল। সঙ্গে সঙ্গেই সম্পাদকীয় দপ্তরে পাঠকদের কাছ থেকে চিঠি আসতে আরম্ভ করে, অনেকে প্রবন্ধের অতিমাত্রায় তারিফ করে চিঠি দিয়েছে, আবার অনেকে ব্যঙ্গও করেছে। তবে তারিফই করেছে বেশি লোক। আর্নলদভের প্রতি ছত্র লেখার পারিশ্রমিক বেড়ে যায় এবং এক সপ্তাহ বাদে প্রধান সম্পাদকের ঘরে তার ডাক পড়ে। পলিতকেশ, রক্তিমবদন ভাসিলি ভাসিলিয়েভিচের অঙ্গ থেকে ইংরেজদের অ-ডি-কোলনের গন্ধ বেরোচ্ছে। আর্নলদভকে একটি আরামকেদারা দেখিয়ে দিয়ে সামান্য উদ্বিগ্ন কণ্ঠে তিনি বলেনঃ

"আমরা তোমাকে গ্রামে পাঠাতে চাই।"

"খুব ভাল কথা, স্যার।"

"আমাদের জানা দরকার চাষীরা কি ভাবছে ও বলছে।" একগাদা চিঠির ওপর তিনি তাঁর হাত রাখেন। "পল্লী অঞ্চল সম্পর্কে বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে প্রচুর আগ্রহ দেখা যাচ্ছে। গ্রামাঞ্চল নিয়ে কত অদ্ভুত কল্পনা করে লোকে; কিন্তু প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা দিয়ে তার জীবন্ত চিত্র আমাদের তুলে ধরতে হবে।"

"সৈন্যসংগ্রহের ফলাফল দৃষ্টে মনে হয়, স্যার, লোকের মধ্যে যথেষ্ট দেশাত্মবোধ জেগেছে।"

"জানি। কিন্তু চুলোয় যাক, আসছে তা কোন্ নরক থেকে? তোমার যেখানে খুশি যাও, লোকের কথা শোন, লোককে প্রশ্ন কর। শনিবারের মধ্যে আশা করি তোমার কাছ থেকে গ্রাম সম্পর্কে পাঁচশ' ছত্র লেখা পাব।"

আপিস থেকে বেরিয়ে আর্নলদভ নেভস্কি প্রস্পেক্টে যায়; সামরিক ছাঁট-কাটের একটা ভ্রমণের পোশাক, হলদে পদাবরণ ও একটা টুপি সে কেনে। সেই পোশাক পরে সে দোননের রেস্তোরাঁয় মধ্যাহ্ন ভোজন করে, একাই এক বোতল ফরাসী শ্যাম্পেন চালায় এবং স্থির করে প্রথম খিমবি গ্রামেই সে যাবে। সেখানে এলিজাবেতা কিয়েভনা তার ভাই কী-র কাছে গ্রীষ্মকালটা কাটাচ্ছে। সেই সন্ধ্যায় সে এক ঘুমোবার গাড়ীতে গিয়ে চড়ে, একটা সিগার ধরায়; হল্দে পদাবরণটা মচ্মচ্ শব্দ করছে, সেটার দিকে চেয়ে থেকে মনে মনে ভাবে সেঃ "এই তো জীবন!"

খিমবি গ্রামে ষাট ঘর লোকের বাস। বাড়িগুলির পেছন দিককার বাগানে অসংখ্য গুজবেরির ঝোপ, রাস্তার দু'পাশে সারবন্দে পুরনো লাইম গাছ। পাহাড়ের ওপর একটা বিদ্যালয় (আগে জমিদারবাড়ি ছিল)। একটা জলাভূমি ও স্বিনুখা নদীর মাঝখানে ফাঁকা জায়গাটায় রয়েছে গ্রাম। সর্বসাধারণের ব্যবহার্য জমি নেই বললেই চলে; মাটি অনুর্বর, গ্রামের প্রায় সকলেই মস্কোতে কারখানায় কাজ করে।

আর্নলদভ সন্ধ্যার দিকে সেই গ্রামে গিয়ে পৌঁছয়ঃ নিস্তব্ধতা তাকে বিস্মিত করে দেয়। সেই নিস্তব্ধতা ভেদ করে একমাত্র শব্দ কানে আসছিল, ঘোড়ার খুরের তলায় পড়বার ভয়ে পলায়মান একটা মুরগির ডাক, একটা গোলাতে একটা কুকুরের ঘেউ ঘেউ চীৎকার আর নদীর পাড়ে ধোপার কাপড়-কাচার শব্দ। রাস্তার মাঝখানে দুটো ভেড়া শিং দিয়ে গুঁতোগুঁতি করছে। যে কালো বুড়ো স্টেশন থেকে গাড়ী হাঁকিয়ে আর্নলদভকে নিয়ে এসেছিল তার ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে সে পথ ধরে হাঁটতে থাকে। ভূর্জবৃক্ষের সবুজ পাতার ফাঁক দিয়ে বিদ্যালয়ভবনের যে সাদা স্তম্ভগুলি দেখা যাচ্ছে তার দিকে রাস্তাটা চলে গেছে। তোরণের অর্ধভগ্ন সিঁড়িতে বসে বিদ্যালয়ের শিক্ষক কিঈ কিয়েভিচ ও এলিজাবেতা কিয়েভনা গল্প করে সময় কাটাচ্ছে। বিরাট বিরাট উইলো গাছের দীর্ঘ ছায়া নীচে প্রান্তরের ওপর এসে পড়েছে। একঝাঁক স্টারলিং পাখী আকাশে একখন্ড কালো মেঘের মত উড়ে যায়। বহু দূরে শিঙা ফুঁকে গরুবাছুরকে বাড়ি ফেরার জন্য ডাকা হচ্ছে। নলখাগড়ার বন থেকে কয়েকটা লাল গরু বেরোয়, একটা মুখ তুলে হাম্বারব করে। কিঈ কিয়েভিচও দেখতে তার বোনেরই মত অনেকটা, ঠিক সেই রকম অদ্ভুত অস্বাভাবিক চোখ। একটা ঘাসের ডাঁটা চিবোতে চিবোতে বোনকে সে বলছেঃ

"অন্যান্য দিকে তো আছিসই, যৌনজীবনের ক্ষেত্রে তুই সবচেয়ে বেশি বিশৃংখল, লিজা। তোর মত চরিত্রের লোক যারা আছে তারা হচ্ছে বুর্জোয়া সংস্কৃতির পচা আবর্জনা।"

যেখানে অস্তগামী সূর্যের রশ্মিতে ছায়া ও ঘাসগুলি মনোরম পীতবর্ণ ধারণ করছে, এলিজাবেতা কিয়েভনা একটু অলস হাসি হেসে সেদিকে চেয়ে থাকে।

"তোমার একঘেয়ে কথা শুনে হাঁপিয়ে উঠতে হয়, দাদা। সবই যেন তোমার মুখস্থ, সবই তোমার কাছে পরিষ্কার, যেন কেতাবে লেখা।"

"প্রত্যেক মানুষেরই চেষ্টা করা উচিত, লিজা, যাতে তার চিন্তায় একটা সঙ্গতি ও শৃঙ্খলা থাকে। তা বলা যদি বিরক্তিকর হয় হবে, তাতে কিছু এসে যায় না।"

"বেশ, তুমি যত পার চেষ্টা কর।"

নিথর সন্ধ্যা। ভূর্জবৃক্ষসমূহের নত শাখাগুলি তোরণের সামনে একটা স্থির স্বচ্ছ পর্দা সৃষ্টি করেছে। পাহাড়ের পাদদেশে দাঁড়কাকের ডাক শুনতে পাওয়া যায়। কিঙ্গ কিয়োভিচ ঘাসের ডাঁটা চিবোচ্ছে। গোধূলির নীলাভ আলোয় যেখানে গাছগুলি মিলিয়ে যাচ্ছে সেদিকে চেয়ে আছে এলিজাবেতা কিয়েভনা। অকস্মাৎ তার নজরে পড়ে একটা খাটো লোক সুট-কেস হাতে তাদের দিকে এগিয়ে আসছে।

"এই যে, লিজা, ভাল তো সুন্দরী " চেঁচিয়ে ওঠে আর্নলদভ।

তাকে দেখে এলিজাবেতা কিয়েভনা অত্যন্ত খুশি হয়। প্রচণ্ডভাবে সে লাফিয়ে ওঠে এবং ছুটে এসে আর্নলদভকে জড়িয়ে ধরে। কিঙ্গ কিয়েভিচ সংক্ষেপে তাকে অভিনন্দন জানায় এবং ঘাসের ডাঁটা চিবিয়েই চলে।

আর্নলদভ সিঁড়ির ওপর বসে একটা সিগার ধরায়। তারপর সে বলে :

"আপনার কাছে আমি খবরের জন্য এসেছি, কিঙ্গ কিয়েভিচ। দয়া করে যতদূর সম্ভব বিস্তারিতভাবে আমাকে বলুন তো এই যুদ্ধ সম্পর্কে খিমুবের লোক কি ভাবছে এবং কি বলছে।"

কিঙ্গ কিয়েভিচ একটু বক্র হাসি হাসেন।

"তারা কি ভাবছে শয়তানই জানে। বলছে না তারা কিছুই। নেকড়েরা মেষপালের ওপর লাফিয়ে পড়ার সময় কিছু বলে না।"

"তা হ'লে সৈন্য সংগ্রহের কোনরূপ বাধা দেওয়া হচ্ছে না ?"

"না, মোটেই না।"

"তারা কি বুঝতে পারছে যে জার্মানরা তাদের শত্রু ?"

"না ; জার্মানদের কথা তারা ভাবছেই না।"

"তবে কাদের কথা ভাবছে ?"

কিঙ্গ কিয়েভিচ আবার হাসে।

"না, জার্মানদের নিয়ে তারা মাথা ঘামাচ্ছে না—তারা ভাবছে রাইফেলের কথা।...রাইফেল তারা চায়। রাইফেল হাতে থাকলে মানুষের মন অন্যরকম হয়ে যায়। আমরা যদি বেঁচে থাকি তবে দেখে যাব রাইফেল ঠিক কোন্ দিকে গুলি ছুঁড়তে চায়। হ্যাঁ, মশায়, তাই !"

"ভাল কথা। দেখুন তবু জিজ্ঞাসা করছি, তারা কি যুদ্ধ সম্পর্কে কিছুই বলে না?"

"গ্রামে গিয়ে শুনুন তারা বলে কিনা..."

আর্নলদভ ও এলিজাবেতা কিয়েভনা গোধূলির সময় গ্রামের ভেতর ঢোকে। আগস্ট মাসের আকাশ তারায় ভরে গেছে। গ্রামের ভেতরের দিকটা স্যাঁতসেঁতে। গরুর খুরে যে ধূলি উড়েছিল তা তখনো মিলিয়ে যায়নি। জ্বালদেওয়া দুধের গন্ধ বাতাসে পাওয়া যাচ্ছে। দোরের কাছে সব খালি গাড়ী পড়ে আছে। লাইমগাছগুলির তলে অন্ধকারে একটা কুয়োর ওপরকার হুইল কড়কড় শব্দ করছে আর একটা ঘোড়ার নাকের শব্দও পাওয়া যাচ্ছে। ঘোড়াটা জল খাচ্ছে আর জোরে জোরে শ্বাস ফেলছে। একটা গোলাঘরের সামনে খোলা জায়গায় কাঠের গুঁড়ির ওপর বসে গুণগুণ করে গান গাইছে তিনটি তরুণী। গোলাঘরটা কাঠের তৈরী, তবে ছাউনিটা খড়ের। এলিজাবেতা কিয়েভনা ও আর্নলদভ তাদের কাছে যায় এবং সামান্য একটু দূরে বসে।

তরুণীরা তাদের গানের মধ্য দিয়ে বলছিল তাদের নিজেদের গ্রাম খ্যিবি কি সুন্দর: খ্যিবিতে ফুল আছে, হ্যাঁ, ভাল তৈজসপত্র আছে, ছেলেরা দেখতে ছবির মত ইত্যাদি। নবাগতদের দেখে তাদের মধ্যে একজন মিহিস্বরে বলে:

"চল, বোন, শোবার সময় হ'ল।"

কিন্তু আসলে তারা বসেই থাকে, নড়ে না একটুও। গোলাঘরের মধ্যে একজনের আওয়াজ পাওয়া যায়। তারপর দোরটা খট্ করে খুলে যায়। মাথায় টাকপড়া একজন চাষী বেরিয়ে আসে ভেতর থেকে। তার গায়ে একটা মেষের চামড়ার জ্যাকেট, বুকটা খোলা। তালাটা খুলতে তার অনেকক্ষণ লাগে, খালি গজ্‌গজ্ করতে থাকে। তারপর তরুণীদের কাছে সে আসে, একটা হাত পেছনে কটিদেশের ওপর রাখে, তার অবাধ্য দাড়িগুলি সামনের দিকে এগিয়ে যায়।

"এখনো গান চলেছে, আমার বুলবুলিরা!"

"হ্যাঁ, গাইছি, তবে তোমার সম্বন্ধে নয়, ফিওদর খুড়ো।"

"চাষকালে ঠিক হয়। রাত্রে বসে গান গাওয়া—লজ্জাও করে না।"

"হিংসে হয় নাকি?" বলে একটি তরুণী। আর একজন দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলে:

"কাজ নেই ত কি করব, ফিওদর খুড়ো, তাই বসে খ্যিবির গান গাইছি।"

"বটে! এসমস্ত ভাল নয়। ধারে কাছে একটা পুরুষ মানুষ নেই, আর তোরা এখানে একা একা বসে!"

এই বলে ফিওদর তরুণীদের পাশে বসে পড়ে। পাশের জন তাকে বলে:

"কজ্‌মোদেমিয়ার মেয়েরা সেদিন বলছিল যে, পৃথিবীর আদ্ধেক লোকই নাকি যুদ্ধে গেছে।"

"তোমাদেরও ডাক পড়তে দেরি নেই, সোনারা।"

"কি? আমাদের ডাক পড়বে? যুদ্ধের জন্য?"

তরুণীরা হো হো করে হেসে ওঠে এবং কাছের জন বলেঃ

"আমাদের জার কার সঙ্গে যুদ্ধ করছে, ফিওদর খুড়ো?"

"আর একজন জারের সঙ্গে।"

তরুণীরা একে অন্যের দিকে চায়। একজন দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে, আর একজন তার গায়ের ওড়নাটা টেনে ঠিক করে, পাশের জন বলেঃ

"কজ্‌মোদেমিয়ার মেয়েরা সেকথাই বলল: বলল যে আর একজন জারের সঙ্গে যুদ্ধ হচ্ছে।"

এই সময় কাঠের গুঁড়িগুলির পেছন থেকে একটা এবড়ো থেবড়ো মুখ দেখা দেয়। গুঁড়িগুলির মালিক সে। মেষের চামড়ার জ্যাকেটটা গায়ে জড়িয়ে কর্কশ কণ্ঠে সে বলেঃ

"বাজে বকো না। আর একজন জার আবার কে এল! আমাদের যুদ্ধ বেধেছে জার্মানদের সঙ্গে।"

"হতে পারে," বলে ফিওদর।

মাথাটা আবার অদৃশ্য হয়। আর্নলিদভ তার সিগারেটকেস বার করে ফিওদরকে একটা সিগারেট দেয়; তারপর সে সাবধানে প্রশ্ন করেঃ

"আচ্ছা, যুদ্ধে যখন ডাক পড়ল, তখন আপনাদের গ্রামের লোকেরা কি স্বেচ্ছায় গেল?"

"আজ্ঞে হাঁ, অনেকেই স্বেচ্ছায় গেল।"

"খুব আগ্রহ ছিল?"

"নিশ্চয়ই। কেন থাকবে না? তারা ভাবল গিয়ে ত অন্তত দেখতে পাবে ব্যাপারটা কি। যদি মরে—লোক তো এখানেও মরে। এখানকার জমিতে কিছু হয় না, অতি কায়ক্লেশে আমরা দিন কাটাই। লোকে বলে, আপনারা দিনে দু'বার মাংস পান, চিনি চা তামাকের অভাব নেই আপনাদের, যত খুশি আপনারা ধূমপান করতে পারেন।"

"যুদ্ধের কথা শুনে ভয় হয় না?"

"হয় বই কি। নিশ্চয়ই হয়।"

॥ পনের ॥

কর্দমাক্ত সড়ক দিয়ে সশব্দে দুলতে দুলতে চলেছে ত্রিপলে ঢাকা মালটানা গাড়ী, খড় ও শুকনো ঘাস বোঝাই গো-শকট, এম্বুলান্স আর যাচ্ছে নদীর ওপর ভাসমান সেতু বাঁধবার প্রচুর কাষ্ঠাধার। টিপটিপ করে অবিশ্রান্ত বৃষ্টি

পড়ছে, ফোঁটাগুলি যাচ্ছে তেরছা ভাবে। রাস্তার ধারের নালা ও চষা জমিতে লাঙলের খাতগুলি জলে ভরে গেছে। দূরে গাছ ও ঝোপঝাড়গুলিকে অস্পষ্ট রেখার মত দেখা যাচ্ছে। চীৎকার, গালাগালি, চাবুকের আওয়াজ, অক্ষদণ্ডের ক্যাঁচকোঁচ শব্দ করে তুষারস্তূপ পতনের মত জলকাদার মধ্য দিয়ে অবিরাম গতিতে এগিয়ে চলেছে অগ্রসরমান রুশ বাহিনীর সরবরাহ। মৃত ও মৃতপ্রায় অশ্বগুলি পড়ে আছে রাস্তার দুধারে, উল্টে-যাওয়া গো-শকট-সমূহের চাকা আকাশের দিকে উঠে আছে। মাঝে একটা সামরিক গাড়ী এসে এই প্রবাহের মধ্যে প্রবেশ করে। সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার ও গুঞ্জনধ্বনি ওঠে, ঘোড়াগুলি ভয় পেয়ে দ্রুত ছুটতে থাকে, ভারীভাবে বোঝাই করা কোন মাল-গাড়ী গিয়ে হয়ত রাস্তার ধারের নালায় পড়ে, গাড়োয়ান ছিটকে পড়ে যায়।

তারপর যেখানে গাড়ীর প্রবাহ গিয়ে শেষ হয়েছে সেখানে দেখা যায় ইতস্তত বিন্যস্ত একদল সৈন্য অতিকষ্টে কর্দমাক্ত পিছল পথে হেঁটে চলেছে, তাদের কাঁধে রয়েছে ঝোলা ও তাঁবু। সেই বিশৃংখল সৈন্যদের মাঝখান দিয়ে চলেছে লটবহর ও রাইফেল বোঝাই গাড়ী, রাইফেলগুলির মুখ রয়েছে বিভিন্ন দিকে, আরদালীরা কোনরকমে বসে আছে তার ওপরে। মাঝে মাঝে একজন রাস্তা থেকে মাঠে চলে যায়, বন্দুকটা ঘাসের ওপর পেতে সেখানে বসে পড়ে।

তার পরে দেখা যায় আরো শকট, পন্টুন, এম্বুলান্স, মালটানা গাড়ী; সেগুলির মধ্যে বসে আছে ভেজা সামরিক কোর্তাপরা কতগুলি লোক। মুখর মিছিল এবার হোঁচট খেয়ে এবং ঠেলাঠেলি করে পড়ে গিয়ে একটা সংকীর্ণ পথে, একটু জায়গা পাবার জন্য সকলের ধাক্কাধাক্কি ও চেঁচামেচি, মিছিলটা ধীরে ওঠে গিয়ে একটা পাহাড়ের গায়ে এবং গিরিশীর্ষে উঠে মিলিয়ে যায়। খাদ্যশস্য, ঘাস ও গুলিগোলায় পূর্ণ আরো বহু গাড়ী বিভিন্ন দিক থেকে এসে তাতে যোগ দেয়। মাঝে মাঝে কিছু অশ্বারোহী সৈন্য মাঠ পেরিয়ে এসে রাস্তায় মিছিল ধরে, আর শকটসমূহের মাঝখান দিয়ে গোলন্দাজ বাহিনী লৌহগর্জন করে দ্রুতবেগে ছুটে চলে। চওড়া বুক, প্রকাণ্ড ঘোড়ার পিঠে চ'ড়ে দাড়িওয়ালা ভীষণাকৃতি তাতারগণ ঘোড়া ও মানুষের ওপর সমানে চাবুক চালাচ্ছে আর সড়কে লাঙলের মত নিজেদের ও পেছনের কামানগুলির যাবার পথ করে নিচ্ছে। চারদিক থেকেই লোক ছুটে আসছে; অনেকে গরুর গাড়ীর ওপর দাঁড়িয়ে হাত আন্দোলিত করছে। জনপ্রবাহ এবার গিয়ে একটা বনের ধারে উপস্থিত হয়; সেখানে ব্যাঙের ছাতা ও পচা পাতার গন্ধ আর বৃষ্টির টুপটাপ শব্দ।

তারপর আরো কিছুদূর গিয়ে দেখা যায়, রাস্তার দুপাশে সারবরাব্দে রয়েছে বহু চিমনী, আবর্জনা ও পোড়া কাঠের স্তূপ থেকে উপর দিকে উঠে গেছে সেগুলি। একটা খুঁটিতে একটা ভাঙ্গা লম্ফ এদিকে ওদিকে দুলছে আর পাশেই কামানের গোলায় বিধ্বস্ত একটা বাড়ির ইটের দেয়ালে মারা রয়েছে একটা সিনেমার পোস্টার। সেখানেই একটা ভাঙ্গা গাড়ীতে পড়ে

আছে অস্ট্রিয়ার একজন আহত লোক; গাড়ীটার সামনের চাকা দুটো নেই। লোকটার গায়ে নীল রংএর একটা কোট, তার মুখটা তোবড়ানো ও পীতাভ, স্তিমিত চোখ দুটো বেদনায় ভরা।

সামনের দিকে প্রায় কুড়ি মাইল দূরে ধূমাচ্ছন্ন দিগন্তে কামান গর্জন শুনতে পাওয়া যায়। সেদিকেই চলেছে দিনরাত অবিরাম গতিতে এই সমস্ত সৈন্য ও শকট, আর যাচ্ছে রাশিয়ার সমস্ত অঞ্চল থেকে ট্রেনবোঝাই খাদ্যশস্য, মানুষ ও গোলাবারুদ। কামান গর্জনে সারা দেশ জেগে উঠেছে। দমন ও অত্যাচারের চাপে যে সমস্ত অতৃপ্ত বাসনা ও দুষ্প্রবৃত্তি বহুদিন থেকে পুঞ্জীভূত হয়ে আসছিল, এবার সেগুলি ছাড়া পেয়েছে।

যে শহরের লোকেরা বিকৃত, কলুষিত জীবনযাত্রায় গা ঢেলে দিয়েছিল, এখন মনে হয় তারা যেন একটা দুঃস্বপ্ন থেকে জেগে উঠেছে। সমগ্র বিশ্বে যে ঝড় বয়ে যাবে, কামান গর্জন যেন তারই মহা আহ্বান। পুরাতন জীবন আর যেন সহ্য হয় না। একটা উৎকট উন্মত্তভাবশে লোক যুদ্ধকে অভিনন্দিত করে।

কে শত্রু, কেনই বা যুদ্ধ করা হচ্ছে গ্রামাঞ্চলে তা নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না—তাদের কাছে সবই সমান। ক্রোধ ও বিদ্বেষের একটা রক্তাক্ত পর্দা তাদের দৃষ্টিশক্তিকে বহুদিন থেকেই আচ্ছন্ন করে রেখেছে। ভয়ংকর কাজ করার সময় সমুপস্থিত। চাষী যুবকেরা তাদের স্ত্রী ও প্রিয়তমাদের ছেড়ে অধীর আগ্রহে দলে দলে গিয়ে মালবাহী ট্রাকে চড়ে এবং শিস দিয়ে ও অশ্লীল গান গেয়ে শহরের পর শহর ঘুরে বেড়ায়। পুরনো জীবনের অবসান হয়েছে—মনে হয় কেউ যেন একটা বড় হাতা দিয়ে নাড়ছে আর রাশিয়া টগবগ করে ফুটছে। যুদ্ধের মাদকতায় প্রমত্ত হয়ে সব কিছুই যেন গতি পেয়েছে, সামনের দিকে ছুটে চলেছে।

বহু মাইল ব্যাপী রণাঙ্গনে কামান গর্জন আকাশ বাতাস মথিত করে তুলেছে। সরবরাহ বাহিনীর সৈন্য ও গাড়ীগুলি যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে, মিলিয়ে যায়। সেখানে জনপ্রাণী সবই অনড়, নিশ্চল। প্রত্যেকের জন্য স্থান নির্দিষ্ট রয়েছে ভূগর্ভে, পরিখায়—সেখানেই সে ঘুমোয়, খায়, উকুন মারে আর বৃষ্টির আবছা পর্দা ভেদ করে রাইফেল থেকে গুলি চালায়।

রাত্রিবেলা প্রচণ্ড অগ্নিশিখায় সমস্ত দিগন্ত লাল হয়ে ওঠে; হাউইগুলি আকাশের বুকে উজ্জ্বল আলোরেখা সৃষ্টি করে বিদ্যুৎবেগে ছুটে চলে এবং রাশি রাশি ফুলঝুরি ছড়িয়ে শেষ হয়, কামানের গোলাগুলি কর্ণভেদী শব্দ করে উড়ে এসে পড়ে এবং বিদীর্ণ হবার সঙ্গে সঙ্গে ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হয় আগুন, ধোঁয়া ও ধূলিরাশি।

এখানে ভয় মানুষের জীবনীশক্তিকে কামড়ে কামড়ে খায়, গা ছম ছম করে, হাতের আঙুলগুলি অবশ হয়ে যেন বুজে আসে। অবস্থা চরমে ওঠে গিয়ে মাঝরাত্রের দিকে। কাঠিন্যভরা মুখে অফিসারগণ ছুটে এসে চীৎকার ও

গালাগালি করে, ঘুষি মেরে সৈন্যদের জাগিয়ে দেয়। ঘুমে ও ঠাণ্ডায় লোকগুলির চোখমুখ ফোলা। পরিখা থেকে উঠে অসমতল মাঠের ওপর দিয়ে হোঁচট খেতে খেতে ছুটে চলে তারা, মুখে অশ্লীল গালি নরত জন্তুজানোয়ারের মত গোঁ গোঁ শব্দ, একবার তারা শুয়ে পড়ে আবার লাফিয়ে ওঠে, তারপর বধির, উন্মাদ, ভয় ও ক্রোধে অর্ধ-অচেতনের মত শত্রুপক্ষের পরিখাগুলির মধ্যে গিয়ে পড়ে ঝাঁপিয়ে।

তারপর যে সেই পরিখাসমূহের মধ্যে কি হয় কারো কিছু মনে নেই। এখন যদি কেউ বীরত্ব প্রকাশের জন্য বর্ণনা করে—কিভাবে বেয়নেটটা ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল, কিভাবে রাইফেলের কুঁদোর গুঁতোয় মাথাটা ফেটে চৌচির হয়ে গেল, তবে বলতে হবে সে মিথ্যে কথা বলছে। এই নৈশ আক্রমণের একমাত্র অবিসম্বাদী ফল হ'ল কতগুলি মৃতদেহ।

আরম্ভ হয় আর একটি নতুন দিন। রণাঙ্গনের রন্ধনশালাও স্থানান্তরিত হয়েছে। শীতার্ত ও শ্রান্ত সৈন্যরা আহার ও ধূমপান করে। তারপর তারা সব খিস্তি করতে থাকে, মেয়েছেলেদের সম্পর্কে রসের কথা বলে—কিন্তু তাদের অধিকাংশ কথাই মিথ্যা। নিজেদের দেহে উকুন আছে কিনা তারা একবার দেখে নেয়, তারপর ঘুমিয়ে পড়ে। বিষ্ঠা ও শোণিত দূষিত করে তুলেছে যে জায়গার আবহাওয়া, মৃত্যুর কালো ছায়া পড়েছে যেখানে, যে উন্মুক্ত স্থান থেকে অবিরাম কামানগর্জন শোনা যাচ্ছে, সেখানে দিন কয়েক ঘুমিয়ে নেয় তারা।

সে'তসে'তে কাদাময় স্থানে অন্যান্যের মত তেলেগিনও একই জীবন যাপন করছে, কয়েক সপ্তাহ ধরে পোষাকও ছাড়ে না, বুটও খোলে না। যে রেজিমেন্টে সে সাব-লেফ্‌টেনান্ট হিসেবে নাম লিখিয়েছে সেটাই এই আক্রমণে যোগ দিয়েছে। এই রেজিমেন্টের অর্ধেকেরও বেশি অফিসার এবং সৈন্য খোয়া গেছে, কোন নতুন সৈন্য আমদানী হয়নি, মাত্র একটা বিষয়ের প্রতীক্ষায় আছে তারা: ছিন্নবস্ত্রে, শ্রান্ত দেহে, অর্ধমৃত অবস্থায় তাদের পেছনে ফিরে যাবার ডাক কখন পড়বে।

কিন্তু সুপ্রীম কমান্ড চায় যত ক্ষতি স্বীকার করেই হোক শীতের আগেই কার্পাথিয়ান ব্যূহ ভেদ করে হাঙ্গেরিকে ধ্বংস করতে। যত সৈন্য লাগে লাগুক, যত মরে মরুক—সৈন্যের অভাব হবে না, প্রচুর রিজার্ভ বাহিনী রয়েছে। তারা মনে করছে, ক্রমাগত তিনমাস চালিয়ে যেতে পারলে অস্ট্রিয়ান বাহিনীর প্রতিরোধ ভেঙ্গে পড়বে, তারা তো ইতিমধ্যেই বিশৃংখলভাবে পশ্চাদপসরণ করছে। ক্র্যাকাও ও ভিয়েনার পতন হবে এবং রুশ বাহিনীর বাম বাহু তখন জার্মানীর অরক্ষিত পৃষ্ঠদেশে আক্রমণ চালাতে পারবে।

এই পরিকল্পনা অনুসারে রুশ বাহিনী অবিরাম পশ্চিম দিকে এগিয়ে চলে। সহস্র সহস্র সৈন্য তাদের হাতে বন্দী হয়। প্রতিপক্ষের প্রচুর খাদ্য, গোলাবারুদ, অস্ত্রশস্ত্র ও পোষাকপরিচ্ছদ তারা হস্তগত করে। আগেকার

দিনের যুদ্ধে এর একাংশ সাফল্য লাভ করলে, এখনকার যে সমস্ত অবিশ্রান্ত রক্তাক্ত রণে এক একটি পূর্ণ আর্মি কোর নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, আগেকার দিনে তার একটিও হলে যুদ্ধের ফলাফল চূড়ান্তভাবে নিরূপিত হয়ে যেত। আর আজকাল প্রথম রণেই যদি সমস্ত রেগুলার আর্মি নিশ্চিহ্ন হয় তবে যুদ্ধের প্রচণ্ডতা আরো বাড়ে। আবালবৃদ্ধ সকলেই, গোটা জাতিই এখন যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। এই যুদ্ধে এমন কিছু আছে যা মানুষ ধারণাও করতে পারে না। মনে হয়, শত্রু বুঝি নিশ্চিহ্ন হয়ে এসেছে, তার শেষ শোণিতবিন্দু পাত হতে আর দেরি নেই, আর এক আঘাত হানলেই চূড়ান্ত জয়লাভ করা যাবে; কিন্তু সেই আঘাত হানতে গিয়ে দেখা যায় প্রতিপক্ষের বিধ্বস্ত বাহিনীর স্থান এসে দখল করেছে নতুন সৈন্যদল, তারা মরিয়া হয়ে মৃত্যু ও ধ্বংসের দিকে এগিয়ে আসছে। চতুর বুশ কৃষকরা ভালভাবেই জানে যে, তারা শুধু কামানের খোরাক এবং প্রভুরা এই কসাইখানায় জবাই করার জন্য তাদের গরুর পালের মত তাড়িয়ে নিয়ে এসেছে। তথাপি তারা এবং দুর্বল, অতিভোজী ইওরোপীয়গণ যেরূপ প্রচণ্ডতার সঙ্গে যুদ্ধ করছে এবং স্বেচ্ছায় অকাতরে প্রাণ বিসর্জন দিচ্ছে, দুর্ধর্ষ ভ্রাম্যমান তাতারগণ বা পারস্যের দুর্জয় সৈন্যরাও বুঝি ততখানি পারত না।

তেলেগিনের রেজিমেন্টের অবশিষ্ট সৈন্যরা একটি অপরিসর, গভীর নদীর তীর ধরে পরিখায় আশ্রয় গ্রহণ করে। স্থান হিসেবে এটা ভাল নয়, চারদিক থেকেই দেখতে পাওয়া যায়, পরিখাও অগভীর। যে কোন মুহূর্তেই এগিয়ে যাবার জন্য রেজিমেন্টের প্রতি আদেশ হতে পারে, ওপারের পরিখা থেকে অস্ট্রিয়ান সৈন্যরা মুহুর্মুহু কামান দাগছে, তবু তারই মধ্যে তাদের আনন্দ যে তারা একটু ঘুমিয়ে নিতে পারছে, বুট খুলে একটু বিশ্রাম করার সুযোগ পাচ্ছে।

সন্ধ্যার দিকে সাধারণত যেমন হয়ে থাকে তেমনি ঘণ্টা তিনেকের জন্য গোলাগুলি বর্ষণ বন্ধ হয়, তেলেগিন তখন রেজিমেন্টের প্রধান কার্যালয়ে যায়। তাদের পরিখার মাইলখানেক পেছনে একটা পরিত্যক্ত কেল্লায় এই প্রধান কার্যালয় স্থাপিত হয়েছে। আঁকাবাঁকা নদীটার ওপর পেঁজা তুলোর মত একটা কুয়াশার পর্দা পড়েছে, তীরের ঝোপগুলির ওপরও তা মালার মত ঝুলছে। বাতাস আর্দ্র, তাতে ভেজা পাতার গন্ধ আছে।

তেলেগিন রাস্তার পাশের নালাটা লাফিয়ে পার হয় এবং সিগারেট ধরাবার জন্য সড়কে দাঁড়ায়। তার দু'পাশে কুয়াশায় নিষ্পত্র লম্বা গাছ মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। জলাভূমিতে গাছগুলির গোড়ায় যেসমস্ত গর্ত ও ফাঁকা জায়গা আছে মনে হয় সেগুলি দুধে ভরা। এই নিস্তব্ধতার মধ্যে একটা গুলি বাঁশীর মত আওয়াজ করে চলে যায়। একটা গভীর নিশ্বাস ফেলে তেলেগিন ছায়াঘন বৃক্ষগুলির দিকে ঊর্ধ্ব দৃষ্টিতে চেয়ে পথ চলতে থাকে, তার পায়ের নীচে কঙ্করগুলি খালি কড়মড় কড়মড় করে। এই একা পথ চলা,

একা ভাবা আর এই নিস্তব্ধতা তার মনে একটা প্রশান্তি এনে দিয়েছে; দিনের বেলার সেই কর্ণপটাহবিদারী শব্দের কথা সে ভুলে গেছে, একটা সূক্ষ্ম, তীক্ষ্ম বেদনা অনুভব করছে সে তার হৃদয়ে। আর একবার সে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে, তারপর সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ঘাড়ের পেছনে পাঞ্জা দুটো রাখে এবং আঙুলের ভেতর আঙুল ঢুকিয়ে দেয়। মনে হয় সে যেন কোন স্বপ্ন জগতে হেঁটে চলেছে, সেখানে আছে শুধু অসংখ্য কল্পতরু, তার প্রণয়কাতর কম্পিত হৃদয় আর দাশার স্পর্শাতীত সুষমা।

এই বিশ্রাম ও প্রশান্তির সময় দাশাকে সে কাছে পায়। বিধাতার বিশ্বে নিতান্ত অপ্রয়োজনীয় কামানের গোলার ধাতব হুংকার, রাইফেলের গুলির আওয়াজ, চীৎকার ও কটূবাক্য যখনই থেমে যায়, পরিখার এককোণে যখনই সে একটু শান্তিতে মাথা রাখবার অবসর পায় তখনই দাশার মাধুরীর স্পর্শ সে তার হৃদয়ে অনুভব করে।

তেলেগিন ভাবে, যদি তাকে মরতে হয় তবে শেষ মুহূর্ত পর্যন্তও তার এই অনুভূতি থেকে যাবে। মৃত্যুর কথা সে ভাবে না বা মৃত্যুকে সে ভয়ও করে না। যে অতুল জীবনৈশ্বর্যের অধিকারী হয়েছে সে তা থেকে এখন তাকে কিছুই, এমন কি মৃত্যুও আর বঞ্চিত করতে পারবে না।

সেই গ্রীষ্মের সময় দাশাকে শেষবারের মত দেখার জন্য সে যখন ইউপাতোরিয়ার দিকে গিয়েছিল, তার মনে তখন এসেছিল, একটা সংকোচ ও দ্বিধার ভাব, সেখানে যাওয়ার সর্বপ্রকার কৈফিয়ৎ খুঁজছিল সে। কিন্তু রাস্তায় যখন দেখা হয়ে গেল তখন দাশার চোখের সেই অপ্রত্যাশিত জল, তার বুকে গুঁজে দেওয়া দাশার সেই স্বর্ণাভ মস্তক, তার কেশ, সমুদ্রের স্বাদযুক্ত তার বাহু ও স্কন্ধ, শিশুর মত সরলতা ভরা তার ছোট মুখ, তার সেই সিক্ত চোখের পাতা, সেই মুখ তুলে অর্ধনিমীলিত ছলছল নয়নে তার ব্যাকুলভাবে বলা: "ইভান ইলিয়িচ, ইভান ইলিয়িচ আমার, আমি যে তোমারই অপেক্ষায় ছিলাম!" —এই সমস্ত অভাবনীয় ব্যাপার যেন আকাশ থেকে পড়ল, সমুদ্রের ধারে সেই রাস্তার ওপর কয়েকমুহূর্তে তেলেগিনের সমগ্র জীবনকে তা একেবারে পরিবর্তিত করে দিল। সেই প্রিয় মুখখানির দিকে চেয়ে সে বলেছিল:

"আজীবন আমি তোমাকে ভালবাসব।"

পরে তার মনে হয়েছিল সত্যি কি দাশাকে একথা সে বলেছে, না তার মনের মধ্যে তা ছিল। বলুক না বলুক, দাশা কিন্তু ঠিকই বুঝেছিল। সে বলেছিল:

"তোমাকে আমার অনেক কথা বলার আছে। চল।"

তারা জলের ধারে গিয়ে বালির ওপর বসল। দাশা এক মুঠো নুড়ি কুড়িয়ে একটা একটা করে তা সমুদ্রের জলে ছুঁড়ে মারে।

"কথা হ'ল এই যে, আমার বিষয়ে তুমি যখন সমস্ত জানতে পারবে তখনো আমার প্রতি তোমার এই অনুরাগ থাকবে কিনা নিশ্চয় করে বলা যায় না।

অবশ্য তুমি আমাকে ভালবাসবে কি ছেড়ে যাবে, তাতে কিছু যায় আসে না।" দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে দাশা। "তুমি যখন দূরে ছিলে আমি তখন খুব খারাপ কাজ করেছি, ইভান ইলিয়িচ। পার তো আমাকে ক্ষমা কর।"

তারপর সে অকপটে সমস্ত খুলে বলতে থাকে; সামারার সব ঘটনা, এখানে সে কিভাবে এল এবং কি করে বেসনভের সঙ্গে দেখা হ'ল, পিতার্সবুর্গের সেই বিষ-বাষ্প আবার তার জীবনে এসে কিভাবে তার রক্তকে দূষিত করে ফেলেছে, আবার তার মধ্যে সেই ঔৎসুক্য জাগিয়ে দিয়েছে, সব কিছু আবার তার কাছে কিভাবে বিষাক্ত করে তুলেছে এবং তার ফলে কিভাবে জীবনের প্রতি তার বিতৃষ্ণা এসে গেছে।

"নিজের সঙ্গে সংগ্রাম করে কতদিন বাঁচা যায়? হঠাৎ মনে হ'ল, মাথি একবার কাদা গায়ে, ভালই হবে। কিন্তু শেষ মুহূর্তে ইভান ইলিয়িচ, আমি ভয় পেয়ে গেলাম।" দাশা তার হাত দুটো ঊর্ধ্বে তুলে বলেঃ "বাঁচাও আমাকে। আমি পারিনে, চাইনে জীবনকে আর আমি বিষিয়ে তুলতে। নিশ্চয়ই জীবনের সমস্ত মাধুর্য আমার নষ্ট হয়ে যায়নি। অন্য কিছু, সম্পূর্ণ অন্যরকমের কিছু চাই আমি।"

এর পর দাশা অনেকক্ষণ আর কথা বলে না। আবশির মত নীল জল সূর্যকিরণে জ্বলজ্বল করছে, তেলেগিন সেদিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে, সব-কিছু সত্ত্বেও তার হৃদয়ে অপার আনন্দের হিল্লোল খেলে যাচ্ছে। খানিকক্ষণ বাদে বাত্যাবিতাড়িত একটা ঢেউ এসে যখন দাশাব পাদস্পর্শ করে, একমাত্র তখনই তার খেয়াল হয় যে, যুদ্ধ বেধেছে এবং পরদিনই তেলেগিনকে গিয়ে তার রেজিমেন্টে যোগ দিতে হবে।

"ইভান ইলিয়িচ?"

"কি?"

"আমাকে তোমার ভাল লাগে?"

"হ্যাঁ।"

"খুব ভাল লাগে?"

"হ্যাঁ।"

দাশা তখন বালুর ওপর দিয়ে জানুদুটো সরিয়ে এনে তেলেগিনের আরো কাছে ঘেঁষে বসে। তারপর স্টীমারে যেমন রেখেছিল সেভাবে তার হাতে হাত দুটো রেখে সে বলেঃ

"আমারও তোমাকে ভাল লাগে, ইভান ইলিয়িচ।"

একটু থেমে যায়, তারপর তেলেগিনের কম্পিত আঙুলগুলি শক্ত করে চেপে ধরে দাশা বলেঃ

"রাস্তায় না তুমি আমাকে কি বলছিলে?" ললাট কুঞ্চিত করে সে। "যুদ্ধ? কাদের সঙ্গে?"

"জার্মানদের সঙ্গে।"

"ও! আর তুমি?"

"কালই আমাকে যেতে হবে।"

দাশার যেন নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে, কিছু বলে না সে। সমুদ্রের তীর ধরে দূর থেকে ছুটতে ছুটতে তাদের দিকে আসতে দেখা যায় নিকলাই ইভানোভিচকে। মনে হয় এইমাত্র তিনি ঘুম থেকে উঠে এসেছেন। পরনে তাঁর একটা ডুরে পায়জামা। তাঁর হাতের খবরের কাগজের একটা পৃষ্ঠা তুলে ধরে তিনি ইসারা করছেন আর ডাকতে ডাকতে আসছেন। ইভান ইলিয়িচের দিকে তাঁর নজর নেই। কিন্তু দাশা যখন বলে ঃ

"জামাইবাবু, এ হচ্ছে আমার সব চেয়ে প্রিয় বন্ধু," নিকলাই ইভানোভিচ তখন তেলেগিনের বাহু শক্ত করে চেপে ধরে জোরে জোরে তার মুখের ওপর বলতে থাকেন ঃ

"এও আমাদের দেখতে হ'ল হে: তরুণ! একে বল তোমরা সভ্যতা! দানবীয় ব্যাপার! বুঝলে? পাগলের প্রলাপ!"

সারাদিনে দাশা তেলেগিনকে এক মিনিটের জন্যও ছেড়ে দিল না। সে শান্ত হয়ে গেছে, সর্বদাই কি যেন ভাবছে। স্বচ্ছ সূর্যকিরণ ও সমুদ্রকল্লোলে পরিপূর্ণ সে দিনটি তেলেগিনের কাছে অনন্ত বলে মনে হয়। এক একটি মুহূর্তকে মনে হচ্ছে এক একটি যুগ।

তেলেগিন ও দাশা সমুদ্রসৈকতে ঘুরে বেড়ায়, বালুর ওপর শুয়ে পড়ে, গাড়ীবারান্দায় গিয়ে বসে, কিন্তু সব সময়ই তাদের মনে হয় তারা যেন কিরকম একটা কুয়াশার মধ্যে আছে। নিকলাই ইভানোভিচের চোখের আড়াল হবার উপায় নেই, সর্বত্র তিনি গিয়ে হাজির; যুদ্ধ এবং জার্মানদের বর্বরতা ও নৃশংসতা সম্পর্কে অনবরত তিনি বকে চলেছেন।

সন্ধ্যার দিকে তারা কোনরকমে নিকলাই ইভানোভিচের দৃষ্টি এড়িয়ে উপসাগরের তীর ধরে অনেক দূর চলে যায়। এক সঙ্গে পা ফেলে নীরবে তারা হেঁটে চলে। তেলেগিনের মনে হয় দাশাকে এবার কিছু বলা উচিত। দাশা নিশ্চয়ই তার কাছ থেকে দু'টি ভালবাসার কথা শুনতে চায়; খোলাখুলি কথা পাবার ইচ্ছেই কি তার না আছে। কিন্তু সে কি বলবে? তার মনের কথাকে কি ভাষায় ব্যক্ত করা সম্ভব? না, তা ব্যক্ত করা যায় না।

"না, না," মাটির দিকে চেয়ে আপন মনে বলে সে। "তাকে এ ধরনের কোন কথা বলা দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পরিচায়ক হবে; আমাকে তার ভালবাসা কি করে সম্ভব, কিন্তু যেমন সরল ও কোমল হৃদয় তার, তাতে আমি যদি তার কাছে প্রস্তাব করি অমনি সে ভাববে আমাকে গ্রহণ করতে সে বাধ্য। না, এ তার ওপর অত্যাচার করা হবে। তাছাড়া অনির্দিষ্ট কালের জন্য আমাদের উভয়কে ছাড়াছাড়ি হয়ে থাকতে হবে এবং এমনও হতে পারে আমি এই যুদ্ধ থেকে আর ফিরলামই না; সুতরাং তাকে তো এসমস্ত বিষয়ে বলার কোন অধিকারই আমার নেই।"

নিজেকে সে যখন এভাবে ক্ষতবিক্ষত করছিল তখন দাশা হঠাৎ থেমে দাঁড়ায় এবং একহাতে তেলেগিনের কাঁধটা ধরে ঝুঁকে পড়ে অন্য হাতে নিজের পায়ের একপাটি জুতো খোলে। জুতোর বালি ঝেড়ে ফেলতে ফেলতে সে বলে, "ভগবান! হে, আমার ভগবান!" আবার সে জুতোটা পায়ে দেয়, সোজা হয়ে দাঁড়ায় এবং একটা গভীর নিশ্বাস ফেলে বলে:

"তুমি চলে যাবার পরও তোমার প্রতি আমার ভালবাসা একটুও কমবে না, ইভান ইলিয়িচ।"

তারপর সে দুহাতে তেলেগিনের গলা জড়িয়ে ধরে, দুটি স্বচ্ছ ধূসর চোখ দিয়ে তার চোখের দিকে চেয়ে থাকে, দৃষ্টিতে হাসির রেশ নেই, যেন কঠিন। আর একবার আস্তে আস্তে নিশ্বাস ফেলে দাশা বলে:

"সেখানেও আমাদের মিলন হবে, কি হবে না?"

তেলেগিন ধীরে তাকে কাছে টেনে নেয় ও তার কোমল কম্পিত ওষ্ঠাধরে চুম্বন করে। দাশা চোখ বোজে। দুজনের শ্বাসপ্রশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে আসে। দাশা নিজেকে ছাড়িয়ে নেয় এবং তেলেগিনের বাহুতে বাহু রেখে আবার হাঁটতে আরম্ভ করে; তাদের পায়ের কাছে কালো ঘন বারি রক্তিম রসনা দিয়ে তটভূমিকে অবলেহন করছে।

কোন নীরব মুহূর্ত এলেই এসমস্ত স্মৃতি দ্বিগুণ হয়ে তেলেগিনের চিত্তপটে জেগে ওঠে। দুপাশে গাছ, কুয়াশাচ্ছন্ন সড়ক দিয়ে হেঁটে চলেছে সে; এক হাতের আঙুল আর এক হাতের আঙুলের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে ঘাড়ের পেছনে হাত রেখে হাঁটতে হাঁটতে এখন আবার বেশি করে মনে পড়ছে তার দাশার সেই উজ্জ্বল দুটি চোখ, আর অনুভব করছে তার সেই দীর্ঘস্থায়ী চুম্বন।

"থাম! কে যাচ্ছ!", তাকে দেখে কুয়াশার মধ্যে কে একজন কর্কশ কণ্ঠে চীৎকার করে ওঠে।

"স্বপক্ষের লোক, স্বপক্ষের লোক!" জবাব দেয় তেলেগিন। হাত নামিয়ে সে ওভারকোটের পকেটে ঢুকিয়ে দেয় এবং ওক গাছের নীচে ঘুরে ছায়ার ন্যায় অস্পষ্ট কেল্লাটার দিকে এগিয়ে যায়। কয়েকটা জানালা দিয়ে উজ্জ্বল হলদে আলো দেখা যাচ্ছে। ফটকে একজন সৈন্য তেলেগিনকে চিনতে পেরে হাতের সিগারেটটা ফেলে দেয় এবং 'এটেন্‌সন' হয়ে দাঁড়ায়।

"ডাক এসেছে?"

"না, সার, প্রতিমুহূর্তেই আমরা ডাকের আশা করছি।"

ইভান ইলিয়িচ হল-ঘরে চলে যায়। ঘরের শেষ প্রান্তে ওক কাঠের একটা চওড়া সিঁড়ির ওপরের দিকে ঝুলানো একটা চিত্রিত পর্দায় দেখা যাচ্ছে আদম ও ইভের ছবি; সরু সরু গাছের মাঝখানে তারা দাঁড়িয়ে আছে; ইভের হাতে একটা আপেল ও আদমের হাতে ফুলসমেত একটা শাখা। সিঁড়ির গোড়ায়

স্তম্ভের ওপর বোতলের মধ্যে বসানো একটা মোমবাতি জ্বলছে, তার ক্ষীণ আলো গিয়ে পড়েছে ছবি দুটির অনুজ্জ্বল মুখে ও নীলাভ অঙ্গে।

ডানদিকের দরজা খুলে তেলেগিন একটা শূন্য ঘরে প্রবেশ করে, ঘরটার ছাতে কারুকার্য রয়েছে। আগের দিন একটা কামানের গোলা এসে পড়ায় ছাতটার এককোণ ধ্বসে পড়েছে। লেফ্‌টেনান্ট প্রিন্স বেলস্কি ও সেকেন্ড লেফ্‌টেনান্ট মার্তিনফ আগুনের কুন্ডের সামনে একটা খাটিয়ায় বসে আছে। তেলেগিন ও তারা পরস্পর পরস্পরকে অভিবাদন করে। তেলেগিন তাদের জিজ্ঞাসা করে যে, প্রধান কার্যালয় থেকে কখন ডাকের গাড়ী এসে পৌঁছাবে বলে তারা আশা করে। অদূরেই গুলি বোঝাই একটা বাক্স পড়ে ছিল; সে গিয়ে তার ওপর বসে। আলোতে তার চোখ দুটো মিট মিট করছে।

"আচ্ছা, এখনো কি সেখানে গুলি চলছে?" জিজ্ঞাসা করে মার্তিনভ।

তেলেগিন কোন উত্তর দেয়না, খালি কাঁধ দুটো সামান্য নাচায়। প্রিন্স বেলস্কি নিম্নস্বরে কথা বলতে থাকে:

"সব চেয়ে অসহ্য হ'ল দুর্গন্ধ। বাড়িতে আমি চিঠি দিয়েছি এবং তাতে লিখেছি মরতে আমার ভয় নেই। আমার দেশের জন্য নিজের জীবন বলি দিতে আমি প্রস্তুত, সত্যি কথা বলতে কি এজন্যই আমি পদাতিক বাহিনীতে চলে এসেছি এবং এখানে এই পরিখায় বসে আছি। কিন্তু দুর্গন্ধ আমাকে মেরে ফেলছে।"

"দুর্গন্ধে কি এসে যায়। ভাল না লাগে গন্ধ শুঁকো না," কাঁধের একটা ফিতে টেনে সোজা করতে করতে বলে মার্তিনভ। সব চেয়ে অসহ্য লাগে যে, এখানে কোন মেয়েমানুষ নেই। এতে কোন্ ভালটা হবে! তুমি নিজেই ভেবে দেখ না—আমাদের আর্মি কমান্ডার হলেন পুরনো বালির-বাক্সের মত একটা শুষ্ক নীরস প্রাণী, অতএব আমাদের জন্যও এখানে সন্ন্যাস জীবনের ব্যবস্থা। না আছে মদ, না আছে মেয়েমানুষ। এর নাম সৈন্যদের সুখসুবিধা বিধান! এ কেমনতর যুদ্ধ হে?"

মার্তিনভ খাটিয়া থেকে লাফিয়ে ওঠে এবং বুটের মাথা দিয়ে একটা জ্বলন্ত কাঠকে লাথি মারতে আরম্ভ করে। প্রিন্স বেলস্কি নিবিষ্ট মনে আগুনের শিখার দিকে চেয়ে থাকে।

"পঞ্চাশ লক্ষ সৈন্য এখানে মলমূত্র ত্যাগ করছে, তার ওপর মানুষের মৃতদেহ ও মড়া ঘোড়াগুলি পচছে। সারা জীবন আমার মনে থাকবে এই যুদ্ধটা একটা দুর্গন্ধ। ওয়াক—থুঃ!"

এই সময় আঙিনায় একটা মোটর গাড়ীর এঞ্জিন কেঁপে কেঁপে আওয়াজ করে ওঠে।

"মশায়রা, ডাক এসেছে!" দরজার ফাঁক দিয়ে একজনকে আনন্দে চীৎকার করে বলতে শোনা যায়।

অফিসারগণ বেরিয়ে ফটকের কাছে যায়। কালো কালো মানুষের মূর্তি

গাড়ীর নিকটে ঘুরে বেড়াচ্ছে আর আঙিনায় লোক ছুটোছুটি করছে। একটা কর্কশ কণ্ঠে বারবার বলতে শোনা যাচ্ছেঃ "ভদ্রমহোদয়গণ, আমার হাত থেকে এগুলি ছিনিয়ে নেবেন না।"

চিঠি ও পার্সেলের থলেগুলি হলের মধ্যে নিয়ে গিয়ে সিঁড়ির ওপর সেই আদম ও ইভের ছবির নীচে খোলা হয়। এক মাসের চিঠিপত্র। এ যেন প্রেম, প্রীতি ও অশ্রুতে ভরা এক বিচিত্র সমুদ্র—এ সমস্ত হ'ল মানুষের পেছনে ফেলে আসা সেই প্রিয় জীবন যা আর ফিরে পাবার উপায় নেই, তা সমস্তই লুকানো রয়েছে এই ময়লা ক্যানভাসের থলেগুলিতে।

"মশায়রা, আমার হাত থেকে আপনারা এগুলি ছিনিয়ে নেবেন না," জোয়ান রক্তিমানন ক্যাপ্টেন বার্বাকিন চেঁচিয়ে বলে। "সাব-লেফ্‌টেনান্ট তেলেগিন, এই নিন আপনার ছ'খানা চিঠি ও একটা পার্সেল।...নেঝ্‌নি, আপনার দু'খানা চিঠি.."

"নেঝ্‌নি মারা গেছে, সার।"

"কবে?"

"আজ ভোরে।"

তেলেগিন আবার সেই আগুনের ধারে চলে যায়। ছ'খানা চিঠিই দাশার। খামগুলির ওপর খুব খুব বড় অক্ষরে ঠিকানা লেখা। যে হাতের এই বড় বড় অক্ষর সেই প্রিয় হাতখানির জন্য ইভান ইলিয়িচের মনটা কেমন করে ওঠে। আগুনের দিকে ঝুঁকে বসে সে প্রথম খামখানি খোলে। চিঠির ভেতর থেকে সুগন্ধ বেরুতেই সমস্ত স্মৃতি তার মনের মধ্যে এমন ভাবে ভেসে ওঠে যে খানিকক্ষণের জন্য তাকে চোখ বন্ধ করে থাকতে হয়। তারপর সে পড়ে চলেঃ

"আপনাকে বিদায় দেবার পর জামাইবাবু ও আমি সোজা সিম্ফারোপলে চলে যাই এবং পিতার্সবুর্গের ট্রেন ধরি। এখন আমরা আমাদের সেই আগে-কার ফ্ল্যাটেই বাস করছি। জামাইবাবু বড় উদ্বেগে আছেন, দিদির কোন খবর নেই এবং আমরা জানিনে সে কোথায় আছে। আপনার ও আমার মধ্যে যা ঘটেছিল তা এতই মহৎ ও এমনই আকস্মিক যে এখনো পর্যন্ত আমি তাতেই ডুবে আছি। 'তুমি' না লিখে আপনাকে 'আপনি' লিখলাম বলে রাগ করবেন না। আপনাকে আমি ভালবাসি। একান্তভাবে আপনাকেই ভালবাসব এবং আজীবন প্রাণ দিয়ে ভালবাসব। কিন্তু এখন সব কিছুই যে গোলমেলে। রাস্তা দিয়ে সৈন্যরা মার্চ করে যাচ্ছে, সঙ্গে বাজছে ব্যান্ড। সমস্ত ব্যাপারটাই এমন করুণ যে মনে হয় বিগল্ ও সৈন্যদের সঙ্গে সুখও বুঝি মার্চ করে চলে যাচ্ছে। আমি জানি এ সমস্ত লেখা আমার উচিত নয়—তবু আমার অনুরোধ, যুদ্ধে নিজের দিকে সর্বদাই দৃষ্টি রাখবেন।..."

"সার, শুনুন, সার!"

তেলেগিন কষ্টে ফিরে চায়। দরজার ফাঁকে একজন আরদালি দাঁড়িয়ে।

"টেলিফোনে আপনাকে খবর পাঠিয়েছে, সার।...কোম্পানীর হেড-কোয়ার্টার্সে ডাক পড়েছে আপনার।"

"কে ডেকেছে আমাকে?"

"লেফ্‌টেনান্ট কর্নেল রোজানফ। তিনি আপনাকে যত শীগ্‌গির সম্ভব সেখানে যেতে বললেন।"

চিঠিটা পড়া শেষ হয়নি। তেলেগিন সেটাকে আবার ভাঁজ করে অন্যান্য চিঠির সঙ্গে শার্টের মধ্যে রাখে এবং টুপিটা প্রায় চোখ পর্যন্ত টেনে নামিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ে।

কুয়াশা এখন আরো ঘন হয়ে উঠেছে, গাছগুলি দেখতে পাওয়া যায় না। মনে হচ্ছে দুধের মধ্য দিয়ে যেন সে হেঁটে যাচ্ছে; জুতোর চাপে কঙ্করগুলি কড়মড় শব্দ করছে বলে বোঝা যাচ্ছে এটা রাস্তা। ইভান ইলিয়িচ আপন মনে পুনরাবৃত্তি করেঃ "একান্তভাবে আপনাকেই আমি ভালবাসব এবং আজীবন প্রাণ দিয়ে ভালবাসব।" সহসা সে থেমে দাঁড়ায় এবং দাঁড়িয়ে কান পাতে। মাঝে মাঝে গাছ থেকে টুপটাপ করে বড় ফোঁটা পড়ার শব্দ ছাড়া কুয়াশার মধ্যে আর কোন শব্দ শুনতে পাওয়া যায় না। তারপর কাছেই একটা যেন কল্‌কল্‌ শব্দ ও মৃদু খসখস শব্দের মধ্যে পার্থক্য অনুভব করার চেষ্টা করে সে। সে এগিয়ে চলে, কল্‌কল্‌ শব্দটা স্পষ্টতর হয়। হঠাৎ তার পা'টা কাদায় পড়ে, লাফ মেরে সে পেছন দিকে চলে আসে, তার পায়ের তলা থেকে খানিকটা কাদা ছিটকে গিয়ে ঢুপ করে জলে পড়ে। এখানে এসেই নদীর ধারে পুলের কাছে সড়কটা শেষ হয়েছে। পুলটা পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। তেলেগিন জানে, নদীর ওপারে একশ' পা গেলেই রয়েছে নদীতীর পর্যন্ত বিস্তৃত অস্ট্রিয়ানদের পরিখা। জলে কাদা প'ড়ে শব্দ হবার একটু পরেই চাবুকের মত আওয়াজ করে ওপার থেকে একটা গুলি ছোটে, নদীবক্ষে শব্দটা প্রতিধ্বনিত হয়; তার-পর আসে দ্বিতীয় ও তৃতীয় গুলি এবং অবশেষে লোহার কড়কড় শব্দ করে চলে গুলির বহর। সঙ্গে সঙ্গে চারদিক থেকে পাল্টা গুলি চলে, কুয়াশা ভেদ করে সে শব্দ কানে আসে। নদীর ওপর খটখট শব্দ ও গর্জন ক্রমশ বেড়েই চলে এবং সেই পৈশাচিক শব্দের মধ্যে আবার শোনা যায় মেশিনগানের ভটাভট্‌ আওয়াজ। বনের মধ্যে কোথাও "বুম্‌" করে একটা প্রচন্ড শব্দ হয়। গুড় গুড় শব্দে মথিত, আবড়োখাবড়ো ঘন কুয়াশার পর্দা মাটির ওপর শূন্যে ঝুলে থেকে এই নিত্যনৈমিত্তিক ঘৃণ্য কাজকে ঢেকে রেখেছে। ইভান ইলিয়িচের নিকটেই একটা গাছে কয়েকটা গুলি এসে মট্‌মট্‌ করে লাগে, কয়েকটা কচি ডাল ভেঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে। রাস্তা থেকে সরে গিয়ে সে ঝোপের ভেতর দিয়ে বেরাস্তায় হেঁটে চলে। টুপিটা সে খুলে ফেলে এবং ভেজা কপালটা মুছে নেয়। আবার সমস্ত শান্ত হয়ে আসে, কেবল ঝোপ থেকে টুপটাপ করে বৃষ্টির ফোঁটা পড়ার শব্দ শুনতে পাওয়া যায়। ভগবানকে ধন্যবাদ—আজই সে দাশার চিঠিগুলি পড়তে পারবে! তেলেগিনের মুখে হাসি দেখা দেয়; একটা

নালা লাফিয়ে পার হয় সে। নিকটেই একজনকে হাই তুলে বলতে শোনা যায়ঃ

"খুব ঘুমিয়ে নিয়েছি আমরা, ভাসিলি, চমৎকার ঘুম!"

"রাখ্," চট করে বলে একটা লোক। "কে একজন আসছে!"

"কে যায়?"

"মিত্র, মিত্র." তাড়াতাড়ি উত্তর দেয় তেলেগিন আর সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পায় পরিখার পাশে প্রাচীরের মত উঁচু করা যে মাটি রয়েছে তার পেছন থেকে দাঁড়িওয়ালা দুজন লোক মুখ তুলে তার দিকে চেয়ে আছে।

"কোন্ কোম্পানী?" প্রশ্ন করে সে।

"তিন নম্বর কোম্পানী, সার, আপনার নিজের কোম্পানী। আপনি ওপরে আছেন কেন, সার? গুলি লাগতে পারে।"

পরিখার মধ্যে তেলেগিন লাফিয়ে পড়ে এবং অফিসারদের সঙ্গে সংযোগ রাখার যে পরিখা রয়েছে সেদিকে হাঁটতে থাকে। গুলির আওয়াজ শুনে যেসমস্ত সৈন্য জেগে উঠেছিল তাদের বলাবলি করতে শোনা যায়ঃ

"যেরকম কুয়াশা করেছে তাতে তারা অনায়াসে কোন জায়গায় নদী পার হতে পারে।"

"খুবই পারে। তাতে আর অসুবিধে কি!"

"হঠাৎ গুলি চালাল, কি ভীষণ গর্জন!—কারণ তো কিছুই দেখিনে।.. আমাদের ভয় দেখাতে চায়, না নিজেরাই ভয় পেল?"

"তুমি ভয় পাওনি?"

"আমি? আমি একটুতেই ভয় পেয়ে যাই।"

"গাভরিলের হাতের আঙুলটা কেটে ফেলতে হয়েছে হে।"

"নিশ্চয়ই সে চীৎকার করেছে!"

"কারো কারো বরাত ভাল।...তাকে বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হবে।"

"বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হবে? কি আশা! গোটা হাতটা উড়ে গেলে না হয় একটা কথা ছিল। একটা আঙুল যাওয়ার অর্থ হচ্ছে তাকে কাছেই কোথাও পাঠিয়ে দেওয়া হবে—তারপর আবার তাকে কোম্পানীতে এসে যোগ দিতে হবে।"

"এই যুদ্ধ শেষ হবে কবে?"

"আঃ! চুপ কর!"

"যুদ্ধ একদিন শেষ হবেই, তবে ততদিন হয়ত আমরা বেঁচে থাকব না।"

"আমরা যদি অন্তত ভিয়েনাটাও নিতে পারতাম।"

"ভিয়েনা নিয়ে তোমার কি হবে?"

"না, কিছুই হবে না, তবু..."

"বসন্তকালের মধ্যে যদি যুদ্ধ শেষ না হয়, সবাই বাড়ির দিকে পালাবে।

জমি চাষ করবে কে—মেয়েরা? ঝুড়ি ঝুড়ি লোক জবাই হয়েছে। আর কত! ঢের হয়েছে। এবার আমরা চলে যাব।"

"না হে, তাড়াতাড়ি যুদ্ধ বন্ধ করার ইচ্ছে জেনারেলদের নেই।"

"এসব কি কথা? কে বলল তা?"

"আঃ, চুপ কর! সার্জেন্ট...তুমি বলে যাও।..."

"জেনারেলরা যুদ্ধ বন্ধ করবেন না।"

"ও ঠিক কথাই বলছে। প্রথমত তাঁরা দ্বিগুণ মাইনে পাচ্ছেন, ক্রস পাচ্ছেন, মেডেল পাচ্ছেন। তারপর একজন আমাকে বলল যে, প্রতিটি সৈন্য সংগ্রহের জন্য ইংরেজরা আমাদের জেনারেলদের সাড়ে আটত্রিশ রুবল করে দিচ্ছে।"

"ও, শুয়োরের বাচ্চারা আমাদের গরুবাছুরের মত বেচছে!"

"কুছ পরোয়া নেই। দ্যাখ না, কি হয়।"

অফিসারদের পরিখায় ঢুকে তেলেগিন দেখে তার ব্যাটেলিয়ন কমান্ডার লেফটেনান্ট কর্নেল রোজানফ এক কোণে দেবদারু শাখার তলে এক গাদা ঘোড়ার কম্বলের ওপর বসে আছে। স্থূলকায়, চোখে চশমা এবং মাথায় পাতলা কোঁকড়ান চুল। তেলেগিনকে দেখে সে বলেঃ

"তুমি তা হলে এসে পৌঁচেছ শেষ পর্যন্ত!"

"আমি দুঃখিত, ফিওদর কুজমিচ, রাস্তা হারিয়ে ফেলেছিলাম—যে কুয়াশা!"

"আজ রাত্রে তোমাকে একটা কাজ করতে হবে।"

এতক্ষণ তার মলিন হাতে একটা রুটির টুকরো ছিল, এবার সে তা মুখে ফেলে দেয়। তেলেগিনের মুখটা আস্তে আস্তে কঠিন হয়ে ওঠে।

"বুঝলে, ইভান ইলিয়িচ, এই নদী পার হবার জন্য আমাদের প্রতি আদেশ হয়েছে। কাজটা নির্বিঘ্নে করতে পারলেই ভাল হয়, কি বল? ব'স না এখানে। একটু ব্রান্ডি খাবে? আচ্ছা, তবে দ্যাখ, আমি যে পরিকল্পনা করেছিঃ ঐ বড় অল্ডার গাছটার বিপরীত দিকে—ঠিক এই জায়গায় আমাদের একটা সেতু নির্মাণ করতে হবে। তারপর দুই প্লেটুন সৈন্য নদী পার হয়ে ওপাড়ে চলে যাক..."

॥ ষোল ॥

"সুসফ!"

"এই যে, সার!"

"এখানে খোঁড়! আস্তে—জলে মাটি ফেল না। ..এগিয়ে যাও, তোমরা, এগিয়ে যাও! জুবৎসফ!"

"এই যে, সার!"

"সবুর, এক মিনিট! এটা ওখানে রাখ। আর একটু খোঁড়...নামাও এটা।...এবার আলগা কর!"

"ঐ জায়গায় আলগা কর, ছোকরারা! আমার হাত যাবে, হাত যাবে! সরাও!"

"নাও, এবার ধাক্কা মার!"

"চেঁচিও না, বোকার দল, চুপ কর!"

"আর এক মাথা বাঁধ।..এবার তুলে ধরব, সার?"

"দুই মাথা বাঁধা হয়েছে?"

"সব ঠিক সার।"

"তা হ'লে তোল এবার!"

দুটো লম্বা কাঠের কড়িতে আড়াআড়ি ভাবে আরো অনেকগুলি কাঠের খণ্ড বাঁধা হয়েছে। চন্দ্রালোক-বিমিশ্রিত কুজ্ঝটিকায় কড়কড় শব্দে কড়ি দুটো আকাশে মাথা তুলে দাঁড়ায়। জরুরী প্রয়োজন মেটাবার জন্য এই সেতু। স্বেচ্ছাবাহিনীর লোকেরা তীরে ঘোরাফেরা করছে, তাদের অস্পষ্ট ছায়ার ন্যায় দেখাচ্ছে। তারা ফিসফিস করে কথা বলছে, খিস্তিও করছে।

"ঠিক মত আছে?"

"হ্যাঁ, সার, সব ঠিক আছে!"

"তবে নামাও এবার।.. হুঁশিয়ার!"

"আস্তে, ছোকরারা, আস্তে!"

নদীটা যেখানে সব চেয়ে বেশি সংকীর্ণ সেখানে কড়ি দুটোর একদিককার দুমাথা তীরের কাছে জলে খানিকটা বসে গেছে, আর ওপর দিকটা আস্তে আস্তে কুয়াশার মধ্যে নদীর দিকে নেমে যাচ্ছে।

"ওপাড় পর্যন্ত এটা যাবে তো?"

"একটু দেখেশুনে নামাবে!"

"বড্ড ভারী!"

"থাম...থাম, আস্তে!"

কিন্তু সেতুর আর এক মাথা ধপাস করে জলের মধ্যে পড়ে এবং বেশ খানিকটা জল ওপরের দিকে ছিটকে ওঠে। তেলেগিন হাত তুলে বলে:

"শুয়ে পড়!"

স্বেচ্ছাসেনারা নিঃশব্দে শুয়ে পড়ে, তীরের ঘাসের মধ্যে গা-ঢাকা দেয়। কুয়াশা ঘন হয়ে আসে। শেষ রাত্রির অন্ধকার আরো সূচীভেদ্য হয়ে ওঠে এবং ঊষার খর সমীরণ প্রবাহ দিনের আগমনবার্তা জানায়। নদীর অপর তীরে স্তব্ধতা বিরাজ করছে। তেলেগিন বলে:

"জুবৎসফ!"

"এই যে, সার!"

"নেমে যাও, গিয়ে তক্তাগুলি বিছাও।"

দীর্ঘকায় ভাসিলি জুবৎসফের গা দিয়ে ঝরঝর করে ঘাম ঝরছে। তেলেগিনের পাশ দিয়ে চলে গিয়ে সে তীর থেকে জলের দিকে নামতে থাকে। তেলেগিন দেখতে পায় তার বিশাল হাতটা কাঁপছে। ঘাসগুলিকে সে একবার মুঠোর মধ্যে ধরে, তারপর নেমে অদৃশ্য হয়ে যায়।

নীচে থেকে জুবৎসফকে ধরা ও চাপা গলায় বলতে শোনা যায়ঃ "অনেক জল।...দাও, তোমরা তক্তাগুলি এদিকে দাও দেখি।"

"আন আন, তক্তা আন, তক্তা আন।"

হাতে হাতে সবাই তাড়াতাড়ি নীরবে তক্তা দিতে থাকে। শব্দ হয়ে বলে পেরেক ঠোকা সম্ভব হচ্ছে না। কয়েকটা তক্তা বিছিয়েই জুবৎসফ জল থেকে তার ওপর উঠে পড়ে এবং দাঁত চিবিয়ে চিবিয়ে অর্ধস্ফুট স্বরে বলেঃ

"জলদি, জলদি, জলদি করে দাও তক্তাগুলি—ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কাজ ক'র না!"

সেতুর নীচে তুষারবৎ জল টগবগ করে ফুটছে এবং কড়িকাঠ দুটো দুলছে।

ওপারের ঝোপঝাড়গুলির কালো রেখা তেলেগিনের নজরে আসে, এপারের ঝোপঝাড়ের সংগে তার কোন পার্থক্য নেই, তবে মনে হয় ওগুলির মধ্যে যেন কি একটা আপদ লুকিয়ে আছে। তীরে যেখানে স্বেচ্ছাসেনারা শুয়ে আছে সেখানে সে যায় এবং জোরে বলেঃ

"ওঠ!"

অসম্ভব লম্বা মানুষগুলি ছায়ামূর্তির মত সেই সাদা ঘন কুয়াশার মধ্যে সহসা উঠে দাঁড়ায়।

"এক লাইনে ডবল মার্চ করে চল!"

তেলেগিন আবার সেতুর ধারে আসে। ঠিক সেই মুহূর্তে সূর্যরশ্মির মত একটা আলোর ঝলক সঞ্চরমান কুজ্ঝটিকারাশি ভেদ করে হলদে তক্তাগুলির ওপর এসে পড়ে এবং জুবৎসফ চমকে উঠে তার শ্মশ্রুমণ্ডিত মুখটা ওপর দিকে তোলে। সার্চলাইটের আলোটা পাশে ঝোপের দিকে ঘুরে যায় এবং একটা পল্লবহীন বৃক্ষ শাখার ওপর গিয়ে পড়ে, তারপর আবার আলোটা তক্তাগুলির ওপর ঘুরে আসে। তেলেগিনের মুখটা কঠিন হয়ে ওঠে, সে সেতুর ওপর চলে যায়। তার পরমুহূর্তেই সেই সমগ্র কালো নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে দিয়ে তার কানের কাছে বজ্রনাদ শুরু হয়ে যায়। অস্ট্রিয়ানরা সেতু লক্ষ্য করে মুহুর্মুহু রাইফেল ও মেশিনগানের গুলিবর্ষণ করতে থাকে।

তেলেগিন লাফিয়ে ওপাড়ে গিয়ে ওঠে, হাঁটু গেড়ে বসে নুয়ে পড়ে এবং পেছনের দিকে তাকায়। লম্বা একজন সৈন্য বুকের কাছে শক্ত করে তার রাইফেলটা ধরে সেতুর ওপর দিয়ে ছুটে আসছে—সৈন্যটিকে সে চিনতে পারে না। হঠাৎ দেখা গেল বন্দুকটা ফেলে দিয়ে দুবাহু ঊর্ধ্বে তুলে সেতুর এক পাশ দিয়ে সে জলে পড়ে গেল। সেতু, জল, তীর সর্বত্র এসে পড়ছে মেশিনগানের

অসংখ্য গুলি।...আর একজন সৈন্য দৌড়ে সেতুটা পার হয়ে আসে—সুসফ—সে এসেই তেলেগিনের পাশে শুয়ে পড়ে।

"শালাদের নাড়িভুড়ি ছিঁড়ে ফেলব না—হারামজাদারা!"

আর একজন পার হয়ে আসে, তারপর আর একজন—এই করে তারা চারজন হয়। আরো একজন পার হবার চেষ্টা করে, কিন্তু পারে না, চীৎকার করে সে জলে পড়ে যায়।

এরপর একে একে সবাই পার হয়ে আসে। শুয়ে পড়ে তারা। কোদাল দিয়ে তাড়াতাড়ি মাটি কেটে সামনের দিকটা খানিকটা উঁচু করে দেয়। ভীষণ গুলি চলে তখন। মাথা তুলতে পারে না তারা। তাদের মাথার ওপর দিয়েই চলেছে অজস্র মেশিনগানের গুলি। হঠাৎ একটু ওপরেই প্রচণ্ড শব্দ—একবার, দুবার নাঃ, পরপর ছবার—তাদের পেরিয়ে সামনে ছটা বিস্ফোরণ। রুশরা শত্রুপক্ষের মেশিনগানের ঘাঁটি তাক করে কামান দাগছে।

তেলেগিন ও ভাসিলি জুবৎসভ লাফিয়ে ওঠে, ছুটে চল্লিশ পা এগিয়ে যায় এবং আবার শুয়ে পড়ে। অন্ধকারে তাদের বাঁদিকে মেশিনগানের অবিরাম শব্দ শোনা যাচ্ছে। তবে এটা বেশ স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে, রুশ পক্ষেরই গুলিগোলার জোর বেশি এবং অস্ট্রিয়ানরা গা ঢাকা দিচ্ছে। আগের দিন রুশ গোলন্দাজ বাহিনী যে জায়গায় অস্ট্রিয়ানদের পরিখার সম্মুখস্থ কাঁটাতারের বেড়া বিধ্বস্ত করে দিয়েছিল, গুলির ফাঁকে স্বেচ্ছাসেনারা সেখানে ছুটে গিয়ে হাজির হয়।

রাত্রির অন্ধকারে অস্ট্রিয়ানরা সেই কাঁটাতারের বেড়া আবার মেরামত করতে লেগে গিয়েছিল। তার ওপর একটা মৃতদেহ ঝুলছিল। জুবৎসফ কাঁটা তারটা কেটে দিতেই মৃতদেহটা একটা বস্তার মত ধপ করে তেলেগিনের পায়ের কাছে পড়ে। স্বেচ্ছাসেনা লাপতেফ তার রাইফেলটা রেখে হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে যায়: অন্যান্যরা এগোয় না, পেছনেই থাকে। শত্রুপক্ষের পরিখার সামনে প্রাচীরের মত করে তোলা যে মাটির স্তূপ আছে তার আড়ালে সে গিয়ে শুয়ে পড়ে। জুবৎসফ চীৎকার করে তাকে বলেঃ

"উঠে একটা হাতবোমা ছোড়।"

কিন্তু লাপতেভের দিক থেকে কোন সাড়াশব্দই আসে না, তাকে নড়তে-চড়তেও দেখা যায় না। ভয়ে বোধ হয় তার সর্বাঙ্গ অবশ হয়ে গেছে। আরো জোর গুলি চলতে থাকে, স্বেচ্ছাসেনাদের নড়বার চড়বার উপায় নেই। তারা মাটিতে একেবারে গা লাগিয়ে শুয়ে থাকে।

"উঠে একটা হাতবোমা ছুড়ে মার!" জুবৎসফ আবার চীৎকার করে ওঠে। "আরে নেড়ী কুত্তার বাচ্চা, একটা হাতবোমা ছোড়!" যতটা পারে দেহটাকে ছড়িয়ে দেয় সে, তারপর রাইফেলের কুঁদোটা ধরে সঙ্গীণ দিয়ে লাপতেভের লম্বা কোটটার পেছনে খোঁচা মারে। ভয়ার্ত মুখটা ফিরিয়ে লাপতেভ চায়; তারপর তার বেল্ট থেকে একটা হাতবোমা খুলে নিয়ে বুকে ভর দিয়ে সে মাটির

ঢিঁবিটার ওপর ওঠে এবং পরিখার মধ্যে ছুঁড়ে মারে। বোমাটা বিদীর্ণ হবার পরই সে পরিখার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

"মার, শালাদের মার," অস্বাভাবিক কণ্ঠে চীৎকার করে ওঠে জুবৎসফ।

দশজন স্বেচ্ছাসেনা লাফিয়ে উঠে দাঁড়ায়, ছুটে এগিয়ে গিয়ে পরিখার মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যায়--কেবল বিস্ফোরণের গগনবিদারী প্রচণ্ড শব্দ কানে আসতে থাকে।

পরিখার সামনের মাটির বাঁধটার ওপর চটকরে উঠে ভেলোগিন এদিক ওদিক করতে থাকে, একটা হাতবোমা খুলবার চেষ্টা করে কিন্তু পারে না। অবশেষে পরিখার মধ্যে লাফিয়ে প'ড়ে সে দৌড়তে থাকে, তার দু'কাঁধে এ'টেল কাদা লেগে যায়। বারবার সে হোঁচট খায়, গলা ছেড়ে চীৎকার করতে থাকে।... হঠাৎ সাদা মুখোসের মত একটা মুখ নজরে পড়ে তার; পরিখার মধ্যে মাটির সঙ্গে যেন মিশে যাচ্ছে লোকটা। ভেলোগিন তার কাঁধ দুটো চেপে ধরে, লোকটা স্বপ্নাতুরের ন্যায় খালি বিড়বিড় ক'রে কি বলে।...

"চুপ কর, বোকা কোথাকার, আমি তোমাকে মারব না," লোকটাকে চীৎকার করে বলে ভেলোগিন, বলবার সময় তার প্রায় কান্না আসে। মৃতদেহগুলির ওপর দিয়ে টপকে টপকে ছুটে চলে ভেলোগিন। কিন্তু এখানকার লড়াইটা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। রাইফেল ফেলে দিয়ে ধূসর বর্ণের একদল লোক পরিখা থেকে ওপরে উঠে আসছে। পেছন থেকে রুশ সৈন্যরা বন্দুকের কুঁদো দিয়ে গুঁতিয়ে গুঁতিয়ে তাদের সামনের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। কিন্তু চল্লিশ পা দূরেই আড়াল থেকে শত্রুপক্ষের মেশিনগানটা তখনো গর্জন করছে; নদীর ওপর যেখানে সেতু পাতা হয়েছে সেদিকে চলেছে গুলি। ভেলোগিন স্বেচ্ছা-সেনা ও তাদের বন্দীদের ভেতর দিয়ে পথ করে এগিয়ে যায় এবং চীৎকার করে বলে ঃ

"কেউ কি ওটা বন্ধ করতে পারে না? জুবৎসফ! জুবৎসফ কোথায়?"

"এখানে, সার!"

"তুমি ওটা বন্ধ করতে পার না, গাধা কোথাকার?"

"কি ক'রে যাব, সার! কোত্থেকে যে গুলি আসছে.."

সকলে দৌড়ে এগোয়।

"ঐ যে, ওখান থেকে মেশিনগান দাগা হচ্ছে। বন্ধ কর ওটা!"

মেশিনগানটা যেখানে লুকনো রয়েছে, পরিখা থেকে একটা সরু পথ চলে গেছে সেখানে। ভেলোগিন উপুড় হয়ে সেদিকে ছুটে যায়, তারপর খাদের মধ্যে লাফিয়ে পড়ে। অন্ধকারে মেশিনগানের আওয়াজে সেখানে সব কিছু কাঁপছে। ভেলোগিন একটা লোকের বাহুতে ধরে টান মারতেই সমস্ত স্তব্ধ হয়ে যায়। মেশিনগানের কাছ থেকে লোকটাকে টেনে সরিয়ে আনবার চেষ্টা করতেই ধস্তাধস্তি বেধে যায়, লোকটার ঘনঘন নিঃশ্বাস বইতে থাকে।

"শুয়োরের বাচ্চা! আসবি না তুই, আসবি না কিছুতেই? রাখ শালা,

দেখাচ্ছি।" এই বলে জ্বংসফ তার রাইফেলের কুঁদো দিয়ে তিনবার গুঁতো মারে লোকটার মাথায়। অস্ট্রিয়ান সৈন্যটা থরথর করে কেঁপে ওঠে, মুখ দিয়ে তার "বু-বু-বু" শব্দ বেরয়, তারপরই চুপ।

লোকটাকে ছেড়ে দিয়ে তেলেগিন খাদ থেকে উঠে আসে। পেছন থেকে জ্বংসফ চেঁচিয়ে ওঠেঃ "মেশিনগানের সঙ্গে শিকল দিয়ে লোকটা বাঁধা আছে, স্যার !"

দেখতে দেখতে চারদিক ফর্সা হয়ে যায়। হলদে কাদায় রক্তের দাগ ও শোণিতধারা দেখা যাচ্ছে। সর্বত্র বস্তার মত মৃতদেহ পড়ে আছে, তার মধ্যে এখানে সেখানে ইতস্তত ছড়িয়ে আছে কতগুলি খাদ্যের থলি, টিনের কৌটা ও ফ্রাইং প্যান। স্বেচ্ছাসৈন্যরা ক্লান্ত, কেউ শুয়ে বিশ্রাম করছে, কেউ বা টিনের কৌটা খুলে খাবার খাচ্ছে, আবার কেউ কেউ অস্ট্রিয়ানদের ফেলে যাওয়া পোঁটলা-পুঁটলিগুলি খুলে দেখছে তাতে কিছু আছে কিনা।

বন্দীদের অনেকক্ষণ আগেই নদীর অপর তীরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। রেজিমেন্টের সমস্ত সৈন্য নদী পার হয়ে এসে এখানে ঘাঁটি গেড়ে বসে। রুশ গোলন্দাজ বাহিনী এবার অস্ট্রিয়ানদের দ্বিতীয় ব্যূহের ওপর কামান দাগতে থাকে। তারাও আবার পাল্টা গোলা বর্ষণ করে। বৃষ্টি আরম্ভ হয়, কুয়াশা কেটে যায়। গত রাত্রে যে মাঠটা তারা পেরিয়ে এসেছে সেটার দিকে ইভান ইলিয়িচ পরিখার ধারে কনুইএ ভর করে চেয়ে থাকে। অন্যান্য মাঠেরই মত এই মাঠটাও বাদামী রংএর এবং ভেজা; এখানে সেখানে জড়ানো কাঁটা তার, কালো মাটির স্তূপ এবং কয়েকটি স্বেচ্ছাসৈন্যের মৃতদেহ। কাছেই নদী। গতকালের সেই উঁচু উঁচু গাছ আর বিপদসংকুল ঝোপগুলি আজ আর কোথাও দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। কিন্তু এই সামান্য জায়গাটুকু অতিক্রম করতে কি ভীষণ ক্ষয়ক্ষতিই না হয়েছে !

অস্ট্রিয়ানরা পেছনে হটতে থাকে এবং রুশ সৈন্যরা সন্ধ্যা পর্যন্ত অবিরাম তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে চলে। এগিয়ে গিয়ে ছোট পাহাড়ের শীর্ষে একটা বনজঙ্গল দখল করার জন্য তেলেগিন ও তার স্বেচ্ছাসৈন্যদের প্রতি আদেশ হয়। সামান্য গুলি বিনিময়ের পর তারা সন্ধ্যার দিকে সেটা দখল করে। পরিখা খনন করে তাতে তাড়াতাড়ি তারা আশ্রয় নেয়, প্রহরী মোতায়েন করে, তাদের ডিভিশনের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের জন্য টেলিফোনের লাইন বসায় এবং থলেতে যে খাদ্য ছিল তা খায়। সারা রাত গুলি চালাবার আদেশ থাকলেও তাদের মধ্যে অনেকেই শুকনো ঝরা পাতার ওপর শুয়ে অন্ধকারে সামান্য বৃষ্টির মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ে।

শেওলায় ঢাকা মসৃণ একটা গাছের কাণ্ডে হেলান দিয়ে আর একটা কাটা গাছের গোড়ায় তেলেগিন বসে। মাঝে মাঝে তার কলারের ভেতর দিয়ে দু'

একটা বৃষ্টির ফোঁটা পড়ে, তাতে জেগে থাকার পক্ষে সুবিধেই হয়। প্রাতঃকালীন উন্মাদনা অনেকক্ষণ হ'ল কেটে গেছে; আরো কেটে গেছে সিক্ত ফসলে ভরা মাঠের মধ্য দিয়ে একরের পর একর মার্চ করে চলা, বেড় ডিঙ্গানো, লাফিয়ে পরিখা পার হওয়া ও অসহ্য মাথাব্যথা নিয়ে অসাড় চরণে দ্রুত পথ চলার দুঃসহ ক্লান্তি।

শুকনো ঝরা পাতার ওপর দিয়ে কে একজন তার দিকে এগিয়ে আসে এবং একটু বাদেই জুবৎসফকে মৃদুকণ্ঠে বলতে শোনা যায়ঃ

"একটা বিস্কুট খাবেন, সার?"

"ধন্যবাদ।"

তেলেগিন বিস্কুটটা নিয়ে কামড়ে খেতে থাকে; বেশ মিষ্টি বিস্কুটটা আর মুখে দিতেই গলে যায়। জুবৎসফ তার পাশে বসে পড়ে।

"একটু ধূমপান করব, সার?"

"কর, তবে সাবধান।"

"আমার সঙ্গে পাইপ আছে।"

"জুবৎসফ," তেলেগিন বলে, "জান, তোমার তাকে মারা ঠিক হয়নি।"

"সেই মেশিনগানওয়ালাকে?"

"হ্যাঁ।"

"সত্যি, না মারলেই হ'ত।"

"ঘুমোবে নাকি?"

"না, আমি জেগেই থাকব।"

"আমি ঘুমিয়ে পড়লে ধাক্কা মেরে আমাকে জাগিয়ে দিও, বুঝলে।"

টিপটিপ করে ধীরে বৃষ্টির ফোঁটা পড়ে পচা পাতার ওপরে তেলেগিনের হাতে ও তার টুপির চুড়োয়। কোলাহল, চীৎকার, সারাদিনের প্রাণান্তকর হুড়োহুড়ি, মেশিনগানওয়ালাকে হত্যা—এসমস্তর পরে মনে হচ্ছে বৃষ্টির ফোঁটাগুলি অন্ধকারে স্ফটিকমালার মত ঝরে পড়ছে। সর্বত্র ঝরা পচা পাতার গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। পাতার মর্মর শব্দে ঘুমোয় কার সাধ্য। ..ঘুমোবে না... না না, ঘুমোবে না। .তেলেগিন জেগেই আছে, জোর করেই সে চোখের পাতা খুলে রাখে। অস্পষ্ট শাখাগুলির দিকে চেয়ে থাকে সে; মনে হয় কেউ বুঝি অঙ্গার দিয়ে এ'কে রেখেছে সেগুলিকে।. .কিন্তু সারারাত ধরে গুলি চালাতে হবে ..এর কোন মানে হয়? নিক না লোকগুলি একটু ঘুমিয়ে।...আটজন নিহত; এগারজন আহত। ..অবশ্য যুদ্ধে নিজের প্রতি নিজেরই দৃষ্টি রাখতে হয়।.. ও, দাশা, দাশা! স্ফটিকের ন্যায় স্বচ্ছ বৃষ্টিবিন্দু সমস্ত জ্বালা জুড়িয়ে দিয়ে, শান্তি আনে। ..

"জেগে আছেন, সার?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ! আমি ঘুমুইনি, জুবৎসফ।"

"মানুষ মারা অন্যায়, নয়?...নিশ্চয়ই তার বাড়িঘর আছে, পরিবারও যা

হয় একটা আছে, ডামির মত তার বুকে তুমি সঙগীনটা বসিয়ে দিলে—তারপর সব শেষ। প্রথম যেদিন একটা মানুষকে হত্যা করলাম সেদিন খেতে পারলাম না আমি—কেমন একটা অস্বস্তি হ'ল। আর এখন? এ পর্যন্ত আমি ন'-দশটা লোককে শেষ করেছি।...কি সাংঘাতিক, নয়? কেউ কি এই পাপের ভাগী হয়েছে?"

"কোন্ পাপের?"

"আমার এই পাপের। কোন জেনারেল বা পিতার্সবুর্গের কোন লোক অর্থাৎ যারা এসমস্ত কাজ করাচ্ছে তাদেরই তো কারো উচিত আমার এই পাপের সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করা।"

"স্বদেশ রক্ষার জন্য তুমি যা করেছ তাকে তুমি পাপ বল কি করে?"

"হ্যাঁ, আমি তা জানি, কিন্তু আপনাকেও আমি বলে রাখছি, দোষ নিশ্চয়ই কারো আছে এবং সেই দোষী ব্যক্তিকে আমরা খুঁজে বার করবই। যারা এই যুদ্ধ বাধায় তাদের এজন্য কৈফিয়ৎ দিতে হবে। রক্ত দিয়ে এর জবাব দিতে হবে তাদের।..."

জঙগলের মধ্যে একটা গুলির আওয়াজ হয়। তেলেগিন গুলি চালাতে আরম্ভ করে। বিপরীত দিক থেকে প্রতিপক্ষ তার জবাব দেয় আরো কয়েকটা বেশি গুলি চালিয়ে।

সন্ধ্যার পর থেকে শত্রুপক্ষের কোন সাড়াশব্দ পাওয়া যায়নি বলে ব্যাপারটা আরো বেশি বিস্ময়কর বলে মনে হয়। তেলেগিন ছুটে টেলিফোনের কাছে যায়। টেলিফোন অপারেটর একটা গর্ত থেকে মুখটা বাড়িয়ে দেয়।

"টেলিফোন কাজ করছে না, সার।"

জঙ্গলের চারদিকেই তখন মুহুর্মুহু গুলির আওয়াজ শোনা যায়, শাখা-প্রশাখার ভেতর দিয়ে শোঁ শোঁ শব্দে গুলি ছুটতে থাকে। যারা এগিয়ে ছিল গুলি করতে করতে তারা পেছন দিকে হটে আসে। ক্রিমফ নামে একজন স্বেচ্ছাসৈন্য তেলেগিনের পাশে এসে কিরকম একটা বিকৃত ভয়ার্ত কণ্ঠে বলেঃ

"আমাদের ঘিরে ফেলেছে, সার!" এই বলে সে দু'হাতে মুখ ঢাকে বসে পড়ে এবং উপুড় হয়ে পড়ে যায়। অন্ধকারে আর একজন চেঁচিয়ে ওঠেঃ

"আমি গেলাম, ভাইসব!"

তেলেগিন দেখতে পায় তার স্বেচ্ছাসৈনাদের দীর্ঘ নিশ্চল দেহগুলি বৃক্ষ-কাণ্ডসমূহের ফাঁকে ফাঁকে দাঁড়িয়ে আছে। এও সে বুঝতে পারে যে সকলেরই দৃষ্টি রয়েছে তারই দিকে। একে একে সকলকে বনের উত্তর দিকে চলে যেতে সে আদেশ করে, কারণ সেদিকটা হয়ত তখনো পরিবেষ্টিত হয়নি। যাদের সাহস আছে তাদের নিয়ে সে এখানে পরিখায়ই থেকে যাবে। যতক্ষণ সম্ভব শত্রুদের ঠেকিয়ে রাখবার চেষ্টা তারা করবে।

"পাঁচজন চাই। কে কে থাকবে?"

জুবৎসফ, সুসফ ও কোলফ নামে অল্পবয়স্ক একটি স্বেচ্ছাসৈন্য গাছের পেছনে থেকে বেরিয়ে তার কাছে এসে হাজির হয়।

"আরো দু'জন চাই! রিয়াবীকিন, তুমি এস!" ঘাড় ফিরিয়ে চীৎকার করে বলে জুবৎসফ।

"বেশ, আমি থাকব।"

"আরো একজন চাই। তবে না পাঁচজন হবে।"

মেষের চামড়ার জ্যাকেট ও খস্‌খসে টুপি-পরা একটা বেঁটে লোক মাটি থেকে তড়াক করে লাফিয়ে উঠে বলেঃ

"আমি আছি। আমাকে নিয়ে পাঁচজন হবে।"

কুড়ি পা দূরে দূরে ছ'জন লোক শুয়ে পড়ে এবং গুলি করতে আরম্ভ করে। গাছের আড়ালে অন্যান্য যারা ছিল তাদের আর দেখতে পাওয়া যায় না। তেলেগিন কয়েক রাউন্ড গুলি চালায় এবং অকস্মাৎ তার চোখের সামনে পরদিনকার সকালবেলার ছবি যেন জ্বলজ্বল করে ভেসে ওঠে: ফিকে নীল কোর্তা-পরা লোকগুলি তার দাঁতবেরকরা মৃতদেহটা উল্টিয়ে ফেলে পকেট-গুলি তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখছে কয়েকটা ময়লা হাত তার শার্টের মধ্যে ঢুকে গেছে।

রাইফেলটা নামিয়ে রেখে নরম ভেজা মাটিতে সে একটা গর্ত করে; তারপর দাশার চিঠিগুলি বার করে চুম্বন করে এবং গর্তের মধ্যে সেগুলি রেখে দিয়ে শুকনো পাতা দিয়ে ঢেকে দেয়।

"ভাইসব! ভাইসব!" বাঁদিকে সুসফের গলার আওয়াজ। তার আর মাত্র দু'রাউন্ড কার্তুজ আছে। তেলেগিন হামাগুড়ি দিয়ে সুসফের কাছে যায়, গিয়ে দেখে সে মুখ উপুড় করে পড়ে আছে। তেলেগিন তার পাশে শুয়ে পড়ে এবং তার খাপ থেকে কার্তুজ বার করে নেয়। এখন তেলেগিন ও তার ডানদিকে আর একজন লোকই মাত্র গুলি চালাচ্ছে। অবশেষে তাদেরও কার্তুজ ফুরিয়ে যায়। তেলেগিন একমুহূর্ত ভাবে, চারদিকে তাকায়, উঠে দাঁড়ায়, নাম ধরে স্বেচ্ছাসৈনাদের ডাকতে থাকে। মাত্র একজনের সাড়া মেলেঃ "এখানে, সার!" কোলফ বন্দুকের ওপর ভর করে এগিয়ে আসে।

"কার্তুজ আছে?" জিজ্ঞেস করে তেলেগিন।

"না।"

"আর কারো সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না?"

"না, কেউ সাড়া দিচ্ছে না, সার!"

"ঠিক আছে। চল যাই। দৌড়ও!"

কোলফ তার রাইফেলটা পিঠে ঝুলিয়ে দৌড় মারে এবং গাছের আড়ালে গিয়ে আশ্রয় নেয়: কিন্তু তেলেগিন দশ পা' যেতে না যেতেই পেছন দিক থেকে একটা ভোঁতা ইস্পাতের আঙ্গুল এসে যেন তার কাঁধে খোঁচা মারে।

॥ সতেরো ॥

যুদ্ধ সম্পর্কে সেই আগেকার ধারণা অর্থাৎ বেপরোয়াভাবে অশ্বারোহী বাহিনী চালিয়ে পরপর আক্রমণ করা, বিপুল বাহিনী নিয়ে মার্চ করে এগিয়ে যাওয়া, সৈন্য ও সেনানীদের বীরত্ব প্রদর্শন করা, এ সমস্তই এখন অচল হয়ে গেছে। .

হর্স গার্ডস্-এর বিখ্যাত আক্রমণের কথাই ধরা যাক। তার মোট ফল দাঁড়াল কি? তাদের তিনটি স্কোয়াড্রন পায়ে হেঁটে প্রতিপক্ষের কাঁটাতারের ব্যূহ ভেদ করল, একটি গুলিও তারা ছুঁড়ল না। রেজিমেন্টের সেনাপতি প্রিন্স দোলগোরুকফ মেশিনগানের গুলির আচ্ছাদনের নীচে থেকে সিগার টানতে টানতে এবং অভ্যাসমত ফরাসী ভাষায় গালিগালাজ করতে করতে এগিয়ে গেলেন সামনের দিকে। হর্স গার্ডস্-এর অর্ধেক সৈন্য হতাহত হ'ল, তারা গিয়ে পেল দুটো বড় কামান, কিন্তু দেখা গেল দুটো কামানই বিকল। একটা মাত্র মেশিনগান কামান দু'টোকে রক্ষা করছিল।

এসম্পর্কে একজন কসাক ক্যাপ্টেন বলেছিল:

"দশবারো জন কসাক নিয়ে আমি ঐ বাজে মাল হাত করতে পারতাম।"

যুদ্ধ বাধবার পরে প্রথম কয়েক মাসের মধ্যেই প্রত্যেকের কাছে একথা স্পষ্ট হয়ে উঠল যে, সেই নির্ভীক দাড়িওয়ালা জোয়ানের দল যারা অশ্বারোহণে পটু ও দ্রুত আঘাত হানতে সিদ্ধহস্ত, গুলিকেও যারা গ্রাহ্য করে না আগেকার দিনের সেই সমস্ত সৈন্যদের বীরত্ব আজ মূল্যহীন। যান্ত্রিক পারদর্শিতা ও পশ্চাদ্দেশে সামরিক সংগঠন ক্ষমতার ওপর এখন যুদ্ধ প্রধানতঃ নির্ভর করে। আজকাল সৈন্যদের করণীয় হ'ল মানচিত্র নির্দিষ্ট কতগুলি জায়গায় গিয়ে অত্যন্ত বিশ্বস্ত ভাবে প্রাণ দেওয়া। যারা ভালভাবে আত্মগোপন করতে পারে, পরিখায় লুকিয়ে থাকতে সক্ষম ও মাটির রংএর সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে দিতে নিপুণ তারাই আজকাল ভাল সৈন্য। কোন্ হত্যাকান্ড নীতিসম্মত আর কোন্ হত্যাকান্ড নীতিবিরুদ্ধ তার সংজ্ঞা নির্দেশ করে হেগ আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যে ভাবালুতাপূর্ণ বিধান রচিত হয়েছিল অতি সহজেই তা ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে এবং সেই ছেঁড়া কাগজের সঙ্গে নৈতিক বিধানের শেষ চিহ্নটুকুও কোথায় মিলিয়ে গেছে! কেউ আর আজকাল তা মেনে চলার প্রয়োজন বোধ করে না।

কয়েক মাসের মধ্যে যুদ্ধ যেন এক শতাব্দীর কাজ সারে। সেদিনও পর্যন্ত অনেকের বিশ্বাস ছিল যে, মানুষের জীবন এক ঊর্ধ্বতর নৈতিক বিধানের দ্বারা পরিচালিত, কু ও সু দুইই আছে এবং শেষ পর্যন্ত কুএর পরাজয় ও সুএর জয় হবেই, মনুষ্য সমাজও তখন সর্বপ্রকার দোষমুক্ত হয়ে জীবনে পরিপূর্ণতা লাভ করবে। হায়, এতে সেই মধ্যযুগীয় চিন্তাধারা,

মানুষের ইচ্ছাশক্তিকে এ দুর্বল করে দেয় এবং সভ্যতার অগ্রগতিকেও রোধ করে। অতিবড় আদর্শবাদীও কিন্তু এখন বুঝতে পেরেছে যে, কু ও সু হচ্ছে শুধু দর্শনের তত্ত্বকথা, মানুষের প্রতিভা এখন নিয়োজিত হয়েছে দুষ্ট প্রভুর সেবায়।

এ এমন একটা সময় যখন ছোট ছোট শিশুদের পর্যন্ত শেখান হয় হত্যা, ধ্বংস, একটা গোটা জাতিকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া সৎ ও প্রশংসনীয় কাজ। প্রতিদিন সংবাদপত্রের লক্ষ লক্ষ স্তম্ভে একথাই সমর্থন করে বিশেষ জোর দিয়ে বারবার প্রচার করা হচ্ছে। প্রত্যহ ভোরবেলা বিশেষজ্ঞগণ যুদ্ধের ফলাফল সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করে থাকে। নামকরা দৈবজ্ঞ মাদাম তাব-এর ভবিষ্যদ্বাণী ফলাও করে কাগজে ছাপা হয়। অসংখ্য গণৎকার ও জ্যোতিষী গজায়। সমস্ত রকম দ্রব্যাভাব ঘটে। জিনিস অগ্নিমূল্য হয়। রুশীয়া থেকে কাঁচা মাল রপ্তানী করা বন্ধ হয়ে যায়। অবরুদ্ধ ও বিচ্ছিন্ন দেশের উত্তর এবং পূর্ব প্রান্তে মাত্র তিনটি বন্দর খোলা থাকে; সেখানে সমরসম্ভার ও কামানের গোলা ছাড়া আর কিছু আমদানী হয় না। জমি অনাবাদী অবস্থায় পড়ে থাকে। কোটি কোটি কাগজের টাকা গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে দেওয়া হয়; কাগজের বিনিময়ে খাদ্যশস্য দিতে কৃষকদের অনিচ্ছা ইতিমধ্যেই প্রকাশ পেতে আরম্ভ করেছে।

স্টকহোমে নৃতর্কবাগীশদের অকাল্ট লজের এক গুপ্ত অধিবেশনে আন্দোলনের প্রবর্তক বলেন যে, ঊর্ধ্বলোকে যে প্রচন্ড সংগ্রাম হয়ে গেছে তাই এখন ধরায় নেমে এসেছে, বিশ্বব্যাপী এক অমঙ্গল আসন্ন, মানবজাতির পাপস্খালনের জন্য রুশিয়াকে বলি দিতে হবে। যে রক্তের সমুদ্রে ইওরোপের দু'হাজার মাইল ক্ষেত্র নিমজ্জিত হয়ে আছে তাতে সমস্ত সঙ্গত ও সুস্থ চিন্তা তলিয়ে গেছে। ইস্পাত ও ডিনামাইট নিয়ে, দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করে মানুষ কেন পাগলের মত নিজেকে ধ্বংস করছে, এ সম্পর্কে যুক্তিপূর্ণ কথা বললেও আজ কেউ শুনবে না। বহুদিনের পুরনো ঘা বেরিয়ে পড়েছে। অতীতের দুষ্কৃতির জের এবার স্বমূর্তি ধারণ করেছে। কিন্তু তাতেও তো সব কথা বলা হয় না।

যুদ্ধমান দেশগুলিতে ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে। সর্বত্র জীবন এসে একটা নিশ্চল অবস্থায় দাঁড়িয়েছে। মনে হয়, যে বিষাদান্ত নাটক আরম্ভ হয়েছে, এই যুদ্ধ তার প্রথম অঙ্ক মাত্র।

এই দৃশ্যের সামনে ব্যক্তির সত্তা তুচ্ছ হয়ে গেছে, স্ফীত দম্ভ সংকুচিত হয়ে ধূলোর সঙ্গে মিশে গেছে, এই বিষাদান্ত নাটকে পাদপ্রদীপের সম্মুখে ব্যক্তির স্থান এসে দখল করেছে আদিম মানুষের সমষ্টি।

সব চেয়ে জীবন কষ্টকর হয়ে ওঠে নারী-সমাজের। এতদিন তারা যে যার রূপ, মাধুরী ও সামর্থ্য অনুযায়ী ছোট ছোট জাল বুনে যাচ্ছিল, তার সুতো সরু হ'লেও জীবনের স্বাভাবিক প্রয়োজন মেটাবার পক্ষে যথেষ্টই শক্ত ছিল। যাদের জন্য সে জাল রচিত হ'ত, যেভাবেই হোক, তারা সেজালে পড়তই এবং তাদের মধুর গুঞ্জনও শোনা যেত। কিন্তু এই যুদ্ধে সে সমস্ত

জাল ছিঁড়ে গেছে। এই দারুণ দুঃসময়ে নতুন করে জাল বোনার কথা কেউ কল্পনাও করতে পারে না। একমাত্র সুদিনের আশায় বসে থাকা ছাড়া জালে ধরবার মত আর কিছুই নেই। তাই নারীজাতি ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করছে, ব্যর্থতা ও বেদনায় তাদের জীবনের মূল্যবান দিনগুলি অতিবাহিত হচ্ছে।

স্বামী, প্রণয়ী, ভ্রাতা, পুত্র, সকলেই যেন একটা গাণিতিক সংখ্যায় পরিণত হয়েছে, আজ আর কারো প্রত্যক্ষ অস্তিত্বই অনুভূত হয় না—রণাঙ্গনে, মাটির স্তূপের মধ্যে, নয় তো বনপ্রান্তে, অথবা রাস্তার ধারে তারা পড়ে আছে। রমণীকুলের মুখমণ্ডলে ক্রমশ যে বার্ধক্যের কুঞ্চিত রেখাবলী বেড়ে যাচ্ছে শত চেষ্টা করেও তা আর ঘুচানো যাবে না।

॥ আঠারো ॥

"আমার দাদাকে আমি বলেছিঃ 'তুমি একটা গোঁড়া। তোমাদের—সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটদের—আমি ঘৃণা করি। তোমাদের আমলে কারো মুখ দিয়ে একটা বেফাঁস কথা বেরিয়ে পড়লে তার জন্য তাকে নির্যাতন ভোগ করতে হবে। তুমি হচ্ছ সেই আধিভৌতিক লোকদের একজন', আমি বললাম তাকে। আমার কথা সে সহ্য করতে পারেনি, তাই আমাকে সে বাড়ি থেকে বার করে দিয়েছে। কপর্দকহীন অবস্থায় মস্কোতে আমি চলে এসেছি। কি মজা, না? দারিয়া দ্মিত্রেভ্না, তুমি ভাই দয়া করে নিকলাই ইভানোভিচকে আমার হয়ে বলবে, যে কোন কাজ হলেই চলবে, তবে হাসপাতাল ট্রেনে একটা কাজ পেলেই ভাল হয়।"

"ঠিক আছে, আমি তাঁকে বলব।"

"এখানে কারো সংগে আমার আলাপপরিচয় নেই। আমাদের 'কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের' কথা তোমার মনে পড়ে? শুনেছি ভালেত চীনের প্রায় সীমান্তে চলে গেছে। সাপোঝকভ যুদ্ধক্ষেত্রে আছে। জিরভ ককেসাসে গিয়ে ফিউচারিজম্ সম্পর্কে বক্তৃতা করছে। ইভান ইলিয়িচ তেলেগিন কোথায় আছে জানিনে। তুমি তো তার খবর ভালভাবেই রাখ কি রাখ না?"

এলিজাবেতা কিয়েভনা ও দাশা একটা সরু রাস্তা দিয়ে ধীরে হেঁটে চলে, দুধারে বরফের স্তূপ জমে উঠেছে। তুষারপাত হচ্ছে এবং তাদের পায়ের তলায় পড়ে বরফ কড়মড় শব্দ করছে। একটা নীচু স্লেজ গাড়ী ধীরে ধীরে চলেছে, তার চালকের লোমযুক্ত কড়া বুটজোড়া ড্যাশবোর্ডের ওপর ঝুলছে। কিয়েভনা ও দাশাকে লক্ষ্য করে সে বলেঃ

"দেখে চলুন, ভদ্রমহিলারা, না হ'লে চাপা পড়বেন!"

এবার শীতে বড় বেশি তুষার পড়ছে। লাইম গাছের বরফমণ্ডিত শাখা-

গ্নলি রাস্তার ওপর ন্নয়ে পড়েছে। শ্নভ্র, তুষারাচ্ছন্ন আকাশে অসংখ্য পাখী দেখা দিয়েছে। গীর্জার ছাতে যেসমস্ত কাক থাকে সেগ্নলি ঝাঁক বেঁধে কা কা করতে করতে শহরের ওপর দিয়ে অনবরত উড়ে বেড়ায়, মাঝে মাঝে সেগ্নলি বাড়ির মাথায় ও গম্ব্নজের চুড়োয় বসে, আবার হিমেল আকাশে উড়ে-বহ্ন ঊর্ধ্বে উঠে যায়।

রাস্তার কোণে গিয়ে দাশা থামে এবং মাথায় সাদা নার্সের ট্নপিটা ঠিক করে নেয়। তার শীল-ত্বকের কোট ও হস্তাবরণটা তুষারকণায় ঢাকা পড়ে গেছে। ম্নখটা তার প্নর্ন হয়ে উঠেছে, চোখ দ্নটো যেন আরো বড় হয়ে গেছে, তাতে একটা গাম্ভীর্যের ভাব।

"ইভান ইলিয়িচের কোন খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না," বলে দাশা। "তার কোন খবরই জানিনে আমি।"

দাশা চোখ তুলে পাখীগ্নলির দিকে তাকায়। তার মনে হয় দাঁড়কাকগ্নলি এই তুষারময় শহরে এসে নিশ্চয়ই অনাহারে আছে। এলিজাবেতা কিয়েভনা মাথা নীচু করে সেখানে দাঁড়িয়ে, তার অতিরক্তিম অধরোষ্ঠে হাসি যেন হিমে জমে গেছে। তার মাথায় মোড়কে ঢাকা একটা ট্নপি, গায়ে ব্নক আঁটা একটা প্নর্নষের কোট, খ্নব চওড়া ফ্নল কলার, আস্তিন এতই ছোট যে লাল হাত দ্নটো প্রায় অনাবৃতই রয়েছে। তার ঈষৎ পীতবর্ণ কণ্ঠদেশে তুষারকণা পড়ে গলে যাচ্ছে।

"আজই আমি জামাইবাব্নর সঙ্গে দেখা করে তোমার বিষয়ে বলব," বলে দাশা।

"তাঁকে বলবে, যে-কোন কাজই নিতে আমি প্রস্তুত।" এলিজাবেতা কিয়েভনা মাটির দিকে চায় এবং মাথাটা ঝাঁকায়। "আমি ছিলাম ইভান ইলিয়িচের প্নজারী, সত্যি তার প্নজা করতাম আমি।" হেসে ওঠে সে, তার ঝাপসা দৃষ্টিসম্পন্ন চোখ দ্নটো জলে ভরে যায়। "আচ্ছা কাল আবার আসব তোমার কাছে আমি। এখন আসি তবে।"

দাশার কাছে বিদায় নিযে সে তার ঠান্ডা হাত দ্নটো প্নর্নষের ভঙ্গিতে পকেটে প্নরে দেয় এবং লোময্নক্ত ব্নট পায়ে দীর্ঘ পদক্ষেপে চলতে আরম্ভ করে।

দাশা খানিকক্ষণ তার দিকে চেয়ে থাকে, তারপর ভ্রূভঙ্গি করে নিজের পথ ধরে। রাস্তার কোণ ঘ্নরে সে একটা বড় বাড়ির প্রবেশপথে গিয়ে উপনীত হয়। আগে এটা গেরস্তবাড়ি ছিল, এখন একটা হাসপাতাল র্নপে ব্যবহৃত হচ্ছে। এখানে ওক কাঠের প্যানেল করা সব বড় বড় ঘর, সর্বত্র আয়োডো-ফর্মের গন্ধ, হাসপাতালের পোষাক পরা ও ছোটকরে চুল ছাঁটা সমস্ত আহত সৈন্য, কেউ বা খাটের ওপর শ্নয়ে, কেউ বা বসে। দরজার কাছে বসে দ্নজন সতরঞ্চ খেলছে। আর একজন চটিজ্নতো পায়ে ঘরের মধ্যে আস্তে আস্তে পায়চারি করছে। দাশা ঘরে ঢ্নকতেই সে চকিতে তার দিকে তাকায় এবং

ভ্রূকুঞ্চিত করে; তারপর বিছানায় গিয়ে মাথার নীচে হাত দিয়ে সে শুয়ে পড়ে।

"নার্স!" ক্ষীণ কণ্ঠের ডাক। একটা লম্বা-চওড়া লোকের কাছে গিয়ে দাশা উপস্থিত হয়। তার ঠোঁটদুটো অত্যন্ত পুরু। কাঁকিয়ে কাঁকিয়ে সে বলে: "আমাকে একটু বাঁ পাশ ফিরিয়ে দাও, ভগবান তোমার মঙ্গল করবেন।" দাশা দুহাতে তাকে বেষ্টন ক'রে ধরে, গায়ের সমস্ত জোর দিয়ে একটু আলগা করে তুলে বস্তার মত তাকে পাশ ফিরিয়ে শুইয়ে দেয়। "আমার গায়ের তাপ নেবার সময় হয়েছে, নার্স।" থার্মোমিটারটা ঝেঁকে নামিয়ে নিয়ে দাশা লোকটার বগলে পুরে দেয়।

"খেলেই আমার বমি হয়, নার্স। এক টুকরো রুটি খেলেও তা উঠে আসে। কিছুই আমার পেটে থাকে না।"

তার গায়ে কম্বলটা টেনে দিয়ে দাশা চলে যায়। পাশের শয্যাগুলিতে হাসি ফুটে ওঠে। একজন বলে:

"তোমার আদর পাবার লোভেই লোকটা ওরকম করে, নার্স। না হ'লে ও ষাঁড়ের মত বল রাখে।"

"করুক না ওর যা ইচ্ছে!" বলে আর একজন। "সে তো কোন ক্ষতি করছে না—আমাদের যত্ন করবার জন্যই তো নার্স আছে। এ ক'রে লোকটা যদি একটু আনন্দ পায়, পা'ক না!"

"সেমিয়ন তোমাকে কিছু বলতে চায়, নার্স, কিন্তু লাজুক বলে বলতে পারছে না।"

দাশা তখন একজন চাষীর কাছে যায়। লোকটা বিছানায় বসে আছে। দাঁড়কাকের মত গোল তার চোখ দু'টোয় আনন্দ আর ধরছে না। মুখটা ভল্লুকের মত ছোট; দু'পাশে ছড়ানো তার একরাশি দাড়ি সযত্নে চিরুনি দিয়ে আঁচড়ানো। দাশা নিকটে যেতেই সে তার মাথাটা পেছনে সরিয়ে নেয় এবং অধরোষ্ঠ চাপে।

"ওরা ঠাট্টা করছে, নার্স। আমি বেশ ভাল আছি। তোমাকে অশেষ ধন্যবাদ।"

দাশা হেসে ফেলে। তার বুকের বোঝাটা যেন হাল্কা হয়ে যায়। সেমিয়নের পাশেই একটা শয্যায় সে বসে এবং লোকটার আস্তিন উল্টিয়ে দেখে যে তার ড্রেসিং ঠিক আছে কি না। সে দাশাকে সবিস্তার বলতে আরম্ভ করে তার হাতের ব্যথাটা কিভাবে তাকে কষ্ট দিচ্ছে।

দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে নিকলাই ইভানোভিচ অক্টোবর মাসে মিউনিসিপাল প্রতিরক্ষা সংস্থার মস্কো শাখায় একটা কাজ নিয়ে মস্কোতে চলে আসেন; তাঁর সঙ্গে দাশাও আসে। পিতার্সবুর্গের ফ্ল্যাটটা বৃটিশ সামরিক মিশনের একজন ইংরেজকে তিনি দিয়ে এসেছেন এবং মস্কোতে এসে দাশাকে নিয়ে একেবারে অনাড়ম্বর জীবন যাপন করছেন। ছাগচর্মের একটা অতি সাধারণ জ্যাকেটই

হয় তার সম্বল। বিলাসব্যসনে মত্ত বুদ্ধিজীবীরা তাঁর চক্ষুশূল হয়ে ওঠে। নিজেই বলেন যে, তিনি ঘোড়ার মত খাটেন।

দাশা ফৌজদারী আইন পড়ে, ছোট সংসারের কাজকর্ম দেখাশুনো করে এবং রোজ ইভান ইলিয়িচকে চিঠি লেখে। ভেতরটা তার একেবারে শান্ত ও স্থির। অতীতের কথা তার ধু ধু মনে পড়ে, সে যেন আর এক জীবনের কথা। আধখানা তার ফাঁকা হয়ে গেছে, সর্বদাই ভয় ও উদ্বেগ, কখন কি খবর আসে। ইভান ইলিয়িচের জন্য নিজেকে নির্মল ও পবিত্র রাখতে সে সর্বদাই ব্যগ্র।

নবেম্বর মাসের প্রথম ভাগে একদিন সকালবেলা প্রাতরাশের সময় 'রুশ কথা' পত্রিকার পৃষ্ঠাগুলি ওল্টাতে ওল্টাতে দেখতে পায়, নিখোঁজ ব্যক্তিদের নামের তালিকায় রয়েছে তেলেগিনেরও নাম। ছোট ছোট হরফে হতাহত ও নিখোঁজ ব্যক্তিদের নামের তালিকা দুই কলমব্যাপী ছাপা হয়েছেঃ আহত এই এই লোক নিহত, এই এই লোক নিখোঁজ এই এই লোক এবং একেবারে শেষের দিকে নাম রয়েছে—তেলেগিন, ইভান ইলিয়িচ, সাব-লেফ্‌টেনান্ট।

সেই ক্ষুদ্র অক্ষরের অর্ধেক লাইনটা তার সমস্ত জীবনটাকে একেবারে অন্ধকার করে দেয়।

দাশার মনে হয়েছিল, সেই ছোট হরফগুলি, সেই নীরস পংক্তিসমূহ, সংবাদপত্রের সেই স্তম্ভগুলি, সেই শিরোনামা থেকে যেন বিন্দু বিন্দু রক্ত ঝরছিল। কি অবর্ণনীয় ভয়ংকর মুহূর্ত সেটা—সেই সংবাদ বক্ষে ধারণ করেছিল খবরের কাগজের যে পৃষ্ঠাটা সেটা যেন দুর্গন্ধময় রক্তাক্ত পংক, তা থেকে বেরিয়ে আসছিল গলিত মাংসের পূতিগন্ধ ও বিপন্ন কণ্ঠের আর্তনাদ।

দাশা কেঁপে ওঠে। তার আদিম ভীতি ও ঘৃণার মধ্যে শোকও পর্যন্ত বিলীন হয়ে যায়। সোফায় শুয়ে পড়ে ফার কোট দিয়ে দেহটাকে ঢেকে দেয় সে। নিকলাই ইভানোভিচ বাড়িতে খেতে এসে দেখেন দাশার এই অবস্থা। সোফার প্রান্তভাগে তিনি বসে পড়েন এবং দাশার পা ধরে আস্তে নাড়া দেন।

"ধৈর্য ধর, দাশা, ধৈর্য ধর," বলেন নিকলাই ইভানোভিচ। "তার খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না তার মানে সে বন্দী হয়েছে। এরকম তো হাজার হাজার হচ্ছে।"

সে রাত্রে দাশা একটা স্বপ্ন দেখেঃ একটা সংকীর্ণ খালি ঘর, জানালা মাকড়সার জাল ও ধুলোয় ভরা, একটা লোহার খাটে সৈনিকের পোশাক পরে বসে আছে একটি লোক। ব্যথায় তার পাংশু মুখটা বিকৃত দেখাচ্ছে। তার মুণ্ডিত মস্তকটা সে দু'হাতে খুঁটছে, মনে হচ্ছে যেন একটা ডিমের খোসা ছাড়াচ্ছে, চামড়ার নীচে যা পাচ্ছে নখ দিয়ে খুঁটে খুঁটে এনে তাই মুখে দিচ্ছে ও খেয়ে ফেলছে।

মাঝ রাত্রে দাশা এত জোরে চীৎকার করে ওঠে যে, নিকলাই ইভানোভিচ তাড়াতাড়ি গায়ে একটা কম্বল জড়িয়ে দাশার বিছানার পাশে এসে দাঁড়ান; অনেকক্ষণ তিনি বুঝতেই পারেন না ব্যাপারটা কি। তারপর একটা মদের

গ্লাসে কয়েক ফোঁটা ক্লান্তিনাশক ওষুধ ঢেলে দাশাকে খাইয়ে দেন এবং নিজেও একটু খান।

দাশা উঠে বসে। বুকে হাত দিয়ে নৈরাশ্যের সুরে আস্তে আস্তে বলে সে:

"বাঁচবার শক্তি আমার আর নেই, জামাইবাবু। বুঝতে পারছেন, বুঝতে পারছেন আপনি? এ জীবন আমি আর রাখতে পারছিনে, রাখতে চাইও না আমি!..."

যা হয়ে গেছে তারপরে বেঁচে থাকা সত্যি কঠিন; কিন্তু দাশা এযাবৎ যেভাবে জীবন ধারণ করে আসছিল সেভাবে তার আর বেঁচে থাকা একেবারেই অসম্ভব হয়ে পড়ে।

এর আগে যুদ্ধের কঠিন লৌহ-কর তাকে স্পর্শ করেছিল মাত্র, কিন্তু এখন প্রতিটি মৃত্যু প্রতিটি চোখের জল তার অন্তরের বেদনাকে উদ্বেলিত করে তোলে, তাকে পাগল করে দেয়। কাজেই প্রথম আঘাতের তীব্র অনুভূতিটা একটু কমে আসতেই দাশার পক্ষে যা করা সম্ভব তাই সে করে—নার্সিংএ শর্টকোর্স ট্রেনিং নেয় এবং একটা সামরিক হাসপাতালে নার্স হয়ে যোগ দেয় সে।

গোড়ার দিকে বড় অসুবিধে হয়। রণাঙ্গন থেকে যেসমস্ত আহত সৈন্যকে প্রথমে হাসপাতালে নিয়ে আসা হয় কয়েকদিন ধরে তাদের ড্রেসিং বদল না হবার ফলে ব্যান্ডেজ থেকে এমন দুর্গন্ধ বেরোতে থাকে যে নার্সদের মধ্যে অনেকে বমি করে ফেলে, কেউ কেউ অজ্ঞানও হয়ে যায়। অস্ত্রোপচারের সময় দাশা আহত ব্যক্তিদের কালশিটে-পড়া হাতপাগুলি ধরে রাখে; ব্যান্ডেজের সঙ্গে জমাট রক্ত পচা মাংস ও পুঁজ বেরিয়ে আসে। দেখে সে অভ্যস্ত হয়ে গেছে যে, অতি বড় জোয়ানরাও কেমন দাঁতে দাঁত চেপে থাকে, যন্ত্রণায় কিভাবে তারা অসহায়ের মত ছটফট করে ও থরথর করে কাঁপে।

এই কষ্ট এত বেশি যে সারা দুনিয়ার দয়ার ভাণ্ডার উজাড় করে দিলেও বুঝি তার লাঘব হয় না। দাশা ক্রমশ উপলব্ধি করে যে, এই বিখণ্ডিত ও রক্তাক্ত জীবনের সঙ্গে তার ভাগ্য চিরদিনের মত বিজড়িত হয়ে গেছে, তার জন্য অন্য কোন জীবন আর নেই—খালি আছে রাত্রিবেলার নার্সের কক্ষে সবুজ আলোর আভা, দেয়ালের অপর পার্শ্বে বিকারগ্রস্ত রোগীর বিড়বিড় শব্দ আর রাস্তা দিয়ে লরী যাবার সময় তাকের ওপর সাজানো ওষুধের বোতলগুলির টুনটুন্ আওয়াজ। তার নিজের দুঃখ এই সমস্ত বাস্তব জীবনসত্যের একটি কণিকা মাত্র।

সন্ধ্যার পরে নৈশ নার্সের কক্ষে টেবিলের ধারে বসে দাশা তার অতীত জীবনের কথা ভাবে; সে সমস্তই যেন তার কাছে স্বপ্ন বলে মনে হয়। একটা উচ্চস্তরে সে বাস করত, সেখান থেকে মাটি দেখতে পাওয়া যেত না। আশে-পাশের আর দশজনের মতই সে জীবনযাপন করত; সে ছিল আত্মকেন্দ্রিক,

অহঙ্কারী। সেই মেঘলোক থেকে এখন তাকে নেমে আসতে হয়েছে এই শোণিত ও ক্লেদের মধ্যে, রুগ্ন দেহগুলির কটুগন্ধে পরিপূর্ণ এই হাসপাতালের অভ্যন্তরে যেখানে ঘুমন্ত অবস্থায় লোক গোঙায়, প্রলাপ বকে, বিড়বিড় করে কথা বলে। আজ রাত্রে একজন তাতার সৈন্যের মরণাপন্ন অবস্থা, দশ মিনিটের মধ্যেই তাকে মর্ফিয়া ইন্‌জেক্‌সন দেবার জন্য দাশাকে যেতে হবে।

আজ এলিজাবেতা কিয়েভনার সঙ্গে দেখা হবার পর দাশার মনটা খারাপ হয়ে যায়। দিনটা বড় খারাপ গেছেঃ গালিসিয়া থেকে এমন আহতাবস্থায় সৈন্যদের আনা হয়েছে যে, একজনের কব্জির কাছে হাতটা এবং আর একজনের সমস্ত বাহুটাই কেটে ফেলতে হয়েছে, আর দুজন বিছানায় শুয়ে বিকারের প্রলাপ বকছে, মৃত্যুর পূর্ব লক্ষণ।

দিনান্তে দাশা বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছে কিন্তু এলিজাবেতা কিয়েভনার কথা সে কিছুতেই ভুলতে পারছে না—তার সেই বঙ্কিম হাত ও পুরুষের কোট, করুণ হাসি ও চোখের কোমল দৃষ্টি কেবলই তার মাথার মধ্যে ঘুরছে।

বিশ্রামের জন্য সন্ধ্যাবেলা বসে সবুজ আলোটার দিকে চেয়ে চেয়ে ভাবে দাশা, এলিজাবেতার মত রাস্তার মোড়ে গিয়ে চীৎকার করে যদি অপরিচিত লোককে বলা যায়ঃ "আমি ইভান ইলিয়িচকে ভালবাসতাম, কত ভালবাসতাম তাকে আমি।"

বড় আরাম কেদারাটায় বসে পড়ে দাশা, এক পায়ের ওপর আর এক পা তুলে দেয়, পড়বার জন্য একটা বই খোলে। মিউনিসিপাল প্রতিরক্ষা সংস্থার ত্রৈমাসিক কার্যবিবরণ—তাতে রয়েছে কলমের পর কলম সংখ্যা ও অর্থহীন কতগুলি কথার প্রাচুর্য। ভাল লাগে না, দাশা রেখে দেয় সেটা। নিজের ঘড়ি দেখে, দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে এবং তারপর ওয়ার্ডে চলে যায়।

আহত লোকগুলি ঘুমোচ্ছে, ঘরটায় কিরকম গুমোট ভাব মনে হয় যেন দম আটকে আসছে। মাথার ওপরে ওক কাঠের সিলিংএর তলায় ঝাড়ের লোহার আংটায় লটকানো একটা লম্ফ টিমটিম করে জ্বলছে। যে যুবক তাতার সৈন্যের হাতটা কেটে ফেলা হয়েছে সে জ্বরে প্রলাপ বকছে আর কামানো মাথাটা বালিশের ওপর অনবরত এদিক-ওদিক করছে। দাশা মেঝে থেকে আইস-ব্যাগটা তুলে নিয়ে তার আগুনের মত কপালের ওপর চাপায় এবং গায়ের কম্বলটা টেনে ঠিক করে দেয়। রোগীদের একবার সে ঘুরে দেখে এবং তারপর গিয়ে একটা টুলে বসে, হাত দুটো রাখে কোলের ওপর।

"আমার হৃদয় বড় কাঁচা, তাকে গড়াপেটা হয়নি," ভাবে সে। "যা সেরা, যা সুন্দর একমাত্র তাই সে ভালবাসতে জানে। ভালবাসার মত যা নয় তা সে ভালবাসতে পারে না, তার প্রতি তার করুণা হয় না।"

"তোমার খুব ঘুম পেয়েছে, নার্স" দরদের কণ্ঠে বলে একজন। দাশা

মুখ ঘুরিয়ে দেখে দাড়িওয়ালা সেমিয়ন তার বিছানা থেকে চেয়ে আছে তার দিকে।

"কি, ঘুমোওনি তুমি ?" জিজ্ঞাসা করে দাশা।

"দিনের বেলা খুব ঘুমিয়েছিলাম।"

"তোমার হাতের ব্যথা কি বেড়েছে ?"

"না, খুব বেশি না, নার্স !"

"তবে ?"

"তোমার মুখখানা কত ছোট দেখাচ্ছে আর তোমার ঘুমও পেয়েছে খুব। যাও, একটু ঘুমিয়ে নাওগে। আমি নজর রাখব—প্রয়োজন হ'লে তোমাকে ডেকে দেব।"

"না, আমার একটুও ঘুম পায়নি।"

"তোমার কেউ যুদ্ধে গেছে নাকি ?"

"হ্যাঁ, আমার প্রিয়তমই যুদ্ধে গেছে।"

"ভেব না, ভগবান তাকে রক্ষা করবেন।"

"সে নিখোঁজ বলে খবর বেরিয়েছে।"

"আহা-হা !" সেমিয়ন দাড়ি নাড়ে ও দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে। "আমারও এক ছোট ভাই-এর খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না, তারপর তার কাছ থেকে এক চিঠি পাওয়া গেল—সে বন্দী হয়েছে। তোমার প্রিয়তম নিশ্চয়ই ভাল মানুষ ?"

"খুবই ভালমানুষ সে।"

"হয়ত তার কথা শুনেও থাকব। কি নাম তার ?"

"ইভান ইলিয়িচ তেলেগিন।"

"হ্যাঁ, তার নাম শুনেছি আমি। এক মিনিট এক মিনিট অপেক্ষা কর। হ্যাঁ, লোকের মুখে শুনেছি সে বন্দী হয়েছে। কোন্ রেজিমেন্টে ছিল ?"

"কাজান।"

"হুঁ, ঠিক সেই লোক ! সে বন্দীই হয়েছে। বেঁচে আছে সে। বড় ভালমানুষ ! চিন্তা ক'র না, নার্স, ধৈর্য ধর। বরফ গলবে—যুদ্ধ শেষ হবে—আবার আমরা শান্তি ফিরে পাব। বিশ্বাস কর আমাকে, সে আসবে এবং তুমি তাকে ছেলে উপহার দেবে !"

দাশা তার কথা শুনছে আর তার ভেতর থেকে কান্না যেন ঠেলে ঠেলে উঠছে। সে জানে সেমিয়নের এগুলি সমস্তই বানানো কথা, ইভান ইলিয়িচের নাম সে এর আগে শোনেওনি। তবু তার প্রতি নিজেকে কৃতজ্ঞ বলে মনে হয় তার।

"আহা, তোমার ঐ সুন্দর কচি মুখখানির দিকে তাকালে সত্যি দুঃখ হয়," কোমল কণ্ঠে বলে সেমিয়ন।

নৈশ নার্সের কক্ষে আরাম কেদারার পেছন দিকে মুখ করে দাশা আবার বসে। তার মনে হয়, সে অপরিচিত হ'লেও লোকগুলি এখন স্নেহ দিয়ে

তাকে তাদেরই একজন করে নিয়েছে। এও তার মনে হয় যে, এই সমস্ত আর্ত, নিদ্রিত লোকের প্রতি এখন তার করুণার অভাব নেই। একথা ভাবতে ভাবতে হঠাৎ তার ইভান ইলিয়িচের কথা মনে পড়ে যায়. চোখের সামনে যেন জ্বলজ্বল করে ভেসে ওঠে তার, এদেরই মত সেও কোন এক জায়গায় একটা সরু খাটে শুয়ে ঘুমোচ্ছে, শ্বাস ফেলছে।...

ঘরে সে পায়চারি করতে থাকে। হঠাৎ টেলিফোনটা বেজে ওঠে। সেই তন্দ্রালস নিস্তব্ধতার মধ্যে আওয়াজটা বড় কর্কশ ও বেসুরা ঠেকে। দ্রুত বেগে সে টেলিফোনের কাছে যায়। ভাবে সেঃ আবার বুঝি আহত লোক নিয়ে আর একটা ট্রেন এল।

টেলিফোনের রিসিভারটা ধরে সে বলেঃ

"হ্যালো।..হ্যাঁ, বলুন!"

একটি নারীর ভাংগা ও উত্তেজিত কণ্ঠস্বর কানে আসে তার।

"দারিয়া দ্মিত্রেভনা বুলাভিনকে একটু ডেকে দিন না, দয়া করে।"

"বলছি," উত্তর দেয় দাশা। তার হৃদয়ে অতি দ্রুত স্পন্দন হতে থাকে। "কে?..দিদি?. তুই? তুই কথা বলছিস দিদি?. কি আনন্দ! .তুই. .তুই দিদি?"

॥ উনিশ ॥

"তা হলে আমরা সবাই এসে আবার এখানে একত্র হলাম," উদরের কাছে চামড়ার জ্যাকেটের বোতামটা লাগাতে লাগাতে বলেন নিকলাই ইভানোভিচ। তারপর কাতিয়ার চিবুক ধরে তার গণ্ডদেশে তিনি একটি সোহাগের চুম্বন করেন। "কিগো, ঘুম হলো কেমন?"

এর পর দাশার পশ্চাতে গিয়ে তিনি তার কেশ চুম্বন করেন।

"দাশা ও আমার মধ্যে এখন আর কিছুই ছেদ টানতে পারবে না, কাত্যুশা। হাতড়ে এরকম একটি মেয়ে মিলবে কিনা সন্দেহ। কি চমৎকার কর্মী!"

পরিষ্কার ঢাকনা দেওয়া একটা টেবিলের ধারে তিনি বসেন. ডিম রাখার একটা চিনেমাটির বাটি থেকে হাত বাড়িয়ে একটা ডিম আনেন এবং ছুরি দিয়ে ডিমটার মাথা ছাড়ান।

"দ্যাখ কাত্যুশা, রাই ও মাখন দিয়ে ইংরেজরা যেভাবে ডিম খায় সেভাবে ডিম খেতে আমার খুব ভাল লাগে। বেশ সুস্বাদু হয়, খেয়েই দ্যাখ না। আর জার্মানরা এখন দু'হপ্তা অন্তর মাথা প্রতি একটা করে ডিম পায়। তোমার কি মনে হয় তাতে?

বিরাট মুখটা হাঁ করে তিনি হেসে ওঠেন। "এই ডিমের সাহায্যেই আমরা জার্মানিকে অল্পসেদ্ধ করা নরম ডিমের মত ভেঙ্গে চুরমার করব। লোকে

বলছে জার্মান শিশুরা নাকি এক পরল চামড়া কম নিয়েই জন্মাচ্ছে। বিসমার্ক এই বোকাদের বলেছিলেন, রুশিয়ার সঙ্গে শান্তিপূর্ণভাবেই তাদের বাস করতে হবে। কিন্তু তাঁর কথা তো তারা শুনল না, ভাবল আমরা কিছুই নই —এখন টের পাচ্ছে মজাটা, মাসে দুটো করে ডিম!"

"চর্মহীন শিশু জন্মাচ্ছে এ ভাবতেও হৃদকম্প হয়," আনত নয়নে বলে কাতিয়া। "এখানেই জন্মাক আর জার্মানিতেই জন্মাক, ব্যাপারটা যে বীভৎস তাতে সন্দেহ নেই।"

"মাফ কর, কাতিয়া, তবে তুমি যা বলছ তা অর্থহীন।"

"আমি বুঝি, প্রতিদিন যদি হত্যা, আর হত্যাই শুধু চলে তবে বেঁচে থাকার কোন সার্থকতাই নেই।"

"কি করা যাবে, বল। আমাদের নিজেদের মূল্য দিয়েই জানতে হবে, আমাদের এই রুশিয়া বলতে আমরা কি বুঝি। এযাবৎ আমরা কেবল ইতিহাসের পৃষ্ঠায়ই পড়ে এসেছি যে, কুলিকোভো*, বোরোদিনো** প্রভৃতি রণাঙ্গনে আমাদের কৃষকরা যুদ্ধ করে জয়লাভ করেছিল। মানচিত্রের দিকে চেয়ে আমরা বলে এসেছি: 'কি বিশাল দেশ এই রুশিয়া।' মানচিত্রের যে স্থানটা সবুজ ও ইওরোপ থেকে এসিয়া পর্যন্ত যা বিস্তৃত তার অখণ্ডতা রক্ষার জন্য এখন আমাদের এগিয়ে এসে কিছু লোককে প্রাণ দিতেই হবে। সখ করে যে দিচ্ছি তা নয়। অবশ্য যদি তুমি বল যে আমাদের রাষ্ট্রিক যন্ত্র ভাল নয়, আমি তোমার সঙ্গে একমত। রাষ্ট্রের জন্য প্রাণ দিতে যাবার আগে নিশ্চয়ই আমি জিজ্ঞাসা করব: 'তুমি যে আমাকে মরণের মুখে পাঠাচ্ছে, বল তো, রাষ্ট্রপরিচালনার পূর্ণ বিচক্ষণতা কি তোমার আছে? আমি যখন আমার দেশের জন্য নিজের শোণিতপাত করব তখন তুমি কি আমাকে এই বিষয়ে নিশ্চয়তা দিতে পার? কি বলব তোমাকে, কাত্যুশা, সরকার তার পুরনো অভ্যাস এখনো ছাড়তে পারেনি, সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলি সম্পর্কে আজো তাদের মনে সন্দেহ আছে। কিন্তু একথা তো ঠিক যে আমাদের বাদ দিয়ে আর সে চলতে পারে না। আর আমাদের দিক থেকে বক্তব্য হচ্ছে, প্রথমে একটা আঙুল, তারপর গোটা হাতটাই নেব আমরা। আমি কিন্তু এসম্বন্ধে খুব আশাবাদী, কাতিয়া!"

উঠে দাঁড়ান নিকলাই ইভানোভিচ, অগ্নিকুণ্ডের উপরস্থিত তাক থেকে একটা দেশলাই নেন এবং একটা সিগারেট ধরান, দেশলাইর জ্বলন্ত কাঠিটা ডিমের খোসাগুলির মধ্যে ছুঁড়ে মারেন।

"রক্তপাত বৃথা যাবে না, যুদ্ধান্তে দেখা যাবে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা আমাদের মত

* প্রিন্স ডি, আই, দোন্সগোরস্কির নেতৃত্বে রুশ সেনারা কুলিকোভো রণাঙ্গনে খান মামাইর হানাদার বাহিনীকে পরাজিত করে বিরাট জয়লাভ করেছিল।

** বোরোদিনো রণাঙ্গন—১৮১২ সালের প্রচণ্ড যুদ্ধে এখানেই নেপোলিয়নের বাহিনীর চরম পরাজয় ঘটে।

লোক—সমাজকর্মীদের হাতে এসে যাচ্ছে। 'দেশ ও স্বাধীনতা সংঘ', বিপ্লবী দল, মার্কসবাদীরা যা করতে পারত না যুদ্ধ তা সম্ভব করে তুলবে। আচ্ছা, আসা যাক তবে। বিদায়!" জ্যাকেট্‌টা টেনে বোতাম লাগিয়ে তিনি ঘরের বাইরে চলে যান। তাকে পেছন থেকে দেখে মনে হয়, একটি বলিষ্ঠ নারী যেন পুরুষের বেশ ধারণ করেছে।

কাতিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে এবং জানালার ধারে তার বোনার কাজ নিয়ে বসে। কাতিয়ার চেয়ারের হাতলের ওপর বসে দাশা, এক হাতে দিদির গলা জড়িয়ে ধরে। দুজনের পরণেই উঁচু কলারওয়ালা কালো রং-এর জামা, পাশাপাশি বসে আছে দুজন নীরবে, দেখতে অনেকটা একরকম। জানালার বাইরে হাল্কা তুষারপাত হচ্ছে, ঘরের দেয়ালে এসে পড়েছে তুহিন উজ্জ্বল আলো। দিদির চুলে দাশা তার গালটা লাগায়, এক অপূর্ব মৃদু সুগন্ধ পাওয়া যাচ্ছে তাতে।

"দিদি, এতদিন তুই কি করছিলি? কৈ, কিছুই তো বললি নে?"

"কি আর বলার আছে, বোন। তোকে তো চিঠি লিখেছি।"

"তবু যেন ঠিক বুঝতে পারিনে, দিদি। এত সুন্দর, এত মধুর, এত আকর্ষণীয় তুই। তোর মত মেয়ে আর একজনও আমি দেখেছি বলে মনে পড়ে না। তবু তুই সুখী নস। চোখ দুটো তোর সর্বদাই বেদনায় ভরা।"

"ধরে নে, যারা কিছুতেই আনন্দ পায় না আমি তাদেরই একজন।"

"ঠাট্টা রাখ। ব্যাপারটা গুরুতর।.."

"ঠিকই, বোন, আমি নিজেও সর্বদাই এ নিয়ে ভাবি। আসল দুঃখ তো সেটাই দাশা, যখন তোমার সব কিছুই আছে, অথচ তুমি সুখী নও। আমার অমন চমৎকার স্বামী, এমন সুন্দর ছোট বোন, নিজেও আমি স্বাধীন...তবু মনে হয় আমি এক স্বপ্নের মধ্যে আছি, আমি নিজে যেন একটা ভূত।...মনে পড়ে, প্যারিসে আমি সময় সময় ভাবতাম মফঃস্বলের কোন একটা ছোট্ট শহরে গিয়ে থাকতে পারলে ভাল হয়, সেখানে মুরগী পুষব, শাকশব্জীর বাগান করব আর সন্ধ্যার দিকে নদী পার হয়ে আমার প্রিয়তমের কাছে চলে যাব।... কিন্তু তা হবার নয়, দাশা, আমার জীবন শেষ হয়ে গেছে।"

"দিদি, বাজে বকিসনি।"

"জানিস," বোনের দিকে ঘোলাটে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলে কাতিয়া, "আমি সেই দিনটা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি...ডোরা-কাটা গদি, ওলট পালট করা বিছানার চাদর, পিত্তরসে ভরা একটা গামলা।...সেখানে আমি শুয়ে আছি, মৃত, রক্তহীন ফ্যাকাশে হলদে চামড়া, পাকা চুল।.."

বোনার সরঞ্জাম রেখে দিয়ে বাইরের দিকে তাকায় কাতিয়া, দেখে নিথর নিস্তব্ধতার মধ্যে তুষারকণাগুলি উড়ে উড়ে মাটির দিকে পড়ছে। আরো দূরে যেখানে ক্রেমলিনের একটা গম্বুজের চূড়োয় রয়েছে সোনালি ঈগল, তার চারপাশে ঘিরে আছে কালো মেঘের মত এক ঝাঁক দাঁড়কাক।

"একদিনের কথা মনে পড়ে, দাশা, অতি প্রত্যূষে আমি ঘুম থেকে উঠেছি। আমার ঝুলবারান্দা থেকে গোটা প্যারিস শহরটাকে দেখা যাচ্ছিল একটা নীল কুয়াশার পর্দায় ঢাকা। এখানে সেখানে নীল, ধূসর, সাদা ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে আকাশের দিকে উঠছিল। রাত্রিবেলা বৃষ্টি হয়েছিল, মৃদুমন্দ সমীরণে সবুজ লতাপাতা ও অন্যান্য জিনিসের গন্ধ ভেসে এসে মনকে স্নিগ্ধ ও আমোদিত করে দিচ্ছিল। বালকবালিকারা বই হাতে রাস্তা দিয়ে হেঁটে চলেছিল, মেয়েরা যাচ্ছিল ঝুড়িহাতে, মুদীখানাগুলির দোর খোলা হচ্ছিল। বড় ভাল লাগছিল আমার, মনে হচ্ছিল এই তো চিরন্তন জীবন। নীচে ছুটে গিয়ে ভীড়ের মধ্যে মিশে যাবার একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাগল আমার মনে। ভাবলাম, করুণায়-ভরা যার চোখ তেমন একজন পুরুষের কাছে যাই আমি এবং গিয়ে তার বুকে আমার হাত রাখি। কিন্তু প্রশস্ত রাজপথে নেমে গিয়ে আমি দেখি, সমগ্র নগরী যেন এরই মধ্যে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে। পত্রিকা-হকাররা ছুটোছুটি করছে, সর্বত্র উত্তেজিত লোককে দেখা যাচ্ছে দলে দলে ভীড় করে দাঁড়াতে। সমস্ত পত্রিকায় ছড়িয়ে আছে বিদ্বেষ ও মৃত্যুভয়। যুদ্ধ বেধেছে। সেদিন থেকে আমি কেবল শুনে আসছি: মৃত্যু, মৃত্যু, মৃত্যু। সামনের দিকে তাকাবার মত আর কি আছে?"

মুহূর্তকাল নীরব থেকে দাশা বলে:

"দিদি!"

"কি, বল, বোন?"

"জামাইবাবু আর তোর বিষয়টাব কি হবে?"

"জানিনে। আপাতত আমরা উভয়ে উভয়কে ক্ষমা করেছি। তিনদিন হল আমি এসেছি—আমার প্রতি তাকে তো খুব সদয়ই দেখছি। তাছাড়া, সে-সমস্ত ধরে থাকার সময় তো এখন নয়। আমরা দুঃখ পেলাম কি পাগল হয়ে গেলাম কে তা এখন গ্রাহ্য করছে? সবই হবে মশার ভনভনানির মত, কে শুনবে তা? তুই নিজেও তো শুনতে পাবিনে। বৃদ্ধাদের দেখে আমার ঈর্ষা হয়—জিনিসটা কত সহজ তাদের কাছে: মৃত্যু আসন্ন আর তাদের এক-মাত্র কাজ হল সেই মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হওয়া।"

চেয়ারের হাতলের ওপর দাশা ঘুরে বসে, বার কয়েক দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে এবং কাতিয়ার কাঁধ থেকে হাতটা সরিয়ে নেয়।

কাতিয়া স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলে: "দাশেংকা, নিকলাই ইভানোভিচ বলছিল তুই নাকি ভালবেসেছিস এবং কথা দিয়েছিস। সত্যি তাই নাকি রে, বোন?" দাশার হাত টেনে নিয়ে সে চুম্বন করে, তারপর হাতটা নিজের বুকে সস্নেহে চেপে ধরে। বলে সে:

"আমার নিশ্চিত বিশ্বাস ইভান ইলিয়িচ বেঁচে আছে। তুই যদি সত্যি তাকে ভালবেসে থাকিস তবে আর কি, পৃথিবীতে তো আর কিছুর প্রয়োজন নেই তোর।"

জানালার বাইরে যে তুষারপাত হচ্ছে নীরবে দুই বোন তার দিকে চেয়ে থাকে। তোয়ালে ও ছাড়া পোশাকটা বগলে পুরে এক প্লেটুন যুদ্ধবিদ্যা-শিক্ষার্থী চলেছে রাস্তা দিয়ে মার্চ করে। যাচ্ছে তারা সর্বসাধারণের ব্যবহার্য স্নানাগারের দিকে। যেতে যেতে শীস দিচ্ছে ও গান গাইছে তারাঃ

"উড়ে যাও, উড়ে যাও বাজপাখিগণ,
শোকদুঃখ ভুলে গিয়ে ঈগলের সম
মহাশূন্যে কর বিচরণ।"

কয়েকদিন বাড়িতে থাকার পর দাশা আবার হাসপাতালে যেতে আরম্ভ করে। কাতিয়া সারাদিন একাই ফ্ল্যাটে থাকে। এখানে সবকিছুই যেন অপরিচিত বলে মনে হয় তারঃ দেয়ালে প্রাকৃতিক দৃশ্যের দুটো ম্লান চিত্র. একটায় আঁকা হয়েছে ঘাসের গাদা আর একটায় আঁকা হয়েছে পল্লবহীন ভূর্জ-বৃক্ষসমূহের মাঝখান দিয়ে গলিত তুষারের প্রবাহ; ড্রইং-রুমের সোফার ওপর দেয়ালে টাঙানো অপরিচিত লোকের আলোকচিত্র; এবং এক কোণে পালকের মত ঘাসের ধূলিপড়া একটা আঁটি।

কাতিয়া থিয়েটারে যায়, সেখানে সেই পুরনো অভিনেতা অভিনেত্রীরাই অস্ত্রোভ্স্কির বই অভিনয় করে; চিত্রপ্রদর্শনীতে যায়, যাদুঘরে যায়, কিন্তু কোথাও ভাল লাগে না তার, মনে হয় সব কিছুই যেন ম্লান, বিবর্ণ, অর্ধমৃত—নিজের সম্বন্ধে তার মনে হয় এই পৃথিবীতে জীবনের এক নির্জন পথে সে যেন ছায়ার মত একাকী ঘুরে বেড়াচ্ছে।

গরম জলের নলের কাছেই জানালার ধারে বসে কাতিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দেয়, চেয়ে থাকে তুষারাবৃত প্রশান্ত মস্কোর দিকে, যেখানে মৃদুমন্দ সমীরণ ভরে আছে পড়ন্ত তুষারকণা ও শোকার্ত ঘণ্টাধ্বনিতে, অবিরাম বাজে ঘণ্টা, কখনো মৃতের স্মৃতিতর্পণের আবার কখনো মৃতের শোকযাত্রার। বইও পড়তে ভাল লাগে না কাতিয়ার। কি পড়বে সে? কিসের স্বপ্ন আর দেখবে সে? তার সেই আগেকার সমস্ত চিন্তা ও স্বপ্নের আজ কোন মূল্যই নেই।

মানুষ এখন সময়ের হিসেব করে সকাল ও বিকালের কাগজ কখন বেরুবে তা ধরে। কাতিয়ার চারদিকে যারা আছে তারা বেঁচে আছে একমাত্র ভবিষ্যতের দিকে চেয়ে; ভয় ও শান্তির একটা কাল্পনিক ভবিষ্যত ভেবে আছে তারা; তাদের এই আশার অনুকূল কিছু দেখলেই তারা আনন্দে দিশেহারা হয়ে যায়, আবার প্রতিকূল কিছু ঘটলেই একেবারে মুষড়ে পড়ে। লোক মাত্রাজ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে, যে-কোন গুজব, যে-কোন অলীক কাহিনী পেলেই তারা তা লুফে নেয়; তাদের মাথা খারাপ করে দেবার পক্ষে সংবাদপত্রের একটি শিরোনামাই যথেষ্ট।

কাতিয়া অবশেষে মনঃস্থির করে ফেলে, স্বামীকে বলে তার জন্য যুদ্ধের কোনও একটা কাজ যোগাড় করে দিতে। মার্চের গোড়া থেকেই দাশা যে হাসপাতালে কাজ করে সেও সেই হাসপাতালেই কাজ করতে আরম্ভ করে।

মানুষের যন্ত্রণা ও ক্লেদ দেখে দাশারই মত কাতিয়ারও প্রথমটায় একটা অস্বস্তির ভাব হত। কিন্তু ক্রমশ এটাকে সে জয় করে এবং কাজের মধ্যে ডুবে যায়। এই আত্মজয়ে তার বড় আনন্দ। তার আশেপাশের জীবনের সঙ্গে এই যেন একটা প্রথম যোগসূত্র সে খুঁজে পায়। ক্লেদ ঘাঁটতে তার আর কষ্ট হয় না, যাদের সেবা করে সে তাদের জন্য দরদে তার অন্তর ভরে ওঠে। এক সময় সে দাশাকে বলে :

"আমাদের মাথায় কে ঢুকিয়ে দিয়েছিল রে, আর পাঁচজন থেকে স্বতন্ত্র হয়ে একটা বিশেষ মার্জিত জীবন যাপন করতে হবে আমাদের ? মূলত চাষী-মেয়ে ও আমাদের মধ্যে কি কোন পার্থক্য আছে ? আমরাও তো স্ত্রীলোকই। মনের মত স্বামী, ঘরভরা ছেলেমেয়ে আর সরলসহজ জীবনে কি আমাদেরও প্রয়োজন নেই !"

ঈস্টার সপ্তাহে কাতিয়াই খৃস্টকে নিবেদনের জন্য হাসপাতালের পক্ষ থেকে ইস্টারের মিঠাই গীর্জায় নিয়ে যায়। হাসপাতালেই সে দাশার সঙ্গে প্রাতরাশ করে। নিকলাই ইভানোভিচের সে-রাত্রে একটা বিশেষ সভা ছিল, দুবোনকে নিয়ে আসার জন্য রাত তিনটেয় তিনি গাড়ী নিয়ে হাসপাতালে গিয়ে উপস্থিত হন। কাতিয়া বলে তার ও দাশার ঘুমোবার ইচ্ছে নেই তারা গাড়ীতে করে বেড়াতে চায়। অদ্ভুত খেয়াল বটে; কিন্তু তারা গাড়ীচালককে এক গ্লাস ব্রান্ডি দেয়, সে তাদের নিয়ে খোদিনস্কোয়ে ময়দানে চলে যায়।

বাতাসের সঙ্গে সামান্য তুষার মিশে আছে, তাদের গণ্ডদেশ শীতল করে দেবার পক্ষে তাই যথেষ্ট। নির্মেঘ আকাশ, কয়েকটা তারা জ্বলজ্বল করছে। চাকার তলে বরফের কড়মড় আওয়াজ হচ্ছে। কাতিয়া ও দাশা উভয়েরই মাথা শালে ঢাকা, গায়ে ধূসর বর্ণের কোট, গাড়ীর পেছনের আসনে দুবোন লাগা-লাগি হয়ে বসে আছে। নিকলাই ইভানোভিচ বসেছেন সামনের দিকে চালকের পাশে। ঘাড় ফিরিয়ে তিনি দুবোনের দিকে তাকান, দুজনেরই কালো সুচিক্কণ ভ্রূ ও আয়ত নেত্র।

"তোমাদের দুজনের মধ্যে কে যে আমার স্ত্রী, চেনা দায়," অতিশয় মোলায়েম কণ্ঠে বলেন নিকলাই ইভানোভিচ।

তাদের একজন জবাব দেয় : "আর চেনা সম্ভব হবেও না কোনদিন," দুজনেই হাসে।

কুয়াশাচ্ছন্ন বিস্তীর্ণ ময়দানের শেষপ্রান্তে এইমাত্র দিগন্ত সবুজ আভা-যুক্ত হতে আরম্ভ করেছে; দূরে রজত-বৃক্ষরাজির কৃষ্ণ রেখাবলী দেখা দিয়েছে।

দাশা কোমল কণ্ঠে বলে : "দিদি, ভালবাসার জন্য আমার মন বড় ব্যাকুল।"

কাতিয়া বোনের হাত সস্নেহে চেপে ধরে। বৃক্ষসমূহের মাথার ওপরে

ভোরের সজল সবুজ আকাশে একটা বড় তারা ঝিকিমিকি করে জ্বলছে, মনে হচ্ছে যেন শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে বাড়ছে আর কমছে।

নিকলাই ইভানোভিচ ঘুরে বসে বলেনঃ "তোমাকে একটা কথা বলতে ভুলেই গেছি, কাতিয়া। আমাদের প্রতিনিধি চুমাকভ সবে ফিরে এসেছেন। তিনি এসে বললেন, গ্যালিসিয়ায় অবস্থা খুবই সঙ্গীন। জার্মানরা আমাদের ওপর এমনভাবে কামান দাগছে যে, রেজিমেন্টগুলি সবই একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে। আমাদের গোলাগুলি ফুরিয়ে এসেছে। কি, ভয়ঙ্কর কথা, বল তো..."

কাতিয়া জবাব দেয় না; সে খালি তারাগুলির দিকে চেয়ে থাকে। দাশা তার গালটা দিয়ে দিদির কাঁধে চাপ দেয়। নিকলাই ইভানোভিচ আর একবার ক্ষোভ প্রকাশ করে চালককে বলেন বাড়ির দিকে গাড়ি চালাতে।

ঈস্টারের ছুটির তৃতীয় দিবসে কাতিয়া অসুস্থ হয়ে পড়ে। হাসপাতালে যাওয়া আর সম্ভব হয় না, তাকে বিছানা নিতে হয়। সেদিন রাত্রে বেড়াতে গিয়ে ঠান্ডা লাগার ফলে তার নিউমোনিয়া হয়ে যায়।

॥ কুড়ি ॥

"অবস্থা যেরকম দাঁড়িয়েছে--ভাবলে মাথা খারাপ হয়ে যায়।..."

"নে রাখ, আগুনের দিকে চোখ দিয়ে অনেকক্ষণ বসে আছিস, এবার ঘুমো গে, যা।"

"যেরকম বিশৃঙ্খলা!..হ্যাঁ, গেল, আমাদের রুশিয়া গেল।"

একটা উঁচু খড়ের ঘরের মাটির দেয়ালের পাশে ঘুষঘুষে আগুনের সামনে বসে আছে তিনজন সৈন্য। একজন খুঁটির ওপর তার পা বাঁধবার পটি মেলে দিয়ে শুকোচ্ছে এবং দেখছে যাতে আগুনে তা পুড়ে না যায়; আর একজন তার ছেঁড়া পাতলুনে তালি দিচ্ছে, ছুঁচের ফোঁড় দিচ্ছে খুবই সাবধানে; তৃতীয় সৈন্যটি বসে আছে পা দু'টো মাটিতে আড়াআড়ি করে রেখে কোটের পকেটে হাত ঢুকিয়ে, তার মুখে ব্রণের দাগ, নাকটা বড় ও পাতলা, কালো দাড়ি, চোখ দু'টো কোটরগত; সন্তপ্ত নয়নে চেয়ে আছে সে আগুনের দিকে।

"চারদিকেই বিশ্বাসঘাতকতা, তাই এই অবস্থা," শান্তভাবে বলে সে। "আমরা একটু সুবিধে করে এনেছি কি অমনি আদেশ এলঃ পেছনে হট! আমরা যা করি তাতেই অপরাধঃ যত দোষ নন্দ ঘোষ, কিন্তু গলদ তো ওপর-তলায়, সেখান থেকেই তো যত বিশ্বাসঘাতকতা।"

"এই যুদ্ধের প্রতি আমার অসম্ভব ঘেন্না ধরে গেছে, কিন্তু কাগজে তো তারা এখবর ছাপবে না," পা বাঁধবার পটি যে শুকোচ্ছিল বলে সেই সৈন্যটি। জ্বলন্ত অঙ্গারগুলির মধ্যে সাবধানে সে আরো কিছু গাছের শুকনো ডাল

ফেলে দেয়। "প্রথমে আমরা এগুই, তারপর পেছনে হটে আসি; আবার আক্রমণ করি আবার যেখান থেকে আরম্ভ করেছিলাম সেখানেই ফিরে আসি। এর আর শেষ নেই! লাভ কিছুই হয় না!" এই বলেই আগুনের মধ্যে সে খানিকটা থুথু ফেলে।

"সেদিন লেফ্‌টেনান্ট ঝাদভ এল আমার কাছে," যে সৈন্যটি পাৎলুন রিপু করছিল বলে সে। মাথা তোলে না সে, কাজের দিকেই নজর তার। "মনে হল সেও অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে উঠেছে। কাজেই এসেই আমার দোষ ধরতে লাগল। আমার পাৎলুন ছিঁড়ল কেন? আমি ঠিক মত দাঁড়াইনি কেন? বললাম না কিছু। শেষ পর্যন্ত আমার গালে এক ঘা বসিয়ে দিল!"

যে পা বাঁধবার পটি শুকোচ্ছিল সে এর জবাব দেয়ঃ

"বন্দুক নেই, গুলি নেই, নেই বলতে কিচ্ছু নেই। আমাদের ব্যাটারিতে কামান-পিছু মাত্র সাতটা করে গোলা আছে। আমাদের গালে চড় মারা ছাড়া তাদের আর কিই বা করবার আছে!"

যে পাৎলুন রিপু করছিল সে বিস্ময়ে মাথা তুলে চায় এবং ঘাড় নেড়ে তার কথায় সায় দেয়।

কালো দাড়িওয়ালা লোকটা তার হিংস্র চোখ দু'টো ঘুরিয়ে বলেঃ

"সবাইকে যুদ্ধে টেনে এনে নামানো হচ্ছে। যাদের বয়েস তেতাল্লিশ তাদেরও পর্যন্ত যুদ্ধে ডাক পড়েছে। এত লোক দিয়ে সারা দুনিয়া জয় করা যায়। যুদ্ধ আমরাও করতে চাই এবং করছিও—কিন্তু তারা কি তাদের কাজ করছে? তোমরা তোমাদের কাজ কর, আমরা আমাদের কাজ করি।"

"ঠিকই তো," পাৎলুন সেলাই করতে করতে বলে অপর সৈন্যটি।

"ওয়ারস'র নিকটে এক রণাঙ্গনের অবস্থা আমি স্বচক্ষে দেখেছি," বলে কালো দাড়িওয়ালা সৈন্যটি। "পাঁচ ছ' হাজার সাইবিরীয় রাইফেলধারী সৈন্য সেখানে ধরাশায়ী। মৃতদেহগুলি দেখে মনে হচ্ছিল যেন আঁটি আঁটি ফসল কেটে মাঠে ফেলে রাখা হয়েছে। কিসের জন্য? কেন? কেন, তা আমি বলছি তোমাদের। সমর পরিষদ যখনি কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয় তখনি জেনারেলদের মধ্যে একজন চলে যায় এবং গিয়ে সাংকেতিক ভাষায় বার্লিনে টেলিগ্রাম করে। বুঝলে? দু'টি সাইবিরীয় কোর স্টেশন থেকে সোজা রণাঙ্গনে চলে যায় মেশিনগানের মুখে কচুকাটা হতে। তুমি বলছ তোমার গালে চড় মারা হয়েছে? তাতে হয়েছে কি? আমি যখন ঘোড়াকে ঠিক মত যোয়ালে যুততে পারতাম না, বাবা আমার মুখে মারতেন খুব কষে চাপড়, ঠিকই করতেন তিনি। মানুষের শেখা দরকার, তাকে শেখাতে হবে। কিন্তু সাইবিরিয়ার রাইফেলধারী সৈন্যদের ভেড়ার মত কসাইখানায় পাঠানো হয় কেন? আমি তোমাদের বলছি, রুশিয়ার দফা নিকাশ করা হয়েছে, তাকে বিকিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং যে এই বিশ্বাসঘাতকতা করেছে সে আমাদেরই মত একজন চাষী, আমাদেরই গ্রাম পোক্রোভস্কোয়ের লোক সে, একটা ভবঘুরে। তার

নাম মুখে আনতেও ঘৃণা হয়।...লেখাপড়া কিছুই জানে না, তবে মুখে খুব মিষ্টি, ফন্দীবাজও খুব। বেটা কাজকম্ম কিছুই করত না, ঘোড়া চুরি করতে আরম্ভ করল, মঠে মঠে ঘুরে বেড়াত, মাগী আর মদে মত্ত হয়ে থাকত।...আর এখন সে বেটা পিতার্স্বুর্গে গিয়ে বসেছে প্রায় জার হয়ে। কত প্রতিপত্তি তার, মন্ত্রী ও সেনাপতিরা অনবরত সেলাম ঠুকছে তাকে। আমরা জবাই হচ্ছি, সেঁতসেঁতে মাটিতে হাজার হাজার মরছি আমরা, আর শালারা পিতার্স্-বুর্গে চোখ-ঝলসান বিজলী বাতির তলায় বসে খাচ্ছে দাচ্ছে মজা লুটছে আর ফুলে মোটা হচ্ছে।"

হঠাৎ সে চুপ করে যায়। সব নিস্তব্ধ ও একটা সেঁতসেঁতে ভাব, ঘরের ভেতর ঘোড়াগুলির জাবরকাটার শব্দ হচ্ছে; একটা ঘোড়া দেয়ালে ধুপ করে লাথি মারে। নিশাচর একটা পাখী ঘরের চালের নীচ থেকে উড়ে এসে করুণ সুরে ডাকতে ডাকতে আগুনের ওপর দিয়ে চলে যায়। ঠিক সেই মুহূর্তে অনেক দূরে এমন প্রচণ্ড গর্জন শোনা যায় যাতে কর্ণ প্রায় বধির হয়ে যাবার উপক্রম, শব্দটা ক্রমশ কাছে আসতে থাকে, মনে হয় কোন একটা হিংস্র জানোয়ার বুঝি অন্ধকার ভেদ করে বিদ্যুৎগতিতে ছুটে আসছে, একটা বাধা পেয়ে যেন সেটা ভেঙে পড়ে। চালা ঘরটার ওধারে দূরে একটা বিস্ফোরণ হয়, আকাশ ও ভূতল কেঁপে ওঠে। ঘরের মধ্যে ঘোড়াগুলি হুটোপুটি করতে থাকে, শিকলের ঝন্‌ঝন্ শব্দ হয়। যে সৈন্যটি পাৎলুন রিপু করছিল সে ঘাবড়ে গিয়ে বলে ঃ

"বিরাট একটা !"

"কামান বটে।"

"এক মিনিট।"

তিনজনই মাথা উঁচু করে। নক্ষত্রহীন আকাশে আর একটা শব্দ উত্থিত হয়। প্রায় দু'মিনিটকাল শব্দটা থাকে। ঘরের পেছনে এবার কাছেই দ্বিতীয় গোলাটা বিদীর্ণ হয়, কালো দেবদারু গাছের মাথাগুলি আকাশে দেখতে পাওয়া যায়। মাটি আবার কেঁপে ওঠে। পরমুহূর্তেই তারা আর একটা কামানের গোলা আসার শব্দ শুনতে পায়। এমন সর্বগ্রাসী বিকট শব্দ এটার যে কানে আসামাত্রই যেন লোকের হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়। কালো দাড়িওয়ালা সৈন্যটি উঠে দাঁড়ায়, পেছনে হটতে থাকে। এরই মধ্যে বিদ্যুৎহীন অদৃশ্য বজ্রের মত একটা কি নীচে নেমে আসে। তারপরই গগনবিদারী ঘর্ঘর ধ্বনির সঙ্গে ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হয় কৃষ্ণবর্ণ ও আগুনের লাল আভাযুক্ত একটা স্তম্ভ।

স্তম্ভটা মিলিয়ে যেতেই দেখা যায়, যেখানে তিনজন সৈন্য ও অগ্নিকুণ্ডটা ছিল সেখানে কামানের গোলা পড়ে একটা গভীর গর্তের সৃষ্টি হয়েছে। ভগ্ন দেয়ালের ওপর খড়ের চাল দাউ দাউ করে জ্বলছে, হলদে রং-এর ধোঁয়া উঠছে। লম্বা কেশরযুক্ত একটা ঘোড়া লাফাতে লাফাতে ও নাসার আওয়াজ করতে

করতে আগুনের মধ্য দিয়ে ছুটে বেরোয় এবং আকাশের দিকে মাথা তুলে যে দেবদারু গাছগুলি দাঁড়িয়ে আছে সেদিকে দ্রুত চলে যায়।

ততক্ষণে দেখা যাচ্ছে অসমতল প্রান্তরের শেষ সীমানায় আলোর ঝলকানি এবং দূর থেকে ভেসে আসছে কামান গর্জন। সাপের লেজের মত আলো-রেখা এঁকে দিয়ে আকাশে উঠছে অসংখ্য হাউই, আবার ধীরে সেগুলি নেমে যাচ্ছে আর তাতে আলোকিত হচ্ছে জলে পূর্ণ কালো জমি। আকাশ ভেদ করে কামানের গোলাসমূহ ছুটে আসছে ভীম বজ্রনাদ করতে করতে।

॥ একুশ ॥

সেদিনই সন্ধ্যাবেলা সেই চালাঘরের অদূরে অফিসারদের খাদে উসোলস্ক রেজিমেন্টের একটি কোম্পানীর অফিসারগণ আনন্দোৎসব করছে। খবর এসেছে ক্যাপ্টেন তেৎকিনের ছেলে হয়েছে। ভূগর্ভস্থ আশ্রয়স্থলের ওপরে রয়েছে তিন স্তরে সাজানো আচ্ছাদন। কাঁচের চিমনীর মধ্যে বসানো মোমবাতির আলোতে অভ্যন্তরটা আলোকিত হয়েছে। একটা টেবিলের ধারে বসেছে আটজন অফিসার, একজন ডাক্তার এবং রণাঙ্গনস্থিত হাসপাতালের তিনজন নার্স।

খুব মদ খাচ্ছে তারা। একটা থালায় নানারকম ভুক্তাবশিষ্ট পড়ে আছে, তাতে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছে জনক হবার সদ্য আনন্দে মশগুল ক্যাপ্টেন তেৎকিন, তার একটা মলিন হাত টেকো মাথাটার ওপর বিলম্বিত অবস্থায় আছে। গুমসো আবহাওয়া, মদের গন্ধ ও মোমের কমনীয় আলোতে মনে হচ্ছে নার্সরা বেশ রমণীয়। তাদের একজনের নাম মুশকা, তার কপালের দু'পাশে দুলছে মোড়ানো কৃষ্ণকুন্তল; শুভ্র গ্রীবা পশ্চাৎদিকে ঈষৎ হেলিয়ে সে কেবলই হাসছে। তার দু' পাশের দু'জন এবং সামনে বসে আছে যে আরো দু'জন অফিসার তারা একদৃষ্টে চেয়ে আছে তার দিকে। দ্বিতীয় নার্সের নাম মারিয়া ইভানোভা, স্থূলকায়া, ভ্রূ পর্যন্ত গন্ডদেশের রক্তিম আভা বিস্তৃত; সুললিত কণ্ঠে যাযাবরী গান গাইছে সে। পাশের শ্রোতারা গান শুনে মেতে উঠেছে; হাতে টেবিলের ওপর তাল ঠুকছে তারা আর বার বার বলছে:

"দূর শালা! সেই তো ছিল জীবন!"

তৃতীয় নার্স হল এলিজাবেতা কিয়েভনা। মোমের আলোর শিখাগুলির দিকে চেয়ে আছে সে, দেখে এক একবার কেঁপে সেগুলো ভাগ হয়ে যাচ্ছে আবার একত্র হয়ে জ্বলে উঠছে জোরে; টেবিলের চারপাশের লোকগুলির মুখ ধোঁয়ায় সাদা দেখাচ্ছে, তবে তার পাশেই যে অফিসারটি বসে আছে অর্থাৎ লেফ্‌টেনান্ট ঝাদভের মুখখানাই শুধু সে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। মনে হয় তার মুখখানা ভয়ঙ্কর কিন্তু সুন্দর। চওড়া কাঁধ তার, পিঙ্গল চুল, দাড়ি-

গোঁফ পরিষ্কার করে কামানো, বিবর্ণ, ঈষৎ স্বচ্ছ চোখ। বেশ সোজা হয়ে বসেছে সে, টেনে বেল্ট আঁটা, এন্তার মদ খেয়ে যাচ্ছে, প্রতিবার মদের প্লাসে চুমুক দেবার পরই তার মুখটা আরো বিবর্ণ হয়ে যায়। কালোকেশী মুশকা যখনই হাসিতে ফেটে পড়ে, অথবা মারিয়া ইভানোভ্না তার গীটারটা হাতে নিয়ে ভাঁজ করা রুমালে মুখ মুছে যখনই উদাত্ত সুরে গান ধরে: "মোলদাভিয়ার তৃণপ্রান্তরে জনম লভিনু আমি," তখনই ঝাদভের ঋজু অধরোষ্ঠের এক কোণে মৃদু হাসি ফুটে ওঠে, আর এক চুমুক মদ খায় সে।

তার চোখা সুডোল মুখখানির দিকে নিবিড়ভাবে চেয়ে থাকে এলিজাবেতা কিয়েভনা। সেও তাকে মামুলি গল্প শুনিয়ে খুশি করে। অন্যান্য গল্পের সঙ্গে সে এ গল্পটাও করে যে, তাদের রেজিমেন্টে মার্তিনভ নামে একজন ক্যাপ্টেন ছিল। লোকে বলত সে একজন অদৃষ্টবাদী। রাত্রে মদ খেলেই সে কাঁটা তারের বেড়া ডিঙিয়ে শত্রুপক্ষের পরিখার ধারে চলে যেত এবং চারটে ভাষায় জার্মানদের গালাগালি করত। কয়েকদিন আগে তার সেই উচ্চাভিলাষের জন্য তাকে মূল্য দিতে হয়েছে, পেটে গুলি খেয়েছে। দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে এলিজাবেতা কিয়েভনা বলে ক্যাপ্টেন মার্তিনভকে নিশ্চয়ই একজন বীর বলতে হবে। ঝাদভ হাসে।

"মাফ কর, উচ্চাভিলাষী লোকও আছে, বোকাও আছে, কিন্তু বীর নেই কেউ।"

"আপনারা যখন আক্রমণ করতে যান তখন সেটা কি বীরত্ব নয়?"

"প্রথমত, কেউ আক্রমণ কবতে যায় না, আক্রমণ করতে বাধ্য হয় এবং যারা যায় তারা ভীরু। অবশ্য বাধ্যবাধকতা ছাড়াও কোন কোন লোক নিজের জীবনকে বিপন্ন করে, কিন্তু সেই সমস্ত লোক হত্যাব প্রবৃত্তি নিয়েই জন্মগ্রহণ করে।" ঝাদভ তার শক্ত নখগুলিব মাথা দিয়ে টেবিলটাকে ঠোকে। "তুমি অবশ্য বললে বলতে পার যে, এই সমস্ত লোক সমকালীন চেতনার একটা উন্নততর স্তরে গিয়ে পৌঁচেছে।"

চেয়ার থেকে একটু উঠে টেবিলের এক কোণে ফলের জেলির একটা বড় বাক্সের দিকে সে হাত বাড়ায় এবং খানিকটা জেলি এনে এলিজাবেতা কিয়েভনাকে দিতে যায়।

"না, আপনাকে ধন্যবাদ," বলে এলিজাবেতা কিয়েভনা। তার হৃদয়টা যেন দুরদুর করে কেঁপে ওঠে, দেহটাও কিরকম শিথিল হয়ে আসে। "ভাল, আপনার নিজের কথা বলুন না।"

ঝাদভ ভ্রুকুটি করে; তার মুখে হঠাৎ যেন বার্ধক্যের ছাপ দেখা দেয়, ললাট কুঞ্চিত হয়ে ওঠে।

"কি বলতে চাও তুমি—আমার কথা?" কর্কশ কণ্ঠে প্রশ্ন করে সে। "গতকাল চালাঘরের পেছনে আমি গুলি করে একটা ইহুদীকে হত্যা করেছি।

তুমি জানতে চাও নাকি যে সে কাজটা আমার পক্ষে আনন্দদায়ক হয়েছিল কি না? কি অদ্ভুত!"

তীক্ষ্ন দাঁত দিয়ে সে একটা সিগারেট চেপে ধরে এবং ফ্যাচ করে দেশলাই জ্বালে। মোটা আঙগুলে জ্বলন্ত কাঠিটা অবিচলিত ভাবেই মুখের কাছে নেয় সে, কিন্তু আগুনের শিখা সিগারেটটাকে স্পর্শ না করায় সেটা ধরে না।

"ও, নেশায় ধরেছে আমাকে। মাফ কর।" দেশলাই কাঠিটা পুড়তে পুড়তে প্রায় তার নখ পর্যন্ত এসে গেছে, ছুড়ে ফেলে দেয় সেটা। "চল না একটু হাওয়া খেয়ে আসি।"

এলিজাবেতা কিয়েভনা স্বপ্নোত্থিতের ন্যায় উঠে দাঁড়ায় এবং খাদ থেকে উঠে যাবার সংকীর্ণ সুড়ংগ পথে তাকে অনুসরণ করে। তাদের লক্ষ্য ক'রে হর্ষোৎফুল্ল, পানোন্মত্ত কণ্ঠে চীৎকার ওঠে এবং মারিয়া ইভানোভনা তার গীটারের তারে ঘা মেরে দরাজ গলায় গান ধরেঃ "যৌবন মদিরা রসে নিশি ভরপুর।.. "

বাইরে বসন্ত ও ঝরাপাতার গন্ধ, চারদিক অন্ধকার ও নিস্তব্ধ। পকেটে হাত রেখে ঝাদভ দ্রুতপদে ভেজা ঘাসের ওপর দিয়ে হেঁটে চলে। এলিজাবেতা একটু পেছনে পড়ে যায়, মুখে তার হাসিটি লেগেই আছে। ঝাদভ হঠাৎ থেমে গিয়ে ঝপ করে প্রশ্ন করেঃ

"আচ্ছা, এটার আবার কি হ'ল?"

এলিজাবেতা কিয়েভনার দেহের সমস্ত রক্ত যেন তার মুখে ছুটে আসে। ঢোক গিলে প্রায় অস্ফুট স্বরে বলে সেঃ

"জানিনে আমি।"

"এস, ভেতরে যাই।" এদিক ওদিক মাথা নেড়ে অন্ধকার চালাঘরের ভেতরটা সে বারকয়েক দেখে নেয়। কয়েক পা এগোবার পর সে আবার থেমে দাঁড়ায় এবং তার তুষারহিম হাত দিয়ে এলিজাবেতা কিয়েভনার একটা হাত শক্ত করে চেপে ধরে।

"দেবতার মত বল আমার দেহে আছে" অসম্ভব উত্তেজনার সঙ্গে বলে সে। "আমি হাতে একটা রৌপ্যমুদ্রাকে ভেঙ্গে দুটুকরো করতে পারি। মানুষ আমি দেখেই চিনতে পারি, মনে হয় তারা যেন কাঁচে তৈরী। আমি তাদের ঘৃণা করি!" একটু থামে, মনে হয় কি যেন একটা তার মনে পড়েছে, পদাঘাত করে সে। "এই সমস্ত চাপা হাসি, গান, ভীরু আলাপ আমার অসহ্য লাগে! মনে হয় এগুলি উষ্ণ গোবরের কীট। ইচ্ছে হয় তাদের পিষে ফেলি।...শোন ...আমি তোমাকে ভালবাসিনা, তোমাকে ভালবাসতে পারি না আমি এবং ভাল-বাসবও না।...চাটুবাদে ভুল না।...কিন্তু আমি তোমাকে চাই।...এই বশ্যতার ভাব আমি আর সহ্য করতে পারি না।..নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ তুমি।..." এলিজাবেতা কিয়েভনার বাহুদ্বয়ের নীচে তার হাত দুটো চালিয়ে দিয়ে তাকে

সে জোর করে কাছে টেনে আনে এবং জ্বলন্ত কয়লার মত শুষ্ক ও উত্তপ্ত অধরোষ্ঠ দিয়ে তাকে চুম্বন করতে থাকে।

এলিজাবেতা কিয়েভনা নিজেকে ছাড়াবার জন্য সংগ্রাম করে, কিন্তু ঝাদভ লৌহ বেষ্টনীর মত দু'বাহুর মধ্যে ফেলে এমনভাবে তাকে চেপে ধরে যে তার দম প্রায় বন্ধ হয়ে আসে; সংগ্রামের আশা ছেড়ে দিয়ে অগত্যা সে মাথা হেঁট করে নিজেকে তার বাহুর ওপর অসহায়ের মত ছেড়ে দেয়।

"তুমি আর সবার মত নও, একটু পার্থক্য আছে," বলে ঝাদভ। "তোমাকে দেখে নেব।..." হঠাৎ থেমে গিয়ে মাথা তোলে সে।

অন্ধকারে একটা কর্ণভেদী দারুণ তীক্ষ্ম শব্দ।

"দূর শালা!" দাঁত কিড়মিড় করে বলে ওঠে ঝাদভ।

মুহূর্ত বাদেই একটা কামানের গোলা দূরে ফাটে। এলিজাবেতা কিয়েভনা আবার নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টা করে, কিন্তু ঝাদভ তাকে আরো জোরে চেপে ধরে। মরিয়া হয়ে বলে সে ঃ

"আমাকে যেতে দাও!"

আর একটা কামানের গোলা বিদীর্ণ হয়। ঝাদভ বিড়বিড় করে কি বলতে থাকে, সহসা ঘরের ঠিক পেছনেই একটা কৃষ্ণ অগ্নিস্তম্ভ ওপরের দিকে ওঠে, সঙ্গে সঙ্গে বিস্ফোরণের প্রচণ্ড আওয়াজ, চালার জ্বলন্ত খড়গুলি আকাশে উৎক্ষিপ্ত হয়।

জোর করে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে এলিজাবেতা কিয়েভনা ভূগর্ভস্থ আশ্রয়-স্থলের দিকে ছুটে চলে যায়।

সুড়ঙ্গ পথ দিয়ে অফিসারগণ তাড়াতাড়ি বাইরে চলে আসে: জ্বলন্ত খড়ের ঘরটার দিকে তারা তাকায়, আগুনের আলো তেরচাভাবে এসে পড়ায় অসমতল ভূমির খানিকটা ফর্সা খানিকটা কালো দেখাচ্ছে; সেই অসমতল ক্ষেত্রের ওপর দিয়েই তারা দৌড়তে থাকে। বাঁদিকে বনের মধ্যে যেখানে পরিখা সেখানে ছুটে চলে যায় কয়েকজন আর কয়েকজন চলে যায় ডান দিকে যেখানে রয়েছে পারঘাটার ঘাঁটির সঙ্গে সংযোগস্থাপনের পরিখা। নদীর অপরতীরস্থ পাহাড়ের পশ্চাতে থেকে জার্মান গোলন্দাজ বাহিনী কামান দাগছে। দু'দিক থেকে গোলা বর্ষিত হচ্ছে, ডান দিকে হচ্ছে সেতুর ওপরে, আর বাঁদিকে হচ্ছে নদীর সেই জায়গাটায় যেখানে হেঁটে নদী পার হওয়া চলে; সম্প্রতি নদীর অপর তীরে উসলন্স্ক রেজিমেন্টের ছয় নম্বর কোম্পানী যে খামারটা দখল করেছে শেষোক্ত স্থানটা দিয়ে হেঁটে নদী পার হয়ে সেখানে যাওয়া যায়। রুশ কামানসমূহ লক্ষ্য করেও কিছুটা গোলা বর্ষিত হতে থাকে।

এলিজাবেতা কিয়েভনা দেখে ঝাদভ খালি মাথায় পকেটে হাত রেখে সোজা মাঠটা পার হয়ে যেখানে মেশিন-গান বসানো আছে সেখানে যায়। অকস্মাৎ ধোঁয়া ও আগুনের একটা কুণ্ডলীর মধ্যে তার দীর্ঘ কান্তিটা ঢাকা পড়ে। এলিজাবেতা কিয়েভনা চোখ বোজে। তারপর চোখ মেলে আবার

সে দেখতে পায় ঝাদভ তার হাত দুটো সেই আগের কায়দায়ই রেখে আর একটু বাঁদিক ঘেঁষে যাচ্ছে। দূরবীক্ষণ চোখে দিয়ে ক্যাপ্টেন তেৎকিন একেবারে এলিজাবেতা কিয়েভনাকে ঘেঁষেই দাঁড়িয়ে আছে। ক্রোধে সে চীৎকার করে বলে :

"আমি বললাম, কি হবে আমাদের ঐ তুচ্ছ খামার দখল করে! শুনল না আমার কথা। এখন দ্যাখ, হেঁটে নদী পার হবার জায়গাটার কি অবস্থা করল তারা। ' শুয়োরের বাচ্চারা!" আবার সে দূরবীনটা চোখে দেয়।

"ও! হারামজাদারা সোজা খামারে গোলাবর্ষণ করছে! আহা! ছয় নম্বর কোম্পানীটা গেল।" সে ঘুরে দাঁড়ায় এবং মাথার পেছন দিক্‌কার টাকটা চুলকায়। "শিলয়াপকিন!"

"এই যে, সার!" সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দেয় শিলয়াপকিন। সে বেঁটে, তার নাকটা বড়, মাথায় একটা কসাক টুপী।

"খামারের সঙ্গে সংযোগ আছে?"

"না, সার, তারটা কাটা।"

"দশ নম্বর কোম্পানীকে বল খামারের সৈন্য পাঠাতে।"

"আচ্ছা, সার!" কপালের পাশ থেকে তাড়াতাড়ি হাত নামিয়ে জবাব দেয় শিলয়াপকিন। দু' পা গিয়েই সে থামে।

"লেফ্‌টেনান্ট শিলয়াপকিন!" চোখমুখ লাল করে আবার ভীষণভাবে চিৎকার করে ওঠে ক্যাপটেন।

"বলুন, সার!"

"আমার আদেশ পালন কর।"

"যে আজ্ঞা, সার!" শিলয়াপকিন কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে মাথা নীচু করে এবং হাতের বেত দিয়ে মাটি খোঁচাতে আরম্ভ করে।

"লেফ্‌টেনান্ট শিলয়াপকিন!" গর্জে ওঠে ক্যাপ্টেন।

"বলুন, সার!"

"সোজা রুশ ভাষায় কথা বললে তুমি বোঝ, না, বোঝ না?"

"হ্যাঁ, সার, বুঝি।"

"তবে আট নম্বর কোম্পানীকে আমার হুকুম পেঁাছাও। এই হুকুম যদি তারা না মানে তবে বুঝব এজন্য দায়ী তুমি। সেখানে লোক পাঠানো উচিত কি অনুচিত তা তারাই ভাল বুঝবে। লোক পার হবার জায়গায় পনের জন লোক তারা পাঠাক। ডিভিশনের প্রধান কার্যালয়ে অবিলম্বে ফোন কর যে, আট নম্বর কোম্পানী বীরত্বের সঙ্গে হেঁটে নদী পার হচ্ছে। প্রধান কার্যালয় থেকে আমাদের ক্ষয়ক্ষতির কথা জিজ্ঞেসা করলে ছ' নম্বর কোম্পানীর হতাহতদের নাম বলে দিও। নাম শুনে তারা অত বুঝতে পারবে না। চলে যাও। আর মিস, তুমিও সরে পড় এখান থেকে." এলিজাবেতা কিয়েভনার

দিকে ঘুরে বলে সে। "ভাল চাও তো চলে যাও এখান থেকে—এক্ষুনি গোলা-গুলি চলবে।"

ঠিক সেই মুহূর্তে শোঁ শোঁ করে একটা কামানের গোলা ছুটে আসে এবং নিকটেই কিসে আঘাত লেগে বিদীর্ণ হয়।

॥ বাইশ ॥

যে-খাদে মেশিনগানটা রাখা হয়েছে তারই একেবারে ধারে শুয়ে দূরবীনের সাহায্যে বণাঙ্গনের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করছে ঋাদভ। চোখ থেকে দূরবীনটা সে একবারের জন্যও নামায় না। পাহাড়ের একটা ঢালুতে মেশিনগানের জন্য খাদটা খনন করা হয়েছে; পাহাড়ের ওপরে রয়েছে বন। পাহাড়ের পাদদেশে নদীটা সামান্য বাঁক খেয়ে গেছে। ডানদিকে যে সেতুটা এইমাত্র কামানের গোলায় পুড়ে গেছে তা থেকে এখনো রাশি রাশি ধূম নির্গত হচ্ছে। সেটা ছাড়িয়ে গিয়ে নদীর ওপারে একটা তৃণময় জলাভূমিতে রয়েছে আঁকাবাঁকা পরিখা, উসলস্ক রেজিমেন্টের এক নম্বর কোম্পানী তা দখল করে আছে। তাদের বাঁ পাশে একটা ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী নলখাগড়ার ভেতব দিয়ে প্রবাহিত হযে পড়েছে গিয়ে বড় নদীটায়। বাঁ দিকে আরো গেলে অর্থাৎ ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনীর অপর তীরে দেখা যায় তিনটা খামারবাড়ি আগুনে পুড়ছে। তা ছাড়িয়ে গিয়ে রয়েছে কতগুলি পরিখা; সেগুলি এক জায়গায় গিয়ে কোণ হয়ে মিলেছে, মনে হয় যেন একটা কীলক ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেই পরিখায়ই আছে ছ' নম্বর কোম্পানী। এ থেকে প্রায় তিনশ' গজ দূরেই আরম্ভ হয়েছে জার্মান ব্যূহ; ডান হাতে চলে গেছে ব্যূহটা পশ্চাদ্বর্তী বনাকীর্ণ পাহাড়ের দিকে।

দু' পাড়ের কামানের গোলার আগুনে নদীর জল ঘোলাটে লাল হয়ে ওঠে ও কামানের গোলা থেকে অনবরত নদীবক্ষে অগ্নিবমনের ফলে জল টগবগ করে ফুটতে থাকে।

খামারেই কামানের গোলা এসে পড়ে সব চেয়ে বেশি। প্রতি মুহূর্তেই শ্র্যাপনেল গোলা বিস্ফোরণের অগ্নিচ্ছটা জ্বলন্ত বাড়িগুলির ওপর দিয়ে দেখতে পাওয়া যায় এবং আঁকাবাঁকা পরিখাগুলির কোণের কাছে ধোঁয়ার কালো স্তম্ভ ওপরের দিকে ওঠে। ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনীর ওপারে নলখাগড়া ও ঘাসের অন্তরালে রাইফেল থেকে নির্গত সূক্ষ্ম আলোবিচ্ছুরণ দেখতে পাওয়া যায়।

বড় কামানের গোলা যখন বিদীর্ণ হয় তখন সারা আকাশ কেঁপে ওঠে। নদী, মাঠ এবং নদীর এপাড়ে যে-সমস্ত পরিখা দু' নম্বর, তিন নম্বর ও চার নম্বর কোম্পানীগুলি দখল করে আছে সেগুলির ওপর শ্র্যাপনেল থেকে গুলি ফটাফট ছুটতে থাকে। পাহাড়ের পেছনে বারো ব্যাটারী জার্মান কামানের

গুরুগর্জন কানে আসছে আর দেখা যাচ্ছে অবিশ্রান্ত আলোবিচ্ছুরণ। রুশ কামান থেকে পাল্টা গোলাসমূহ সশব্দে আকাশপথে ছুটে গিয়ে পড়ে পাহাড়ের ওধারে। কর্ণপটাহবিদারী প্রলয়ংকর শব্দ; মনে হয় যেন জগদ্দল পাষাণ মানুষগুলির বুকে চাপিয়ে দেওয়া হল, ঘৃণা ও ক্রোধে তাদের অন্তর কাণায় কাণায় ভরে ওঠে।

এই অবস্থাটা অনেকক্ষণ ধরে চলে। ঋাদভ তার ঘড়ির উজ্জ্বল ডায়্যালটার দিকে চায়—রাত আড়াইটা। আর একটু পরেই তো ফর্সা হয়ে আসবে এবং জার্মানরা আক্রমণ শুরু করে দেবে।

কামান গর্জন আরো ঘনঘন হতে থাকে এবং নদীর জল আরো বেশি টগ-বগ করে ফুটতে আরম্ভ করে; নদী পার হবার জায়গায় ও নদীর এপাড়স্থিত পাহাড়ের ওপর অসংখ্য কামানের গোলা এসে পড়ে। মাঝে মাঝে মাটি কেঁপে উঠে গুরগুর আওয়াজ হয়, মেশিনগান রাখার খাদের পার্শ্বস্থিত প্রাচীন ও ওপরের আচ্ছাদন থেকে ঝুরঝুর করে মাটি ও নুড়ি খসে পড়ে। ভস্মীভূত খামারটা এখন স্তব্ধ। অকস্মাৎ বহু দূর থেকে ডজন ডজন হাউই সর্পিল গতিতে তেরচাভাবে নদীর দিকে ছুটে আসে, মাটিতে দিনের মত আলো হয়ে যায়। হাউইগুলি নিভে গেলে কয়েক মিনিট ঘোর অন্ধকারে কাটে। জার্মানরা পরিখা থেকে উঠে আক্রমণ করার জন্য এগিয়ে আসছে।

ঊষার অস্পষ্ট আলোতে ঋাদভ অবশেষে দেখতে পায় অনেকদূরে কতগুলি মনুষ্যদেহ মাঠ পার হয়ে এগিয়ে আসছে, একবার তারা নেমে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে আবার ছুটে সামনের দিকে আসছে। তাদের রুখবার জন্য খামার থেকে একটা গুলিও হল না। ঋাদভ ঘুরে উচ্চস্বরে বলেঃ

“চালাও গুলি!”

মেশিনগানটা মনে হয় পৈশাচিক ক্রোধে কেঁপে ওঠে, তারপর সীসা ও তীব্র ধূমরাশি উদ্গীরণ করতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে মনুষ্যদেহগুলি মাঠের মধ্য দিয়ে আরো দ্রুত ছুটতে আরম্ভ করে, কয়েকজন পড়েও যায়। এর মধ্যে মাঠে অগণিত বিন্দুর ন্যায় লোক দেখতে পাওয়া যায়, তারা আক্রমণকারী সৈন্য। মুখপাতে যারা রয়েছে তারা ছ' নম্বর কোম্পানীর লণ্ডভণ্ড পরিখাগুলির দিকে ধেয়ে যায়। পরিখাগুলির অভ্যন্তর থেকে বিশজন লোক বেরিয়ে আসে; কিন্তু দেখতে না দেখতেই জার্মানদের ভীড়ের মধ্যে তারা অদৃশ্য হয়ে যায়।

কয়েক শ' মাইল ব্যাপী রণাঙ্গনে যে বিরাট যুদ্ধ চলেছে এবং তাতে উভয় পক্ষেরই যে হাজার হাজার লোকক্ষয় হচ্ছে, খামারের জন্য এই লড়াই হল তার একটি অতি ক্ষুদ্র অংশ।

নদীর অপর তীর থেকে আক্রমণ হলে আত্মরক্ষার একটা ভাল ঘাঁটি হবে এই আশায় দু' সপ্তাহ আগে রুশরা খামারটা দখল করেছিল। নদীর নিকটে পর্যবেক্ষণের জন্য একটা ভাল ঘাঁটি পাওয়া যাবে এই ভেবে জার্মানরাও সেটা দখলের জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ে। বসন্তকালীন অভিযানের যে বিশদ পরি-

কল্পনা হয়ে গেছে তাতে এই খামারটা সামরিক গুরুত্ব লাভ করেছে, সুতরাং রুশ ও জার্মান উভয় পক্ষেরই ডিভিশন-সেনাপতিরা এই জায়গাটা দখলে রাখবার জন্য উদগ্রীব।

জেনারেল দোব্রভ হলেন রুশ ডিভিশনের সেনাপতি। মাত্র ছ' মাস পূর্বে সম্রাটের অনুমতি নিয়ে তিনি তাঁর আগেকার অ-রুশ নামের পরিবর্তে এই নতুন নাম গ্রহণ করেছেন। উসলস্ক রেজিমেন্টের অধিকৃত এলাকায় জার্মান আক্রমণের খবর যখন আসে তখন তিনি তাস নিয়ে বসে পেশেন্স খেলছিলেন।

জেনারেল তাঁর খেলা বন্ধ করে পদস্থ সেনানীবৃন্দ ও দু'জন পার্শ্বচর নিয়ে যে-ঘরে টেবিলের ওপর স্থানের বিবরণযুক্ত সামরিক মানচিত্রসমূহ রয়েছে সে-ঘরে যান। হেঁটে পার হবার জায়গা ও সেতুর ওপর গোলাবৃষ্টি হচ্ছে বলে খবর পাওয়া গেছে। জেনারেল বুঝতে পারেন জার্মানরা খামারটা দখলের মতলবে আছে। এই খামারটাকে ঘাঁটি করেই অভিযান চালাবার একটা বড় পরিকল্পনা তিনি করেছেন, কোরের প্রধান কার্যালয় থেকে অনুমোদিত হয়ে সে পরিকল্পনা আর্মি কমান্ডারের নিকট প্রেরিত হয়েছে। জার্মানরা সেই খামার আক্রমণ করে সমস্ত পরিকল্পনা বানচাল করে দিয়েছে।

মিনিটে মিনিটে টেলিফোনে যে-সমস্ত খবর আসতে থাকে তা দ্বারা জেনারেলের অনুমানই সত্যে পরিণত হয়। তাঁর প্রকাণ্ড নাকের ওপর থেকে স্প্রিং-এর চশমা জোড়া খুলে নিয়ে নাচাতে নাচাতে শান্ত অথচ দৃঢ়ভাবে তিনি বলেন ঃ

"আচ্ছা, দেখা যাক! আমার সৈন্যরা যে-জায়গা দখল করেছে তার সূচ্যগ্র ভূমিও আমি ছেড়ে দেব না।"

তৎক্ষণাৎ টেলিফোনে খবর পাঠানো হয যে, শেষ রক্তবিন্দু দিযে খামারটা রক্ষা করতে হবে। আঞ্চলিক বাহিনীর কুন্দ্রাভিন রেজিমেন্ট এতদিন রিজার্ভ হিসেবে রাখা হয়েছিল, আদেশ হয় হেঁটে নদী পার হবার জায়গা রক্ষায় তেৎকিনকে সাহায্যের জন্য উক্ত রেজিমেন্ট থেকে দু' ব্যাটেলিয়ন সৈন্য পাঠাতে হবে। এই আদেশ পাঠাবার অব্যবহিত পরেই বড় কামানের ব্যাটারির অধিনায়কের কাছ থেকে খবব আসে ঃ কামানের গোলা সামান্যই আছে, একটা কামান ইতিমধ্যেই বিগড়ে গেছে এবং প্রতিপক্ষের গোলাবর্ষণেব যোগ্য প্রত্যুত্তর দেবার কোন সম্ভাবনাই নেই।

জেনারেল দোব্রভ কঠোরভাবে একবার তার অফিসারদের দিকে তাকান এবং বলেন ঃ

"বেশ, সমস্ত গোলা যখন ফুরিয়ে যাবে তখন খালি কামান নিয়েই আমরা লড়াই করব।" ওপরের দিকে লাল কাপড় বসানো তাঁর ধূসর বর্ণের রোমান কোটটার পকেট থেকে তুষারশুভ্র একটা রুমাল বের করে তিনি ভাঁজ খোলেন এবং তা দিয়ে স্প্রিং-এর চশমা জোড়া মুছতে মুছতে মানচিত্রের ওপর ঝুঁকে পড়েন।

এমন সময় দরজার ফাঁকে এসে দাঁড়ায় তাঁর জুনিয়র পার্শ্বচর কাউন্ট বোব্রোইস্কি, গাঢ় খাকি রংএর পোশাক পরণে তার, দস্তানার মত ফিট করেছে পোশাকটা তাকে। তার তারুণ্যভরা পাতলা অধরোষ্ঠে মৃদু হাসি টেনে এনে বলে সে ঃ

"মাননীয় জেনারেল সাহেব, ক্যাপ্টেন তেৎকিন খবর দিলেন যে, প্রতিপক্ষ মারাত্মকভাবে গোলাবর্ষণ করা সত্ত্বেও আট নম্বর কোম্পানীর সৈনারা নির্ভীক-ভাবে হেঁটে নদী পার হচ্ছে।"

জেনারেল তাঁর স্প্রিংএর চশমার ভেতর দিয়ে তার দিকে একবার তাকান এবং পরিষ্কার করে কামানো ওষ্ঠ একবার খোলেন ও বন্ধ করেন। তারপর বলেন তিনি ঃ

"খুব ভালো কথা।"

কিন্তু তাঁর কণ্ঠস্বরে যত আনন্দই প্রকাশ পাক না কেন, রণাঙ্গন থেকে ক্রমাগত কেবল দুঃসংবাদই আসতে থাকে। কুন্দ্রাভিন রেজিমেন্ট নদী পার হবার জায়গায় গিয়ে পরিখায় আশ্রয় নিয়েছে। আট নম্বর কোম্পানী তখনো মরিয়া হয়ে লড়াই করছে, কিন্তু কোনভাবেই নদী পার হতে পারেনি। মর্টার বাহিনীর অধিনায়ক ক্যাপ্টেন ইসলামবেকভ খবর দেয় যে, তার দুটো মর্টার বিকল হয়ে গেছে এবং আর অল্প কয়েকটা মাত্র গোলা হাতে আছে। উসলস্ক রেজিমেন্টের এক নম্বর ব্যাটেলিয়নের সেনানী কর্নেল বোরোজদিন খবর পাঠায় যে, উন্মুক্ত অরক্ষিত জায়গায় থাকার দরুন দু' নম্বর, তিন নম্বর ও চার নম্বর কোম্পানীকে ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে হচ্ছে; সুতরাং হয় তাকে এগিয়ে গিয়ে উদ্ধত শত্রুকে হটিয়ে দেবার অথবা বনের ধারে সরে আসবার অনুমতি দেওয়া হোক। খামার রক্ষার ভার পড়েছে ছ' নম্বর কোম্পানীর ওপর; তাদের কোন খবরই পাওয়া যাচ্ছে না।

রাত্ত দেড়টার সময় সেনানীদের মন্ত্রণাসভা বসে। জেনারেল দোব্রভ বলেন যে, তিনি নিজে সামনে থেকে তাঁর সৈন্যদের পরিচালনা করবেন, কিন্তু যে পারঘাটাটা দখল করা হয়েছে তার এক ইঞ্চি জায়গাও তিনি ছেড়ে দেবেন না। ঠিক সেই মুহূর্তে খবর আসে যে খামারটা শত্রুপক্ষের দখলে চলে গেছে এবং ছ' নম্বর কোম্পানীর একজন সৈন্যও আর অবশিষ্ট নেই। জেনারেল তাঁর হাতের সাদা রুমালটা চেপে ধরেন এবং চোখ দুটো বোজেন। তাঁর সেনানী মণ্ডলের অধ্যক্ষ কর্নেল স্বেচিন বিশাল কাঁধ দুটো ঈষৎ নাচায়, তার কৃষ্ণ শ্মশ্রুমণ্ডিত শাঁসাল মুখটা রক্তিম করে রুক্ষস্বরে স্পষ্টভাবেই বলে সে ঃ

"আপনাকে তো আমি অনেকবারই বলেছি, মাননীয় জেনারেল সাহেব, নদীর ওপারে ঘাঁটি গাড়তে যাওয়া বিপজ্জনক হবে। নদী পার হতে গিয়ে আমাদের দু'-তিনটে কি চারটে পর্যন্ত ব্যাটেলিয়নও হারাতে হতে পারে, তারপরে যদি খামারটা আবার আমরা দখল করতেও পারি, ওটা রাখা খুবই কষ্টকর হবে।"

"ঐ পারঘাটা আমাদের দরকার: ওটা আমাদের পেতেই হবে এবং ওটা আমরা দখল করব," বলেন জেনারেল। তাঁর নাকের ওপর যে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিয়েছে তা তিনি মুছে ফেলেন। "আসল কথা হল এই যে, ঐ পারঘাটা যদি হাতছাড়া হয় তবে আমার সমগ্র পরিকল্পনা ভেস্তে যায়।"

কর্নেল স্বেচিনের মুখ আরো লাল হয়ে ওঠে। প্রতিবাদের সুরে বলে সেঃ মাননীয় জেনারেল সাহেব, আমাদের গোলন্দাজ বাহিনী যথেষ্ট সাহায্য না পেলে প্রতিপক্ষের কামানের মুখে সৈন্যদের নদী পার হওয়া অসম্ভব— এবং আপনি ভালভাবেই জানেন যে, আমাদের গোলন্দাজদের গোলাবারুদ নেই।"

জেনারেল উত্তর দেনঃ

"উত্তম। তা হলে আমার সৈন্যদের বলে দাও যে, নদীর ওপারে কাঁটা তারে তাদের জন্য সেন্ট জর্জ ক্রুশ ঝুলছে। আমি আমার সৈন্যদের চিনি।"

ইতিহাসের পৃষ্ঠায় চিরদিনের জন্য মুদ্রিত হয়ে থাকার মত এই ক'টি কথা উচ্চারণ করেই জেনারেল উঠে দাঁড়ান এবং তাঁর সোনার স্প্রিংএর চশমা জোড়া পিঠের কাছে নিয়ে খাটো আঙুলগুলি দিয়ে তা ঘোরাতে থাকেন। জানালা দিয়ে মাঠটার দিকে চান তিনি. ভোরের দিকের তরল নীল আভায় দাঁড়িয়ে আছে একটা সিক্ত ভূর্জ বৃক্ষ। এক ঝাঁক চড়াই উড়ে এসে গাছটার বিরলপত্র হাল্কা-সবুজ শাখায় বসে; ব্যস্তভাবে খানিকক্ষণ কিচিরমিচির করে আবার হঠাৎ সেগুলি উড়ে চলে যায়। কুয়াশাচ্ছন্ন মাঠটায় গাছগুলিকে দেখা যাচ্ছে অস্পষ্ট রেখার মত। ইতিমধ্যে সূর্যের স্বর্ণরশ্মিতে গোটা মাঠটা ছেয়ে গেছে।

সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই লড়াই বন্ধ হয়। খামার ও ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনীর বাঁ তীর জার্মানরা দখল করে নিয়েছে। পারঘাটার একটা জায়গা মাত্র এখনো রুশদের হাতে আছে, সেটা হচ্ছে ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনীর ডান পাড়ের ঢালু জায়গাটা। এক নম্বর কোম্পানী তা দখল করে আছে। স্রোতস্বিনীর ওপর দিয়ে সারাদিন ধরে কোনরকমে গুলি চালানো হয়, কিন্তু এটা বেশ স্পষ্টই বোঝা যায় যে, নদীর ওপরের সেতুটা বিধ্বস্ত হওয়ায় স্বপক্ষের সঙ্গে সরাসরি যোগসূত্র বিচ্ছিন্ন হয়েছে এবং তার ফলে উক্ত কোম্পানীর পরিবেষ্টিত হবার আশঙ্কা আছে। মনে হয় একমাত্র বুদ্ধিমানের কাজ হবে যদি সেদিনই রাত্রে জলা-জায়গাটা থেকে সরে আসা যায়।

কিন্তু অপরাহ্নে এক নম্বর ব্যাটেলিয়নের অধিনায়ক কর্নেল বোরোজ্দিন নির্দেশ পায় যে, এক নম্বর কোম্পানীকে সাহায্য করার জন্য সন্ধ্যার পর নদী পার হয়ে সেই জলাভূমিতে গিয়ে পেঁছাতে হবে এবং তার জন্য সে যেন প্রস্তুত থাকে। ক্যাপ্টেন তেৎকিনের প্রতি আদেশ হয়, সে যেন খামারের নিম্ন-দেশে পাঁচ নম্বর ও সাত নম্বর কোম্পানীর সৈন্যদের সমবেত করে এবং পন্টুনের সাহায্যে নদী পার হয়। উসলন্স্ক রেজিমেন্টের তিন নম্বর ব্যাটেলিয়ন

রিজার্ভ রাখা হয়েছিল। তাদের প্রতি আদেশ হয়, যে-সমস্ত কোম্পানী আক্রমণ চালাবে তাদের স্থান যেন তারা গিয়ে অধিকার করে। পোড়া সেতুটার কাছেই নদীর এক জায়গায় জল খুবই কম। কুন্দ্রাভিন রেজিমেন্টের প্রতি আদেশ হয় সেই জায়গা দিয়ে নদী পার হয়ে তারা যেন সোজা আক্রমণ চালায়।

এই আদেশ নড়চড় হবার নয়। পরিকল্পনা পরিষ্কার ঃ ডান পাশ থেকে এক নম্বর ব্যাটেলিয়ন এবং বাঁ পাশ থেকে দু' নম্বর ব্যাটেলিয়ন সাঁড়াশীর ন্যায় আক্রমণ চালিয়ে খামারটা দখল করবে, আর সামনে থেকে আক্রমণ চালাবে কুন্দ্রাভিন আঞ্চলিক রেজিমেন্ট, শত্রুপক্ষের সমস্ত দৃষ্টি ও গোলাগুলি এসে পড়বে তাদের ওপর। ঠিক হয় মাঝ রাতে আক্রমণ শুরু করা হবে। সন্ধ্যার পরই ঝাদভ তার মেশিনগানগুলি নদী পার হবার জায়গায় স্থাপন করে; তারপর যাতে না দেখা যায় সেভাবে সর্বপ্রকার সাবধানতা অবলম্বন করে নৌকাযোগে একটা মেশিনগান সে ছোট একটি দ্বীপে নিয়ে যায়, দ্বীপটার আয়তন একশ' বর্গ ফুটের বেশি হবে না, উইলো গাছের ঝোপে তা ঢাকা। ঝাদভ নিজে এখানে তার মেশিনগান নিয়ে থেকে যায়।

সারাদিনই রুশ কামান থেকে মাঝে মাঝে খামার ও নদীতীরস্থ অগ্রবর্তী জার্মান ঘাঁটিগুলির ওপর গোলা বর্ষিত হয়। নদীর দুই তীরে সময় সময় রাইফেলের গুলির আওয়াজও শুনতে পাওয়া যায়। মাঝ রাতে রুশ সৈন্যরা একেবারে নিঃশব্দে এক সঙ্গে তিন জায়গা দিয়ে নদী পার হতে আরম্ভ করে। শত্রুর দৃষ্টি অন্য দিকে নিবদ্ধ করার উদ্দেশ্যে নদীর প্রায় তিন মাইল উজানে সন্নিবেশিত বেলংসারকোভস্কি রেজিমেন্টের একটা অংশে কামান দাগতে আরম্ভ করে; কিন্তু জার্মানরা একেবারে চুপ, পাল্টা কোন জবাবই দেয় না।

উইলো গাছের জড়ানো শাখার ফাঁক দিয়ে ঝাদভ সৈন্যদের নদী অতিক্রম করা নিবিষ্টচিত্তে লক্ষ্য করে। ডান দিকে বনাকীর্ণ জাহাজের ওপরে নিম্নাকাশে দেখা যাচ্ছে হলদে রংএর স্থির একটা তারা; কালো জলে তার ম্লান প্রতিবিম্বটা কাঁপছে এবং তার ফলে একটা সরু আলোরেখার সৃষ্টি হয়েছে, কালো কালো বস্তু মাঝে মাঝে সেটাকে বিখণ্ডিত করে দিচ্ছে। বালুকাময় চড়াগুলিতে এবং নদীর অগভীর জায়গায় বহু ধাবমান নরদেহ দেখা যাচ্ছে। ঝাদভের একেবারে পাশ দিয়েই জলের ছপাছপ শব্দ করে দশ-বার জন লোক চলে যায়ঃ রাইফেল ও কার্তুজের থলে মাথায় করে এক গলা জল ভেঙে চলেছে তারা। এখানে নদী পার হচ্ছে কুন্দ্রাভিন রেজিমেন্টের সৈন্যরা।

হঠাৎ নদীর অপর তীরে অনেক দূরে আলোর ঝলক দেখা যায়। শোঁ শোঁ শব্দ করে কামানের গোলা উড়ে আসে; নদীর ওপর ধাতব আওয়াজ করে একটার পর একটা শ্র্যাপনেল বিদীর্ণ হতে থাকে। প্রতিটি আলোর ঝলকে দেখা যায় জল থেকে কতগুলি দাড়িওয়ালা সাদা মুখ ওপরের দিকে চেয়ে আছে। লোকের ছুটোছুটিতে নদীর অগভীর জায়গার জল আলোড়িত হয়ে উঠছে।

আবার আর এক ঝাঁক গোলা ছুটে আসে। মানুষগুলি চীৎকার করে ওঠে। আকাশে অনেকগুলি হাউই দেখা দেয়, সেগুলি ফেটে গিয়ে শূন্যে এমন আলো সৃষ্টি করে যে চোখ ঝলসে যায়। এবার রুশ কামান থেকে গোলা ছুটতে থাকে। সংগ্রাম করতে করতে একটা লোক স্রোতের টানে ঝাদভের পায়ের কাছে এসে পড়ে। "আমার মাথা, আমার মাথাটা তারা চুরমার করে দিয়েছে," রুদ্ধশ্বাসে বার বার বলে সে আর উইলো গাছের ডাল আঁকড়ে ধরে।

ঝাদভ দৌড়ে দ্বীপটার আর এক ধারে চলে যায়। দূরে দেখা যাচ্ছে লোক-বোঝাই পন্টুন চলেছে নদীর এক তীর থেকে অপর তীরে। যারা গিয়ে নদীর ওপারে নেমেছে তারা মাঠ দিয়ে দৌড়চ্ছে। আগের দিনের মতই নদী ও পাহাড়ের ওপর, পার হবার জায়গায় চলেছে কামানের গোলার প্রচণ্ড ঝড়, তার শব্দে কান বধির হয়ে যায়, আগুনের ঝলকে চোখ অন্ধ হয়ে আসে। কৃষ্ণ ও পীতাভ ধূমরাশি ও ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত জলস্তম্ভের মধ্যে দলে দলে সৈন্যের ছুটোছুটি ও চীৎকারে মনে হয় নদীর ফুটন্ত জলে বুঝি জীবন্ত কীটসমূহ কিলবিল করছে। যারা ওপারে পৌঁচেছে তার গিয়ে তীরে ওঠে। পশ্চাদ্দিকে ঝাদভের মেশিনগানটা ঘর্ঘর শব্দ করছে। তাদের সামনের দিকে বহু দূরে গিয়ে রুশ কামানের গোলা বিদীর্ণ হচ্ছে। ক্যাপ্টেন তেৎকিনের অধীন দুটি কোম্পানীরই সৈন্যেরা খামারটার ওপর জোর গুলিগোলা বর্ষণ করছে। কুন্দ্রাভিন রেজিমেন্টের যে সেনামুখ বর্শাফলকের মত এগিয়ে গেছে তারা একবার বেয়নেট চার্জের চেষ্টা করে, কিন্তু প্রতিহত হয়ে কাঁটাতারের বেড়ার নিকটে শুয়ে পড়ে। তখন ক্ষীণ স্রোতস্বিনীর তীরস্থ নলখাগড়ার বন থেকে এক নম্বর ব্যাটেলিয়ন বজ্রব্যূহ সৃষ্টি করে আক্রমণ চালায়। জার্মানরা পরিখা থেকে বেরিয়ে পড়ে।

ঝাদভ তার মেশিনগানের পাশে শুয়ে অনবরত কম্পমান হাতলটা শক্ত করে ধরে এবং জার্মান পরিখার পশ্চাদ্দিকস্থ তৃণময় ঢালু জায়গাটার ওপর এমনভাবে গুলিবৃষ্টি করতে থাকে যাতে সেখানকার সবকিছুই ধ্বংস হয়ে যায়। দুজন, তিনজন কি তারও বেশি লোক একত্র হয়ে সেই ঢালু জায়গাটা দিয়ে দৌড়চ্ছে, তারা হোঁচট খায়, কেউ কাত হয়ে পড়ে, কেউ বা পড়ে উপুড় হয়ে।

"আটান্ন ষাট।" গোনে ঝাদভ।

আর একটা দুর্বল লোক দু'হাতে মাথা ধরে উঠে দাঁড়ায় এবং টলতে টলতে ঢালু জায়গাটা দিয়ে যেতে থাকে। ঝাদভ তার মেশিনগানের নলটা ঘুরিয়ে দেয়, লোকটা প্রথমে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে, তারপর ধরাশায়ী হয়। ঝাদভ হিসেব করেঃ "একষট্টি।" হঠাৎ তার চোখের সামনে একটা অসহ্য চোখ-ঝলসান আলোর ঝলক খেলে যায়, মনে হয় সে যেন শূন্যে উঠে গেছে, তার হাতে তীব্র বেদনা।

খামার ও তার সংলগ্ন পরিখাগুলি রুশদের দখলে আসে। প্রায় দু'শ

জার্মান বন্দী হয়। প্রত্যুষে উভয় পক্ষের কামানগুলি স্তব্ধ হয়ে যায়, স্ট্রেচার-বাহকগণ নিহত ও আহত সৈন্যদের নিয়ে আসতে থাকে। এম্বুলেন্সের লোক সেই ক্ষুদ্র দ্বীপটা তল্লাস করতে গিয়ে দেখে একটা উইলো গাছের ভাঙা ডাল-পালার নীচে একটা মেশিনগান উল্টে পড়ে আছে, তারই নিকটে দেখা যাচ্ছে বালুতে অর্ধপ্রোথিত একজন সৈনিকের মৃতদেহ, তার খুলির পেছন দিকটা উড়ে গেছে। দশ গজ দূরে দ্বীপের অপর ধারে ঝাদভ পড়ে আছে, তার পা দুটো রয়েছে জলে। তারা তাকে ধরে তোলে, সে গোঙাতে থাকে। রক্তাক্ত আস্তিনটা থেকে বেরিয়ে পড়েছে একটা রক্তমাখান হাড়।

রণাঙ্গনের হাসপাতালে ঝাদভকে নিয়ে এলে এলিজাবেতা কিয়েভনাকে ডেকে ডাক্তার বলেন:

"তোমার মানুষটিকে তারা নিয়ে এসেছে। তাকে টেবিলের ওপর শোয়াও। তার হাতটা কেটে ফেলতে হবে।"

ঝাদভ অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে আছে: তার সরু নাসা, স্তিমিত চোখ, অধরোষ্ঠ কালো হয়ে গেছে। শার্টটা খুলে ফেলতেই এলিজাবেতা কিয়েভনা তার শুভ্র, প্রশস্ত বক্ষে দেখতে পায় উলকি, দুটো বানর লেজ জড়াজড়ি করে বসে আছে। অস্ত্রোপচারের সময় সে দাঁতে দাঁত চাপে: যন্ত্রণায় মুখটা বিকৃত হয়ে ওঠে তার।

কাটা জায়গাটা ব্যান্ডেজ করা হয়ে গেলে তীব্র যন্ত্রণার যখন একটু উপশম হয় সে তখনি চোখ মেলে। এলিজাবেতা কিয়েভনা তার ওপর ঝুঁকে পড়ে। ঝাদভের মুখ থেকে বেরিয়ে আসে: "একষট্টি।"

পরদিন সকাল পর্যন্ত ঝাদভের এই বিকার অবস্থা থাকে, তারপর সে ঘুমিয়ে পড়ে। এলিজাবেতা কিয়েভনা তাকে ডিভিশনের প্রধান কার্যালয়-সংলগ্ন বড় হাসপাতালে নিয়ে যাবার অনুমতি প্রার্থনা করে।

॥ তেইশ ॥

খাবার ঘরে এসে দাশা টেবিলের ধারে দাঁড়ায়। তার বাবা দ্মিত্রি স্তেপানোভিচ জরুরী তার পেয়ে দুদিন আগে সামারা থেকে এখানে এসেছেন। তিনি ও নিকলাই ইভানোভিচ টেবিলের পাশে নীরবে বসে আছেন। দ্মিত্রি স্তেপানোভিচ পা দুটো আড়াআড়িভাবে রেখে বসেছেন। দাশা তার শালটা গলায় জড়িয়ে বাবার রক্তিম আনন ও অবিন্যস্ত কেশের দিকে তাকায়। নিকলাই ইভানোভিচের দিকে চেয়ে দেখে দাশা, তার মুখখানা বিষাদে-ভরা, চোখের পাতা ফুলে উঠেছে। দাশা নিজেও বসে পড়ে। বাইরে গোধূলির নীল আলোয় আকাশে কাস্তের মত যে উজ্জ্বল, সরু চাঁদটা দেখা যাচ্ছে, জানালা দিয়ে সে তার দিকে চেয়ে থাকে।

দ্মিত্রি স্তেপানোভিচ ধূমপান করছেন, ছাই-এ তাঁর খসখসে ওয়েস্ট-কোটটা একেবারে ছেয়ে গেছে। টেবিলক্লথের ওপর রুটির যে কুচোগুলি পড়েছিল, নিকলাই ইভানোভিচ সেগুলি সযত্নে কুড়িয়ে এক জায়গায় জড় করছেন। অনেকক্ষণ ধরে কারো মুখে কোন কথা নেই। অবশেষে নিকলাই ইভানোভিচ রুদ্ধকণ্ঠে বলেন ঃ

"কাতিয়াকে একা ফেলে রেখে আসাটা ঠিক হয়নি।"

"আপনি থাকুন—আমি যাচ্ছি," উঠে দাঁড়িয়ে বলে দাশা। সে তার দেহে কোন ক্লান্তি বা বেদনা বোধ আর করে না। "বাবা, তুমি এসে দিদিকে আর একটা ইন্‌জেক্‌সন দিয়ে যাও," এই বলে শালটা সে মুখের কাছে টেনে দেয়।

দ্মিত্রি স্তেপানোভিচ জোরে নিঃশ্বাস টানেন এবং সিগারেটের অবশিষ্ট অংশটা কাঁধের ওপর দিয়ে পেছন দিকে ছুড়ে ফেলে দেন। তিনি যেখানে বসেছেন তার চারদিকে মেঝেটা পোড়া সিগারেটের টুকরোয় ভরে গেছে।

"বাবা, আর একটা ইন্‌জেক্‌সন দাও তুমি তাকে, দাও বাবা, দয়া করে দাও!"

নিকলাই ইভানোভিচ তখন উত্তেজিত ও অস্বাভাবিক স্বরে বলে ওঠে ঃ

"ক্যাম্ফর দিয়ে আর তাকে বাঁচান যাবে না, দাশা, তার তো হয়ে এল।"

প্রচণ্ডভাবে তাঁর দিকে ঘুরে দাশা বলে ঃ

"আপনি একথা বলতে পারলেন! পারলেন আপনি! না না, সে মরতে পারে না.. মরতে পারে না সে!..."

নিকলাই ইভানোভিচের পাণ্ডুর মুখখানা সংকুচিত হয়ে যায়। জানালার দিকে মুখ ঘুরিয়ে তিনিও সেই অনন্ত নীলে সরু, উজ্জ্বল এক ফালি চাঁদের দিকে চেয়ে থাকেন।

"উঃ! ভাবতেও পারিনে," বলেন তিনি। "তাকে যদি হারাতে হয়, আমি বাঁচব না"

দাশা আস্তে আস্তে পা ফেলে ড্রইং-রুমটা পার হয়ে যায়, জানালার দিকে তাকায়, বাইরে বিরাজ করছে তুষারহিম, অনন্ত অসীমতা। নিঃশব্দে সে কাতিয়ার শয়নকক্ষে প্রবেশ করে, ঘরে জ্বলছে একটা ক্ষীণ আলো।

ঘরে এক পাশে একটা প্রশস্ত অনুচ্চ শয্যায় বালিশের ওপর দেখা যাচ্ছে আগেরই মত একখানি ছোট, স্থির মুখ, শুষ্ক অনুজ্জ্বল চুল ওপর দিকে টেনে আঁচড়ান, কম্বলের ওপর পড়ে আছে একটি শীর্ণ হাত। শয্যার পাশে দাশা হাঁটুগেড়ে বসে পড়ে। কাতিয়ার শ্বাসপ্রশ্বাস অতি ক্ষীণভাবে বইছে। অনেকক্ষণ বাদে সে নিস্তেজ কণ্ঠে বলে ঃ

"ক'টা বাজে?"

"আটটা, দিদি।"

কাতিয়া একটু দম নিয়ে আবার বিষণ্ণ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে ঃ

"ক'টা বাজে?"

সারা দিন ধরে সে শুধু এই একটা প্রশ্নই করছে। চোখ বুজে পড়ে আছে সে। তার স্বচ্ছপ্রায় মুখখানা শান্ত।...দীর্ঘ পীতাভ গলিপথে নরম গালিচার ওপর দিয়ে সে যুগ যুগ ধরে হেঁটে চলেছে। সমস্ত হলদে, দেয়াল, ছাত, সব কিছু। দক্ষিণে ধূলোকীর্ণ গবাক্ষপথে ওপর থেকে একটা অসহ্য হলদে আলো এসে ভেতরে পড়েছে। বামে রয়েছে অসংখ্য রুদ্ধ দ্বার। সেগুলি উন্মুক্ত করলেই দূরে দেখা যাবে পৃথিবীর শেষ প্রান্ত—অনন্ত গহ্বর। কাতিয়া ধীরে হেঁটে চলে, অত্যন্ত ধীরে, মনে হয় স্বপ্নাবিষ্ট অবস্থায় চলেছে সে, দ্বার ও ধূলোকীর্ণ গবাক্ষগুলি অতিক্রম করে চলে যায় সে। তার সামনে রয়েছে সুদীর্ঘ, মসৃণ গলিপথ, তাতে এসে পড়েছে হলদে আলো। জায়গাটায় গুমসা ভাব, প্রতিটি দ্বার থেকে বেরিয়ে আসছে দুঃসহ যাতনার নিঃশ্বাস। হে ভগবান, কখন এর শেষ হবে? কখন? মুহূর্তেক দাঁড়িয়ে সে কি কান পেতে শুনবে?...লাভ নেই, কিছুই কানে আসে না তার। না, কিছুই নেই। একমাত্র আছে দ্বারসমূহের পশ্চাদ্দিকস্থ অন্ধকারে ঘড়ির পেন্ডুলামের আওয়াজের মত একটা অনুচ্চ অস্পষ্ট টক্-টক্ শব্দ।. উঃ, কি ভয়ঙ্কর!.. যদি কোনরকমে জ্ঞান ফিরে পায় সে. যদি কিছু বলতে পারে, সহজভাবে মানুষের মত একটা কথাও বলবার শক্তি যদি তার হয়

আবার সেই নিস্তেজ ক্ষীণ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে কাতিয়াঃ

"ক'টা বাজে?"

"বারবার একথা জিজ্ঞেস করছিস কেন, দিদি?"

(ও! দাশা তবে এখানে আছে।.) আবার সেই গলিপথের নরম, অস্বস্তিকর গালিচাটা তার পায়ের নীচে মেলে যায়, ধূলিধূসর গবাক্ষপথ দিয়ে আবার সেই দুঃসহ তীব্র আলোটা এসে ভেতরে পড়ে, দূরে ঘড়ির সেই টক্ টক্ আওয়াজ পুনরায় শুনতে পাওয়া যায়।

(না, কিছু শোনা নয়, দেখা নয়, অনুভব করা নয়, শুধু শুয়ে থাকা আর শয্যার সঙ্গে মিশে যাওয়া কতক্ষণে সেই শেষ মুহূর্ত আসবে তার জন্য প্রতীক্ষা করা। কিন্তু দাশার জন্য তা পারা যাবে না, সে আমাকে শান্তিতে চোখ বুজতে দেবে না।...আমার হাত ধরে থাকে সে, চুমো খায়, আর খালি বিড়বিড় বিড়বিড় করে কি বলে।.. আমার এই হাল্কা, শূন্য দেহটায় সে যেন তার নিজের দেহ থেকে কি একটা সঞ্জীবনী শক্তি সঞ্চারিত করে দিচ্ছে।.. অসহ্য! যদি তাকে শুধু একথাটা বোঝাতে পারতাম, আমার মধ্যে এই সঞ্জীবনী শক্তিকে অনুভব করার চাইতে আমার মরা কত সহজ।...সে কেন আমাকে ছেড়ে দেয় না।)

"দিদি, দিদি, তুই কি শুনতে পাচ্ছিস, দিদি, আমি তোকে কত ভালবাসি?"

(সে আমাকে যেতে দেবে না, আমাকে হারালে সে বাঁচবে না।...তা হলে

আমার মরা চলবে না।...ছোট বোনটা আমার বড় একা পড়ে যাবে, একেবারে অনাথ হবে...)

"দাশা !"

"দিদি ?"

"আমি মরব না রে।"

তামাকের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে—তবে তার বাবা আসছেন। তিনি একটু উপুড় হয়ে কাতিয়ার গা থেকে কম্বলটা সরান এবং বুকে একটা ছুঁচ ফুটিয়ে দেন, ছুঁচের ফোঁড়ে সামান্য একটু চিনচিনে ব্যথা হয়। কাতিয়ার শিরায় শিরায় একটা স্নিগ্ধকর তরঙ্গ খেলে যায়। সেই হলদে গলিপথের দু'পাশের দেয়াল কেঁপে উঠে দু'ধারে সরে যেতে থাকে; ভেতরে বয়ে চলে শীতল সমীরণের প্রবাহ। শয্যার আস্তরণের বাইরে কাতিয়ার যে হাতখানি পড়ে আছে দাশা তাকে আস্তে করাঘাত করে, নিজের উষ্ণ অধরোষ্ঠ দিয়ে স্পর্শ করে তা। আর এক মিনিট, তারপরই কাতিয়ার দেহ নিমগ্ন হবে প্রগাঢ় সুষুপ্তিতে। কিন্তু আবার তার দু' চোখের কোন থেকে বেরিয়ে আসে সেই তীব্র হলদে রেখাগুলি, চেয়ে দ্যাখে, আবার তারা, বেড়ে যাচ্ছে ক্রমশ, আবার সেই ভয়ংকর গুমসা গলিপথ..

"দাশা, ও দাশা, আমি সেখানে যেতে চাইনে।"

দাশা জীবন্ত ও সবল। সে বাহু দিয়ে কাতিয়ার মাথাটা জড়িয়ে ধরে নিজের মাথাটা বালিশে রাখে, কাতিয়াকে খুব চেপে ধরে, মনে হয় নিজের একটা দুর্দমনীয় প্রচণ্ড শক্তি দিয়ে, দিদিকে বাঁচাবেই সে।

কিন্তু আবার সেই গলিপথ কাতিয়ার চোখের সামনে দেখা দেয়ঃ তাকে উঠে দু' পায়ে জগদ্দল পাথরের বোঝা নিয়ে টলতে টলতে চলতে হবে সেই গলিপথ দিয়ে। শুতে পারে না সে—দাশা নিশ্চয়ই দু' বাহুতে জড়িয়ে তাকে তুলে ধরবে এবং বলবেঃ "আয় !"

তিন দিন তিন রাত্রি ধরে কাতিয়া এভাবে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করে। সে বুঝতে পারে যে দাশার ঐকান্তিক ইচ্ছাশক্তির জোরেই সে টিকে আছে, দাশা না থাকলে অনেক আগেই তার সমস্ত শক্তি নিঃশেষ হয়ে যেত এবং সে শান্তির ক্রোড়ে ঘুমিয়ে পড়ত।

তৃতীয় দিন সন্ধ্যা থেকে সারা রাত দাশা কাতিয়াকে ছেড়ে কোথাও গেল না। মনে হয় যেন দু' বোন এক হয়ে গেছে, একের বেদনায় অপর কাতর, একের ইচ্ছায় অপর বাঁচে। অবশেষে ভোরের দিকে কাতিয়ার অসম্ভব ঘাম হয় এবং পাশ ফিরে শোয়। তার শ্বাসপ্রশ্বাস ক্ষীণ। দাশা খুব ভয় পেয়ে ছুটে যায় তার বাবাকে ডাকতে; কিন্তু অপেক্ষা করা ছাড়া তাঁর কিছু করবার নেই। ঠিক ছ'টার পর কাতিয়া জোরে নিঃশ্বাস ফেলে এবং ঘুরে পাশ ফিরে শোয়। সংকট কেটে গেছে, জীবনের লক্ষণ দেখা দিয়েছে।

কাতিয়ার শয্যার পার্শ্বে একটা বড় আরাম কেদারায় তিন দিনের মধ্যে দাশাও এই প্রথম ঘুমিয়ে পড়ে। নিকলাই ইভানোভিচ যখন শুনতে পান যে, কাতিয়ার জন্য আর ভয়ের কারণ নেই তখন শ্বশুরকে জড়িয়ে ধরে তিনি একেবারে কেঁদে ফেলেন।

আজ বড় আনন্দের দিন। উজ্জ্বল রোদ উঠেছে এবং উষ্ণ উষ্ণ ভাব। প্রত্যেককেই প্রত্যেকের ভাল লাগছে। ফুলের দোকান থেকে একটা সাদা লাইল্যাক ফুলের গুচ্ছ এনে ড্রইং-রুমে রাখা হয়েছে। দাশার মনে হচ্ছে একটা অন্ধকার ও হিম কালো গহ্বর থেকে কাতিয়াকে সে নিজহাতে টেনে বার করে নিয়ে এসেছে। এখন সে সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করতে পেরেছে যে, পৃথিবীতে জীবনের চেয়ে মূল্যবান আর কিছু নেই।

মে মাসের শেষাশেষি নিকলাই ইভানোভিচ কাতিয়াকে মস্কোর নিকটেই এক পল্লীভবনে নিয়ে রাখেন। দু'দিকে দুটো বারান্দাওয়ালা একটা ছোট কাঠের বাড়ি—একটা বারান্দায় দাঁড়ালে দেখা যায় সাদা ভূর্জবৃক্ষের ঝোপ, তার চঞ্চল সবুজ ছায়াতলে বিচরণ করে চিত্রবিচিত্র গোবৎসের দল; আর একটা বারান্দার সামনে রয়েছে ঢালু মসৃণ, তরঙ্গায়িত প্রান্তর।

প্রতি সন্ধ্যায় দাশা ও নিকলাই ইভানোভিচ পল্লীঅঞ্চলগামী ট্রেন থেকে একটা ক্ষুদ্র স্টেশনে নেমে এক জলাভূমি হেঁটে অতিক্রম করে, যাবার সময় তাদের মাথার চারদিকে অসংখ্য ক্ষুদ্র পতঙ্গ উড়তে থাকে। তারপর তাদের একটা পাহাড়ে গিয়ে উঠতে হয়। সেখানে গিয়েই নিকলাই ইভানোভিচ সাধারণত সূর্যাস্ত দেখার জন্য দাঁড়িয়ে যান; তিনি উচ্ছ্বসিতভাবে বলে ওঠেন ঃ

"বাঃ ! কি সুন্দর !"

সেই প্রায়ান্ধকার হিল্লোলিত প্রান্তরে আছে নানাবিধ শস্যক্ষেত্র, বাদাম গাছের সারি ও ভূর্জবৃক্ষের ঝোপ, তার ওপরে দেখা যায় সন্ধ্যার রক্তিম রাগে রঞ্জিত স্থির, বর্ষণ-অক্ষম পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ। সুদীর্ঘ মেঘমালার স্তরে স্তরে পড়েছে অস্তরাগের ক্ষীণ আভা, একটা সংকীর্ণ নদীর বাঁকে প্রতিফলিত হয় আকাশের লাল মেঘ। নদীর দু'পারে ভেকের দল নানা রকম আওয়াজ করে ডাকতে থাকে। সমতল প্রান্তরে ঘাসের গাদা ও ঘরের চালাগুলিকে দেখা যায় এক একটা কালো উঁচু ঢিবির মত। এক জায়গায় একটা আগুন জ্বলছে। বনের ধার থেকে অনেকক্ষণ ধরে টানা বাঁশী বাজিয়ে একটা ট্রেন বেরিয়ে আসে; সূর্যাস্তের ম্লান আলোযুক্ত পশ্চিমের দিকে ট্রেন সৈন্য নিয়ে যাচ্ছে।

বনের ধারের রাস্তা দিয়ে দাশা ও নিকলাই ইভানোভিচ সেই বাড়ির কাছে গিয়ে হাজির হন এবং বারান্দার কাচের শার্সি দিয়ে দেখতে পান খাবার-টেবিল পাতা রয়েছে, তার ওপরে আছে একটা লম্ফ, লম্ফের কাচের গোল আবরণটা তুষারসিক্ত। বাড়ির কুকুর শারিক ঘেউ ঘেউ করে ছুটে বেরিয়ে আসে তাদের সম্বর্ধনা করতে, লেজটা সে অত্যন্ত দ্রুত নাড়ে এবং তারপর আবার ঝোপের

মধ্যে ছুটে গিয়ে অতিথিদের আগমনবার্তা সুনিশ্চিতরূপে বিঘোষিত করে। কাতিয়া বারান্দায় কাচের শার্সির আড়ালে বসে হাতছানি দিয়ে তাদের ডাকতে থাকে; সন্ধ্যার পরে এখনো তার বেরোতে নিষেধ। নিকলাই ইভানোভিচ কাতিয়ার দিকে মুখ করে তার পেছনের ফটকটা বন্ধ করতে করতে বলেন: "কি সুন্দর এই ছোট্ট জায়গাটি, সত্যি চমৎকার!" তারপর তারা সকলে একত্র খেতে বসে এবং স্থানীয় সমস্ত খবর কাতিয়ার কাছ থেকে শোনে: তুশিলো থেকে একটা পাগলা কুকুর এসে কিভাবে কিশকিনের দু'টো মুরগীকে কামড়ে দিয়েছে; ঝিলকিনরা আজই পাশের বাড়িতে চলে গেছে এবং এরই মধ্যে তাদের সামোভার চুরি হয়েছে; রাঁধুনী মাত্রিয়োনা আজো তার ছেলেকে ধরে মেরেছে ইত্যাদি ইত্যাদি।

দাশা নীরবে বসে খায়; সারাদিন শহরে থেকে সে বড় ক্লান্ত হয়ে পড়ে। নিকলাই ইভানোভিচ তাঁর নথিপত্রের বাক্সটা থেকে এক তাড়া খবরের কাগজ টেনে বার করেন এবং দন্তকাঠি দিয়ে দাঁত খুঁচতে খুঁচতে সেগুলি পড়তে থাকেন। কোন খারাপ খবর নজরে পড়লেই তিনি জিভ দিয়ে চুক চুক শব্দ করে ওঠেন এবং কাতিয়া যখন আপত্তি জানিয়ে বলে: "আঃ, নিকলাই, ওরকম কর না!" তখন তিনি থামেন। দাশা বাইরে গিয়ে চাতালে গালে হাত দিয়ে বসে, অন্ধকার মাঠটার দিকে চেয়ে থাকে সে, দেখে এখানে সেখানে আগুন জ্বলছে, আকাশের বুকে ফুটে উঠেছে গ্রীষ্মকালীন তারার স্তবক আর বাতাসে ভেসে আসছে সদ্য জল দেওয়া ফুলের বাগানের গন্ধ।

বারান্দায় বসে নিকলাই ইভানোভিচ তাঁর খবরের কাগজগুলির খস্ খস্ শব্দ করে বলেন:

"আমাদের এবং আঁতাতে আমাদের যে সমস্ত মিত্র আছে তাদের সম্বল ও সামর্থ্য শীগ্‌গিরই শেষ হয়ে যাবে এবং এজন্যই যুদ্ধ আর খুব বেশিদিন চলতে পারে না।"

কাতিয়া জিজ্ঞেস করে: "একটু দই খাবে?"

"হ্যাঁ, যদি ঠাণ্ডা হয়। সর্বনাশ! কি সর্বনাশ! আমাদের লভফ ও লুবলিন শত্রুর হাতে পড়েছে। কি ভয়ঙ্কর অবস্থা! বিশ্বাসঘাতকেরা যদি আমাদের পেছন থেকে ছোরা মারে তবে আর আমরা লড়াই করব কি করে! এ অসহ্য!"

"নিকলাই, জিভ দিয়ে ওরকম চুক চুক শব্দ কর না।"

"আমাকে একা থাকতে দাও! আমাদের যদি ওয়ারস'ও হারাতে হয় তবে আর আমরা বেঁচে থাকব কোন্ মুখে! সত্যি সময় সময় আমার মনে হয় এর চাইতে কোন রকমের একটা সন্ধি করে পিতার্সবুর্গের বিরুদ্ধে আমাদের সঙ্গীন তুলে ধরাই ভাল।"

দূর থেকে একটা ট্রেনের বাঁশীর আওয়াজ তাদের কানে আসে; যে সংকীর্ণ নদীর জলে তারা একটু আগেই সন্ধ্যার রক্তিম আকাশের প্রতিবিম্ব দেখতে

পেরেছিল সেই নদীতে একটা সেতুর ওপর ঘর্ঘর করে ট্রেনটা এসে ওঠেঃ খুব সম্ভব রণাঙ্গন থেকে আহত সৈন্য নিয়ে ট্রেনটা মস্কোতে এল। নিকলাই ইভানোভিচ আবার তাঁর কাগজগুলির খস্‌খস্‌ শব্দ করে বলেনঃ

"রাইফেল ছাড়াই দলে দলে সৈন্য রণাঙ্গনে পাঠান হচ্ছে; তারা গিয়ে ছড়ি নিয়ে পরিখায় বসে, আর কোন অস্ত্রই তাদের কাছে থাকে না। পাঁচজনে একটা করে রাইফেল। ছড়ি নিয়ে তারা এই ভেবে পরিখা থেকে ওঠে যে, একজন যখন ধরাশায়ী হবে তখন পরের লোকটি তার রাইফেলটা পেয়ে যাবে। হায় ভগবান, কি অবস্থা!..."

দাশা তখন চাতাল ছেড়ে এসে কাটা-দরজার মাথায় হেলান দিয়ে দাঁড়ায়। বেড়ায় যে সমস্ত আগাছা রয়েছে তার চকচকে পাতাগুলি ও রাস্তার ওপরে বারান্দার আলো এসে পড়েছে। মাত্রিয়োনার ছেলে পেৎকা মাথা নীচু করে খালি পায়ে ধুলোয় লাথি মারতে মারতে নিতান্ত অনিচ্ছায় দাশার পাশ দিয়ে চলে যায়, তার অবস্থা শোচনীয়। রান্নাঘরে যাওয়া, মার হাতে বেদম প্রহার খাওয়া এবং তারপর শুয়ে পড়া, এছাড়া আর কিই বা তার করবার আছে!

দাশা ফটকের বাইরে গিয়ে হাঁটতে হাঁটতে খিমকা নদীর দিকে চলে যায়। সেখানে অন্ধকারে নদীর ঢালু পাড়ে কান পেতে সে শোনে কোথায় একটা ঝরণার কল্‌কল্‌ শব্দ; নিঝুম রাত না হলে সে-শব্দ কানে আসে না। শুকনো পাড় থেকে এক খণ্ড মাটি গড়িয়ে নদীতে পড়ে এবং খানিকটা জল ছিটকে ওঠে। চারদিকের গাছগুলি দাঁড়িয়ে আছে নিশ্চল নিস্পন্দ অবস্থায়—হঠাৎ তাদের পাতাগুলি একবার ঘুমের ঘোরে মর্মর করে ওঠে—তারপরই আবার সব নিস্তব্ধ। "কবে, কবে, ওগো কবে?" দাশা মৃদুস্বরে বলে আর নিজের আঙুলটা মটকায়।

জুন মাসের গোড়ার দিকে একটা ছুটির দিনে দাশা খুব প্রত্যূষে ঘুম থেকে ওঠে। কাতিয়ার নিদ্রার ব্যাঘাত না হয় সেজন্য সে রান্নাঘরে মুখ ধুতে যায়। টেবিলের ওপর একরাশি তরিতরকারী আর তার ওপরে দেখা যাচ্ছে অদ্ভুত ধরনের একটা সবুজ পোস্টকার্ড—শব্জীওয়ালাই ডাকঘর থেকে খবরের কাগজের সঙ্গে সেটা কিনে থাকবে। মাত্রিয়োনার ছেলে পেৎকা দোরের সিঁড়ির ওপর বসে আছে; সে হাঁপাচ্ছে এবং লাঠির সঙ্গে একটা মুরগীর পা বাঁধবার চেষ্টা করছে। মাত্রিয়োনা একটা ফুলগাছের শাখায় জলাধারটা ঝুলিয়ে দেয়, দাশা একটা মৃৎপাত্রে খানিকটা নদীর জল ঢালে, শেমিজের ফিতে কাঁধ থেকে খুলে ফেলে এবং সেই পোস্টকার্ডটার দিকে আবার তাকায়। ভেজা আঙুলে অতি আলগোছে সে পোস্টকার্ডটা তুলে আনে এবং পড়তে থাকেঃ

'প্রিয় দাশা, আমি আমার একখানা চিঠিরও উত্তর পাইনি, এজন্য বড়ই উদ্বেগে আছিঃ চিঠিগুলি কি তোমার হাতে পৌঁছায়নি?'

সহসা দাশা একটা চেয়ারে বসে পড়ে; তার চোখ দুটো জলে ঝাপসা হয়ে ওঠে এবং পা দুটো অবশ হয়ে আসে।...

'আমার ক্ষত এখন সম্পূর্ণ শুকিয়ে গেছে। আমি আজকাল প্রত্যহই ব্যায়াম করি এবং মোটামুটি ভালই আছি বলা চলে। আমি ইংরাজী ও ফরাসী ভাষা শিখছি। আমার ভালবাসা জানবে ও চুম্বন নেবে, অবশ্য আমাকে যদি তুমি ভুলে না গিয়ে থাক।—ইভান তেলেগিন।'

দাশা তার শেমিজের ফিতে আবার কাঁধে পরিয়ে দেয় এবং কার্ডটা দ্বিতীয়-বার পড়ে। "আমাকে যদি তুমি ভুলে না গিয়ে থাক!" লাফিয়ে উঠে ছুটে যায় সে কাতিয়ার শোবার ঘরে, জানালার ছাপা পর্দা চট করে সরিয়ে দেয়।

"পড়, দিদি, জোরে পড়!"

কাতিয়া একেবারে হকচকিয়ে যায়। সে কিছু বলার আগেই দাশা বিছানার ধারে বসে পড়ে এবং নিজেই চিঠিটা পড়ে শোনায়, সংগে সংগে আর একবার সে লাফিয়ে ওঠে ও হাততালি দেয়।

"দিদি, দিদি, কি ভয়ানক কথা বল তো!"

"কেন, দাশা, সে যে বেঁচে আছে এই তো ঢের। এর চেয়ে আর বড় আনন্দের কথা কি হতে পারে রে!"

"আমি তাকে ভালবাসি! ও ভগবান, কি করব আমি তাহলে? কবে? কবে এ যুদ্ধের শেষ হবে, বল, দিদি?"

পোস্টকার্ডটা দিদির হাত থেকে কেড়ে নিয়ে দাশা ছুটে নিকলাই ইভানোভিচেব কাছে যায়। তাঁকে সেটা পড়ে শোনাবার পর দাশা প্রায় বায়না ধরেই বসে যে, তাকে বলতেই হবে কবে এ যুদ্ধ শেষ হবে।

"কিন্তু সেকথা কি কেউ বলতে পারে, বোন!"

"তাহলে আপনাদের ঐ বোগাস মিউনিসিপ্যাল লীগ-এ আপনারা করছেন কি? সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত বসে কেবল বাজে বকাই হচ্ছে আপনাদের কাজ। প্রধান সেনাপতির সংগে দেখা করার জন্যে আমি এক্ষুনি মস্কো চলে যাচ্ছি। .আমি তাঁর কাছে দাবী করব ."

"কি দাবী করবে তুমি তাঁর কাছে?.. ধৈর্য ধর, দাশা, আর সকলের মত তুমিও একটু ধৈর্য ধর।"

কয়েকদিন দাশাকে বড় অস্থির দেখা যায়, বুঝে উঠতে পারে না সে কি কববে, তারপব ঠাণ্ডা হয়ে আসে, মনে হয় তাব ভেতরের আগুনটা যেন নিভে গেছে। সন্ধ্যার দিকে দেরি না করেই তার ঘরে ঢোকে সে, সেখানে বসে ইভান ইলিয়িচকে চিঠি লিখে, তার জন্য পার্সেল বাঁধে ও তার ওপর কাপড় মুড়ে সেলাই করে দেয়। কাতিয়া তেলেগিন সম্পর্কে কিছু বললে দাশা তার বড় একটা জবাব দেয় না; সন্ধ্যা বেলা আর বেড়াতে বেরোয় না সে, সেলাই অথবা পড়া নিয়ে অধিকাংশ সময়ই সে কাতিয়ার পাশে বসে কাটায়। সে তার সমস্ত আবেগকে যেন হৃদয়ের অন্তরালে চাপা দিয়ে রাখতে চায়; নিত্যনৈমিত্তিক কাজের কঠিন বর্মে নিজেকে ঢেকে রাখবার চেষ্টা করে সে।

কাতিয়া সেই গ্রীষ্মেই সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করলেও দাশারই মত

তারও মনে স্ফূর্তি নেই, কেমন যেন অসাড়, নিস্তেজ ভাব তার। প্রায়ই দু'বোনে বলাবলি করে, তাদের ওপর যেন জগদ্দল পাষাণ চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। কেবল তাদেরই নয়, আজ প্রায় সকলেরই এ অবস্থা। ঘুম থেকে ওঠা, চলাফেরা করা, কিছু ভাবা, লোকের সঙ্গে মেলামেশা করা, সবই যেন অনিচ্ছায় জোর করে করতে হয়; মনে হয় কতক্ষণে রাত আসবে এবং ক্লান্ত দেহটাকে বিছানায় এলিয়ে দেবে। ঘুমিয়ে পড়া এবং সব কিছু ভুলে যাওয়াতেই তাদের একমাত্র আনন্দ। আগের দিন রাত্রে ঝিলকিনরা নতুন তৈরি মোরব্বা চেখে দেখবার জন্য তাদের বন্ধু-বান্ধবদের নিমন্ত্রণ করেছিল। তারা সবে চা খেতে বসেছে, এমন সময় এল খবরের কাগজ। কাগজে দেখা গেল, যুদ্ধে নিহত ব্যক্তিদের নামের তালিকায় ঝিলকিনের ভাইয়ের নামও আছে। নিমন্ত্রণ-কারীরা বাড়ির ভেতরে চলে গেল, অতিথিরা গোধূলির ম্লান আলোতে বারান্দায় খানিকক্ষণ বসে থেকে নীরবে যে যার বাড়ির দিকে রওনা হল। এই রকমই অবস্থা সর্বত্র।

জিনিস ক্রমশই মাগ্‌গি হয়ে উঠছে। ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত, অন্ধকার। ওয়ারশ' শত্রুর হাতে পড়েছে। ব্রেস্ত লিতভস্ক কামানের গোলায় বিধ্বস্ত, তা ছেড়ে দিয়ে চলে আসা হয়েছে। সর্বত্র গুপ্তচর ধরা পড়ছে।

খিমকা নদীর তীরে একটা সংকীর্ণ গিরিসংকটে এসে আশ্রয় নিয়েছে একদল দস্যু। এক সপ্তাহ ধরে কেউ আর বনের ভেতর দিয়ে যেতে সাহস করে না। অবশেষে পুলিশ এসে দস্যুদের সেই গিরিসঙ্কট থেকে বিতাড়িত করে; দু'জন ধরা পড়ে, তৃতীয়জন পালায়, শোনা যায় সে জভেনিগোরদ জেলায় চলে গেছে।

•

একদিন সকালবেলা একজন গাড়োয়ান অত্যন্ত দ্রুতগতিতে একটা ঘোড়ার গাড়ী চালিয়ে স্মোকোভনিকভদের কুটীরের অদূরে একটা খোলা জায়গায় এসে দাঁড়ায়। ঘোড়াকে মারবার জন্য তার হাতের চাবুকটা উদ্যত। গ্রামের মেয়ে ও বালকবালিকার দল এবং চাকরচাকরাণীরা চারদিক থেকে ছুটে এসে গাড়ীটাকে ঘিরে দাঁড়ায়। নিশ্চয়ই নতুন একটা কিছু ঘটে থাকবে। গ্রীষ্মকালে যারা বেড়াতে এসেছে তাদেরও অনেকে ছুটে আসে তাদের বাগানবাড়ি থেকে কি হয়েছে তা জানবার জন্য। মাত্রিয়োনা তার জামার খুঁটে হাত মুছতে মুছতে বাগানের পথ ধরে ছুটে আসে। গাড়োয়ান খুব উত্তেজিত, মুখটা তার আগুনের মত লাল হয়ে গেছে। তখনো গাড়ীর ওপর দাঁড়িয়ে আছে সে। সেই অবস্থায়ই সে বলতে থাকে ঃ

"...অফিস থেকে তাকে তারা টেনে বার করে শূন্যে ছুড়ে মারে, আবার তুলে ধরে পথের শানে আছাড় দেয়, তারপর একেবারে মস্কোভা নদীতে। কারখানায় আরো পাঁচটা জার্মান লুকিয়ে ছিল।...তিনটাকে খুঁজে বার করা

হয়, কিন্তু পুলিশ এসে তাদের ছাড়িয়ে নিয়ে যায়; না হলে ঐ তিনটারও গতি হত ঠিক ঐরকম নদীর জলে।...লুবিয়ানস্কায়া স্কোয়ারের চারদিকে শান-বাঁধানো পথ ভরে গেছে রেশমী কাপড় ও মখমলে। সারা শহরে চলেছে লুট।... সর্বত্র লোকের মাথা লোকে খায়।..."

লাগাম দিয়ে খুব কষে ঘা মারে সে তার বলিষ্ঠ কালো ঘোড়াটাকে, গাড়ীর দীর্ঘ, বাঁকা কাষ্ঠদণ্ড দুটোর মধ্যে বসে পড়েছিল সেটা। "চালাকী খাটবে না, বাবা।" কষে মারে সে আর এক ঘা। ঘোড়াটা একবার নাসা দিয়ে শব্দ করে, মুখ দিয়ে খানিকটা ফেনা বেরিয়ে আসে সেটার, তারপর সে রাস্তা দিয়ে জোর কদমে ছুটে চলে গাড়ীটা নিয়ে গ্রাম্য সরাইর দিকে।

দাশা ও নিকলাই ইভানোভিচ তখন মস্কোতে। সেদিকে একটা কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলী আকাশে উঠতে দেখা যায়। ধূসর, তপ্ত, ঘোলাটে আকাশে সেটা মেঘের মত ছড়িয়ে পড়ে। গ্রামের ভ্রমণোদ্যান থেকেই পরিষ্কার আগুন দেখতে পাওয়া যায়; গ্রামবাসীরা দলে দলে দাঁড়িয়ে তা দেখছে। গরমের সময় যারা এখানে বেড়াতে এসেছে তাদের মধ্যে কয়েকজন যখন সেখানে উপস্থিত হয় তখন গ্রামবাসীদের আলোচনা বন্ধ হয়ে যায়; ভদ্রলোকদের দিকে তারা এমনভাবে তাকায় যাতে আছে বিদ্রূপ ও একটা অদ্ভুত রকমের প্রত্যাশা। খালি-মাথায় ও ছেঁড়া জামা গায়ে একটা হোঁৎকা লোক ইষ্টকনির্মিত ছোট গীর্জাটার সিঁড়ির ওপর হঠাৎ উঠে চীৎকার করে বলেঃ

"মস্কোতে তারা দিচ্ছে সমস্ত জার্মানকে শেষ করে!"

তার মুখ থেকে কথাগুলি বেরোবার সংগে সংগেই একটি গর্ভবতী রমণী কি বলে ওঠে এবং জনতা গীর্জার দিকে এগিয়ে যায়। কাতিয়াও তাদের সংগে দৌড়য়। লোকগুলি চঞ্চল ও মুখর।

"ওয়ারশ' স্টেশন পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে, জার্মানরা তাতে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে।"

"দু'হাজার জার্মান নিহত হয়েছে।"

"দু'হাজার নয়—ছ'হাজার! তাদের নদীতে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়েছে!"

"জার্মানদের দিয়ে তারা শুরু করেছে, এখন ধরেছে সবাইকে। শুনছি কুজনেৎস্কিমস্ত্* একেবারে সাফ।"

"আচ্ছা শিক্ষা হয়েছে বেটাদের। হারামজাদারা অনেকদিন ধরে মুনাফা লুঠছিল, আমাদের রক্ত শুষে খাচ্ছিল!"

"লোক সহজে থামবে না!"

"পেত্রভ্স্কি পার্কে, বুঝলে—আমার বোন এইমাত্র সেখান থেকে এল—পার্কের একটা বাড়িতে একটা বেতার যন্ত্র! মাইরি, একটুও বাড়িয়ে বলছি না

* মস্কোর একটি রাস্তা। সেখানে বিদেশীদের সব বড় বড় দোকান ছিল।

আমি। কি বলব? তার সঙ্গে নকল দাড়ি-পরা দু'টো গোয়েন্দা—সঙ্গে সঙ্গেই, ব্যস, একেবারে সেখানেই সাবাড়।"

"বাগানবাড়িগুলি সবই একবার তল্লাস করে দেখা উচিত, বিশ্বাস কি!"

তারপর দেখা যায়, পাহাড়ের পাদদেশে নদীর পাড় ধরে যে-রাস্তাটা মস্কোর দিকে চলে গেছে সেটা দিয়ে একদল মেয়ে খালি বস্তা নিয়ে ছুটতে ছুটতে আসছে। তাদের পেছনে লোক হল্লা করতে থাকে। তারা ঘুরে দাঁড়ায় এবং হাসতে হাসতে হাতের বস্তাগুলি আন্দোলিত করে। পাশেই একটা লম্বা লাঠি হাতে দাঁড়িয়েছিল ভারিক্কী চেহারার একজন বর্ষীয়ান কৃষক; কাতিয়া তাকে জিজ্ঞেস করেঃ

"ঐসব মেয়ের দল কোথায় যাচ্ছে?"

"লুঠ করতে।"

অবশেষে সন্ধ্যা ছটায় দাশা ও নিকলাই ইভানোভিচ একটা গাড়ীতে করে শহর থেকে এখানে এসে পোঁছে। উভয়েই বেশ উত্তেজিত, একে অপরের কথায় বাধা দিয়ে বিবরণ দিতে থাকে, কিভাবে সমগ্র মস্কো শহরের লোক দলে দলে ভীড় করে যে-সমস্ত বাড়িতে জার্মানরা বাস করত সেগুলি ও জার্মান দোকানসমূহ তছনছ করছে। কোন কোন বাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। জামার দোকান ম্যান্ডেল্‌স্ শপ ফাঁকা হয়ে গেছে। কুজনেৎস্কি মস্ত্-এর বেকার পিয়ানোর দোকানটা ভেঙ্গে চুরমার; তেতলা থেকে জানালা দিয়ে পিয়ানোগুলি ছুড়ে ছুড়ে ফেলে দেওয়া হয়েছে, সেগুলি কুড়িয়ে এক জায়গায় রাখা হয়েছে আগুন লাগাবার জন্য। লুবিয়ানস্কায়া স্কোয়ার ওষুধ ও ভাঙ্গা কাচের টুকরোয় ভরে গেছে। শোনা যায়, কিছু লোক নিহতও হয়েছে। অপরাহ্ণে টহলদার বাহিনী আসে এবং লোকের ভীড় ভেঙে দেয়। এখন সব শান্ত।

"অবশ্য, এগুলি বর্বরতা," উত্তেজনাব মুখে কটাক্ষ করে বলেন নিকলাই ইভানোভিচ। "তবে লোকের এই জীবন্ত ভাব, তাদের এই শক্তি আমি পছন্দ করি। আজ তারা জার্মান দোকানগুলি ভাঙছে, কালই হযতো দেখা যাবে তারা ব্যারিকেড নির্মাণ করছে। সরকার ইচ্ছে করেই তাদের এসমস্ত করতে দিয়েছে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি তোমাদের নিশ্চয় করেই বলতে পারি যে, লোক যাতে তাদের ক্রোধ প্রকাশের একটা সুযোগ পায় তারই জন্য সরকার এ করেছে। তবে কথা কি জান, এসমস্ত করে লোক আরো গুরুতর রকমের একটা কিছু করার পথ পেয়ে যাবে। এ হল হাতেখড়ি, বুঝলে!"

সে-রাত্রেই ঝিলকিনদের ভূগর্ভস্থ ভান্ডার থেকে সমস্ত অপহৃত হয় এবং স্বেচনিকভদের চিলেঘর থেকে ওয়াশিংটা চুরি হয়ে যায়। সরাইতে সারা রাত ধরে আলো জ্বলে। এমন কি এক সপ্তাহ পরেও গ্রামে লোককে কানাকানি করতে দেখা যায়, গ্রীষ্মে যারা এখানে এসেছে তারা বেড়াতে বেরুলেই গ্রাম-বাসীরা কিরকম সন্দেহের দৃষ্টিতে তাদের দিকে তাকায়।

আগস্টের প্রথম দিকেই স্মোকোভনিকভরা শহরে চলে যায় এবং কাতিয়া আবার হাসপাতালে তার সেই কাজ নেয়। শরৎকালে পোলান্ড থেকে বহু শরণার্থী এসে মস্কো শহরে ভীড় করে। পেত্রভকা, কুজনেৎস্কি মস্ত, ভেরস্কায়া প্রভৃতি বড় বড় রাস্তায় ভীড়ের জন্য চলাই কঠিন হয়ে পড়ে। দোকান, রেস্তোরাঁ, থিয়েটার সর্বত্র লোকের ভীড় এবং সব জায়গায়ই একটা নতুন কথা শুনতে পাওয়া যায়ঃ "আপনার দয়া চাই!"

এই সমস্ত ব্যস্ততা ও বিলাসিতা—জনাকীর্ণ থিয়েটার ও হোটেল, বিজলী বাতিতে উজ্জ্বল, মুখর রাস্তাসমূহ রক্ষা করছে এক কোটি বিশ লক্ষ সৈন্যের এক জীবন্ত প্রাচীর যার অসংখ্য ক্ষত ঝরে পড়ছে শোণিতের ধারা।

তৎসত্ত্বেও সামরিক পরিস্থিতি ক্রমশই খারাপের দিকে যাচ্ছে। রণাঙ্গনে ও তার পৃষ্ঠদেশে অর্থাৎ সর্বত্রই রাসপুতিনের কুপ্রভাব ও বিশ্বাসঘাতকতার কথা আলোচিত হচ্ছে; সবারই মুখে এক কথা যে সেন্ট নিকলাসের কাছ থেকে কোন দৈববল পাওয়া না গেলে আর বেশিদিন যুদ্ধ চালান সম্ভব হবে না।

এভাবে যখন সকলের নৈরাশ্য দেখা দিয়েছে ও মনোবল ভেঙে পড়েছে ঠিক সেই সময় খবর এল জেনারেল রুজস্কি একটা খণ্ডযুদ্ধে অপ্রত্যাশিতভাবে জার্মান বাহিনীর অগ্রগতি প্রতিহত করেছেন।

॥ চব্বিশ ॥

শরৎকালের গোধূলিতে সাগরতীরে ঈশান কোন থেকে শোঁ-শোঁ করে বাতাস বইছে। বাতাসে নিষ্পত্র পপলার গাছগুলি নুয়ে পড়ছে আর পাহাড়ের ওপরে কাঠের গম্বুজওয়ালা পুরনো বাড়িটার জানালার ফ্রেমগুলি খটাখট শব্দ করছে। ছাতের গায়ে লেগে বাতাসের এমন শব্দ হচ্ছে, মনে হয় যেন টিনের চালের ওপর দিয়ে একটা ভারী লোক হেঁটে যাচ্ছে। চিমনী-গুলির ভেতরে বাতাস চলে যাচ্ছে, দোরের নীচ দিয়ে বাতাস ঢুকছে, কোন ছিদ্র বা ফাঁক পেলেই তা দিয়ে হু হু করে বাতাস প্রবেশ করছে।

বাড়ির জানলা দিয়ে দেখা যায়, কালো মাটিতে উন্মুক্ত গোলাপের ঝাড়-গুলি হাওয়ায় লুটোপুটি খাচ্ছে আর আলুথালু মেঘ বাত্যাবিক্ষুব্ধ বিশাল সাগরের ওপর দিয়ে উড়ে চলেছে।

গোটা বাড়িতে ত্রিতলে একমাত্র বাসযোগ্য যে ঘরখানি আছে তাতে একটি নড়বড়ে সোফায় বসে আছে আরকাদি ঝাদভ। তার এক সময়কার কায়দাদুরস্ত রোমীয় পোশাকের আস্তিনটা এখন গোঁজা রয়েছে কোমরবন্ধের তলায়। চোখের পাতাগুলি তার স্ফীত, তবে মুখ পরিষ্কার করে কামানো, টেড়িটা নিপুণভাবেই কাটা এবং কেশ সুবিন্যস্ত। তার দু'গালেরই নিম্নদেশে খানিকটা করে মাংস কঠিন হয়ে উঠেছে, সেই মাংসপিণ্ড দু'টো সর্বদাই নড়ে। চোখ দু'টো ছোট

করে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে সে লাল সুরা পান করছে। পুরনো বাড়িটার মদের ভাণ্ডারে যা অবশিষ্ট ছিল তা থেকেই এই মদ এনে তাকে দেওয়া হয়েছে। সোফাটার আর এক প্রান্তে বসে আছে এলিজাবেতা কিয়েভনা। তার মুখে মৃদু হাসি। সেও মদ খাচ্ছে আর ধূমপান করছে। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কিভাবে চুপ করে থাকতে হয়, পুরনো বাড়ি কাবেরনেৎ-এর ছ' সাত বোতল মদ উদরে ঢালবার পর সে যখন তার ভাবগুলি ব্যাখ্যা করতে থাকে তখন 'নীরবে' বসে কিভাবে তা মনোযোগ দিয়ে শুনতে হয়, এলিজাবেতা কিয়েভনাকে এসমস্ত ঝাদভ শিখিয়েছে। যুদ্ধ এবং এই অর্ধভগ্ন বাড়ি 'চাতু কাবেরনেৎ'-এ বুভুক্ষু জীবন যাপনের ফলে ঝাদভের মাথায় অনেক উৎকট ভাব এসে জমেছে। তার পিতার মৃত্যুর পর সে একমাত্র সম্পত্তি পায় ছয় একর দ্রাক্ষাক্ষেত্রযুক্ত এই পুরনো বাড়িটা।

ছ' মাস আগে রণাঙ্গনের পশ্চাদ্দেশে একটা হাসপাতালে একদিন রাত্রে কাটা হাতটার যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে ঝাদভ ক্রুদ্ধ কর্কশ ও অপমান-সূচক কণ্ঠে এলিজাবেতা কিয়েভনাকে বলেছিল:

"আমাকে সারারাত জাগিয়ে না রেখে, ওভাবে প্রণয়কাতর চোখে আমার দিকে চেয়ে না থেকে আগামীকাল একজন পাদ্রী ডেকে এই লেঠা চুকিয়ে ফেললেই তো ভাল হয়।"

এলিজাবেতা কিয়েভনার মুখখানা একেবারে বিবর্ণ হয়ে যায়; মাথা নেড়ে সে সায় দেয়। হাসপাতালেই তারা বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হয়। ডিসেম্বর মাসে ঝাদভকে মস্কোতে এনে আর একবার তার দেহে অস্ত্রোপচার করা হয়। তারপর বসন্তকাল আসতে না আসতেই সে ও এলিজাবেতা কিয়েভনা আনাপাতে এসে 'চাতু কাবেরনেৎ'-এ বাস করতে থাকে। ঝাদভের কোন রোজগার নেই, পুরণো আসবাব ও তৈজসপত্র বেচে আহার সংগ্রহ করে। তবে মদ প্রচুর আছে। 'কাবেরনেৎ'-এর দ্রাক্ষামদিরা, যুদ্ধের সময় বেশ সুস্বাদু হয়ে উঠেছে।

অসংখ্য পাখী এসে বাসা বেঁধেছে এই পুরণো ভাঙ্গাচোরা বাড়িটায়। শূন্য পুরীতে দীর্ঘ অলস জীবনযাপন করছে তারা। একই কথার পুনরাবৃত্তি করে দুজনে। ভবিষ্যৎ ফাঁকা। মনে হয়, দুজনের সামনে একটা দ্বার যেন চিরতরে রুদ্ধ হয়ে গেছে।

এলিজাবেতা কিয়েভনা চেষ্টা করে তার নিজের সত্তা দিয়ে এই দুর্বহ দীর্ঘ দিনের রিক্ততাকে ভরে দিতে, কিন্তু পারে না সে: ঝাদভকে খুশি করতে গিয়ে সে নিজে আরো হাস্যাস্পদ হয়ে ওঠে, তার অক্ষমতা আরো ধরা পড়ে যায়, ব্যাপারটা বিসদৃশ হয়ে দাঁড়ায়। তার ব্যর্থতা নিয়ে তাকে খোঁচা দিয়ে কথা বলে ঝাদভ; হতাশ প্রাণে সে উপলব্ধি করে, মন তার যতই উদার হোক না, আসলে নারী-জীবনে সে বড় অভিমানী ও অত্যন্ত অসুখী। তার এই জীবনে আছে কঠোর দারিদ্র্য, অপমান, অসহ্য একঘেয়েমি, একান্ত পতি-

পরায়ণতা, নিত্য নিরানন্দ; তবু এই জীবনের পরিবর্তে আর অন্য কিছুই তার কাম্য নেই।

শূন্য সাগরতীরে শরতের প্রবল বায়ুপ্রবাহ শেষ হতে আর বেশিদিন দেরি নেই। এই সময় ঝাদভের মেজাজটা অসম্ভব তিরিক্ষি হয়ে ওঠে। খোঁচা খেয়ে এলিজাবেতা কিয়েভনা যদি সামান্য একটু ফোঁস করেও ওঠে কখনো, তবে আর রক্ষা নেই, ঝাদভ একেবারে রুদ্রমূর্তি ধারণ করে এবং দাঁতমুখ খিঁচিয়ে যা তা বলে তাকে। এলিজাবেতা কিয়েভনা ভয়ে আর কিছু বলে না; অত্যন্ত মর্মাহত হয় সে এবং রাগে তার গা জ্বলে যায়। কিন্তু ঝাদভের শীর্ণ, সুন্দর মুখখানা থেকে একবারও চোখ ফেরায় না সে, বসে ঘন্টার পর ঘন্টা প্রলাপ শোনে তার।

ইটোখিলান ভূগর্ভস্থ ভান্ডার থেকে মদ আনার জন্য কিয়েভনাকে সে প্রায়ই পাঠায়। সেখানে বহু মাকড়সার বাস। একটা পিপের সামনে বসে এলিজাবেতা কিয়েভনা মাটির কুঁজোয় লাল সুরার যে ধারা পড়ছে তার দিকে চেয়ে থাকে আর কত কি ভাবে। একটা তিক্তমধুর চিন্তা মাথায় আসে তার। কল্পনায় সে দেখতে পায়, একদিন এই ভূগর্ভস্থ ভান্ডারে আর্কাদি তাকে হত্যা করে একটা পিপের তলায় ফেলে রাখবে। অনেক শীতের রাত কেটে যাবে। তারপর একদিন একটা মোমবাতি জ্বেলে সে এখানে এই মাকড়সার রাজত্বে নেমে আসবে। সে এসে একটা পিপের সামনে বসবে এবং এখন সে যেমন দেখছে ঠিক তেমনিভাবে সেও লাল মদের ধারার দিকে চেয়ে থাকবে। হঠাৎ সে ডেকে উঠবে, "লিজা!" কিন্তু কোন উত্তরই পাবে না—একমাত্র মাকড়সাগুলিই দেয়ালের গায়ে ছুটোছুটি করবে। নিঃসঙ্গতায় ও দুঃসহ মনস্তাপে তার জীবনে এই প্রথম সে কেঁদে উঠবে। কল্পনায় একথা ভেবে এলিজাবেতা কিয়েভনা যেন তার সমস্ত অপমানের ক্ষতিপূরণ পেয়ে যায়—শেষ পর্যন্ত জয় হবে তারই, ঝাদভের নয়।

ঝড়ের বেগ বেড়ে যায়। এক একটা দমকা হাওয়ায় জানালাগুলি কেঁপে ওঠে, কাচগুলি ঝন্‌ঝন্‌ করে। বাড়ির গম্বুজটায় ধাক্কা খেয়ে বাতাস জানোয়ারের মতো গর্জন করছে, এ গর্জন সারারাত ধরে চলবে। সাগরের ওপরে একটা তারাও দেখা যায় না।

কুঁজোটা ভরবার জন্য এরই মধ্যে এলিজাবেতা কিয়েভনাকে তিনবার সেই ভূগর্ভস্থ ভান্ডারে যেতে হয়েছে। ঝাদফ তখনো নীরব, নিশ্চল অবস্থায় বসে আছে। আজ রাত্রে তার প্রলাপে নিশ্চয়ই কিছু বৈশিষ্ট্য থাকবে।

"ঘরে কি দুচ বটে আলুও নেই?" হঠাৎ গলা ফাটিয়ে চীৎকার করে ওঠে ঝাদভ। "তোমার বোধ হয় খেয়ালই নেই যে কাল থেকে আমি না খেয়ে আছি।"

এলিজাবেতা কিয়েভনা অবাক হয়ে যায়। আলু, আলু।..সেই সকাল থেকে নিজের চিন্তায় এমনভাবে ডুবে আছে সে এবং তার প্রতি আর্কাদির

ব্যবহারের কথাটা মনের মধ্যে এমনভাবেই তোলপাড় করছে যে রাত্রের খাওয়ার কথা সে ভুলেই গেছে। সোফা থেকে সে লাফিয়ে ওঠে।

"বোস, নচ্ছার মাগী।" ঝাদভের কণ্ঠে মমতার লেশমাত্র নেই। "জানি আমি যে ঘরে একটা গোটা আলুও নেই। আর কোন্ যোগ্যতা আছে তোর ? পারিস কেবল বোঝার মত বসে আকাশপাতাল ভাবতে।"

"দেখি পড়শীদের কাছে গিয়ে—মদের বদলে যদি রুটি ও কিছু আলু পাওয়া যায়।"

"আমার কথা শেষ হলে তবে যাবে। বোস। অপরাধ করা চলে কিনা এ প্রশ্নের সমাধান আজ আমি চূড়ান্তভাবে করে ফেলেছি।"—ঝাদভের মুখ থেকে একথা শুনে এলিজাবেতা কিয়েভনা শালটা দিয়ে নিজের সর্বাঙ্গ ঢাকে এবং সোফার একটা কোণ চেপে বসে থাকে। "শৈশবেই এই প্রশ্নটা আমার চিন্তার মধ্যে এসে ঢুকেছিল। সচরাচর যেসমস্ত স্ত্রীলোকের সংগে আমার দেখা হতো তারা ভাবত আমি একটা দুর্বৃত্ত এবং সেজন্যই আমার কাছে আত্ম-সমর্পণের জন্য তাদের মধ্যে একটা বিশেষ আগ্রহ দেখা দিত। অপরাধ করার ঔচিত্য অনৌচিত্য সম্পর্কে সমগ্র সমস্যার সমাধান আজই মাত্র আমি করতে পেরেছি।"

হাত বাড়িয়ে গ্লাসটা এনে সে খানিকটা সুরা পান করে এবং একটা সিগারেট ধরায়। "মনে কর শত্রুর অবস্থান থেকে তিনশ' গজ দূরে আমি পরিখায় আছি। বল তো পরিখার পার্শ্বস্থিত মাটির প্রাচীরটার ওপর উঠে শত্রুপক্ষের পরিখার মধ্যে আমি কেন চলে যাব না এবং গিয়ে যাকে খুশি তাকে হত্যা করে যদি কিছু অর্থ, কম্বল, কফি ও তামাক পাই তবে তা কেন নিয়ে আসব না ? আমি যদি নিশ্চিতরূপে জানতে পারি যে তারা আমাকে গুলি করবে না বা করলেও সে-গুলি আমার গায়ে লাগবে না, তাহলে নিশ্চয়ই আমি যাব এবং হত্যা ও লুণ্ঠন করব। সংবাদপত্রগুলি তখন আমার ছবি ছাপবে, আমাকে বীর আখ্যা দেবে। ব্যাপারটা অত্যন্ত পরিষ্কার এবং এর পেছনে যুক্তিও যথেষ্টই আছে। কিন্তু এখন যখন আমি পরিখায় নেই, আছি আনাপার ছ' মাইল দূরে এই 'চাতু কাবেরনেৎ'-এ, তখন একদিন রাত্রে শহরে গিয়ে কোন অলংকারের দোকান ভেঙে আমি কেন যত খুশি সোনা ও জহরৎ নিয়ে আসতে পারব না, আর জহুরী বেটা যদি আমাকে বাধা দিতে আসে তবে তার গলাটাই বা কেন কেটে ফেলব না ?" ঝাদভ তার আঙুলগুলি গলার কাছে নিয়ে কাটার ভঙ্গি করে। "আমি এযাবৎ তা করিনি কেন ? ধরা পড়তে পারি, বিচার হয়ে আমার ফাঁসী হতে পারে, একমাত্র এই ভয়েই আমি তা করিনি। আমার কথাগুলি সম্পূর্ণ যুক্তিসংগত, কি বল ? শত্রুকে খুন ও তার সর্বস্ব লুণ্ঠন করা নিয়ে যে প্রশ্ন ছিল, রাষ্ট্রই তার সমাধান করে দিয়েছে অর্থাৎ কর্তৃপক্ষ যে নীতির প্রবর্তন করেছে—মানে আমি দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিধানের কথাই বলছি—তাতেই এর সমর্থন রয়েছে। সুতরাং বৃহত্তর ক্ষেত্রে যা

প্রযোজ্য ব্যক্তির ক্ষেত্রেই বা তা প্রযোজ্য হবে না কেন অর্থাৎ প্রশ্নটা দাঁড়ায় এই যে ব্যক্তিগতভাবে আমি কাকে শত্রু মনে করি।"

"কিন্তু তোমার দেশের শত্রু ও তোমার ব্যক্তিগত শত্রুতে পার্থক্য আছে," এমনভাবে বলে এলিজাবেতা কিয়েভনা যে প্রায় শুনতেই পাওয়া যায় না।

"ও, ধন্যবাদ তোমাকে। সমাজবাদ সম্পর্কে আবার তুমি আমার কাছে বক্তৃতা করতে চাও! রাবিশ! সমষ্টির নয়, ব্যষ্টির অধিকারসমূহই হচ্ছে নীতির ভিত্তি। আমার ধারণা কি জান? পোপের শত প্রতিবাদ সত্ত্বেও প্রত্যেক দেশেই সৈন্যসমাবেশ যে আশ্চর্যরকম সাফল্যলাভ করছে এবং দু' বছরেরও অধিক কাল ধরে এই যে প্রচণ্ড যুদ্ধ চলেছে তার একমাত্র কারণ হল আমাদের প্রত্যেকে, প্রত্যেকটি ব্যক্তিই তার শৈশবের কাঁথা ছেড়ে বড় হয়েছে। আমরা হত্যা ও লুট করতে চাই—আর আমরা ঠিক না চাইলেও তাতে আমাদের আপত্তি নেই কোনভাবেই। রাষ্ট্রেরই উদ্যোগে হত্যা ও লুঠ হচ্ছে। নির্বোধ, দুর্বলচিত্ত ব্যক্তি এবং স্ত্রীলোকেরাই আজো হত্যা ও লুঠকে বলছে খুন ও দস্যুবৃত্তি। কিন্তু এখন থেকে আমি সেগুলিকে বলব: 'ব্যক্তিগত অধিকারের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা।' বাঘের যাতে প্রয়োজন তাই সে গ্রহণ করে। বাঘের চেয়ে নিশ্চয়ই আমি বড়। আমার অধিকারকে ক্ষুণ্ণ করার মত সাহস আছে কার? আইনের কিতাব? ফুঃ! সে তো পোকার খাদ্যে পরিণত হয়েছে।"

ঘরটা প্রায় অন্ধকার। জানালার কাচে এত ধুলো জমে আছে যে অস্তগামী সূর্যের ম্লান রশ্মি তা দিয়ে প্রবেশ করতে পারছে না। ঝাদভ পা'দুটো টেনে একত্র করে এবং উঠে দাঁড়ায়। ঘরের এদিক সেদিক পায়চারি করতে থাকে সে।

"পাঁচ কোটি লোক যুদ্ধক্ষেত্রে লড়াই করছে আর তার চেয়ে বহু গুণ বেশি লোক কোন না কোনভাবে যুদ্ধের কাজে নিয়োজিত আছে। তারা সংগঠিত ও সশস্ত্র। আপাতত তারা দু'টি বিরুদ্ধ পক্ষে বিভক্ত হয়েছে। কিন্তু যে-কোনদিন অস্ত্রচালনা বন্ধ করে তারা যদি হাতে হাত মেলায় কে তাদের ঠেকাবে? এই পাঁচ কোটি লোককে কেউ একজন যদি বলে: 'বোকারা, তোমরা ভুল লক্ষ্যের দিকে তাক করে গুলি চালাচ্ছ' দেখবে তৎক্ষণাৎ তারা হাত মিলিয়ে বসেছে। বিদ্রোহ, বিপ্লব, বিশ্বব্যাপী এক দাবানলের মধ্যেই হবে এই যুদ্ধের অবসান। ঘরের শত্রুর বিরুদ্ধেই তুলে ধরা হবে সঙ্গীন এবং এই পাঁচ কোটি লোকই হবে প্রভু। সর্বাঙ্গ ক্ষতদুষ্ট এক ভিক্ষুক বসবে জারের আসনে, প্রত্যেকে করবে তাকে কুর্নিশ। তাই হোক। তাতে আমার সংগ্রামের ক্ষেত্র আরো প্রশস্ত হবে। একদিকে জনসমষ্টির আইন, অন্য দিকে উলঙ্গ, বন্ধনহীন ব্যক্তির আইন। তুমি চাও সমাজবাদ, আর আমি চাই জঙ্গলের আইন—পবিত্র নৈরাজ্যবাদের অসংগঠিত, লৌহকঠিন শাসন।"

এলিজাবেতা কিয়েভনার বুক দুরদুর করে কেঁপে ওঠে। বহুদিন আগে তেলোগিনের ফ্ল্যাটে যে অতল গহ্বরের স্বপ্ন সে দেখেছিল এ তো সেই। তেলোগিনের ফ্ল্যাটের বাসিন্দারা তার দরজার ওপরে যে 'বারটি প্রশ্নের' তালিকা

পিন দিয়ে এ'টে দিয়েছিল এ তো আর সেই তরল পরিহাস নয়...এখন এই গোধূলির আলোতে যে লোকটি জানলার ধারে পায়চারি করছে সে তো সত্যি ভয়ংকর মানুষ, মনে হয় খাঁচার মধ্যে একটা হিংস্র জন্তু। তার হাত পা বাঁধা বলে সে শুধু এভাবে কথা বলছে। তার কথাগুলি শুনতে শুনতে এলিজাবেতা কিয়েভনা যেন অনুভব করে, চোখের সামনে দেখতে পায়, নিষ্পাদপ তৃণভূমিতে উদ্দাম অশ্বের প্লুতগতি, গগনে আগুনের রক্তিমাভা।...প্রায় স্পষ্টভাবেই তার কানে যেন ভেসে আসে রণহুংকার, অস্ত্রের ঝনৎকার, মৃত্যুর আর্তনাদ আর সেই নিষ্পাদপ তৃণভূমির সঙ্গীত।

॥ পঁচিশ ॥

১৯১৬ সাল। শীতকাল সবে শুরু হয়েছে। সর্বত্র বিষাদ ও নৈরাশ্যের ছায়া। ঠিক সেই সময় গভীরভাবে বরফ কেটে পথ করে ও বরফে আবৃত পাহাড় ডিঙিয়ে রুশ সৈন্যরা অপ্রত্যাশিতভাবে ঝড়ের বেগে গিয়ে এরজেরাম দুর্গ দখল করে। মেসোপোটেমিয়া ও গ্যালিপলিতে তখন বৃটিশ বাহিনীর ভীষণ বিপর্যয় হয়ে গেছে, পশ্চিম রণাঙ্গনে ইসার ফেরীঘাট নিয়ে তুমুল যুদ্ধ চলেছে, এবং কয়েক গজ রক্তাক্ত জমি দখল করাকে বিরাট জয় বলে বিশ্ববাসীর কাছে ঈফেল টাওয়ার থেকে দ্রুত বেতারে প্রচার করা হচ্ছে।

অস্ট্রিয়ান রণাঙ্গনে জেনারেল ব্রুসিলভের সেনাপতিত্বে রুশ বাহিনী যেভাবে আত্মরক্ষা থেকে আক্রমণের পর্যায়ে চলে গেছে তাও কম অপ্রত্যাশিত ব্যাপার নয়।

এই ঘটনাবলী আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এক চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে। ইংলণ্ডে একজন 'দুর্বোধ্য রুশ আত্মা' নাম দিয়ে একটা বইই লিখে ফেলে। আঠার মাস ধরে যুদ্ধ ও ধ্বংসলীলা চলার পর, আঠারটা প্রদেশ শত্রুর কবলে যাবার পর, এই সর্বজনীন হতাশা, অর্থনৈতিক বিপর্যয় ও রাজনৈতিক বিশৃংখলার মধ্যে রাশিয়া যে তার দু'হাজার মাইল দীর্ঘ রণাঙ্গনের সর্বত্র আবার আক্রমণ শুরু করতে পারবে, একথা কেউ ভাবতেও পারেনি। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, এক অফুরন্ত শক্তিপ্রবাহ যেন পশ্চিম দিকে ধাবিত হচ্ছে। লক্ষ লক্ষ সৈন্যকে বন্দী ক'রে রাশিয়ার অভ্যন্তরে নিয়ে আসা হচ্ছে। অস্ট্রিয়া মরণ-আঘাত পায় এবং দু'বছর পরে অতি সহজেই মাটির ভাণ্ডের ন্যায় সে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। জার্মানী গোপনে শান্তির প্রস্তাব করে। রুবলের (রুশ মুদ্রা) দাম বাড়ে। আবার সকলের মনে আশা জেগে ওঠে যে, ঠিক ভাবে আর একটা মাত্র সামরিক আঘাত হানতে পারলেই বিশ্বযুদ্ধের অবসান হবে। 'রুশ আত্মা' সকলের চিত্ত জয় করে। ডিভিশন ডিভিশন রুশ সৈন্যে সমুদ্রগামী জাহাজগুলি বোঝাই হতে থাকে। ওরেল, তুলা ও রিয়াজানের কৃষকরা সালোনিকা,

মার্সাই ও প্যারিসের রাস্তায় রাস্তায় তাদের গ্রাম্য সঙ্গীত গেয়ে চলে এবং 'ইওরোপীয় সভ্যতা রক্ষার জন্য' বেয়নেট নিয়ে প্রচণ্ডভাবে শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।

সারাটা গ্রীষ্মই রুশরা তাদের আক্রমণ চালিয়ে যায়। সৈন্য দলে ক্রমশই লোকের ডাক পড়তে থাকে। তেতাল্লিশ বছর পর্যন্ত যাদের বয়েস তাদের সোজা মাঠ থেকে ধরে এনে সৈন্যদলে নাম লিখিয়ে দেওয়া হয়। রণাঙ্গনে যাবার জন্য প্রত্যেক শহরেই নিত্য নতুন সৈন্যদল প্রস্তুত হয়ে থাকে। মোট সৈন্য সংখ্যা গিয়ে দাঁড়ায় দুই কোটি চল্লিশ লক্ষে। এসিয়ার সেই প্রাচীন ভ্রাম্যমান দুর্ধর্ষ জাতির করাল ছায়া কালো মেঘের মত সমগ্র জার্মানী, গোটা ইওরোপের গগন ছেয়ে ফেলে।

সেই গ্রীষ্মে মস্কো প্রায় ফাঁকা হয়ে যায়—যুদ্ধ সমস্ত পুরুষকে টেনে নিয়েছে। নিকলাই ইভানোভিচ মিনস্কের নিকটে রণক্ষেত্রে গিয়েছেন। দাশা ও কাতিয়া শহরে শান্ত, নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করছে; তবে তাদের অনেক কাজ করবার আছে। মাঝে মাঝে তেলেগিনের কাছ থেকে দু'একখানা সংক্ষিপ্ত, বিবর্ণতা মাখা পোস্টকার্ড আসে; তার চিঠি পড়ে মনে হয় সে পালাবার চেষ্টা করেছিল, এখন তাকে কোনো দুর্গের অভ্যন্তরে নিয়ে আটক রাখা হয়েছে।

একদিন নিকলাই ইভানোভিচ মিউনিসিপাল লীগ থেকে ক্যাপ্টেন রশচিন নামক একটি সুন্দর যুবককে ধরে নিয়ে এসেছিলেন বাড়িতে খাওয়াবার জন্য। মস্কোতে অস্ত্রশস্ত্র ও সমরসম্ভার তত্ত্বাবধানের ভারপ্রাপ্ত সে। তারপর থেকে এ বাড়িতে নিয়মিতভাবে তার যাতায়াত আরম্ভ হয় এবং এখনো আসে সে দুই বোনের সঙ্গে দেখা করতে।

প্রতিদিনই সন্ধ্যার পরে যখন একটু অন্ধকার হয়ে আসে, সামনের দরজায় বেজে ওঠে ঘণ্টা। সংকেতটা কাতিয়ার জন্যই, সে একটা চাপা নিঃশ্বাস ফেলে উঠে যাবে বাসন রাখাব তাকটার কাছে, খানিকটা মোরব্বা তুলে একটা কাচের ডিশে রাখবে অথবা চায়ের জন্য একটা লেবু কেটে খণ্ড করবে। দাশা লক্ষ্য করেছে ঘণ্টা বাজবার কয়েক মিনিট বাদেই রশচিন যখন ভেতরে প্রবেশ করে, কাতিয়া সঙ্গে সঙ্গেই তার দিকে তাকায় না; একটু অপেক্ষা করে সে এবং তারপর তার সেই মধুর হাসিটি যথারীতি ফুটে ওঠে অধরের কোণে। ভাদিম পেত্রোভিচ রশচিন নীরবে সামনের দিকে একটু ঝুঁকে আদপ জানাবে তাকে। দোহারা গড়ন তার, কালো, দীপ্তিহীন চোখ, সুডোল মাথা, চুল খুবই ছোট করে ছাঁটা। ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে টেবিলের ধারে বসবে সে এবং তারপর দু'বোনের কাছে শান্তস্বরে যুদ্ধের খবর বলবে। কাতিয়া সামোভারের পাশে চুপ করে বসে তার দিকে চেয়ে থাকবে, চোখের তারা দু'টো তার এত বড় হয়ে ওঠে যা দেখেই বোঝা যায় কতটা মনোযোগ দিয়ে সে রশচিনের কথাগুলি শুনছে। দু'জনের চোখোচোখি হতেই রশচিন সামান্য একটু দৃষ্টির ঝলক হানবে, টেবিলের তলায় তার জুতোর ঠকাঠক শব্দ হবে। সময় সময় অনেকক্ষণ

নীরবতার মধ্যে কাটবে, তারপর কাতিয়া হঠাৎ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে লাল হয়ে উঠবে এবং একটু দুর্বোধ্য হাসি হাসবে। রাত এগারটা বাজবার একটু আগে রশাচিন উঠে দুবোনের করচুম্বন করবে—তাতে কাতিয়ার প্রতি প্রকাশ পাবে শ্রদ্ধা, আর দাশার প্রতি অন্যমনস্কতা। তারপর সে চলে যাবে। যাবার সময় সে অনুরোধ করবে যাতে সৌজন্য প্রকাশের জন্য তারা আর দরজা পর্যন্ত না যায়। তার দৃঢ় পদক্ষেপের ধ্বনি খালি রাস্তায় অনেক দূর থেকেও কানে আসে।-কাতিয়া কাপড়িশগুলি ধুয়ে মুছে বাসন রাখার তাকে তালাবন্ধ ক'রে রাখে এবং নীরবে নিজের ঘরে গিয়ে দোর বন্ধ ক'রে দেয়।

একদিন সন্ধ্যার দিকে দাশা খোলা জানালার ধারে বসে আছে। রাস্তায় অনেক উঁচুতে বহু বাবুই পাখী উড়ছে। সেগুলির সুতীক্ষ্ম কিচিরমিচির শব্দ তার কানে আসছে। আপন মনে ভাবছে দাশা, পাখীগুলি যখন অতটা উঁচুতে উড়ছে তখন কাল নিশ্চয়ই গরম পড়বে। আরো মনে হচ্ছে তার, সুখী পাখীগুলি জানেই না যে যুদ্ধ চলেছে।

সূর্য অস্তাচলে গিয়েছে, নগরীর ওপর এক সোণালি ধূলির আস্তরণ ঝুলছে। গোধূলির আলোতে লোক বসে আছে দরজার সিঁড়ি ও অলিন্দে। দাশা বিষন্ন মনে কিসের অপেক্ষা করছে। অদূরেই সুপরিচিত করুণ সান্ধ্য রাগে বেজে ওঠে একটা ব্যারেল-অর্গ্যান। দাশা জানালার গোবরাটে তার কনুই দুটো রাখে। সপ্তমে চড়িয়ে একটি নারীকণ্ঠ গাইছেঃ

"মোর ভাগ্যে শুধু পোড়া রুটি,
পানীয় ঠাণ্ডা জল ."

কাতিয়া এসে দাশার চেয়ারের পেছনে নিঃশব্দে দাঁড়ায়, মনে হয় সেও শুনছে গান।

"দিদি, কি চমৎকার গাইছে মেয়েটি।"

"কিসের জন্য?" আবেশভরা কণ্ঠে কাতিয়া হঠাৎ বলে ওঠে। "কেন আমাদের ওপর এসমস্ত চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে? কি করেছি আমরা? যতদিনে এর অবসান হবে ততদিনে যে বুড়ী হয়ে যাব আমি—বুঝতে পারছিস তা? এ আর সহ্য করতে পারছি নে আমি—আর পারছিনে!"

পর্দার ধারে দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে গভীর নিঃশ্বাস ফেলে সে। তার বিষন্ন বদনে সূক্ষ্ম কয়েকটি রেখা দেখা দেয়। শুষ্ক বেদনাহত চোখ দুটি দিয়ে তাকায় সে দাশার দিকে। "আমি আর পারিনে, পারিনে আমি আর!" আস্তে ধরা গলায় বলে সে। "এর আর শেষ হবে না কোনদিন! মরে যাব আমরা...জীবনে সুখের মুখ আর কখনো দেখতে পাব না আমরা।...মেয়েটির কান্না কান পেতে শোন, দাশা আমাকে যেন জীবন্ত অবস্থায় গোর দিচ্ছে।..'

দাশা দিদিকে জড়িয়ে ধ'রে তাকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করে, কিন্তু কাতিয়া তার দুবাহুর সাহায্যে নিজেকে ছাড়িয়ে নেয়।

ঠিক সেই মুহূর্তে সামনের দিককার দরজায় ঘণ্টা বেজে ওঠে। কাতিয়া

ধাক্কা দিয়ে বোনকে দূরে সরিয়ে দেয় এবং দরজার দিকে তাকায়। রশচিন ঘরে ঢোকে, তার গায়ে মোটা কাপড়ের পোষাক ও পায়ে আনকোরা চকচকে জুতো। দাশাকে সে হেসে অভিনন্দন জানায় এবং কাতিয়ার দিকে হাত বাড়িয়ে দেয়, কিন্তু কাতিয়ার মুখের অবস্থা দেখেই হাসি মিলিয়ে যায়, বিস্ময়ে চোখ দুটো তার বিস্ফারিত হয়ে ওঠে। দাশা তৎক্ষণাৎ ভোজন কক্ষে চলে যায়। টেবিলের ওপর চায়ের সরঞ্জাম সাজাতে সাজাতে সে শুনতে পায় সেই মৃদু ধরা গলায় কাতিয়া রশচিনকে বলছেঃ

"আপনি তবে চলে যাচ্ছেন ?"

একটু কেশে নিয়ে শুষ্ক কণ্ঠে উত্তর দেয় রশচিনঃ "হ্যাঁ।"

"কালই ?"

"না, আজই—ধরুন এই এক ঘণ্টা সওয়া ঘণ্টার মধ্যেই।"

"কোথায় ?"

"একেবারে যুদ্ধক্ষেত্রে," বলেই সে থামে একটু, তারপর আবার বলেঃ

"হয়ত জীবনে আর কখনো দেখা হবে না, একাতেরিনা দ্মিত্রেভ্না, এই আমাদের শেষ দেখা, তাই ভেবেছি তোমাকে বলব।.."

কাতিয়া তাড়াতাড়ি তাকে বাধা দেয়ঃ "না, না!..আমি জানি তা।..আর তুমিও তো জান আমার কথা।."

"একাতেরিনা দ্মিত্রেভ্না, তুমি ."

"হ্যাঁ—তুমি তোমার নিজেকে দিয়েই বুঝতে পার। যাও তুমি, দোহাই তোমার, তুমি যাও" হতাশভাবে চীৎকার ক'রে বলে কাতিয়া।

দাশার হাতে কাপটা কেঁপে ওঠে। ড্রইং-রুমে উভয়েই খানিকক্ষণ নীরব। তারপর কাতিয়াকে আবার নিম্নস্বরে বলতে শোনা যায়ঃ

"ভাদিম পেত্রোভিচ, যাও দয়া করে।"

"বিদায়।"

রশচিন ছোট একটা নিঃশ্বাস ফেলে। তার নতুন চকচকে বুটজোড়া মচমচ করে ওঠে, সামনের দরজায় শব্দ হয়। কাতিয়া ভোজনকক্ষে গিয়ে টেবিলের ধারে বসে এবং দুহাতে নিজের মুখটাকে জোরে চেপে ধরে।

যে লোকটি চলে গেল তার সম্পর্কে সেই থেকে কাতিয়ার মুখে আর একটি কথাও শুনতে পাওয়া যায়নি। কোন নালিশও করেনি কোনদিন, নীরবে নিজের বেদনাকে হজম করেছে সে। তবে সকালবেলা ঘুম থেকে উঠলেই দেখা যেত তার চোখ দুটো লাল, অধরোষ্ঠ ভারী! যাবার পথেই কোনও এক জায়গা থেকে রশচিন একখানা পোস্টকার্ডে দুবোনকে প্রীতিপূর্ণ অভিনন্দন জানিয়েছে। অগ্নিকুণ্ডের উপরিস্থিত তাকে চিঠিটা রেখে দেওয়া হয়েছে, তার ওপরে এসে কতগুলি মাছি বসেছে।

প্রতিদিনই সন্ধ্যায় দুবোন যায় ভেরস্কয় বীথিকায় বেড়াতে। সেখানে গিয়ে বেঞ্চিতে বসে তারা ব্যাণ্ড বাজনা শোনে এবং লাল-সাদা ফ্রক পরে যে

কিশোরীর দল গাছের তলায় ঘুরে বেড়ায় তাদের নিরীক্ষণ করে। বহু মহিলা এবং শিশুকেও সেখানে দেখতে পাওয়া যায়। কখনো-সখনো হাতে ব্যান্ডেজ করা অবস্থায় অথবা খঞ্জের যষ্ঠিতে ভর ক'রে বেড়াতে আসে দু'একজন যুদ্ধ-ফেরৎ সৈন্য। ঠিক এমনি একটি সন্ধ্যায় ব্যান্ডবাদকগণ বাজাতে থাকে ওয়ল্‌স্‌ নাচের একটি গান—"মাঞ্চুরিয়ার পাহাড় 'পরে।" বাঁশীর বিষন্ন সুর সন্ধ্যার আকাশে উঠে মিলিয়ে যায়। দাশা দিদির শীর্ণ, দুর্বল ছোট হাতখানি নিজের হাতের মধ্যে টেনে নেয়।

গাছের ডালের ফাঁক দিয়ে সূর্যাস্তের রক্তিমাভা দেখা যাচ্ছে। সেদিকে তাকিয়ে দাশা বলে:

"দিদি, দিদি, আমার বিশ্বাস, সাহস যদি আমাদের থাকে তবে এমন দিন আমরা নিশ্চয়ই পাব যেদিন ভালবেসে আমাদের দুঃখ পেতে হবে না।, আমরা তো এখন জানি যে ভালবাসার চাইতে বড় জিনিস পৃথিবীতে আর কিছুই নেই। সময় সময় আমার মনে হয় ইভান ইলিয়িচ যখন বন্দীশিবির থেকে ফিরে আসবে তখন দেখা যাবে সে একেবারে আলাদা নতুন একটি মানুষ। এখন তাকে আমি ভালবাসি নিভৃতে, একান্তভাবে আপন মনে। কিন্তু আমরা যখন মিলব, তখন সেই আর এক জীবনে যেভাবে পরস্পর পরস্পরকে আমরা ভাল-বেসেছিলাম সেভাবেই মিলব, এখন যেভাবে জীবন চলেছে সেভাবে তো নয়।"

দাশার কাঁধে দেহটাকে এলিয়ে দিয়ে কাতিয়া বলে:

"কিন্তু, দাশা, পুঞ্জীভূত বেদনা ও অন্ধকারে আমার হৃদয়ের বার্ধক্য এসে গেছে। তুই আবার সুখের নাগাল পাবি, কিন্তু আমার সামনে সবই অন্ধকার: জীবনে মধ্যাহ্ন আমার অতিবাহিত, এ ফুলে আর ফল ধরবে না রে।"

"এমন কথা বলিস নে তুই দিদি!"

"কেন নয়, বোনটি আমার, সত্যকে স্বীকার করাই ভাল।"

ঠিক এমনি আর একটি সন্ধ্যায় দেখা যায়, সেই বীথিকায় সামরিক পরি-চ্ছদ পরিহিত একটি লোক বেঞ্চের অপর প্রান্তে বসে আছে। ব্যান্ডবাদক দল সেদিনও ওয়ল্‌স্‌ নাচের একটি পুরনো গান বাজাচ্ছে। গাছের ফাঁকে ফাঁকে ঝিকিমিকি করে জ্বলছে রাস্তার ধারের অনুজ্জ্বল আলোগুলি। বেঞ্চের অপর প্রান্ত থেকে লোকটা দাশার দিকে এমন প্রখর দৃষ্টি হানে যে, সে তাতে খানিকটা অস্বস্তি বোধ করে। দাশা তার দিকে ঘুরে বসে এবং সহসা চকিত-ভাবে অর্ধস্ফুট স্বরে বলে ওঠে:

"না!"

কৃশ, অপরিচ্ছন্ন লোকটা বেসনভ। রোমীয় কায়দার অংগাবরণটা তার কাঁধ থেকে নীচের দিকে বস্তার মত ঝুলে পড়েছে, মাথায় রয়েছে রেড ক্রসের ব্যাজ যুক্ত একটা টুপি। উঠে দাঁড়িয়ে বিনা বাক্যব্যয়ে সে দাশার করমর্দন করে। দাশা বলে: "কেমন আছেন?" এই বলেই সে তার অধরোষ্ঠ চাপে। কাতিয়া বেঞ্চে হেলান দিয়ে দাশার টুপির আড়ালে নিজেকে ঢাকে এবং দু'চোখ

বোজে। বেসনভকে পাংশুবর্ণ দেখাচ্ছে, সর্বাঙ্গ যেন ধুলোয় ঢাকা, মনে হয় স্নান বা ধোয়াকাচার বালাই নেই তার।

"গতকাল এবং তার আগের দিন তোমাকে বীথিকায় দেখতে পেয়েছি আমি," কপালে ভ্রূ তুলে বলে সে দাশাকে। "কিন্তু তোমাকে কিছু বলতে সাহস পাইনি।...আমি যুদ্ধ করতে চলে যাচ্ছি—দ্যাখ, তারা আমাকেও পর্যন্ত ছাড়েনি।"

"যুদ্ধ করতে যাচ্ছেন আপনি একথা কেন বলছেন? আপনি তো দেখছি রেডক্রসে আছেন।" অকস্মাৎ একটু উত্তেজিত হয়ে বলে দাশা।

"অবশ্য বিপদ যে অপেক্ষাকৃত কম তাতে সন্দেহ নেই। তবে বেঁচে থাকব কি মরে যাব তা নিয়ে আমার একটুও ভাবনা নেই।...সব কিছুই এত বিষাক্ত, দারিয়া দ্‌মিত্রেভ্‌না," মাথা তুলে তার নিষ্প্রাণ দুটো চোখ দিয়ে তাকায় সে দাশার দিকে। "খালি মড়া, মড়া আর মড়া ...কাঁহাতক কত ভাল লাগে!..."

চোখ না মেলেই প্রশ্ন করে কাতিয়া ঃ

"সেগুলি কি আপনার পক্ষে খুব পীড়াদায়ক?"

"নিশ্চয়ই অত্যন্ত পীড়াদায়ক, একাতেরিনা দ্‌মিত্রেভ্‌না। এক সময় ছিল যখন অন্তত কিছুটা আশাও আমি মনের মধ্যে পোষণ করতাম।.. কিন্তু এই সমস্ত মৃতদেহ দেখে দেখে এখন কেবলই মনে হচ্ছে সেই চরম তমসা নেমে আসছে...শব, শোণিত, বিশৃংখলা।. এখানে তোমার পাশে এসে কেন বসেছি জান, দারিয়া দ্‌মিত্রেভ্‌না? বসেছি এজন্য যে তুমি যদি তোমার আধ ঘণ্টা সময় আমার জন্য দাও।"

"কেন, কিসের জন্য?" বেসনভের অদ্ভুত অসুস্থ মুখটাকে ভালভাবে লক্ষ্য করে দেখে দাশা এবং দেখে তার মনে হয়—খুব স্পষ্টভাবেই মনে হয়—এই যেন সে লোকটাকে প্রথম দেখছে।

"ক্রিমিয়ায় যা ঘটেছিল সে সম্পর্কে আমি অনেক ভেবেছি," তীক্ষ্ন দৃষ্টি হেনে বলে বেসনভ। "তোমাকে কিছু বলবার আছে আমার..." সিগারেট কেসটা বার করার জন্য হাতটা আস্তে তার জামার পকেটে চলে যায়। "কতগুলি ভুল ধারণা আমি দূর করে দিতে চাই।.."

দাশা ভ্রূ কুঞ্চিত ক'রে প্রখর দৃষ্টিতে তার দিকে তাকায়। না, ঐ বিরক্তিকর মুখখানায় আগেকার সেই যাদুর লেশ মাত্রও নেই। "আমাদের দু'জনের মধ্যে আলোচনা করার মত কিছু আছে বলে আমার মনে হয় না," দৃঢ় কণ্ঠে বলেই ঘুরে বসে দাশা।

"আচ্ছা, আপনি এখন আসতে পারেন, আলেক্সি আলেক্সিয়েভিচ।"

বেসনভ একটু বক্রহাসি হেসে টুপি খুলে আদপ জানায় এবং তারপর হাঁটতে আরম্ভ করে। তার শীর্ণ পৃষ্ঠদেশ, ঢোলা পাৎলুন যা দেখে মনে হয় যে কোন মুহূর্তে খুলে পড়তে পারে, ধুলোমাখা বিরাট সামরিক বুট

জোড়া—এসমস্তর দিকে দাশা তাকায় আর ভাবে, এ কি সত্যি সেই বেসনভ যে ছিল তার কুমারী জীবনের রাত্রির দুঃস্বপ্ন ?

"দিদি, একটু বোস্ তুই, আমি এক্ষুনি ফিরব," চট করে বলেই সে বেসনভের দিকে ধাওয়া করে। একটা ছোট রাস্তায় গিয়ে পড়ে বেসনভ। দাশা ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে গিয়ে তাকে ধরে, তার আস্তিনটা ধরে টান দেয়। থেমে ঘুরে দাঁড়ায় বেসনভ। রুগ্ন পাখীর মত তার চোখের পাতাদুটি নীচের দিকে নেমে আসে।

"আমার ওপর রাগ করবেন না, আলেক্সি আলেক্সিয়েভিচ।"

"আমি তো রাগ করিনি। তুমিই বরঞ্চ আমার সঙ্গে কথা বলতে চাইলে না।"

"না না।...আপনি ভুল বুঝেছেন আমাকে।...আপনার প্রতি আমার যথেষ্ট শ্রদ্ধা আছে এবং সর্বদাই আপনার শুভ কামনা করব আমি। কিন্তু অতীতের জের টেনে আর লাভ নেই, অতীত অতীতই। জানি, দোষ আমারও ছিল। আপনার জন্য সত্যি আমি দুঃখিত।"

বেসনভ তার কাঁধদুটো ঈষৎ নাচায় এবং দাশার প্রতি একটু বক্র দৃষ্টি হেনেই পথচারীদের দিকে তাকায়ঃ

"তোমার অনুকম্পার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ।"

দাশা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে। বেসনভ যদি ছোট বালক হ'ত ব্যড়িতে নিয়ে গিয়ে তাকে সে গরম জলে স্নান করিয়ে দিত এবং মিষ্টি খাওয়াত। কিন্তু যে লোকটা আত্মপীড়নের জন্য রাগে, অভিমানে নিজে ইচ্ছে করেই নিজের জন্য নরক সৃষ্টি করেছে এবং এখন তাতে ভুগছে তার জন্য সে কিই বা করতে পারে।

"আলেক্সি আলেক্সিয়েভিচ, চ ন তো রোজই আমার কাছে চিঠি লিখতে পারেন এবং আপনার প্রতিটি চিঠিরই আমি জবাব দেব।" যতদূর সম্ভব দরদের ভাব মুখে টেনে এনে বলে দাশা।

মাথাটা পেছন দিকে ছুঁড়ে ক্রুদ্ধ. কাষ্ঠহাসি হেসে বলে বেসনভঃ

"ধন্যবাদ তোমাকে। তবে কাগজ ও কালির প্রতি আমার বিতৃষ্ণা এসে গেছে।. ." মুখের বিকট ভঙ্গি করে সে, যেন একটা কটু কিছু গলাধঃকরণ করতে হচ্ছে তাকে। "হয় তুমি দেবী, দারিয়া দমিত্রেভ্‌না, না হয় তুমি একটি মূর্খ।. .তুমি কি বোঝ যে, যতদিন আমি বেঁচে আছি ততদিন তোমার জন্য কি নরকযন্ত্রণা ভোগ করতে হবে আমাকে ?"

যাবার চেষ্টা করে বেসনভ, কিন্তু মনে হয় কে যেন তার পা দু'টো মাটিতে টেনে ধরে রেখেছে। দাশা আনতমস্তকে দাঁড়িয়ে থাকে—সবই বোঝে সে এবং এজন্য দুঃখও হয় তার, কিন্তু হৃদয়ে কোন আলোড়ন নেই। দাশার বক্রগ্রীবার দিকে তাকায় বেসনভ, সাদা জামার চেরা জায়গাটা দিয়ে দাশার কমনীয়, অনাঘ্রাত বক্ষদেশের যে অংশটা দেখা যাচ্ছে তার দিকে চেয়ে থাকে সে আর ভাবে, এই তো নিশ্চিত মৃত্যু।

"দয়া কর," সহজ ও শান্তভাবে বলে বেসনভ, তার কণ্ঠস্বরে মানবিক আবেদন।

মাথা তোলে না দাশা, অনুচ্চকণ্ঠে বলেঃ "হ্যাঁ, হ্যাঁ।" তারপরই সে গাছের সারির মাঝখান দিয়ে হাঁটতে থাকে। বেসনভ ভীড়ের মধ্যে শেষবারের মত দাশার সোনালি মাথাটা একবার দেখে নেয়; দাশা আর ফিরেও তাকায় না। একটা গাছের কাণ্ডে বেসনভ তার হাতটা রাখে, নখ দিয়ে গাছের ছাল খুঁটতে আরম্ভ করে; তার শেষ অবলম্বন মাটিও যেন পায়ের তলা থেকে সরে যেতে থাকে।

॥ ছাব্বিশ ॥

পচা ঘাসে ভরা নির্জন বাদার ওপর নিম্নাকাশে চাঁদটা ঝুলছে একটা অনুজ্জ্বল লাল থালার মত। পরিত্যক্ত পরিখার ওপর কুয়াশা জমে আছে এঁকেবেঁকে ঢেউ খেলে। সর্বত্র দেখে যাচ্ছে পোড়া গাছের গোড়া; মাঝে মাঝে দু'একটা ছোট দেবদারু গাছ অস্পষ্টভাবে আকাশে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। গোটা এলাকাটাই সেঁৎসেঁতে ও নিঝুম। বাদার ভেতর দিয়ে কাঠ ফেলে যে সরু রাস্তা করা হয়েছে তা দিয়ে যাচ্ছে এক সারি অ্যাম্বুলেন্স গাড়ী। করাতের দাঁতের মত খাঁজকাটা অসমতল স্তব্ধ বনটা পেরিয়ে গেলে মাত্র দু'মাইল দূরেই পাওয়া যাবে রণক্ষেত্র।

একটা গাড়ীতে শুকনো ঘাসের ওপর ঘোড়ার কম্বল গায়ে দিয়ে চিত হয়ে শুয়ে আছে বেসনভ, কম্বলটায় ঘোড়ার ঘামের গন্ধ। প্রত্যহই সন্ধ্যার দিকে তার জ্বর আসে; এমন কম্প দিয়ে জ্বর আসে যে দাঁতগুলো তার ঠকঠক করতে থাকে, সমস্ত দেহ তার কুঁকড়ে আসে, হিজিবিজি কত রকম চিন্তা মাথায় আসে তার। পেঁজা তুলোর মত হাল্কা হয়ে সমস্ত দেহটা যেন তার শূন্যে উড়ে বেড়ায়।

ঘোড়ার কম্বলটা থুতনি পর্যন্ত টেনে দিয়ে অলক্ষ্যে আলেক্সিয়েভিচ বেসনভ কুয়াশাচ্ছন্ন, জ্বরাক্রান্ত আকাশটার দিকে তাকায়। ঐ তো—ঐখানেই তো এই পার্থিব যাত্রার শেষঃ কুয়াশা, চন্দ্রালোক আর শিশুর দোলনার মত দোল খেয়ে চলেছে একটা শকট।

শতাব্দীর আবর্তন আর একবার পূর্ণ হল, সিথিয়ান রথের চাকার ঘর্ঘর ধ্বনি আবার শোনা যাচ্ছে। আগের সমস্ত কিছুই মনে হয় স্বপ্নঃ পিতার্স-বুর্গের আলোমালা, তার হর্ম্যরাজির গগনচুম্বী আড়ম্বর, উন্মাদনা-সৃষ্টিকারী সঙ্গীত, সমুজ্জ্বল সভাগৃহসমূহ, নাট্যশালায় ধীরে ধীরে পর্দা উত্তোলনের রোমাঞ্চ, তুষারাচ্ছন্ন রজনী, উপাধানে রমণীর প্রলম্বিত বহু, তার লালসাচঞ্চল কৃষ্ণ নয়নতারা...খ্যাতির উত্তেজনা...যশের মত্ততা, পাঠকক্ষের স্নিগ্ধ আলো...

উৎফুল্ল হৃদয়ের দ্রুত স্পন্দন...জন্মোন্মুখ আলাপে উল্লাস...টুপিতে সাদা ডেজি ফুল গোঁজা কোন তরুণীর আলোকোজ্জ্বাসিত হলঘর থেকে তার অন্ধকার কক্ষে প্রবেশ ও আত্মসমর্পণ...এ সবই স্বপ্ন। গাড়ীটা দুলছে...একটা চাষী টুপিটা চোখ পর্যন্ত টেনে নামিয়ে নিয়ে পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে. .দু' হাজার বছর ধরে ঠিক এমনি ভাবে সে তার গাড়ীর পাশ দিয়ে হেঁটে চলেছে। ঐ বিস্তৃত কুয়াশাচ্ছন্ন চন্দ্রালোকে পড়ে আছে অনন্ত মহাকাল।...যুগ যুগান্তের অন্ধকার ভেদ করে এগিয়ে চলে কতগুলি ছায়া, শ্রুত হয় শকটের ঘর্ঘর ধ্বনি, তার চাকা এঁকে দেয় পৃথিবীর বুকে গভীর কালো রেখা। ঐ কুয়াশার পর্দা ভেদ করে দূরে দেখা যায় কতগুলি অর্ধভগ্ন চিমনী—জ্বলন্ত অঙ্গারের ধোঁয়া সেগুলি দিয়ে আকাশে উঠছে আর শোনা যাচ্ছে চলমান শকটসমূহের চাকার প্রচণ্ড শব্দ। সে শব্দ ক্রমশ উচ্চ থেকে উচ্চতর হয়ে এমন বিকট শোনায় যে কারো কানে এলে তার রক্ত একেবারে জমাট হয়ে যায়।..

হঠাৎ গাড়ী থেমে যায়। একটানা একঘেয়ে শব্দে কুয়াশাচ্ছন্ন বিষণ্ণ রজনী পরিপূর্ণ; তার মধ্যে বেসনভ শুনতে পায় অ্যাম্বুলান্সের লোকদের ভীত কণ্ঠস্বর। কনুইতে ভর দিয়ে সে উঠে বসে। বনের গাছগুলির মাথার একটু ওপরেই জ্যোৎস্নায় দেখা দেয় বেলুনের মত লম্বা একটা গোলাকার জিনিস, তার ছোট ছোট মুখগুলি ঝক্‌মক্ করছে। সেই আলোর বেলুনটা ক্রমশ পরিণত হয় কতগুলি এঞ্জিনের গর্জনে, তারপর তার উদর থেকে নীলাভ-সাদা তীরের মত একটা আলোর ঝলক সমস্ত জলাভূমি, অর্ধদগ্ধ বৃক্ষকাণ্ডসমূহ, ভূপাতিত বৃক্ষরাজি ও দেবদারু গাছগুলির ওপর দিয়ে ঘুরে এসে রাস্তা ও শকটসমূহের ওপর স্থিরভাবে পড়ে। সেই গর্জনের মধ্যেও মেট্রোনোমের দ্রুত আঘাতের মত কতগুলি অস্পষ্ট শব্দ শুনতে পাওয়া যায়। শকট থেকে সকলে লাফিয়ে নীচে নামে। অ্যাম্বুলেন্স গাড়ীটা জলার মধ্যে নেমে গিয়ে উল্টে যায়। তারপর বেসনভের কাছ থেকে শতেক গজের মধ্যেই রাস্তার ওপর একটা চোখ-ঝলসানো আলোকছটা বিচ্ছুরিত হয়, কালো ধূম্ররাশির মধ্যে একটা অশ্ব ও শকট আকাশে উৎক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে, সশব্দ ঘূর্ণীতে শকটের সারিটা একেবারে লণ্ডভণ্ড হয়ে যায়। গাড়ীর ভগ্নাংশ পেছনে নিয়ে ঘোড়াগুলি লাফাতে লাফাতে গিয়ে জলাভূমিতে নামে। মানুষ চারদিকে ছুটোছুটি করতে থাকে। বেসনভ যে গাড়ীটায় শুয়ে ছিল সেটা হঠাৎ ঝাঁকুনি দিয়ে উঠে উল্টে যায়; রাস্তার ধারের খাদে পড়ে যায় সে; একটা ভারী থলে গড়িয়ে পড়ায় তার পিঠে বিষম চোট লাগে, গাড়ীর সমস্ত শুকনো ঘাস প'ড়ে দেহটাকে তার ঢেকে ফেলে।

জেপেলিন থেকে দ্বিতীয় বোমা পড়ে; তারপর সেটার এঞ্জিনের শব্দ দূরে আস্তে আস্তে মিলিয়ে যায়। বেসনভ হাঁপাতে হাঁপাতে ঘাসের ভেতর থেকে নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টা করে; তার ওপরে পড়ে আছে একটা মোট, অতি কষ্টে হামাগুড়ি দিয়ে তার নীচ থেকে সে বেরিয়ে আসে। গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে রাস্তায় এসে দাঁড়ায় সে। এখানে কয়েকটা শকট কাত হয়ে পড়ে আছে, সে-

গাড়ির সামনের দিককার ডান্ডা ভেঙে গেছে; একটা ঘোড়ার গলার সঙ্গে তখনো ডান্ডা আটকানো আছে, ঘোড়াটা বাদায় পড়ে মাথাটা উল্টো দিকে ফিরিয়ে আছে আর পেছনের একটা পা ঘড়ির কলের মত অনবরত ছুড়ছে।

বেসনভ তার শিরে ও মুখে হাত দিয়ে দেখে কিছু হয়েছে কি না। কানের পেছনে আঠার মত কি চটচটে লাগে। রুমাল দিয়ে সে ক্ষতস্থানটা চেপে ধরে এবং রাস্তা ধরে বনের দিকে হাঁটতে থাকে। পড়ে গিয়ে তার লেগেছিল যথেষ্ট। ব্যথা ও ভয়ে তার পা দুটো এমনভাবে কাঁপতে থাকে যে কয়েক পা গিয়েই তাকে ভাঙা পাথরের একটা স্তূপের ওপর বসে পড়তে হয়। তখন একটু ব্রান্ডি পেলে ভাল হয়, কিন্তু তার ফ্লাস্কটা রয়ে গেছে সেই খাদে মোটটার সঙ্গে। অতি কষ্টে পাইপ ও দেশলাইটা সে পকেট থেকে বার করে এবং পাইপটা ধরায়, কিন্তু তামাকের ধোঁয়া বিস্বাদ লাগে, বমি আসে। তখন তার খেয়াল হয় যে তার গায়ে জ্বর আছে। বড়ই সংকটে পড়েছে সে; যেভাবেই হোক তাকে ঐ বন পর্যন্ত যেতেই হবে; সে শুনেছে যে সেখানে স্বপক্ষের এক ব্যাটারি গোলন্দাজ সৈন্য আছে। বেসনভ উঠে দাঁড়ায়; কিন্তু তার পা দুটো একেবারে অবশ হয়ে গেছে: মনে হয় যেন শুকনো কাঠ, পা দুটো নাড়তেই পারে না সে। আবার বসে পড়ে, হাত দিয়ে পা দুটো ডলে, পা ছড়িয়ে তাতে চিমটি কাটে; একটু যখন ব্যথা অনুভব করে, উঠে আবার দাঁড়ায় সে, তারপর পথ চলতে থাকে।

চাঁদটা তখন আকাশে মাথার ওপর এসেছে; রাস্তাটা চলে গেছে কুয়াশাচ্ছন্ন বাদার ভেতর দিয়ে, মনে হয় তার বুঝি আর শেষ নেই। হাত দুটো পিঠে রেখে বেসনভ চলেছে তার ভারি বুট দুটো ফেলে খোঁড়াতে খোঁড়াতে, মনে হয় কে যেন জগদ্দল পাষাণ বেঁধে দিয়েছে তার পায়ের সঙ্গে। যেতে যেতে আপন মনে বলছে সে ঃ

"সামলে চল, তুমি সামলে চল, চাকার নীচে পড়বার আগে সামলে চল... কবিতা লিখেছ তুমি, বোকা মেয়েদের ভুলিয়েছ ..তারপর তুমি ধরা পড়ে গেছ, তোমাকে ছুড়ে ফেলে দেওয়া হয়েছে ঃ পড়ে যাবার আগে অস্তাচলের দিকে এগিয়ে চল।...ইচ্ছে হয় প্রতিবাদ কর। চেঁচাও, যত খুশি পার চীৎকার কর, এগিয়ে যাও. .গলা ফাটাও.. "

হঠাৎ সে ঘুরে দাঁড়ায়। একটা ধূসর ছায়া রাস্তা থেকে বাদার মধ্যে নেমে যায়। দেখে তার শিরদাঁড়াটা শিরশির করে ওঠে। হেসে ওঠে সে, আবার রাস্তা দিয়ে চলতে থাকে, তার মুখে অসংলগ্ন, অর্থহীন প্রলাপ। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই সে পেছন দিকে সতর্ক দৃষ্টি হানে ঃ আবার সেটা সেখানে —বড় মাথা ও লম্বা পা'ওয়ালা একটা কুকুর প্রায় পঞ্চাশ হাত দূরে তার পেছনে পেছনে আসছে।

"কি আপদ !" বিড়বিড় করে বলে বেসনভ। একটু দ্রুত পদে হাঁটতে থাকে সে এবং ঘাড় ফিরিয়ে কাঁধের ওপর দিয়ে আবার পেছন দিকে তাকায়। এবার

দেখা যাচ্ছে পাঁচটা ধূসর বর্ণের কুকুর মাথা নীচু করে এক সার বেঁধে আসছে, সেগুলির পাছাও রয়েছে নীচু হয়ে। একটা ঢিল ছুঁড়ে মারে সে সেগুলির দিকেঃ "রাখ, দেখাচ্ছি তোদের! ভাগ, খচ্চরের দল!"

কুকুরগুলি নিঃশব্দে রাস্তা থেকে খাদায় নেমে যায়। বেসনভ আরো কয়েকটা ঢিল কুড়িয়ে হাতে নেয় এবং মাঝে মাঝে থামে ও কুকুরগুলির দিকে ঢিল ছুঁড়ে মারে। এরপর সে শিস দিয়ে ও চীৎকার করে পথ চলতে আরম্ভ করে। কুকুরগুলি আবার রাস্তায় উঠে এসে এক সারি হয়ে তাকে অনুসরণ করে এগোতে থাকে।

রাস্তাটা এবার এসে পড়ে কতগুলি ছোট গাছের মাঝখানে। রাস্তার বাঁকে বেসনভের সামনে পড়ে একটা মানুষ। লোকটা স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে তার দিকে চেয়ে থাকে; তারপর আস্তে আস্তে গাছের ছায়ায় মিলিয়ে যায়।

"কে রে বাবা!" বেসনভ চুপে চুপে আপন মনে বলে। বুকের ধড়ফড়ানিটা কমাবার জন্য সেও দু'পা পিছিয়ে গিয়ে গাছের নীচে অন্ধকার জায়গায় দাঁড়ায়। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে সে। অদূরে কুকুরগুলিকেও স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়; একেবারে সামনের কুকুরটা থাবার ওপর লম্বা মুখটা রেখে শুয়ে পড়ে। সামনের লোকটাও আর নড়েচড়ে না। একটা দীর্ঘ, সাদা, পাতলা মেঘ চাঁদটাকে অতিক্রম করে যায়; বেসনভ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সেটাকে লক্ষ্য করে। তারপর একটা শব্দ যেন ছুঁচের মত এসে তার মস্তিষ্কে বেঁধে- বোধ হয় অজ্ঞাত লোকটার পায়ের তলায় একটা ডাল ভাঙার শব্দ। বেসনভ তাড়াতাড়ি রাস্তার মাঝখানে চলে আসে এবং রোষে দু'হাত মুষ্টিবদ্ধ করে দীর্ঘ পদক্ষেপে সামনের দিকে এগোতে থাকে। অবশেষে ডানদিকে সেই লোকটাকে সে দেখতে পায়। লোকটা দীর্ঘকায়, কাঁধ দুটো তার নুয়ে পড়েছে, গায়ে একটা লম্বা সামরিক কোট, ভ্রূহীন; তার পাংশু, অর্ধোন্মুক্ত মুখটার দিকে তাকালে মনে হয় সে বুঝি মৃত। বেসনভ চেঁচিয়ে ওঠেঃ

"কে হে তুমি! কোন্ রেজিমেন্টের লোক?"

"দু' নম্বর ব্যাটারির।"

"আমাকে সেখানে নিয়ে চল।"

লোকটা উদ্বেগপূর্ণ দৃষ্টিতে বেসনভের দিকে চেয়ে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর বাঁদিকে মুখ ঘুরিয়ে সে বলেঃ

"ওখানে ওগুলি কি দেখা যাচ্ছে?"

"কয়েকটা কুকুর," অসহিষ্ণুভাবে জবাব দেয় বেসনভ।

"না, কুকুর নয় ওগুলি।"

"চল, ঘুরে চল, আমাকে পথ দেখিয়ে ব্যাটারির কাছে নিয়ে যাও।"

"না, আমি সেখানে যাচ্ছিনে," আস্তে বলে সৈন্যটা।

"দ্যাখ, আমার জ্বর হয়েছে। নিয়ে চল আমাকে। তোমাকে বখশিস দেব।"

"না, ব্যাটারিতে আমি আর যাব না।"

তারপর গলার স্বরটা একটু চড়িয়ে বলে সে: "আমি সৈন্যদল ছেড়ে চলে এসেছি।"

"মূর্খ, তারা তোমাকে ধরে ফেলবে।"

"তা ধরতে পারে।"

বেসনভ ঘাড় ফিরিয়ে পেছন দিকে তাকায়, কুকুরগুলিকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না, নিশ্চয়ই গাছের আড়ালে আছে।

"এখান থেকে ব্যাটারি কি অনেক দূরে?"

সৈন্যটা নিরুত্তর। বেসনভ ঘুরে রওনা হবার উপক্রম করতেই সৈন্যটা তাড়াতাড়ি তার দুবাহু দৃঢ়ভাবে ধরে বলে:

'না, সেখানে যাবে না।'

'আমার হাত ছেড়ে দাও।'

'না!' বেসনভের দুবাহু ঠিক তেমনিভাবে ধরে রেখে লোকটা রাস্তার এক পাশে গাছের ওপর দিয়ে আকাশের দিকে তাকায়। 'তিন দিন ধরে আমি অনাহারে আছি। পরিখায় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম হঠাৎ পায়ের শব্দ কানে এল। ভাবলাম কোন সৈন্যদল মার্চ করে আসছে। শুয়ে পড়লাম। তারা এল, বস্তার ওপর দিয়ে মার্চ করে তারা সবাই এল। তারপর পরিখা থেকে উঁকি মেরে দেখলাম [illegible] যাচ্ছে, তারা মার্চ করে, তার আর শেষ নেই, যেন একরাশি মেঘ।'

'কি বকছ তুমি?' কর্কশ কণ্ঠে বলে বেসনভ। নিজেকে সে ছাড়াবার চেষ্টা করে।

'ঠিকই বলছি এর এক বর্ণও মিথ্যে নয়।'

লোকটার হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করে বেসনভ প্রাণপণ ছুটতে থাকে কিন্তু পায়ে তার জোর নেই, মনে হয় কার্পাসমিশ্রিত পশম দিয়ে বুঝি তার পা দুটো কেউ তৈরী করে দিয়েছে। সৈন্যটা ফোঁস ফোঁস করতে করতে ভারী বুট পায়ে তার পেছনে ছোটে এবং গিয়ে তার কাঁধ ধরে ফেলে। বেসনভ পড়ে যায়, দুহাতে সে তার কণ্ঠ ও মস্তক আবৃত করে। লোকটা হাঁপাতে হাঁপাতে তার ওপর লাফিয়ে পড়ে কঠিন আঙুলগুলি দিয়ে সে বেসনভের টুটি চেপে ধরে ক্রমশই চাপতে থাকে কিছুতেই আর সে ছাড়ে না।

'বুঝেছি শালা, তুই কে! চিনিনি তোকে!' দাঁত কিড়মিড় করে চাপা গলায় বলে সৈন্যটা। ভূতলে শায়িত মানুষের দেহটা বেশ জোরে একবার কেঁপে ওঠে, তারপর প্রলম্বিত হয়ে অসাড় হয়ে যায়, মনে হয় ধূলিতে যেন সেটা টান হয়ে পড়ে আছে। সেটাকে ছেড়ে দিয়ে সৈন্যটা উঠে দাঁড়ায়। টুপিটা কুড়িয়ে নিয়ে রাস্তা ধরে সে হাঁটতে থাকে, কৃতকর্মের দিকে একবারও ফিরে তাকায় না। টলতে থাকে সে, মাথাটা ঝোঁকে, পা দুটো পরিখায় ঝুলিয়ে বসে পড়ে। একটা ধূসর ছায়া দ্রুত রাস্তা পার হয়ে যায়।

"তারপর? কোথায় যাব আমি এখন?" সৈন্যটা মনে মনে বলে। "এই তো শেষ! ওরে জানোয়ারগুলি, আয় তবে আয়, এসে আমাকে টুকরো টুকরো ক'রে ছিঁড়ে ফ্যাল্।..."

॥ সাতাশ ॥

ইভান ইলিয়িচ তেলোগিন বন্দীশালা থেকে পালাবার চেষ্টা ক'রে ধরা পড়ে এবং একটা কেল্লায় স্থানান্তরিত হয়। সেখানে তার ভাগ্যে জোটে নির্জন কারাবাস। সেখান থেকেও আর একবার পালাবার বুদ্ধি মাথায় খেলে তার; সেই আশায় ছ'সপ্তাহ ধরে সে জানালার একটা গরাদ কাটতে থাকে। কিন্তু গ্রীষ্মের মাঝামাঝি অপ্রত্যাশিতভাবে গোটা কেল্লাটাই খালি ক'রে ফেলা হয়, তেলোগিনকে যে সাজা দেওয়া হয়েছিল তার মেয়াদ তখনো উত্তীর্ণ হয়নি বলে তাকে পাঠানো হয় একটা জঘন্য বন্দীশালায়--যার নাম হয়ে গেছে 'পূতিগন্ধময় গহ্বর'। এ অতি সাংঘাতিক জায়গা। একটা বিস্তীর্ণ উপত্যকার মাঝখানে জলাভূমিতে দাঁড়িয়ে আছে চ্যাপটে নীচু লম্বা কুঁড়েঘর, তার চারদিক কাঁটাতার দিয়ে ঘেরা। দূরে পাহাড়ের ধারে ইটখোলার চিমনীগুলি আকাশে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে, মরচে ধরা একটা ন্যারো-গেজের রেলপথ জলাভূমিটার ওপর দিয়ে এসে শেষ হয়েছে কুঁড়েঘরগুলির অদূরে। ঘরগুলি রয়েছে গভীর গহ্বরের মধ্যে। গত বছর এই কাজ করার জন্য যখন বন্দীদের আনা হয় তখন পাঁচ হাজারেরও বেশি রুশ সৈন্য জ্বরবিকার ও আমাশয়ে মারা যায়। এই হরিৎ-পিঙ্গল উপত্যকার অপর প্রান্তে দৃষ্ট হয় কার্পেথিয়ান গিরিমালার আঁকাবাঁকা অভ্রভেদী রক্তিম শিখরসমূহ। কুঁড়েঘরগুলির উত্তরে জলাভূমির মধ্যে বহু দূরে তাকালে দেখতে পাওয়া যায়, দেবদারু কাঠের অনেকগুলি ক্রুশ মাটির ওপরে দাঁড়িয়ে আছে। গরমের দিনে জলাভূমি থেকে উত্থিত বাষ্প, ঘরের চতুর্দিকে অসংখ্য ডাঁশের ভনভনানি ও ম্লান লাল সূর্য মিলে এই নৈরাশ্যময় স্থানটিকে যেন একটি নরককুণ্ড ক'রে তুলেছে।

অ-খাদ্য খাওয়া, আবার তাও অপ্রচুর। অর্ধেক বন্দীই পেটের পীড়া, জ্বর, ফোঁড়া ও চর্মরোগে ভুগছে। তাহ'লেও বন্দী শিবিরে সকলের মধ্যেই যেন একটা আশার ভাব দেখা যায়। প্রচণ্ড বাধা পাওয়া সত্ত্বেও ব্রুসিলভ এগিয়ে চলেছে, শাম্পান ও শাপেএঁ ভের্দাঁ-এ ফরাসীরা জার্মানদের পরাজিত করেছে এসিয়া মাইনর থেকে তুর্কীদের হটিয়ে দেওয়া হচ্ছে। সত্যি, যুদ্ধ শেষ হতে যেন আর দেরি নেই।

কিন্তু গ্রীষ্ম গিয়ে বর্ষা আসে; ব্রুসিলভ ক্র্যাকাও বা ল্ভভ্ কোনটাই দখল করতে পারেনি আর ফরাসী রণাঙ্গনে যুদ্ধ স্তিমিত হয়ে এসেছে। কেন্দ্রীয়

শক্তিসমূহ ও মিত্রশক্তিবর্গ নিজেদের ক্ষত লেহন করছে। এটা এখন স্পষ্টই হয়ে গেছে যে, অন্তত শরৎকালের আগে যুদ্ধ কিছুতেই শেষ হচ্ছে না।

'পূতিগন্ধময় গহ্বরে' যাদের এনে রাখা হয়েছে এবার তারা সত্যি একটু নিরাশ হয়ে পড়েছে। তেলোগিনের পাশের বিছানায়ই থাকে ভিস্কোবয়নিকভ। হঠাৎ সে দাড়িগোঁফ কামানো ও ধোয়াকাচা বন্ধ করে দেয়, তার ভাঙ্গা খাটিয়াটার ধারে চারদিন ধরে শুয়ে থাকে, কেউ ডাকলে সাড়া দেয় না। সে একবার শোয়, একবার বসে, নিজের দেহ ভীষণভাবে চুলকায়। চুলকাতে চুলকাতে তার সর্বাঙ্গ লাল হয়ে ওঠে, আবার তা মিলিয়ে যায়। একদিন মাঝরাতে তেলোগিনকে ঠেলে জাগিয়ে তুলে বিষন্ন কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে সেঃ

"তেলোগিন, তুমি বিবাহিত ?"

"না।"

"ৎভের-এ আমার স্ত্রী ও এক কন্যা আছে। তুমি গিয়ে তাদের বলো, শুনছ !"

"আঃ, চুপ কর না! ঘুমিয়ে পড়।"

"হ্যাঁ ভাই, এবার আমি খুব ভালভাবেই ঘুমিয়ে পড়ব।"

পরদিন ভোরে নাম ডাকার সময় ভিস্কোবয়নিকভের কোন সাড়া নেই। দেখা যায়, সেতখানায় চামড়ার বেল্ট গলায় দিয়ে সে ঝুলছে। সমস্ত কুঁড়েঘরে একটা হৈচৈ পড়ে যায়। মৃতদেহটা যখন মেঝেতে নামানো হয়, তখন সকলে গিয়ে সেটাকে ঘিরে দাঁড়ায়। দুঃসহ বেদনায় ক্লিষ্ট মুখটার ওপর পড়েছে একটা লণ্ঠনের আলো, আর দেখা যাচ্ছে ছেঁড়া শার্টের নীচে বুকটায় নখের আঁচড়। লণ্ঠনের আলোও মনে হচ্ছে ঘোলাটে আর যে জীবন্ত লোকগুলি মৃতদেহটার ওপর ঝুঁকে আছে তাদের মুখগুলি দেখাচ্ছে পাংশু, স্ফীত, বিকৃত। তাদেরই ভেতর থেকে লেফ্‌টেনান্ট-কর্নেল মেলশিন নামক এক ব্যক্তি ঘরের যেখানটা অন্ধকার সেদিকে চেয়ে উচ্চৈস্বরে বলে ওঠেঃ

"কমরেডগণ, এজন্য কি আমাদের কিছু করবার নেই ?"

ভীড়ের মধ্যে এবং খাটিয়াগুলির ওপরে একটা চাপা গুঞ্জনধ্বনি শ্রুত হয়। ঠিক সে সময় সামনের দরজা টা খটাস করে খুলে যায়: প্রবেশ করে বন্দীশিবিরের অধিনায়ক একজন অস্ট্রিয়ান অফিসার। সে ঘরে ঢুকতেই লোকগুলি সরে দাঁড়িয়ে মৃতদেহের কাছে যাবার জন্য তাকে রাস্তা করে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলতে শোনা যায়ঃ

"আমরা আর এ সহ্য করব না!"

"তাকে আত্মহত্যার দিকে ঠেলে দেওয়া হয়েছে!"

"এই হচ্ছে তাদের মারবার পদ্ধতি!"

"আমি নিজেই তিলে তিলে পচে মরছি!"

"আমরা কয়েদী নই!"

"এখনো পর্যন্ত মার যাকে বলে তা খাওনি, শুয়োরের বাচ্চারা!" পাদুকা-

শীর্ষে জোর দিয়ে দাঁড়িয়ে চীৎকার ক'রে বলে অধিনায়কঃ "চুপ কর। যে যার জায়গায় চলে যাও। যত সব রুশ হারামজাদার দল!"

"কি?...কি বলছে সে?"

"আমরা সব রুশ হারামজাদার দল?"

ঠিক সেই মুহূর্তে মোটা, বেঁটে ক্যাপ্টেন ঝুকেভ একমুখ দাড়ি নিয়ে দুই কনুই-এ ভীড় ঠেলে এগিয়ে গিয়ে দাঁড়ায় সেই অস্ট্রিয়ান অধিনায়কের সামনে। দুটো আঙগুলের মধ্যে বৃদ্ধাঙ্গুলি ঢুকিয়ে তার মুখের কাছে নিয়ে একটা অশ্লীল ভঙ্গি ক'রে চেঁচিয়ে বলে সেঃ

"দ্যাখ, শালা, এই দ্যাখ, নেড়ী কুত্তার বাচ্চা!"

তারপর মাথা ঝাড়া দিয়ে সে খপ করে অধিনায়কের কাঁধ দুটো ধ'রে প্রচণ্ডভাবে ঝাঁকুনি দেয়, তাকে ধরাশায়ী ক'রে তার ওপর চেপে বসে।

দুজনের ধস্তাধস্তি চলে। বন্দী রুশ অফিসাররা তাদের ঘিরে একেবারে নীরবে দাঁড়িয়ে থাকে। এর মধ্যে শোনা যায়, সৈন্যরা কাঠের পাটাতনের ওপর দিয়ে খটাখট আওয়াজ করে ছুটে আসছে। অস্ট্রিয়ান অধিনায়ক চীৎকার করে ওঠেঃ "বাঁচাও!"

তেলেগিন তার সহবন্দীদের ঠেলে একপাশে সরিয়ে দেয় এবং বলেঃ

"তোমরা পাগল হ'লে নাকি? আর এক মিনিটের মধ্যেই যে গলা টিপে লোকটাকে মেরে ফেলবে!" ঝুকেভের দু'কাঁধ ধরে জোর ক'রে টেনে তাকে সে ছাড়িয়ে নেয়। অস্ট্রিয়ান অধিনায়ককে জার্মান ভাষায় বলে সেঃ "তুমি একটা পাজি!"

ঝুকেভ হাঁপাতে হাঁপাতে বলেঃ

"ছেড়ে দাও আমাকে, শালাকে একবার দেখিয়ে দেব শুয়োরের বাচ্চা বলার মজাটা কেমন!" ইতিমধ্যে অধিনায়ক উঠে দাঁড়িয়েছে। ধস্তাধস্তির সময় টুপিটা ছিটকে দূরে পড়েছিল, সেটাকে সে তুলে মাথায় দিয়েছে। তাড়াতাড়ি সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ঝুকেভ, তেলেগিন, মেলশিন এবং তাদের পাশে দাঁড়ানো আরো দু'তিনজন অফিসারের দিকে তাকায়; মনে হয় তাদের মুখ চিনে রাখার চেষ্টা করছে সে। তারপর একবার জুতো জোড়ার খটাখট শব্দ ক'রে দীর্ঘ পদক্ষেপে সে ব্যারাক থেকে বেরিয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে দরজায় তালা পড়ে এবং বাইরে প্রহরী মোতায়েন করা হয়।

সেদিন সকালে শিবির পরিদর্শন হ'ল না, ডঙ্কা বাজল না, এক ফাসের কাফিও এল না। দুপুরের দিকে সৈন্যরা এসে স্ট্রেচারে করে ভিস্কোবয়নিকভের মৃতদেহটা নিয়ে গেল। আবার দরজায় তালা পড়ল। বন্দীরা যে যার বিছানায় গিয়ে স্থান নিল, অনেকে শুয়ে পড়ল। সমস্ত কুটিরটা মনে হয় মড়ার মত নীরব। অবস্থাটা বুঝতে কারো বাকী নেইঃ বিদ্রোহ, অফিসারকে প্রহার এবং তারপর—কোর্ট মার্শাল।

তেলেগিন তার নিত্যকর্ম যথারীতিই ক'রে চলে। নিজের জন্য সে কত-

গুলি নিয়ম ক'বে নিয়েছে, বৎসবাধিককাল যাবৎ সেগুলি সে কঠোরভাবে পালন ক'বে আসছে, আজো তাব কোনবূপে ব্যত্যয় হয়নি। ভোর ছ'টায় শিবিরের লালচে জল পাম্প ক'রে সে একটা বালতি ভর্তি করে এবং সেই জল গায়ে ঢেলে গা'টাকে খুব বগড়ায, তারপর সে শ'খানেক ডনবৈঠক করে, দেখে নেয় তার দেহেব সমস্ত পেশীচালনা হ'ল কিনা, অতঃপর সে তাব পরিচ্ছদ পরে ও দাড়িগোঁফ কামায়, সেদিন কাফি না পাওয়ায় খালি পেটেই সে তার জর্মান ব্যাকবণ নিযে পডতে বসে।

বন্দীজীবনেব সর্বাপেক্ষা কণ্টকব ও মাবাত্মক ব্যাপাব হ'ল ইন্দ্রিয-নিগ্রহ। এ-ব্যাপাবে অনেকেব অবস্থা শোচনীয হয়ে দাঁড়ায। একজন হযত হঠাৎ তাব মুখে পাউডাব মেখে, কালি দিযে চোখ-ভ্রূ টেনে ঘবেব এক কোণে ব'সে তাবই মত মুখে পাউডাব মাখা আব একজনেব সঙ্গে সারাদিন ফিসফিস ক'রে খালি কথাই বলল আব একজন হযত কাবো সঙ্গে না মিশে, স্নান না কবে কম্বল মুডি দিয়ে সাবাদিন তাব ভাঙ্গা খাটিয়ায শুযেই বইল, আব একজনকে দেখা গেল সে অশ্লীল গল্প জুডে দিযেছে, এমন সমস্ত অশ্লীল গল্পই সে ছাডল যা লোকেব মুখে মুখে ছডিযে পডল, তারপব সে একদিন এমন কুকাজ ক'বে বসল যাব ফলে তাকে উন্মাদ হাসপাতালে নিযে যাওযা হ'ল। এ থেকে মুক্তি পাবাব একমাত্র উপায হচ্ছে কঠোব জীবন যাপন কবা। বন্দী অবস্থায় তেলেগিন অত্যন্ত স্বল্পভাষী হযে গেছে, তাব কঠিন পেশীগুলি হযে উঠেছে বর্মেব মত দৃঢ ও দুর্ভেদ্য তাব গতি দ্রুত অথচ সংযত তাব নযনে আছে একটা অনুক্ত নির্বাণ দীপ্তি ক্রোধ বা সংকল্পেব মুহূর্তে তাব দৃষ্টিপাত যে কোন লোকেব প্রাণে আতঙ্ক সৃষ্টি কবতে পাবে।

আগেব দিন যেসমস্ত জার্মান শব্দ লিখে নিযেছিল সেগুলি তেলেগিন তাড়াতাড়ি আবো বেশি মনোযোগ দিযে মুখস্থ কবে। তাবপব স্পাইলহাগেনেব একটা ছেঁডা খণ্ড খুলে সে পডতে বসে। ঝুকভ এসে তাব বিছানায বসে। তাব দিকে নজব না দিযে তেলেগিন আপন মনে আস্তে আস্তে পডতে থাকে। দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে ঝুকভ বলে:

'কোর্টমাশালে আমি পাগলামিব ভান কবব ইভান ইলিযিচ।'

তেলেগিন তাব দিকে এক ঝলক দৃষ্টিপাত কবে। ঝুকভেব বঙ্কিম আননে একটা সুজনতাব ভাব সুপবিস্ফুট নাকটা তাব চেপ্টা দাডিগুলি কোঁকডানো, অবিন্যস্ত গোঁফেব ফাঁক দিযে তাব উষ্ণ, কোমল অধবোষ্ঠ দেখা যাচ্ছে। অপবাধীব মত আনত মস্তকে আছে সে তাব চোখেব চিকণ ভেমাগুলি অনবরত কাঁপছে।

"কেন যে লোকটাব মুখেব কাছে বুড়ো নখ নিযে ওবকম কবলাম আমি জানিনে। আমি নিজেই বলতে পারিনে যে কি আমি কবতে চেয়েছিলাম। আমি বুঝতে পাবছি দোষ আমাবই। বাগে আমি দিশেহাবা হয়ে পড়েছিলাম,

তোমাদের সবাইকে আমি বিপদে ফেলেছি।...কাজেই আমি স্থির করেছি যে আমি বলব, আমি পাগল।...তোমার কি মত?"

পৃষ্ঠা ঠিক রাখার জন্য ভেতরে আঙ্গুল ঢুকিয়ে বইটা বন্ধ করে তেলেগিন, তারপর বলেঃ

"দ্যাখ, ঝুকেভ, আমাদের কয়েকজনকে যে গুলি ক'রে মারা হবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।...তুমি বোঝ সেটা?"

"হ্যাঁ।"

"অতএব বিচারের সময় নির্বোধের মত কোন কাজ না করতে যাওয়াই ভাল।..কি বল তুমি?"

"ঠিকই বলেছ তুমি।"

"তোমার কোন বন্ধুই তোমাকে দোষ দিচ্ছে না। একমাত্র কথা হ'ল এই যে, একজন অস্ট্রিয়ানের থোঁতা মুখ ভোঁতা ক'রে দেওয়ার যে আনন্দ পাওয়া গেছে তার জন্য মূল্য দিতে হবে একটু বেশি।"

"কোর্ট-মার্শালে আমার বন্ধুরা সব শাস্তি পাবে—এতে আমার মনের অবস্থা যে কি হয়েছে তুমি বুঝতে পার, ইভান ইলিয়িচ!" ঝাঁকড়া মাথাটা নাড়ে ঝুকেভ। "যত পারে হারামজাদারা আমাকে শাস্তি দিক না, অপরকে নিয়ে টানাটানি কেন!"

এভাবে সে অনেকক্ষণ ধ'রে ব'লে চলে, কিন্তু তেলেগিন সেদিকে কর্ণপাত না ক'রে আবার স্পাইলহাগেন খুলে পড়তে থাকে। খানিকক্ষণ বাদে সে উঠে দাঁড়ায়, হাত-পা মেলে টান করে, গ্রন্থিগুলি মটমট ক'রে ফুটতে থাকে। ঠিক সেই মুহূর্তে বাইরের দরজাটা খটাস্ ক'রে খুলে যায়, সঙ্গীন উঁচিয়ে চারজন সৈন্য প্রবেশ করে। তারা দরজার একেক দিকে দু'জন ক'রে দাঁড়ায়, রাইফেলের টিপকলের খটাখট শব্দ শুনতে পাওয়া যায়। তারপর আসে একজন সার্জেন্ট-মেজর—উগ্র চেহারা, একটা চোখ ব্যান্ডেজ করা। ঘরের চারদিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে জানোয়ারের মত কর্কশ কণ্ঠে সে হাঁক দেয়ঃ

"ক্যাপ্টেন ঝুকেভ, লেফটেনান্ট কর্নেল মেলশিন, সেকেন্ড-লেফটেনান্ট ইভান, সেকেন্ড-লেফটেনান্ট উবেকো, সাব-লেফটেনান্ট তেলেগিন।.."

যাদের নাম ধরে ডাকা হ'ল তারা এগিয়ে এসে দাঁড়ায়। সার্জেন্ট-মেজর শোনদৃষ্টিতে তাদের দিকে তাকায়। সৈন্যরা ঘর থেকে তাদের ঘিরে নিয়ে যায় প্রাঙ্গণ পেরিয়ে ছোট একটা কাঠের ঘরে। সেটা বন্দীশিবিরের অধিনায়কের কার্যালয়। এই মাত্র যে সামরিক গাড়ীটা এসেছে সেটা সেই ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। রাস্তায় বেরোবার পথে কাঁটাতার দিয়ে যে বাধা সৃষ্টি ক'রে রাখা হয়েছে তা সরিয়ে ফেলা হয়। কালো ও হলদে রংএর ডুরিকাটা সেন্ট্রি-বক্সটার সামনে নিশ্চল অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে একজন প্রহরী। স্টীয়ারিং-হুইলের পেছনে সামরিক গাড়ীর চালক পশ্চাদ্দিকে হেলান দিয়ে বসে আছে তার নিজের আসনে। বয়েস তার খুবই কম, চোখের পাতা ফুলো। মেলশিন

হে'টে চলেছে ঠিক তেলেগিনের পেছনেই। তেলেগিন তাকে আস্তে ধাক্কা মেরে বলে ঃ

"গাড়ী চালাতে জান ?"

"হ্যাঁ জানি। কেন ?"

"চুপ !"

অধিনায়কের কার্যালয়ে তাদের নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে পাটল বর্ণের ব্লটিং-পেপারে মোড়া দেবদারু কাঠের একটা টেবিলের পাশে বসে আছে তিন-জন নবাগত উচ্চপদস্থ অস্ট্রিয়ান সামরিক অফিসার। তাদের মধ্যে একজনের দাড়িগোঁফ খুব পরিষ্কার ক'রে কামানো, থুতনিটা নীলাভ, পুষ্ট গালে রক্ত যেন ফেটে বেরুচ্ছে, বসে বসে চুরুট টানছে সে। তেলেগিন লক্ষ্য করে, তারা যখন ঘরে ঢোকে, উক্ত অফিসারটি তাদের দিকে দৃকপাতও করে না, তার মোটা রোমশ হাত দু'টো রয়েছে টেবিলের ওপর, এক হাতের আঙুল আর এক হাতের আঙুলের মধ্যে ঢোকানো; চুরটের ধোঁয়া যাতে না লাগে তারজন্য চোখ দু'টো সে ছোট ক'রে আছে, জামার কলার গলায় প্রায় বসে গিয়েছে। "লোকটা তার রায় ঠিক ক'রেই বসে আছে," ভাবে তেলেগিন।

দ্বিতীয় বিচারক হ'ল আদালতের সভাপতি। লোকটা রোগা, বয়স্ক, দীর্ঘ বিষন্ন বদনে বার্ধক্যের অনেকগুলি রেখা পড়েছে, মুখে শুভ্র শাঁসাল গোঁফ। তার এক চোখে চশমা। আসামীদের সে বেশ নিরীক্ষণ ক'রে দেখে। চশমার ভেতর দিয়ে তার একটি ধূসর চোখের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় তেলেগিনের ওপর। দৃষ্টি স্বচ্ছ, করুণাদ্র, তাতে বুদ্ধির ছাপ আছে। তবে শুভ্র গুম্ফরাশির অগ্রভাগ ঈষৎ কাঁপছে।

"বিশ্রী বিশ্রী," ভাবে তেলেগিন আর তৃতীয় বিচারকের দিকে তাকায়। তার সামনে টেবিলের ওপর রয়েছে একজোড়া শেলের চশমা আর খুব ঘন ঘন ক'রে লেখা মোড়ানো এক শীট কাগজ। লোকটা খর্বাকৃতি, স্থূলকায়, গায়ের রং কাদার মত, খসখসে খাড়া চুল আর ডিমের বড়ার মত দু'টো বড় বড় কাণ। আমলাতান্ত্রিকতা ও অচরিতার্থ উচ্চাভিলাষের ছাপ তার হাবভাব ও সর্বাঙ্গে সুপরিস্ফুট।

টেবিলের সামনে আসামীরা গিয়ে সার দিয়ে দাঁড়ালে সে ধীরে তার গোল চশমাজোড়া পরে, হাতের চেটোটা কাগজটার ওপর মোলায়েম করে বুলোয় এবং হঠাৎ তার হলদে নকল দাঁতগুলি বার করে আসামীদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ গলা ছেড়ে পড়তে আরম্ভ করে।

মামলায় ফরিয়াদী হচ্ছে শিবিরের অধিনায়ক। টেবিলের এক পাশে অধরোষ্ঠ চেপে রক্তচক্ষু করে সে বসে আছে। অভিযোগের বিবরণ বুঝবার জন্য তেলেগিন খুবই মনোযোগ দিয়ে শুনবার চেষ্টা করে, কিন্তু চেষ্টা করলে কি হবে, আসলে তার চিন্তাধারা ধাবিত হয় অন্য পথে।

"...আত্মঘাতীর মৃতদেহ যখন ঘরে আনা হয়, বন্দীদের মধ্যে একদল

তখন এই ঘটনাকে একটা সুযোগ হিসেবে কাজে লাগাতে চায় এবং সমস্ত বন্দীকে অবাধ্য ক'রে তুলবার জন্য উত্তেজনা সৃষ্টি করে। তারা অকথ্য ভাষায় গালাগালি করতে থাকে এবং নানারকম অশ্লীল অঙ্গভঙ্গী করে। তারা মুষ্টি তুলে ভয় দেখায়। তাদের মধ্যে লেফ্‌টেনান্ট-কর্নেল মেলশিন নামক এক ব্যক্তির হাতে খোলা অবস্থায় পেন্সিল কাটবার একটা ছুরি ছিল।..."

জানালা দিয়ে তেলেগিন দেখতে পায় সেই সামরিক গাড়ীর ছোকরা চালকটা আঙুল দিয়ে তার নাক খোঁটে, তারপর নিজের আসনে পাশ ফিরে বসে এবং তার টুপির প্রকান্ড চুড়োটা মুখের ওপর টেনে দেয়। নীল লম্বা কোট গায়ে দু'জন বেঁটে সৈন্য হেঁটে গাড়ীটার কাছে আসে এবং সেটার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকে; একজন উপুড় হয়ে আঙুল দিয়ে মোটরের একটা চাকা টিপে দেখে। তারপর তারা ঘুরে দাঁড়ায়—প্রবেশ করে একটা ফিল্ড-কিচেন (রণাঙ্গনে ব্যবহার্য ভ্রাম্যমান রন্ধনশালাযুক্ত গাড়ী), তার চিম্‌নী দিয়ে অল্প অল্প ধোঁয়া উঠছে। ফিল্ড-কিচেনটা বন্দীশালার কুঁড়েঘরগুলির দিকে রওনা হয়; সৈন্য দু'জনও অলস চরণে সেদিকেই যেতে থাকে। সেই সামরিক গাড়ীর চালককে আর মাথা তুলতে দেখা যায় না, নড়েও না সে নিশ্চয়ই ঘুমিয়ে পড়েছে। তেলেগিন একটু চঞ্চল হয়ে ওঠে, দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরে, তারপর আবার প্রসিকিউটরের কর্কশ কণ্ঠস্বরের দিকে মন দেবার চেষ্টা করে।

" পূর্বোক্ত ক্যাপ্টেন ঝুকভ শিবিরাধিনায়ককে ভীতি প্রদর্শন করে, মুষ্টি তুলে সে তার দিকে এগিয়ে যায়, তর্জনী ও মধ্যমাঙ্গুলির মধ্যে অঙ্গুষ্ঠ প্রবেশ করিয়ে সে অশ্লীল ইঙ্গিত করে, সম্রাটের প্রতিনিধি ও রাজকীয় সৈন্যদলের প্রতি অসম্মান প্রদর্শনই ছিল তার উদ্দেশ্য। "

এই সময় অধিনায়ক উঠে দাঁড়ায়। মুখচোখ তার একেবারে লাল হয়ে গেছে। ঝুকভ তার আঙ্গুলের সাহায্যে ঠিক কি ইঙ্গিত করতে চেয়েছিল বিচারকগণ তা ভাল করে বুঝতে পারেনি। অধিনায়ক তাদের তা ব্যাখ্যা ক'রে বুঝিয়ে দিতে থাকে। ঝুকভ জার্মান ভাষা বোঝে না বললেই হয়, তবু খুব মনোযোগ দিয়ে অধিনায়কের কথাগুলি সে বুঝবার চেষ্টা করে, বোঝা যায় সেও কিছু বলতে চাচ্ছে, বন্ধুদের দিকে সে অপরাধীর মত তাকায়, একটু সরল হাসি হাসে; শেষ পর্যন্ত আর আত্মসম্বরণ করতে পারে না সে, রুশ ভাষায় প্রসিকিউটরকে সম্বোধন ক'রে বলে:

"কর্নেল সাহেব, আমাকে কিছু বলতে দিন। আমি তাকে বলেছিলাম: 'আমাদের সঙ্গে তুমি এরকম ব্যবহার কর কেন-কেন?'...আমি জার্মান ভাষা জানিনে, কাজেই বুঝতে পারছেন, আমার আঙ্গুল দিয়ে আমি তাকে সেকথা বোঝাবার চেষ্টা করছিলাম।"

"চুপ কর, ঝুকভ!" ফিসফিস ক'রে বলে তেলেগিন।

বিচারকমণ্ডলীর সভাপতি পেন্সিল দিয়ে টেবিলের ওপর ঠোকর মারে। প্রসিকিউটর অভিযোগপত্র পড়ে চলে।

ঠিক কিভাবে, কোথায় ঝ্রুকভ শিবিরাধিনায়ককে জাপ্‌টে ধরেছিল এবং চিত করে ফেলে দিয়ে টুঁটি চেপে তাকে মারবার চেষ্টা করেছিল, এসমস্ত সবিস্তার বর্ণনা ক'রে প্রসিকিউটর এবার অভিযোগপত্রের আসল জায়গায় আসে:

"...চীৎকার ও নানারূপ অঙ্গভঙ্গি ক'রে রুশরা খুনী লোকটাকে উত্তেজিত করে; কিন্তু সাব-লেফ্‌টেনান্ট ইভান তেলেগিন যখন টের পায় যে সৈন্যরা অধিনায়ককে উদ্ধার করবার জন্য ছুটে আসছে তখন সে ঝ্রুকভকে ধাক্কা মেরে একপাশে সরিয়ে দেয়; আর একটু হলেই অধিনায়ক মারা পড়ত।" এই বলেই প্রসিকিউটর একটু থামে এবং আত্মপ্রসাদের হাসি হাসে। "কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে প্রহরী এসে উপস্থিত হয় এবং তেলেগিন চীৎকার ক'রে অধিনায়ককে বলে: 'পাজি'!"

অতঃপর তেলেগিনের আচরণের সোজাসুজি মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করা হয়। বলা হয়: "এর আগে দু'দুবার সে বন্দীশালা থেকে পালাবার চেষ্টা করেছিল।" প্রসিকিউটর তেলেগিন ও ঝ্রুকভের বিরুদ্ধে মারাত্মক প্রহারের এবং মেলেশিনের বিরুদ্ধে পেন্সিল-কাটার ছুরি উঁচিয়ে হত্যার প্ররোচনাদানের অভিযোগ আনে। এই তিনজনের বিরুদ্ধে মামলাকে জোরদার ক'রে তুলবার জন্য সে ইভানভ ও উবেকোকে এই বলে রেহাই দেয় যে, 'তারা সুস্থ মস্তিষ্কে এ কাজ করেনি।'

অভিযোগপত্র পাঠের পর শিবিরাধিনায়ক দাঁড়িয়ে তা সমর্থন করে এবং বলে যে তাতে বর্ণিত সমস্ত ঘটনাই সত্য। এর পর সাক্ষ্যদানের জন্য সৈন্যদের ডাকা হয়, তাদের সাক্ষ্যেও একথাই সমর্থিত হয় যে, প্রথম তিনজন আসামী যথার্থ অপরাধী, অপর দুজন সম্পর্কে তারা কিছুই জানে না। বিচারকমণ্ডলীর সভাপতি তার অফিসার হাত দুটো ঘষে নিয়ে বলে যে, ইভানভ ও উবেকো বেকসুর খালাস, কারণ তাদের অপরাধের কোন প্রমাণ নেই। রক্তিমানন অফিসারটার মুখের চুরুট পুড়তে পুড়তে প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। সে ঘাড় নাড়ে, প্রসিকিউটরও একটু ইতস্ততঃ করার পর তাতে সায় দেয়। প্রহরীদের মধ্যে দুজন কাঁধে বন্দুক তোলে।

"বিদায়, বন্ধুগণ," বলে তেলেগিন।

ইভানভ মাথা নোয়ায়, উবেকো নীরবে ভয়ে ভয়ে তেলেগিনের দিকে তাকায়।

তাদের দুজনকে নিয়ে যাওয়া হয়। স্বপক্ষে কিছু বলার থাকলে আসামীরা যাতে তা বলতে পারে, বিচারকমণ্ডলীর সভাপতি এবার সে সুযোগ দেয়। তেলেগিনকে সে প্রশ্ন করে:

"বিদ্রোহের জন্য বন্দীদের তোমরা উত্তেজিত করেছিলে এবং শিবিরাধিনায়কের প্রাণনাশে চেষ্টিত হয়েছিলে, এই অপরাধ কি তোমরা স্বীকার কর?"

"না।"

"তোমার আর কিছু বলবার আছে?"

"এই অভিযোগ আগাগোড়া মিথ্যে।"

কিছু বলবার জন্য অধিনায়ক লাফিয়ে ওঠে, কিন্তু বিচারকমণ্ডলীর সভাপতি তাকে বাধা দেয়।

"বিবৃতিতে তুমি যা বলেছ তাছাড়া নতুন কথা তোমার কিছু আছে?"

"না, কিছু নেই।"

তেলেগিন টেবিলের পাশ থেকে সরে যায় এবং ঝুকভের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে। ঝুকভকে যখন প্রশ্ন করা হয় সে তখন লাল হয়ে ওঠে, নাক দিয়ে জোরে শ্বাস ফেলতে থাকে এবং তেলেগিন যা বলেছিল ঠিক সেই কথাগুলিরই পুনরাবৃত্তি করে। মেলশিনও একই কথা বলে। বিচারকমণ্ডলীর সভাপতি তাদের উত্তর শোনে এবং ক্লান্তভাবে দু'চোখ মুদ্রিত করে। অবশেষে বিচারকগণ উঠে পাশের ঘরে যায়। সকলের পেছনে গেল রক্তিমানন অফিসারটি। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে সে পোড়া চুরুটের অবশিষ্ট অংশটা ফেলে দিল এবং হৃষ্টচিত্তে হাত দু'টো তুলে গা-মোড়া দিয়ে দেহটাকে একটু চাঙগা করে নিল।

"ঘরে পা' দিয়েই বুঝতে পেরেছিলাম আমাদের গুলি করে মারার হুকুম হবে," আস্তে আস্তে বলে তেলেগিন। তারপর প্রহরীর দিকে ঘুরে বলে সে: "দয়া করে এক গ্লাস জল এনে দাও আমাকে।"

কাঁধ থেকে বন্দুক না নামিয়েই সে তাড়াতাড়ি টেবিলের ধারে যায় এবং ডিকান্টার থেকে খানিকটা ঘোলা জল ঢালতে থাকে। তেলেগিন চট করে মেলশিনের কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিস ফিস করে বলে:

"আমাদের যখন বাইরে নিয়ে যাবে ওরা, তুমি তখন মোটরটাকে স্টার্ট দেবার চেষ্টা করবে।"

"বুঝতে পেরেছি।"

এক মিনিটের মধ্যেই বিচারকগণ ফিরে এসে যে যার জায়গায় বসে। বিচারকমণ্ডলীর সভাপতি ধীরে তার সেই এক-চোখের চশমাটা খুলে ফেলে; চোখের সামনে সে এক টুকরো কাগজ তুলে ধরে, কাগজটা ঈষৎ কাঁপছে। সংক্ষিপ্ত দণ্ডাদেশ পড়ে সে—তেলেগিন, ঝুকভ ও মেলশিনকে গুলি করে মারা হবে।

তেলেগিনের নিশ্চিত ধারণা ছিল এরূপ দণ্ডই তাদের পেতে হবে, তথাপি কথাগুলি কানে প্রবেশ করা মাত্র তার হৃদপিণ্ডটা যেন একেবারে শোণিতশূন্য হয়ে যায়। ঝুকভ মাথাটা হেঁট করে। দীর্ঘ, বলিষ্ঠ, গরুড়পক্ষীর ন্যায় নাসাযুক্ত মেলশিন তার জিভ দিয়ে ধীরে অধরোষ্ঠ চাটতে থাকে।

বিচারকমণ্ডলীর সভাপতি তার ক্লান্ত চোখ দুটো রগড়ায়। তারপর হাতের চেটোতে দুচোখ ঢেকে সে বেশ শান্ত কণ্ঠে পরিষ্কারভাবে বলে:

"অবিলম্বে এই দণ্ডাদেশকে কার্যে পরিণত করার জন্য শিবিরাধিনায়ককে নির্দেশ দেওয়া যাচ্ছে।"

বিচারকগণ উঠে চলে যায়। একা অধিনায়ক কয়েক মুহূর্ত তীরের মত সোজা হয়ে বসে থাকে, তার মুখের রং ফ্যাকাশে সবুজ হয়ে গেছে। তারপর সে উঠে দাঁড়ায়, পোশাকটা টেনে ঠিক করে নেয় এবং অতিশয় তীক্ষ্ণ কণ্ঠে উপস্থিত সৈন্য দুজনকে আদেশ করে দণ্ডিত ব্যক্তিদের নিয়ে যাবার জন্য।

সংকীর্ণ দরজার ফাঁকে তেলেগিন মুহূর্তের জন্য থামে, মেলশিনকে আগে যাবার সুযোগ করে দেয়। মেলশিন এমন একটা ভাব দেখায় যেন সে মূর্ছা যাবে। একজন প্রহরীর হাত ধরে সে ভাঙা ভাঙা জার্মান ভাষায় কঁকিয়ে কঁকিয়ে বলে:

"একটু এগিয়ে এস, ভাই, দয়া করে একটু এগিয়ে এস। বড্ড পেটব্যথা! আর সহ্য করতে পারছিনে।..."

সৈন্যটি বিস্মিত হয়ে তার দিকে তাকায়, ধাক্কা দিয়ে তাকে সরিয়ে দেয়, ভয়ে ভয়ে চারদিকে চায়, ঠিক বুঝে উঠতে পারে না এ-অবস্থায় কি করা উচিত। কিন্তু মেলশিন তাকে কোনরকমে গাড়ীটার সামনের দিকে টানতে টানতে নিয়ে যায়, গিয়ে সে বসে পড়ে, মুখের নানা রকম ভঙ্গি করে সে, ব্যথায় যেন ছটফট করছে, আঙুলগুলি কাঁপাতে কাঁপাতে একবার সে পাতলুনের বোতাম চেপে ধরে, আবার গাড়ী স্টার্ট দেবার হাতলটায় হাত দেন। প্রহরীর মুখে যুগপৎ অনুকম্পা ও ঘৃণার ভাব ফুটে ওঠে।

"পেটব্যথা হয়ে থাকে তো একটু বসে নাও," ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলে সে। "তবে বেশি দেরি করা চলবে না!"

কিন্তু মেলশিন হঠাৎ প্রচণ্ড শক্তিতে গাড়ীর স্টার্টারটা ঘুরিয়ে দেয়। সৈন্যটি চকিত হয়ে তার ওপর ঝুঁকে পড়ে, তাকে টেনে সরাবার চেষ্টা করে। গাড়ীর ছোকরা চালক জেগে ওঠে, রেগে গিয়ে চীৎকার করে কি বলে এবং গাড়ী থেকে লাফিয়ে পড়ে। বাকী সমস্ত ঘটনা কয়েক মুহূর্তের মধ্যে ঘটে যায়। তেলেগিন যতদূর সম্ভব দ্বিতীয় প্রহরীর গা ঘেঁষে থাকার চেষ্টা করে এবং মেলশিনের সমস্ত কার্যকলাপ আড়চোখে দেখতে থাকে।

"ঝুকভ, ওর রাইফেলটা কেড়ে নাও! চীৎকার করে বলে তেলেগিন। মাজায় জড়িয়ে ধরে কাছের সৈন্যটিকে ওপর দিকে তোলে সে এবং মাটিতে প্রচণ্ডভাবে আছাড় মারে। কয়েক লাফে সে গাড়ীর ধারে গিয়ে হাজির হয়। মেলশিন সেখানে অপর সৈন্যটির রাইফেল ছিনিয়ে নেবার জন্য তার সঙ্গে লড়াই করছে। তেলেগিন তার গায়ের সমস্ত জোর দিয়ে লোকটার কানের পেছনে ঘুষি মারে, সে হাঁপাতে হাঁপাতে ধরাশায়ী হয়। মেলশিন লাফিয়ে উঠে চালকের আসনে গিয়ে বসে এবং গীয়ার টেনে দেয়। তেলেগিন দেখে

ঝুকেভ একটা রাইফেল নিয়ে গাড়ীতে উঠছে আর সেই ছোকরা অস্ট্রিয়ান চালক অতি সন্তর্পণে দেয়াল ঘেঁষে এগিয়ে গিয়ে হঠাৎ একলাফে শিবিরাধি-নায়কের ঘরের দরজা ফাঁক করে ভেতরে প্রবেশ করে। তারপর এক চোখে চশমাপরা, ক্রোধে বিকৃত একটা লম্বা মুখকে জানালা দিয়ে অনেকক্ষণ চেয়ে থাকতে দেখা যায়। এর পরই রিভলভার হাতে দ্রুত বারান্দায় বেরিয়ে আসে শিবিরাধিনায়ক। গাড়ীটার দিকে তাক করে সে। তার হাতে অনবরত রিভলবারটা নড়ছে। একটা গুলি .তারপর আর একটা।..

"তার গুলি ব্যর্থ হয়েছে, লাগেনি," ভাবে তেলেগিন। মনে হয় গাড়ীটা বুঝি আর কখনো চলবে না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এঞ্জিনের কলকব্জা ঘুরতে আরম্ভ করে, গাড়ীটা হঠাৎ ঝাঁকুনি দিয়ে সামনের দিকে ছুটে চলে। পেছন-দিককার চামড়ায়-মোড়া আসনে তেলেগিন বসে পড়ে। তার মুখে হু হু করে এসে বাতাস লাগছে। সেই ডুরি-কাটা সেন্ট্রি-বক্সটার দিকে তারা দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলে। সেখান থেকে প্রহরী রাইফেল তুলে গুলি চালায়, কিন্তু গাড়ীটা গর্জন করতে করতে একটা ঘূর্ণিবায়ুর মত তাকে অতিক্রম করে চলে যায়। শিবিরের সর্বত্র পলাতকদের পেছনে রাইফেলধারী সৈন্যরা এদিক-ওদিক ছুটো-ছুটি করতে থাকে, এক হাঁটু গেড়ে তারা বসে পড়ে, গুলি চালায়ঃ দুম্! দুম্! দুম্! গুলি চলে, কিন্তু আওয়াজ তেমন জোর নয়। ঝুকভ ঘুরে তাদের ঘুষি দেখায়। চতুষ্কোণাকারে সাজান সেই বিষণ্ণ কুঁড়েঘরগুলি ক্রমশ ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর, নিম্ন থেকে নিম্নতর হয়ে আসে, শেষ পর্যন্ত সেগুলি একটা বাঁকের পেছনে আড়াল হয়ে যায়। টেলিগ্রাফের খাম্বা, গাছ, দূরত্বসূচক পাথরের স্তম্ভগুলি মনে হচ্ছে তাদের দিকে ঝড়ের বেগে ছুটে এসে অকস্মাৎ মিলিয়ে যাচ্ছে।

মেলশিন ঘাড় ফেরাতেই দেখা যায় তার কপাল, একটা চোখ ও একটা গাল রক্তে ভেসে গেছে।

"সোজা যাব ?" চীৎকার করে জিজ্ঞেস করে সে তেলেগিনকে।

"সোজা পুলটা পেরিয়ে চলে যাও—তারপর ডানদিকে গিয়ে একেবারে পাহাড়ের পথ ধরবে।"

॥ আটাশ ॥

শরৎকালের সন্ধ্যা। জোরে বাতাস বইছে। কার্পেথিয়ান শৈলশ্রেণীতে বিরাজ করছে বিষাদ ও নির্জনতা। পার্বত্য রাস্তাটা বৃষ্টিতে ভিজে গেছে। সেই রাস্তা ধরে পলাতকগণ শৈলশীর্ষে উঠে চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। একটা ছোট গিরিশৃঙ্গে চার-পাঁচটা দেবদারু গাছ বাতাসে দুলছে। সেগুলির নীচে ঘন কুয়াশায় প্রায় অদৃশ্য একটা বন মর্মর-ধ্বনি করছে। আরো নীচে

এসে অর্থাৎ গিরিশৃঙ্গের পাদদেশে একটা স্রোতস্বিনী প্রবলবেগে প্রস্তররাশির ওপর দিয়ে সশব্দে প্রবাহিত হচ্ছে।

দেবদারু গাছগুলির ফাঁক দিয়ে বনাকীর্ণ গিরিশৃঙ্গসমূহের পশ্চাতে ধূসরবর্ণের মেঘরাশির মধ্যে দেখা যাচ্ছে অস্তগামী সূর্যের সুদীর্ঘ রক্তিম ছটা। প্রবল বাতাসে গাড়ীর চর্মাচ্ছাদনটা ফড়ফড় শব্দ করছে। পলাতকগণ নিঃশব্দে বসে আছে। ভেলেগিন উপুড় হয়ে মানচিত্র দেখছে। মেলশিনের মাথাটা একটা কানি দিয়ে বাঁধা; সূর্যাস্ত দেখছে সে।

'গাড়ীটা নিয়ে এখন আমরা কি করব?" মৃদুস্বরে জিজ্ঞেস করে সে। "পেট্রল তো শেষ।"

"কিন্তু গাড়ীটাকে কিছুতেই আমরা এখানে রেখে যেতে পারিনে," বলে ভেলেগিন।

"তাহলে এক কাজ করা যেতে পারে। গাড়ীটাকে ধরে তুলে নীচে ফেলে দেওয়া যাক," মেলশিন বলে। খাঁকারি দিয়ে গলাটা সে পরিষ্কার করে, গাড়ী থেকে লাফিয়ে রাস্তায় নামে, ঝেড়ে পা দুটো টান করে নেয়। তারপর ঝুকভের কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দিতে থাকে।

"এই, ক্যাপ্টেন, আমরা এসে পড়েছি। ওঠ!"

চোখ না মেলেই ঝুকভ গাড়ী থেকে লাফিয়ে নীচে নামে হোঁচট খায় এবং একটা পাথরের ওপর বসে পড়ে। গাড়ীর ভেতরে কয়েকটা চামড়ার কোট ও খাবার পড়ে ছিল। ভেলেগিন সেগুলি তুলে নেয়। খাবার আনা হয়েছিল বিচারকদের মধ্যাহ্ন ভোজনের জন্য। খাবারগুলি তিনজনে ভাগ করে নিয়ে যে যার পকেটে বেখে দেয়, গায়ে কোট চাপায় এবং তারপর মাডগার্ড ধরে গাড়ীটাকে ধারের দিকে ঠেলতে থাকে।

"তোমার যা করার তা করেছ বিগতযৌবনা প্রেয়সী," বলে মেলশিন। "মার তবে এবার সকলে মিলে একসঙ্গে ধাক্কা!"

সামনের চাকা দুটো ধার ধারে গিয়ে উঠেছে। চামড়ার আচ্ছাদন ও মুখে ব্রঞ্জযুক্ত, ধূলাকীর্ণ, লম্বা গাড়ীটা যেন পোষা জন্তুর মত কথা শোনে: নীচের দিকে মুখ করে গাড়ীটা পড়তে থাকে, ঝুরঝুর করে পড়ে কতগুলি প্রস্তরখণ্ড, বাড়ানো একটা শিলার সঙ্গে খায় ধাক্কা, ভেঙে উল্টে যায় গাড়ীটা, তারপর হুড়মুড় করে গিয়ে পড়ে সেই স্রোতস্বিনীতে আর তার সঙ্গে সঙ্গে পড়ে ছোট ছোট শিলা ও ভগ্ন ধাতুখণ্ড। পতনের শব্দ প্রতিধ্বনিত হয়ে কুয়াশাচ্ছন্ন সংকীর্ণ উপত্যকাটাকে মথিত করে তোলে।

পলাতকগণ বনের মধ্যে গিয়ে প্রবেশ করে এবং গাছগুলির ভেতর দিয়ে রাস্তার সমান্তরালে হেঁটে চলে। খুব কম কথাই তারা বলে, যা দু-এক কথা বলে তাও ফিসফিস করে। এতক্ষণে ঘোর অন্ধকার হয়ে গেছে। তাদের মাথার ওপরে দেবদারু গাছগুলি মর্মর করছে, মনে হচ্ছে যেন দূরে জলপ্রপাতের শব্দ। মাঝে মাঝে ভেলেগিন দূরত্বসূচক প্রস্তরফলক দেখবার জন্য রাস্তায়

যায়। এক জায়গায় মনে হয় সামরিক ঘাঁটি আছে। সেখানে অনেকটা পথ তারা ঘুরে যায়। ঘুরে যাবার সময় কয়েকটা সংকীর্ণ বন্ধুর গিরিসংকট তাদের অতিক্রম করতে হয়; অন্ধকারে যে-সমস্ত গাছ পড়ে আছে সেগুলিতে তারা হোঁচট খায়, ঝরণায় পড়ে গিয়ে জামাকাপড় ভিজে ও ছিঁড়ে যায়। কিন্তু সারা রাত ধরেই তারা হেঁটে এগিয়ে চলে। ভোর হবার মুখে একটা গাড়ীর শব্দ তাদের কানে আসে; খাদে নেমে তারা গা-ঢাকা দেয়; গাড়ীটা এত কাছ দিয়ে চলে যায় যে আরোহীদের গলার আওয়াজ পর্যন্ত তারা শুনতে পায়।

ভোরের দিকে ঘন বৃক্ষসন্নিবিষ্ট এক গিরিসংকটে একটা ক্ষুদ্র পার্বত্য নদীর ধারে পলাতকগণ ঘুমোবার জন্য জায়গা বেছে নেয়। আহারের পর তারা আধ ফ্লাস্ক ব্রান্ডি পান করে। গাড়ীতে মরচে-পড়া একটা ক্ষুর পাওয়া গিয়েছিল, ঝুকভ সঙ্গীদের বলে তা দিয়ে তার মুখটা কামিয়ে দিতে। দাড়ি গোঁফ কামিয়ে দিতেই দেখা যায়, তার মুখখানা একেবারে কচি। ঝুকভের মুখের এই তারুণ্য দেখে তার সঙ্গীরা অবাক হয়ে যায়। তেলেগিন ও মেলশিন তার মুখের দিকে চেয়ে হো হো করে হেসে ওঠে আর নিজেদের উরত চাপড়াতে থাকে। ঝুকভ খুব খুশি; অধরোষ্ঠ ভেতর দিকে টেনে গরুর মত সে হাম্বা হাম্বা করতে থাকে--তাকে নেশায় ধরেছে। দুই সাথী তাকে পাতা দিয়ে ঢেকে বলে ঘুমিয়ে পড়তে।

অতঃপর তেলেগিন ও মেলশিন মানচিত্রটা ঘাসের ওপর খুলে বসে এবং প্রত্যেকেই নিজের জন্য তা থেকে স্থানের বৃত্তান্তযুক্ত এক-একটি ছোট নক্সা তৈরী করে নেয়। স্থির হয় পরদিন এরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে--মেলশিন ও ঝুকভ যাবে রুমানিয়ার দিকে আর তেলেগিন যাবে গ্যালিসিয়ার দিকে। বড় মানচিত্রটা তারা গর্ত করে মাটিতে পুঁতে রাখে। তারপর কিছু পাতা জড় করে দুজনে শুয়ে পড়ে এবং পাতা দিয়ে নিজেদের ঢেকে দেয়। নিমেষেই ঘুমিয়ে পড়ে তারা।

গিরিসংকটের ওপরে রাস্তার ধারে একটা লোক রাইফেল ভর করে দাঁড়িয়ে আছে; সেতুটা পাহারা দিচ্ছে একজন প্রহরী। তার চতুর্দিকে ও নিম্নে বিরাজ করছে বিজন বিপিনের নিস্তব্ধতা, একমাত্র শোনা যায় দেবদারু গাছের ভেতর দিয়ে ধাবমান বন্য-কুক্কুটের ডানার ঝাপট ও বহু দূরে জলপ্রপাতের শব্দ। প্রহরী দাঁড়িয়ে এক মুহূর্ত কান পেতে কি শোনে, তারপর রাইফেলটা কাঁধে তুলে চলে যায়।

তেলেগিন চোখ মেলে দেখে অন্ধকার হয়ে গেছে। নিষ্কম্প বৃক্ষশাখা-সমূহের ফাঁক দিয়ে দেখা যায়, আকাশে তারাগুলি জ্বলজ্বল করছে। আগের দিনের সমস্ত ঘটনা তার মনে পড়ে, কিন্তু সেই কোর্ট-মার্শালে বিচার ও তাদের পলায়নের সময়কার মানসিক উত্তেজনার স্মৃতি এতই তিক্ত মনে হয় তার কাছে যে সে জোর করে সেই চিন্তাকে তার মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলে।

"তুমি কি জেগে আছ নাকি, ইভান ইলিয়িচ?"

মৃদুস্বরে জিজ্ঞেস করে মেলাশিন।

"হ্যাঁ, খানিকক্ষণ ধরে জেগে আছি। উঠে ঝুকভকে জাগাও।"

এক ঘণ্টা পরে দেখা যায় তেলোগিন একটা রাস্তা ধরে একা একা হেঁটে চলেছে। অন্ধকারে সাদা রাস্তাটা স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে।

॥ উনিশ ॥

দশম দিনে তেলোগিন যুদ্ধএলাকায় পৌঁছয়। দশদিন ধরে সে শুধু রাত্রিবেলা পথ চলেছে, ভোর হলেই সে গিয়ে জঙ্গলে গা-ঢাকা দিত এবং পর্বত থেকে যখন তরুহীন প্রান্তরে তাকে নেমে আসতে হত, তখন লোকালয় থেকে যতদূর সম্ভব দূরে সে ঘুমোবার স্থান নির্বাচন করত। গেরস্থদের শব্জীবাগান থেকে চুরি-করা কাঁচা শাক-সবজি খেয়ে তাকে জীবন-ধারণ করতে হত।

সেদিন রাত্রে বৃষ্টি হয়ে বড় ঠান্ডা পড়েছে। তেলোগিন যে রাস্তা ধরে চলেছে তা দিয়ে পশ্চিম দিকে যাচ্ছে আহত লোক-বোঝাই একাধিক অ্যাম্বুলান্স-গাড়ী আর যাচ্ছে ঘরকন্নার জিনিসপত্রপূর্ণ কৃষকদের কংগুলি মালটানা শকট ও দলে দলে নারী ও বৃদ্ধ, তাদের হাতে কাঁধে রয়েছে শিশু, বোঁচকা ও বাসনকোসন।

বিপরীত দিকে অর্থাৎ পূবে রণাঙ্গন অভিমুখে যাচ্ছে রসদ ও সৈন্য-বোঝাই ট্রেন। ১৯১৪ ও ১৯১৫ সাল কেটে গিয়ে যে ১৯১৬ সালও শেষ হতে চলেছে একথা ভাবতেও কেমন বিস্ময় বোধ হয়, এখনো ভাঙা রাস্তা দিয়ে কৃষকদের সেই মালটানা গাড়ীগুলির ক্যাঁচকোঁচ শব্দ করে যাওয়া এবং কামানের গোলায় দগ্ধ ও বিধ্বস্ত গ্রামের অধিবাসীদের দারুণ হতাশায় শ্রান্ত-চরণে সেই পথ ধরে চলার বিরাম নেই। তবে পার্থক্য যেটুকু দেখা যায় তা হচ্ছে এই: সেই প্রকাণ্ড যুদ্ধাশ্বগুলি এমনই ক্লান্ত হয়ে পড়েছে যে সেগুলির যেন আর নড়বার শক্তি নেই, সৈন্যদের অবস্থা জীর্ণশীর্ণ এবং এখন অবয়বেও তারা অপেক্ষাকৃত ছোট, গৃহহারার দল নীরব ও উদাসীন। পূব দিকে একটা কনকনে হাওয়া নিম্নাকাশের মেঘগুলিকে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে, সেদিকে মানুষ এখনো মানুষকে হত্যা করছে এবং কোন পক্ষই কোন পক্ষকে নিশ্চিহ্ন করতে পারছে না।

একটা জলা-উপত্যকা ও একটা স্ফীতবক্ষ নদীর উপরিস্থিত সেতু অতিক্রম করে অন্ধকারে চলেছে অসংখ্য মানুষ ও বহু শকট। শোনা যাচ্ছে চাকার ঘর্ঘর শব্দ, চাবুকের আওয়াজ আর পশুগুলির প্রতি চালকদের তাড়না; দেখা যাচ্ছে অসংখ্য লণ্ঠনের নৃত্য, সেতুর কাঠের খুটিগুলি ঘিরে সৃষ্টি হয়েছে যে ঘোলাজলের আবর্ত তার ওপর গিয়ে পড়েছে সেগুলির আলো।

রাস্তার পিছল ঢালু ধারটা দিয়ে তেলোগিন কোনরকমে পুলটার মুখে

গিয়ে হাজির হয়. কিন্তু পুলটার ওপর দিয়ে এত গাড়ী যাচ্ছে যে, রাত থাকতে সেটা পার হবার কোন আশাই নেই।

পুলের মুখে গিয়ে ঘোড়াগুলি গাড়ী টেনে তুলবার জন্য একটু নীচু হয়ে ভেজা কাঠের ওপর জোর দিয়ে খুর ফেলে। সেতুমুখের একপাশে একটা লোক লণ্ঠন হাতে ঘোড়ার পিঠে বসে কর্কশ কণ্ঠে চীৎকার করছে; জামাটা তার হাওয়ায় ফুলে উঠেছে। একটি বৃদ্ধ তার কাছে এগিয়ে আসে এবং মাথার টুপি নামিয়ে তাকে কি জিজ্ঞেস করে। কোন জবাব না দিয়ে ঘোড়ার ওপর বসা লোকটা তার হাতের ভারী লণ্ঠনটা দিয়ে মারে সেই বৃদ্ধকে জোরে ঘা, বৃদ্ধ গাড়ীর চাকার নীচে পড়ে যায়।

পুলের অপর মুখটা অন্ধকারে ঢাকা, তবে লণ্ঠনের যে ম্লান আলো স্থানে স্থানে পড়েছে তাতে মনে হয় ওপাড়ে হাজার হাজার শরণার্থী রয়েছে। পুলের ওপর দিয়ে গাড়ীর সারি মন্থর গতিতে এগিয়ে চলেছে। একটা গাড়ীর পাশ ধরে হেঁটে চলে তেলেগিন; সেই গাড়ীতে কম্বল গায়ে বসে আছে একটি রোগা-পানা স্ত্রীলোক, চুল তার চোখের ওপর এসে পড়েছে। এক হাতে সে একটা পাখীর খাঁচা ধরে আছে, আর এক হাতে রয়েছে লাগাম। হঠাৎ গাড়ীটা থেমে যায়। স্ত্রীলোকটি ভয়ে ঘাড় ফেরায়। সেতুর অপর মুখে কোলাহল শুনতে পাওয়া যায়; লণ্ঠনগুলি দ্রুত আন্দোলিত হতে থাকে। কিছু ঘটে থাকবে। একটা ঘোড়া বিকটভাবে চিঁ-হি করে ওঠে। পোলিশ ভাষায় হাঁক দিয়ে বলতে শোনা যায়ঃ "যে-যার নিজেকে বাঁচাও!" তারপরই গগন বিদীর্ণ করে ওঠে গুলির আওয়াজ। ঘোড়াগুলি থমকে দাঁড়ায়, গাড়ীগুলি কড়মড় আওয়াজ করে, নারী ও শিশুরা চেঁচামেচি ও আর্তনাদ করতে থাকে।

দূরে ডানদিকে কয়েকবার আলোর বিচ্ছুরণ দেখতে পাওয়া যায়, চলে পাল্টা গুলিগোলা। ব্যাপারটা ভাল করে দেখবার জন্য তেলেগিন একটা চাকার নাভির ওপর উঠে দাঁড়ায়। বুকে যেন তার হাতুড়ির ঘা পড়ছে। মনে হয় নদীর ওপরে চারদিক থেকেই চলেছে গুলিগোলা। হাতে পাখীর খাঁচা নিয়ে সেই স্ত্রীলোকটি গাড়ী থেকে নামতে গিয়ে স্কার্টটা আটকে গিয়ে পড়ে যায়। কাতরকণ্ঠে সে চীৎকার করে ওঠেঃ "আমাকে বাঁচাও!" পাখীর খাঁচাটা ঢালু পাড়টা দিয়ে গড়িয়ে নীচে পড়ে যায়।

হল্লা ও গাড়ীর ঘর্ঘর শব্দ—সেতুর ওপর দিয়ে এবার গাড়ীগুলি চলেছে দ্রুত গতিতে। সঙ্গে সঙ্গে অনেকবার হুঁশিয়ারি শুনতে পাওয়া যায়ঃ "থামো! থামো!" তেলেগিন দেখে একটা বড় গাড়ী পুলটার ধারে গিয়ে রেলিং ভেঙে নীচে নদীতে পড়ে যায়। সে চাকার ওপর থেকে লাফিয়ে নামে, রাস্তায় যে-সমস্ত পোঁটলাপুঁটলি পড়ে ছিল সেগুলি ডিঙিয়ে চলন্ত গাড়ীর সারিটাকে গিয়ে ধরে এবং একটা গাড়ীর ওপর উঠে বসে। টাটকা রুটির গন্ধ তাকে পাগল করে তোলে। ত্রিপলের নীচে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে এক টুকরো রুটি সে ছিঁড়ে আনে এবং হাবাতের মত খেতে থাকে।

অবশেষে হৈচৈ-গোলমাল ও গুলিগোলার মধ্যে গাড়ীগুলি পুলের অপর ধারে গিয়ে পেঁছায়। তেলেগিন গাড়ী থেকে লাফিয়ে পড়ে শরণার্থীদের শকট-সমূহের ভেতর দিয়ে কোন রকমে নিজের পথ করে নেয়; রাস্তা ছেড়ে তার ধার দিয়ে সে হাঁটতে থাকে। অন্ধকারে যেসমস্ত টুকরো কথা তার কানে এসেছে তা থেকে সে অনুধাবন করতে পেরেছে যে, তারা বলাবলি করছিল শত্রুপক্ষের একজনের অর্থাৎ একটি রুশ প্রহরীর সঙ্গে গুলি বিনিময় হয়েছে। তার অর্থ রণাঙ্গন ছ' মাইলের বেশি দূর হবে না।

দম নেবার জন্য তেলেগিন মাঝে মাঝে থেমে দাঁড়ায়। বৃষ্টি ও বাতাসের দরুন পথ চলতে খুবই কষ্ট হচ্ছে। দু' হাঁটুতে তার ব্যথা হয়ে গেছে, মুখ জ্বালা করছে, চোখ দুটো ফুলে উঠেছে। শেষ পর্যন্ত রাস্তার পাশের একটা পরিখার ধারে মাটির ঢিবির ওপর হাতে মাথা রেখে সে বসে পড়ে। বরফের মত ঠাণ্ডা বৃষ্টির ফোঁটাগুলি তার ঘাড় বেয়ে পড়তে থাকে, সর্বাঙ্গে তার ব্যথা।

ঠিক সেই মুহূর্তে তার কানে আসে একটা আওয়াজ, মনে হয় যেন দূরে একটা মাটির ধ্বস নামল। মিনিকখানেক বাদে আবার সেই শব্দটা শুনতে পাওয়া যায়। মাথা তুলে কান পেতে শোনে সে। এই দুই গভীর নিশ্বাসের মাঝখানে আর একটা আওয়াজ কানে আসে, একবার সেটা মিলিয়ে যায় আবার গুড় গুড় করে ওঠে। যেদিকে সে যাচ্ছে সেদিক থেকে শব্দটা আসছে না, আসছে বাঁদিক থেকে, প্রায় বিপরীত দিক থেকেও বলা যায়।

পরিখার অপর ধারে গিয়ে সে বসে, এবার সে স্পষ্ট দেখতে পায় সীসার মত কালো অন্ধকার, আকাশটায় আলুথালু মেঘ নীচ দিয়ে উড়ে চলেছে। ভোর হয়ে এসেছে। ঐ তো পূব দিক, ওদিকে রয়েছে রুশিয়া।

তেলেগিন উঠে দাঁড়ায়, কোমরবন্ধটা আঁট করে নেয় এবং তারপর পিছল কাদার ভিতর দিয়ে সেদিকে হাঁটতে শুরু করে। ফসল-কাটার পর শস্যের গোড়াগুলি মাঠে রয়ে গেছে, সেগুলি বৃষ্টির জলে ভেজা, আগের বছর যেসমস্ত পরিখা খনন করা হয়েছিল সেগুলি আধবোজা অবস্থায় পড়ে আছে তেলেগিন হোঁচট খেতে খেতে এগিয়ে চলে এসমস্ত অতিক্রম করে।

একেবারে ফর্সা হয়ে গেলে তেলেগিন আবার দেখতে পায় একটা সড়ক মাঠের ভেতর দিয়ে চলে গেছে, লোক ও গাড়ীঘোড়ায় সেটা পরিপূর্ণ। দাঁড়িয়ে চারদিকে তাকায় সে। সড়কটার অদূরেই একটা প্রকাণ্ড গাছের তলায় দাঁড়িয়ে আছে একটা ছোট সাদা গীর্জা। দরজা ভাঙা, গোল গম্বুজটার চারপাশে ও মাটিতে দগ্ধ পাতা ছড়িয়ে পড়ে আছে।

তেলেগিন ঠিক করে সন্ধ্যা না হওয়া পর্যন্ত সেখানে সে অপেক্ষা করবে। সে গিয়ে গীর্জায় প্রবেশ করে, শেওলাপড়া মেঝেয় শুয়ে পড়ে। পচা পাতার দুর্গন্ধে তার মাথাটা ঘুরতে থাকে। দূর থেকে গাড়ীর চাকার ঘর্ঘর শব্দ ও চাবুকের আওয়াজ তার কানে আসে। সেই আওয়াজগুলি তার কাছে আশ্চর্য

রকম মিঠে মনে হয়, হঠাৎ সেগুলি থেমে যায়। কে যেন আঙুল দিয়ে তার চোখের পাতা বুজিয়ে দিচ্ছে। তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় সে দেখতে পায় জীবন্ত একটা কি এসে যেন এক লহমার জন্য তার চোখের সামনে দাঁড়ায়। বুঝি বা স্বপ্ন হয়ে উঠবে, কিন্তু তা আর হতে পারল না সেটা। এতই ক্লান্ত হয়ে পড়েছে তেলেগিন যে, গোঙাতে গোঙাতে আরো গভীরভাবে ঘুমিয়ে পড়ে সে। কিন্তু সেই জীবন্ত ছায়ামূর্তিটা তাকে কিছুতেই শান্তি দিচ্ছে না। তার ঘুম ক্রমশ পাতলা হয়ে আসে এবং আবার সে দূরে সেই গাড়ীর চাকার ঘর্ঘর শব্দ শুনতে পায়। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সে উঠে বসে। দরজা দিয়ে সে দেখতে পায় আকাশে ঘন মসৃণ মেঘ; মেঘের গোড়ার দিকটার রং সীসার মত, সেখান থেকে অস্তগামী সূর্যের রশ্মিগুলি আকাশে ওপরের দিকে উঠে গেছে এক একটা স্তম্ভের আকারে। গীর্জার পুরনো দেয়ালে খানিকটা ম্লান আলো এসে পড়ায় অনেকদিনের কাঠের বিবর্ণ ম্যাডোনা মূর্তিটার সোনালি জ্যোতির্মণ্ডলযুক্ত আনত মুখখানি একটু উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে; তার কোলে শায়িত আছে নানা রঙের ছিটের ফ্রক পরা শিশু খৃষ্ট, আশীর্বাদের ভঙ্গিতে যে হাতখানি তার তোলা ছিল সেটা ভেঙে গেছে।

তেলেগিন গীর্জা থেকে বেরিয়ে আসে। দোরে পাথরের সিঁড়িতে একটি শিশু কোলে নিয়ে বসে আছে একটি অল্প বয়সের মেয়ে। তার গায়ে কিষাণীদের একটা সাদা পোশাক, সেটার নানা জায়গায় কাদা লেগেছে। এক হাতে মাথা রেখেছে সে, আর একটা হাত রয়েছে শিশুর উজ্জ্বল রঙীন কম্বলটার ওপর। ধীরে মাথা তুলে সে তেলেগিনের দিকে চায়। তার দৃষ্টি উজ্জ্বল ও অদ্ভুত, অশ্রুসিক্ত সকরুণ মুখখানির দিকে তাকালে মনে হয় বুঝি তাতে হাসি লুকিয়ে আছে। মৃদুস্বরে রুথেনিয়ান ভাষায় বলে সে:

"বাছা আমার বেঁচে নেই।"

আবার সে গালে হাত দিয়ে সামনের দিকে ঝুঁকে বসে। তেলেগিন সামান্য উপুড় হয়ে তার মাথা ধরে নাড়া দেয়। দীর্ঘনিঃশ্বাস ও কান্নামিশ্রিত একটা শব্দ করে সে সাড়া দেয়।

"এস আমার সঙ্গে। আমি ওকে বয়ে নিয়ে যাব," কোমলকণ্ঠে বলে তেলেগিন।

মেয়েটি মাথা নাড়ে।

"আমি কোথায় যাব? আপনি একাই যান।"

তেলেগিন এক মুহূর্ত কি ভাবে, তারপর মাথার টুপিটা টেনে চোখ পর্যন্ত নামিয়ে দিয়ে হাঁটা শুরু করে। ঠিক তখনি দুজন অস্ট্রিয়ান সামরিক পুলিশ গীর্জার পেছন দিক থেকে জোর কদমে ঘোড়া ছুটিয়ে এগিয়ে আসে। গাল-পাট্টাযুক্ত নীলাভ মুখ তাদের; গায়ের কোট ভেজা ও কাদা-মাখা। অশ্বপৃষ্ঠে চলতে চলতে তেলেগিনের দিকে তারা তাকায় ও বল্গা টানে। সামনের জন কর্কশকণ্ঠে চীৎকার করে বলে:

"এদিকে এস!"

তেলেগিন আদেশ পালন করে। জিনের ওপর থেকে ঝুঁকে পুলিশটা তার কটা চোখ দিয়ে সন্ধানী দৃষ্টিতে তেলেগিনকে নজর করে দেখে; হয় ঠাণ্ডা হাওয়া লেগে না হলে অনিদ্রায় তার চোখ দুটো জ্বল জ্বল করে ওঠে।

"রুশ!" চেঁচিয়ে বলে সে এবং তেলেগিনের কলারটা টেনে ধরে। তেলেগিন নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টা করে না, শুধু একটু বক্র হাসি হাসে।

গাড়ী রাখবার একটা চালাঘরে তালাবন্ধ করে তারা তাকে আটকে রাখে। তখন অন্ধকার হয়ে গেছে। কামানের আওয়াজ স্পষ্ট শুনতে পাওয়া যায়। কাঠের বেড়ার ফাঁক দিয়ে তেলেগিন তোপ-দাগার ম্লান লাল আভা পর্যন্ত দেখতে পায়। আগের দিন গাড়ী থেকে যে-রুটিটা সে তুলে নিয়েছিল তার অবশিষ্ট অংশটুকু এবার সে খেয়ে শেষ করে। তারপর কাঠের বেড়ার ভেতর দিয়ে পালাবার কোন পথ আছে কিনা সে খুঁজতে থাকে। হোঁচট খেয়ে সে শক্ত করে বাঁধা শুকনো ঘাসের একটা গাঁইটের ওপর পড়ে যায়; হাই তুলে তার ওপর সে শুয়ে পড়ে। কিন্তু চোখে তার ঘুম নেই। মাঝ রাতের একটু পরেই অদূরে সে বড় কামানের গর্জন শুনতে পায়। বেড়ার ফাঁক দিয়ে লাল অগ্নিবিচ্ছুরণ দেখতে পাওয়া যায়। তেলেগিন উঠে বসে কান পেতে শোনে। ঘন ঘন গোলা-বর্ষণ হতে থাকে, চালাঘরের কাঠের বেড়া কেঁপে ওঠে, সহসা ঘরের অতি নিকটেই রাইফেলের গুলির আওয়াজ হয়।

যুদ্ধ যে এগিয়ে আসছে সে-বিষয়ে আর সন্দেহ নেই। বেড়ার ফাঁক দিয়ে সে লোকের চেঁচামেচি ও একটা মোটর গাড়ীর ভোঁস্ ভোঁস্ শব্দ শুনতে পায়। বহু লোকের পদধ্বনিও তার কানে আসে। বাইরের বেড়াটার গায়ে একটা ভারী কি বস্তু এসে পড়ে। এবার তেলেগিন বুঝতে পারে কাঠের বেড়ায় এসে লাগছে রাইফেলের গুলি। মনে হচ্ছে মটর-কলাই যেন এসে ঝুরঝুর করে বেড়ার ওপর পড়ছে। তৎক্ষণাৎ সে টান হয়ে মাটিতে শুয়ে পড়ে।

ঘরের মধ্যেও বারুদের গন্ধ ঢোকে। ক্রমাগত গুলিগোলা চলেছে—বোঝা যায় রুশরা প্রচণ্ড গতিতে আক্রমণ চালিয়ে এগিয়ে আসছে। তবে সেই কান-ফাটা শব্দ বেশিক্ষণ স্থায়ী হল না। হাতবোমা বিস্ফোরণের আওয়াজ কানে আসে, মনে হয় যেন এক সঙ্গে অনেকগুলি বাদাম ভাঙা হচ্ছে। লাফিয়ে উঠে বেড়ার ধার দিয়ে পায়চারি করতে থাকে সে। রুশ আক্রমণ কি তবে প্রতিহত হয়েছে? অবশেষে সে শুনতে পায় গভীর হুঙ্কার, চীৎকার, মানুষের পদধ্বনি। সঙ্গে সঙ্গে গোলাগুলি বর্ষণ থেমে যায়। অনেকক্ষণ নীরবতার মধ্যে কাটবার পর আস্তে কয়েকটা ধুপধাপ শব্দ ও ধাতুর ঝন্ ঝন্ আওয়াজ। তারপর ভয়ার্ত কণ্ঠে চীৎকার:

"কামেরাদ! রুশ! রুশ!"

একটা টুকরো চেরা-কাঠ খুলে ফেলে তেলেগিন দরজার ফাঁকটা বড় করে এবং তা দিয়ে উঁকি মেরে দেখে, মাথা বাঁচাবার জন্য হাত ঊর্ধ্বে তুলে লোক

ছুটছে। ডানদিক থেকে ঘোড়সওয়াররা তাদের ধাওয়া করে ভীড়ের মধ্যে গিয়ে ঢোকে, ঢুকেই তারা চক্রাকারে ঘুরতে থাকে। ঘোড়সওয়ারদের মস্ত বড় ছায়াগুলি পড়েছে নীচে। তিনজন লোক হেঁটে আসতে থাকে চালাঘরটার দিকে। একজন ঘোড়সওয়ার তাদের অনুসরণ করে, কাঁধের ওপর তার কসাকী-মস্তকাবরণের লম্বা প্রান্তভাগসমূহ উড়ছে। প্রকাণ্ড ঘোড়াটা পেছনের পা' দুটোয় ভর করে দাঁড়ায়; জানোয়ারটার নাসায় শব্দ। সওয়ার মাতালের মত তার অসি উদ্যত করে, মুখটা তার বিস্ফারিত। ঘোড়ার সামনের পা দুটো আবার মাটি স্পর্শ করা মাত্রই সে তার অসি দিয়ে পলায়নোন্মুখ একটা লোককে মারে কোপ; নামবার সময় অসিটা বাতাসে শোঁ আওয়াজ করে ওঠে। পেশী কেটে মানুষটার দেহে ঢুকেই তরবারিটা মট করে ভেঙে যায়।

"আমি বেরোব," দরজায় ঘা মারে তেলেগিন আর উন্মত্তের মত চেঁচায়।

ঘোড়সওয়ার লাগাম টানে।

"কে ডাকছে ?"

"একজন বন্দী। একজন রুশ অফিসার।"

"একটু সবুর কর !"

ঘোড়সওয়ার ভগ্ন অসির মুখটা হাত থেকে ছুঁড়ে ফেলে দেয়, তারপর সামনের দিকে ঝুঁকে মারে দরজায় জোরে ধাক্কা, আগলটা সরে গিয়ে দরজাটা খুলে যায়। তেলেগিন ঘর থেকে বেরিয়ে আসতেই দুর্মদ কসাক ডিভিসনের যে অফিসারটি তাকে মুক্ত করে সে একটু রসিকতা করে বলেঃ

"তা হলে আবার দেখা হল।"

তেলেগিন তাকে আরো নজর করে দেখে এবং বলেঃ

"আপনাকে তো আমি চিনিনে। চিনি ?"

"কেন, আমি যে সাপোঝকভ—সাগেই সার্গিয়েভিচ সাপোঝকভ।"

হো হো করে হেসে ওঠে সে। "আমি এখানে আসতে পারি এ তুমি আশাই করতে পারনি, না ? একেই বলে যুদ্ধ। যুদ্ধ যে কি না করতে পারে !"

॥ ত্রিশ ॥

মস্কো পৌঁছাতে আর ঘন্টাখানেক বাকি। লম্বা টানা হুইসল্ দিয়ে ট্রেনটা ঘর্ঘর শব্দ করতে করতে বনের ভেতরকার গ্রীষ্ম নিবাসের শূন্য কুটীর-গুলি অতিক্রম ক'রে চলে। এঞ্জিনের সাদা ধোঁয়া গিয়ে মিশে যাচ্ছে শরতের পাতায় পাতায়, উজ্জ্বল হলদে রংএর ভুর্জবৃক্ষের ঝোপে আর যে ধূমলবর্ণ অ্যাসপেন গাছের ঝাড় থেকে ব্যাঙের ছাতার গন্ধ বেরিয়ে আসছে তাতে। এখানে সেখানে মেপল্ গাছের লাল শাখাগুলি লাইনের ওপর এসে পড়েছে।

ঝোপের মধ্য দিয়ে দেখতে পাওয়া যায়, কুটীরগুলির খড়খড়ি বন্ধ, ফুলের বাগান সাজান রয়েছে রঙীন কাচের গ্লোব দিয়ে, পথে ও দরজার সামনের সিঁড়িতে পড়ে আছে ঝরা পাতা।

ট্রেনটা একটা ছোট স্টেশন অতিক্রম ক'রে যায়। সেখানে থলে কাঁধে দু'জন সৈন্য উদাসভাবে ট্রেনটার দিকে তাকায় আর দেখা যায় ছোট চেক কোট পরা বিষণ্ণ বদন একটি মেয়ে বেঞ্চের ওপর একলা বসে তার ছাতার বাঁটের মাথা দিয়ে প্ল্যাটফর্মের ভেজা তক্তায় নক্সা আঁকছে। একটা বাঁকে এসে গাছের পেছনে দেখতে পাওয়া যায় কাঠের একটা সাইনবোর্ড: তাতে একটা বোতল আঁকা রয়েছে আর লেখা আছেঃ শুস্তভের এন্ডারবেরি ভদকার তুলনা নেই। এর পরই বনটা শেষ হয়ে যায়। রেল লাইনটা পড়ে গিয়ে একটা মাঠে। দু'-পাশে রয়েছে ফিকে সবুজ রঙের বাঁধাকপির লম্বা লম্বা সারি। একটা লেভেল ক্রসিং-এ ঘাসবোঝাই একটা অশ্বশকট ট্রেনটা চলে যাওয়ার অপেক্ষায় দাড়িয়ে আছে। মেষের চামড়ায় তৈরী পুরুষের একটা জামা পরে ভীত টাট্টু ঘোড়াটার মুখ ধরে দাঁড়িয়ে আছে একজন স্ত্রীলোক। দূরে মেঘের নীচে মস্কোর চোখা চূড়োগুলি এরই মধ্যে দেখা দিয়েছে: সেন্ট জেভিয়ার-এর গগনচুম্বী উজ্জ্বল গম্বুজটা সবগুলিকে ছাড়িয়ে উঠেছে।

তেলেগিন গাড়ীর জানলার ধারে বসে আছে। শরৎকালের পচা পাতা, ব্যাঙের ছাতা, পোড়া ঘাস ও ভোরের পাতলা শিশিরে ভেজা মাটির সুতীব্র গন্ধ এসে প্রবেশ করছে তার নাকে।

পেছনে পড়ে আছে তার দু'বছরের দুঃখের জীবনের দুর্গম পথ; আজ তার অবসান হয়ে সামনে দেখা দিয়েছে এক আশার উজ্জ্বল জগৎ। হিসেব ক'রে দেখেছে সে ঠিক আড়াইটার সময় সে গিয়ে একটা দরজায় বেল টিপতে পারবে -সেই একটি মাত্র দরজার কথাই ভাবছে সে--কল্পনায় সে দেখতে পায় দরজাটা হাল্কা ওক কাঠে নির্মিত, মাথার দিকে ছোট দুটো জানালা আছে।

সবজি ক্ষেতগুলি শেষ হয়ে রেলপথের দু'পাশে দেখা দেয় শহরতলির কাদামাখা কতগুলি বাড়ি, খোয়া বার করা রাস্তা দিয়ে ঘর্ঘর ক'রে চলেছে শকট সমূহ; বেড়ায় ঘেরা বাগানগুলিতে দেখা যাচ্ছে অনেক পুরনো লাইম গাছ, সেগুলি শাখা বিস্তার করেছে ছোট ছোট রাস্তার ওপর: মাঝে মাঝে দেখা যাচ্ছে নানা বর্ণের উজ্জ্বল সাইনবোর্ড: পথচারীরা চলেছে যে যার আপন মনে, ট্রেনটা যে গর্জে চলেছে তার দিকে বা জানালার ধারে বসা তেলেগিনের দিকে কারো নজরও নেই। অনেক নীচে রাস্তায় একটা চলন্ত ট্রামগাড়ী তার চোখে পড়ে, দেখে মনে হয় যেন একটা খেলনা যাচ্ছে; কতগুলি বাড়ির পেছনে দেখা যায় একটা ছোট গীর্জার গম্বুজ, তারপর রেলপথের সংযোগস্থলে ট্রেনের চাকাগুলি একবার ঘর্ঘর করে ওঠে। অবশেষে দুঃসহ দীর্ঘ দু'টি বছর অতিক্রান্ত হবার পর ট্রেনের দু'পাশে দেখা দেয় মস্কো স্টেশনের কাঠের প্ল্যাট-ফর্ম। সাদা অ্যাপ্রন-পরা পরিচ্ছন্ন ও সম্পূর্ণ উদাসীন বৃদ্ধের দল এসে ওঠে

ট্রেনে। জানালা দিয়ে গলাটা অনেকখানি বাড়িয়ে তেলেগিন চারদিকে তাকায়। পরক্ষণেই ভাবে সেঃ "কি বোকা তুমি! কাকে খুঁজছ? তুমি যে আসবে এ-খবর কি কাউকে দিয়েছ?"

স্টেশন থেকে বেরিয়ে এসে সে রাস্তায় দাঁড়ায়; তার মুখে আর হাসি ধরে না। প্রায় পঞ্চাশ গজ দূরে একটা স্কোয়ারে অনেকগুলি ঘোড়ার গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে সারবন্দী হয়ে। কোচোয়ানরা তাদের আসনে বসে হাত তুলে চীৎকার করে ডাকছেঃ

"আমি আপনাকে নিয়ে যাব, আসুন, আমার গাড়ীতে আসুন!"

"আসুন, সার, দেখছেন কেমন কালো ঘোড়া!"

"জলদি যাবেন তো আমার গাড়ীতে আসুন, সার, রবারের চাকা!"

শক্ত করে লাগাম-পরান রয়েছে ঘোড়াগুলির মুখে। সেগুলি মাঝে মাঝে খুর দিয়ে খটাখট শব্দ করছে, নাক দিয়ে জোরে শ্বাস ফেলছে আর থেকে থেকে ডাকছে। সমস্ত স্কোয়ারটায় একটা সোরগোল পড়ে গেছে, মনে হয় আর এক নিমেষেই গাড়ীর সারিটা ছুটে এসে বুঝি স্টেশনটাকে তচনচ করে দেবে।

একটা উঁচু ঘোড়ার গাড়ীতে গিয়ে চড়ে তেলেগিন, বসবার আসনটা ছোট। কোচোয়ানের চেহারা ভাল, কথা বলে বেশি। শিষ্টাচার দেখাবার জন্য কণ্ঠস্বর মোলায়েম করে প্রশ্ন করে সেঃ "কোন্ ঠিকানায় যেতে হবে?" আরোহীকে তাক লাগিয়ে দেবার জন্য সে চট করে একপাশে গিয়ে বসে এবং বাঁ হাতে আলগাভাবে লাগামটা ধরে ঘোড়াটাকে হাঁকায়। কদমে ছুটতে থাকে ঘোড়াটা আর রবারের চাকা ঘুরে এগিয়ে চলে রাস্তার শানগুলির ওপর দিয়ে।

"যুদ্ধ থেকে ফিরলেন বুঝি, সার?" জিজ্ঞেস করে কোচোয়ান।

"হ্যাঁ, যুদ্ধে বন্দী হয়েছিলাম, পালিয়ে এসেছি।"

"সত্যি? আচ্ছা, সেখানকার অবস্থা কি? লোকে বলে যে, সেখানে নাকি কেউ খেতেই পায় না। ও ঠান্‌দি, দেখে চল...তাহলে আপনি দেশের একজন বীর, কি বলেন? সেখান থেকে পালিয়ে আসছে অনেকেই।..এই গাড়োয়ান, দেখছ না কোন্ দিকে যাচ্ছ! গোবরগণেশ কোথাকার! ইভান ত্রিভনোভিচের নাম শোনেননি আপনি?"

"সে আবার কে!"

"রাজ্জগুলিয়াই স্ট্রীটে থাকে সে—কাপড়ের ব্যবসা করে। গতকাল সে আমার গাড়ী ভাড়া করেছিল, কেঁদেই ফেলল সে। শুনুন মজার কাণ্ড! যুদ্ধের ঠিকাদারী করে সে অনেক পয়সা কামিয়েছে, একেবারে ফেঁপে উঠেছে —গত পরশুদিন তার স্ত্রী এক পোলিশ ছোকরার সঙ্গে পালিয়ে গেছে। আমরা কোচোয়ানরা সকলে সারা মস্কো শহরে এখবর ছড়িয়ে দিয়েছি। ইভান ত্রিভনোভিচ এখন লজ্জায় আর ঘরের বার হতে চায় না। যেমন লোকের রক্ত শোষণ করেছে, পেয়েছে তেমনি তার ফল!"

ঘোড়াটা ঘাড় বাঁকিয়ে বার বার পেছন দিকে ক্রুর দৃষ্টিতে তাকায় আর

ঝড়ের বেগে ছুটে চলে; তবু তেলেগিন কোচোয়ানকে বলেঃ "ওহে বুড়ো, একটু তাড়াতাড়ি চালাও।"

"এই যে আমরা এসে পড়েছি, সার, দু' নম্বর দরজা। হোয়া. ভাসিয়া!"

সাদা ছোট বাড়িটার দিকে তেলেগিন ব্যগ্রভাবে এক ঝলক দৃষ্টি ফেলে; ছ'টা জানালায় পরিষ্কার লেসের পর্দা ঝুলছে। গাড়ী থেকে সে লাফিয়ে নামে। দরজাটা পুরনো, গভীরভাবে খোদাই করা, ওপরে রয়েছে একটা সিংহের মাথা, ইলেক্‌ট্রিক বেলের বোতামের পরিবর্তে আছে টেনে ঘণ্টা বাজাবার একটা হাতল। কয়েক মুহূর্ত সে দাঁড়িয়ে থাকে, ঘণ্টা বাজাবার হাতলটায় হাত দেবার সামর্থ্য যেন তার নেই; মন্দ গতিতে চলেছে হৃদয়ের স্পন্দন, যেন শ্বাসপ্রশ্বাসে কষ্ট হচ্ছে তার। "এখনো তো কিছুই ঠিক নেই। তারা সকলেই হয় তো বেরিয়ে গিয়ে থাকবে নয় তো আমার সঙ্গে দেখাই করল না," মনে মনে ভাবে সে আর ঘণ্টা বাজাবার পেতলের হাতলটা ধরে টানে। ভেতরে ঘণ্টাটা একবার টুং করে বেজে ওঠে। "নিশ্চয়ই ভেতরে কেউ নেই।" এমন সময় তার কানে আসে নারীর চপল লঘু পদধ্বনি। তেলেগিন হঠাৎ বিহ্বল দৃষ্টিতে চারদিকে তাকায়। কোচোয়ান তার দিকে চেয়ে চোখ টেপে আর হাসে। এর মধ্যে শিকলের একটা আওয়াজ হয় ও দরজাটা একটু খুলে যায়। দরজার ফাঁক দিয়ে দেখা দেয় বাড়ির ঝিয়ের মুখ—মুখে তার বসন্তের দাগ।

"দারিয়া দ্মিত্রেভ্না বুলাভিন কি এখানে থাকে?" খাঁকারি দিয়ে গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে জিজ্ঞেস করে তেলেগিন।

"হ্যাঁ, সার, দারিয়া ভেতরেই আছেন। আপনি এদিকে আসুন," দরদমাখা মধুর কণ্ঠে বলে সে। "মিস দারিয়া ও তাঁর দিদি দুজনেই বাড়িতে আছেন।"

স্বপ্নাতুরের মত হাঁটতে হাঁটতে তেলেগিন গিয়ে একটা ছোট হল-ঘরে প্রবেশ করে· কাচের পার্টিশন রয়েছে তাতে। ঘরটা ঝুড়ি ও ট্রাঙ্কবাক্সে ভর্তি, ফার কোটের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। ডানদিকে আর একটা দরজা খুলে দেয় ঝি—দরজাটা কালো অয়েলক্লথে ঢাকা। একটা সবু পথে আধা অন্ধকারে দেখা যাচ্ছে আংটায় ঝুলানো রয়েছে মেয়েদের গায়ে দেবার একটা কোট। আয়নার সামনে একটা শেল্‌ফ-এর ওপর পড়ে আছে কয়েকটা দস্তানা, রেড-ক্রস লাগানো নার্সের একটা মস্তকাবরণ আর একটা রেশম মিশ্রিত পশমের শাল। এই সমস্ত নির্দোষ বস্তু থেকে বেরিয়ে আসছে এমন একটা সুমধুর গন্ধ যা অনাঘ্রাত না হলেও দুর্লভ। তেলেগিনের নাম জিজ্ঞেস না করেই ঝি ভেতরে খবর দিতে চলে যায়।

তেলেগিন তার আঙুল দিয়ে রেশম মিশ্রিত পশমের শালটাকে স্পর্শ করে এবং অকস্মাৎ তার মনে হয় এই পবিত্র, সুন্দর জীবন ও তার মধ্যে কোন সম্পর্ক থাকতে পারে না, রক্তের নরককুণ্ড থেকে সদ্য উঠে এসেছে সে।

"কে একজন আপনাকে ডাকছেন, মিস দারিয়া," ডান দিকে কোনও একটা

জায়গা থেকে ঝিয়ের গলার আওয়াজ আসে। তেলেগিন তার চোখ দুটো বোজে—বুঝি বা বজ্রপাত হবে—আপাদমস্তক কাঁপছে তার। দ্রুত পরিষ্কার কণ্ঠে বলতে শোনা যায়ঃ

"আমাকে? কে সে?"

ঘরগুলির মধ্য দিয়ে কে একজন তার দিকে এগিয়ে আসছে, তার পায়ের শব্দ শুনতে পায় তেলেগিন। দু' বছর ধরে যে এই পদধ্বনির প্রতীক্ষায়ই ছিল সে। দাশা হলঘরের দরজায় এসে উপস্থিত হয়, জানালা দিয়ে যে আলো এসে পড়েছে তাতে তার অবয়বটা দেখা যায়। আলোতে তার হাল্কা চুল সোনার মত জ্বলজ্বল করছে। যেন একটু রোগা ও লম্বা দেখাচ্ছে তাকে। একটা বোনা ব্লাউজ ও নীল রং-এর স্কার্ট পরেছে সে।

"আপনি আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন?" বলে সে এবং বজ্রাহতের মত দাঁড়িয়ে থাকে।

তার মুখের চেহারা অন্য রকম হয়ে যায়, ভ্রু দুটো কপালে ওঠে, হাঁ করে তাকিয়ে থাকে সে, কিন্তু ক্ষণেকের মধ্যেই এই সচকিত ভাব তার কেটে যায়, বিস্ময় ও আনন্দে চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

"তুমি?" অস্ফুটভাবে বলে সে। তারপর প্রচণ্ড আবেগে দু'হাতে তেলেগিনের গলা জড়িয়ে ধরে তার কোমল, কম্পিত অধরোষ্ঠ দিয়ে তাকে চুম্বন করতে থাকে। এর পর একটু সরে গিয়ে বলে তাকেঃ

"এস আমার সঙ্গে, ইভান ইলিয়িচ!"

দাশা ড্রইংরুমে ছুটে গিয়ে একটা আর্মচেয়ারে বসে পড়ে এবং দু' জানুর ওপর ঝুঁকে পড়ে দু'হাতে মুখ ঢাকে।

"আমি জানি এর কোন মানে হয় না, কিন্তু কি করব, কি করব আমি! ভেব না, এক্ষুনি সামলে নেব আমি," ফিস ফিস করে বলে সে আর যতদূর সম্ভব জোরে চোখ দুটো মোছে। তেলেগিন এর সামনে দাঁড়িয়ে থাকে। সহসা দাশা চেয়ারের বাহু দুটো জোরে চেপে ধরে মাথা তোলে।

"ইভান ইলিয়িচ, তুমি কি পালিয়েছিলে?"

"হ্যাঁ।"

"পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ!—তারপর?"

"তারপর আর কি—সোজা এখানে চলে এলাম।"

টুপিটা মাথায় ভাল করে বসিয়ে দাশার বিপরীত দিকে একখানি চেয়ারে সে উপবেশন করে।

"কি করে তা সম্ভব হল?" ভাঙা গলায় জিজ্ঞেস করে দাশা।

"যেমন সাধারণত হয়ে থাকে।"

"বিপজ্জনক তো?"

"হ্যাঁ...তা বই কি, তবে বিশেষ কিছু নয়।"

এভাবে তারা আরো খানিকক্ষণ আলাপ করে চলে; মাথায় তাদের যা আসে

তাই তারা বলে যায়। ক্রমশ তারা আত্মস্থ হয়। মেঝের দিকে চোখ রেখে দাশা প্রশ্ন করেঃ

"তুমি কি অনেকদিন ধরে মস্কো এসেছ ?"

"স্টেশন থেকে সোজা এখানে এসেছি।"

"রাখো, এক্ষুনি আমি কফির অর্ডার দিচ্ছি।"

"না, ওসবে দরকার নেই। আমি এখন গিয়ে কোথাও একটা হোটেল দেখি।"

দাশা তখন কোমল স্বরে বলেঃ "সন্ধ্যার দিকে আসবে তো ?"

কথা না বলে তেলেগিন ঘাড় নেড়ে সায় দেয়। দম নিতে তার কষ্ট হচ্ছে। উঠে দাঁড়ায় সে।

"এখন যাই," বলে তেলেগিন। "সন্ধ্যের দিকে আবার আসব।"

দাশা তার হাতটা তেলেগিনের দিকে বাড়িয়ে দেয়। সে তার কোমল, দৃঢ় হাতটা চেপে ধরে, করস্পর্শে তার সর্বাঙ্গ উষ্ণ হয়ে ওঠে, মুখ লাল হয়ে যায়। হাতের জোরে চাপ দিয়ে সে হলঘরের মধ্যে চলে যায়, দরজার কাছে গিয়ে ফিরে দাঁড়ায়। আলোর সামনে দাঁড়িয়ে আছে দাশা, আনত নয়নে সে তেলেগিনের দিকে তাকায়।

"সাতটার সময় আসব, দারিয়া দ্মিত্রেভ্না ?"

ঘাড় নেড়ে সায় দেয় দাশা। তেলেগিন দ্রুত বেরিয়ে গিয়ে কোচোয়ানকে বলেঃ

"একটা হোটেলে নিয়ে চল, ভাল হোটেল—সব চেয়ে ভাল হোটেল হওয়া চাই, বুঝলে ?"

লম্বা কোটের আস্তিনের মধ্যে হাত দুটো ঢুকিয়ে দিয়ে ঘোড়ার গাড়ীটায় সে হেলান দিয়ে বসে। মুখে তার প্রাণখোলা হাসি। লোকজন, গাছপালা, গাড়ীঘোড়া সব কিছুই কিরকম নীলাভ ছায়ার মত তার চোখের ওপর দিয়ে ভেসে যাচ্ছে। রুশ শহরের বিচিত্র গন্ধযুক্ত শীতল সমীরণ তার বদনমণ্ডলকে স্নিগ্ধ করে দিচ্ছে। দাশার করস্পর্শের উষ্ণতা এখনো যেন তার আঙুলে লেগে আছে। হাতখানা তুলে সে নাকের কাছে নেয় এবং হাসতে হাসতে আপন মনে বলেঃ "যাদু।"

তেলেগিনকে বিদায় দেবার পর দাশা ড্রইং-রুমে জানালার ধারে দাঁড়িয়ে থাকে। কি একটা সুর যেন বাজছে তার মধ্যে; কি যে হয়ে গেল ভাবতেও পারে না সে। নিমেষের জন্য সে চোখ দুটো জোরে বোজে, তারপর দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলে তাড়াতাড়ি দিদির ঘরে চলে যায়।

কাতিয়া জানালার ধারে বসে কি সেলাই করছিল ও ভাবছিল। দাশার পায়ের শব্দ শুনে মুখ না তুলেই সে জিজ্ঞেস করেঃ

"দাশা, তোর সঙ্গে কে দেখা করতে এসেছিল রে ?"

দাশা তার দিকে চেয়ে থাকে, মুখটা তার কাঁপছে।

"সে...তুই বুঝতে পারিসনি, দিদি ? সে—মানে, ইভান ইলিয়িচ।"
কাতিয়া সেলাইটা রেখে দিয়ে দু'হাত এক করে।
"দিদি—জানিস তুই ?—আমার আনন্দ হয়নি—আমার খালি ভয় করছে," নিরানন্দ কণ্ঠে বলে দাশা।

॥ একত্রিশ ॥

সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসতেই প্রতিটি শব্দে দাশা চমকে ওঠে আর খালি বার বার ড্রইং-রুমে যায় ও কান পেতে কি শোনবার চেষ্টা করে। বার কয়েক সে অন্যমনস্কভাবে একটা উপন্যাস খোলে—এক পাতা থেকে আর অন্য পাতায় যাওয়া হয় না। পড়ে সেঃ "মারুসিয়া চকোলেট খেতে ভালবাসত, তার স্বামী ক্রাফট্ থেকে তাকে তা এনে দিয়েছিল।. ."

রাস্তার ওপারে অভিনেত্রী চারোদায়েভার ফ্ল্যাটে কুয়াশাচ্ছন্ন গোধূলির ম্লান আভায় হঠাৎ আলো জ্বলে ওঠে, দুটো জানালা দিয়ে তা দেখতে পাওয়া যায়। সাদা টুপি মাথায় একটি পরিচারিকা টেবিল সাজাচ্ছে। তারপর দেখা দেয় চারোদায়েভা নিজে, কঙ্কালসার চেহারা, হাড় গিরগিব্ করছে। তার কাঁধের ওপর রয়েছে ভেলভেটের একটা স্কন্ধাবরণ। টেবিলের পাশে বসে সে হাই তোলে—বোধ হয় পেছনে সোফায় শুয়ে এতক্ষণ সে ঘুমোচ্ছিল। তার থালায় খানিকটা সুরুয়া সে চামচ দিয়ে তুলে নেয়, কিন্তু হঠাৎ সে যেন ধ্যানস্থ হয়ে যায়, শুকনো গোলাপ-ভরা একটা ছোট ফুলদানির দিকে কাচের মত স্বচ্ছ চোখ দুটো দিয়ে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে।

"মারুসিয়া চকোলেট খেতে ভালবাসত," দাঁত চিবিয়ে চিবিয়ে পুনরাবৃত্তি করে দাশা। ঠিক সেই মুহূর্তে ঘণ্টা বেজে ওঠে। দাশার হৃদস্পন্দন বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু আর কেউ নয়, হকার সান্ধ্যপত্রিকা দিয়ে গেল। "সে আসবে না," দাশা ভাবে। খাবার ঘরে চলে যায় সে। সেখানে সাদা টেবিলক্লথের ওপরে একটা মাত্র বাল্ব জ্বলছে। ঘড়িটার টিক্ টিক্ আওয়াজ হচ্ছে। সাতটা বাজতে পাঁচ মিনিট বাকী। দাশা টেবিলের ধারে বসে। "এইভাবেই টিক্ টিক্ করে তিলে তিলে জীবন ক্ষয় হয়ে যায়," ভাবে সে।

সামনের দরজায় আর একবার ঘণ্টা বেজে ওঠে। দাশা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে, ঢোঁক গেলে, তারপর লাফিয়ে উঠে ছুটে যায় হলঘরে।...হাসপাতাল থেকে এক তাড়া কাগজ নিয়ে এসেছে একজন বার্তাবহ। ইভান ইলিয়িচ আসবে না। যাকগে, না আসাই ভাল। দু' বছর তার প্রতীক্ষায় ছিল সে, কিন্তু আজ যখন সে এসে হাজির তখন তাকে বলবার মত একটি কথাও খুঁজে পায় না সে।

ছোট একটা রুমাল খুলে তার একটা কোণা সে দাঁত দিয়ে কামড়াতে থাকে।

এ অসহ্য, ভাবে সে। মুখে বসন্তের দাগওয়ালা ঝি যে কখন দরজা খুলে এসে ভেতরে দাঁড়িয়েছে সে টেরই পায়নি। ঝি বলেঃ

"এক ভদ্রলোক আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন, মিস।"

গভীর নিঃশ্বাস ফেলে দাশা খাবার ঘরে চলে যায়। কাতিয়া প্রথম তাকে দেখতে পায় এবং তার দিকে চেয়ে হাসে। ইভান ইলিয়িচ লাফিয়ে ওঠে, চোখ মিট মিট করে তাকায় এবং সোজা হয়ে দাঁড়ায়।

তেলেগিনের গায়ে একটা নতুন সার্জের টিউনিক কোট ও তার ওপর একটা আনকোরা বেল্ট; বেল্টটা তার একপাশে কাঁধের ওপর দিয়ে চলে গেছে; সদ্য দাড়িগোঁফ কামানো ও চুল ছাঁটা। এখন বেশ স্পষ্টই নজরে পড়ে সে কত লম্বা ও তার কাঁধ দুটো কত প্রশস্ত। সে যে একেবারে নতুন মানুষ হয়ে গেছে এবিষয়ে আব কোন সন্দেহ নেই। তার নির্মল চোখ দুটিতে সেই আগেকার দৃঢ়তার ছাপ, সরল অধরোষ্ঠের দুপাশে দুটি সরু রেখা।..দাশা বুঝতে পাবে এ হল মৃত্যু, বিভীষিকা ও দুর্ভোগের চিহ্ন। তেলেগিনের হাত আগের মতই শক্ত ও শীতল।

একখানি চেয়াব টেনে দাশা তেলেগিনের পাশেই বসে। মুষ্টিবন্ধ হাত দুটো টেবিলের ওপব রেখে তেলেগিন দুবোনের কাছে দ্রুত তার বন্দীদশা ও পলায়নের কাহিনী বলতে আরম্ভ কবে। দাশা তার পাশ ঘেঁষে বসে মুখের দিকে হাঁ কবে চেয়ে কথাগুলি গিলতে থাকে। গল্প বলার সময় নিজের কণ্ঠস্ববই তেলেগিনের কাছে কেমন যেন অপরিচিত ও দূরাগত শোনায; নিজেই সে মাঝে মাঝে অত্যন্ত উত্তেজিত ও অভিভূত হয়ে পড়ে। তারই পাশে উপবিষ্ট যে তরুণীটির পোশাক এসে তার জানুদেশ স্পর্শ করেছে তাকে ভাষায় বর্ণনা করা যায় না—সম্পূর্ণ কল্পনাতীত সে, তার অঙ্গসৌরভে তেলেগিনের মাথা ঘুরছে।

সারা সন্ধ্যা তেলেগিন গল্প করে যায়। দাশা প্রশ্ন করে, মাঝে মাঝে বাধা দেয়, আনন্দে হাততালি দিয়ে ওঠে এবং দিদির দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

"দিদি—ভাব দেখি একবার! ওকে গুলি করে মারার হুকুম দিয়েছিল তারা!"

কিভাবে গাড়ীটা হাত করবার জন্য তারা লড়েছিল, এক চুল এদিক সেদিক হলে কিভাবে তাদের মৃত্যু হতে পারত, তারপর গাড়ীটা লাফিয়ে উঠে কিভাবে সামনের দিকে ছুটতে আরম্ভ করল এবং অবশেষে মুক্তি ও জীবনের আবহাওয়ায় এসে কিভাবে সে নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচল, এ-সমস্তর বর্ণনা যখন তেলেগিন দিতে থাকে দাশা তখন একেবারে বিবর্ণ হয়ে যায় ও তেলেগিনের হাতে নিজের হাত রাখে।

"তোমাকে আর আমরা যেতে দেব না!"

তেলেগিন হাসে।

"যুদ্ধে যাবার জন্য আবার তারা আমাকে ডাকবে; উপায় নেই। একমাত্র

আশার কথা এই হতে পারে যে, তারা হয়ত কোন অস্ত্রের কারখানায় আমাকে নিযুক্ত করবে।"

সতর্কভাবে দাশার হাতটা সে চেপে ধরে। দাশা তার দিকে অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে তাকায়; তারপর লজ্জায় তার মুখ লাল হয়ে ওঠে ও হাতটা সে সরিয়ে নেয়।

"ধূমপান করছ না কেন? আমি দেশলাই এনে দিচ্ছি।"

দ্রুত সে বেরিয়ে যায় ও একটা দেশলাইর বাক্স নিয়ে পুনঃপ্রবেশ করে; তেলেগিনের সামনে দাঁড়িয়ে সে দেশলাইর কাঠি জ্বালাবার চেষ্টা করে। কাঠি-গুলো মাথায় ধরে ঠোকার ফলে সেগুলো একটার পর একটা ভেঙে যায়। "আমাদের লিসা কি দেশলাই কিনেছে দ্যাখ!" বলে দাশা। অবশেষে দেশলাইর একটা কাঠি জ্বলে ওঠে। সাবধানে তেলেগিনের মুখের সিগারেটটা ধরাতে গিয়ে দাশার নিজেরই কোমল চিবুকটায় শিখার তাপ লাগে। চোখ দুটো ছোট করে তেলেগিন সিগারেটটা টানতে থাকে। একটা সিগারেট ধরানোর মধ্যে যে এত আনন্দ থাকতে পারে আগে তার জানা ছিল না।

সারাক্ষণ কাতিয়া নীরবে দাশা ও তেলেগিনের হাবভাব লক্ষ্য করে। দাশার কথা ভেবে তার আনন্দ হয়, খুবই আনন্দ; তবু তার মনের মধ্যে কোথায় কি যেন একটা খচখচ করে। ভেবেছিল ভাদিম পেত্রোভিচ রশচিনকে সে ভুলে যেতে পারবে, কিন্তু ভুলতে তো পারেনি। তার কথা তো এখনো সে ভাবে। তেলেগিনের মত সেও এসে ঠিক এমনিভাবে টেবিলের ধারে বসত এবং এই-ভাবে দেশলাই এনে সেও তার সিগারেট ধরিয়ে দিত, তবে দাশার মত দেশলাইর কাঠি সে ভাঙত না।

রাত্রির মাঝামাঝি দিকে তেলেগিন তাদের কাছ থেকে চলে যায়। দিদির গলা জড়িয়ে ধরে দাশা তাকে বলিষ্ঠভাবে চুম্বন করে; তারপর নিজের ঘরে গিয়ে সে দোর বন্ধ করে দেয়। দু হাতে মাথা রেখে বিছানায় শুয়ে সে ভাবতে থাকে, অবশেষে দারুন নৈরাশ্য থেকে সে অব্যাহতি পেয়েছে, যদিও তার চতুর্দিকে এখনো রয়েছে রিক্ততা, বিজন মরুভূমির ভয়ংকর নিস্তব্ধতা, তবু দিগন্ত নীল এবং সে সুখী।

॥ বত্রিশ ॥

ফিরে আসার পাঁচ দিন পরই তেলেগিন অবিলম্বে বাল্টিক ওয়ার্কস-এ যোগ দেবার জন্য এক সরকারী চিঠি পায়।

চিঠি খুলে তার যে আনন্দ হয় তা যেন তার কাছে একটা স্বপ্ন: দিনের অবশিষ্ট সময়টা সে শহরের ব্যস্ততার মধ্যে দাশার সঙ্গে কাটায়; তারপর নিকলাই স্টেশনে গিয়ে দ্রুত বিদায় গ্রহণ; গরম ও শুষ্ক দ্বিতীয় শ্রেণীর

কামরায় আরোহণ, গরম করার যন্ত্রটার ফট ফট শব্দ, পকেটে একটা ছোট পুলিন্দা পেয়ে আনন্দ, পুলিন্দাটা ফিতে দিয়ে বাঁধা, তার ভেতরে রয়েছে দুটো আপেল, একখণ্ড চকোলেট ও কয়েকটা কেক। তেলেগিন তার টিউনিক কোটটার কলার খোলে এবং পা দুটো মেলে। তার অধরোষ্ঠে নির্বাধের ন্যায় যে একটা হাসি লেগে আছে সেটাকে সে কিছুতেই মুছে ফেলতে পারছে না। তার বিপরীত দিকে যে অপরিচিত লোকটি বসে আছে তার দিকে সে তাকায়। বৃদ্ধের চোখে চশমা, মুখে একটা কাঠিন্যের ছাপ।

"মশায়ের বুঝি মস্কো থেকে আসা হল ?" বৃদ্ধ জিজ্ঞেস করেন।

"হ্যাঁ, মস্কো থেকেই এলাম।" আহা কি মধুর শব্দটি! মস্কো!... শরতের রৌদ্রস্নাত সরু সরু রাস্তা, পায়ের তলায় শুকনো পাতা, তন্বী দাশা হেঁটে চলে সেগুলির ওপর দিয়ে, তার পরিষ্কার মার্জিত কণ্ঠস্বর—দাশা যা বলেছে তার একটি কথাও সে স্মরণ করতে পারছে না—তারপর যখনই সে তার দিকে ঝুঁকে দাঁড়িয়েছে বা তার হাতে চুম্বন করেছে তখনি সেই ফুলের প্রাণমাতান সৌরভ!

"মস্কো একটা সোডম, সত্যি একটা সোডম," বলেন বৃদ্ধ। "আমি তিন-দিন সেখানে ছিলাম।..তাই যথেষ্ট।" বুটপরা পা দুটো ছড়িয়ে দেন তিনি এবং থুথু ফেলেন। "রাস্তায় আপনি দেখতে পাবেন লোক কেবল ব্যস্তভাবে এদিকে আর ওদিকে ছুটে চলেছে। আর রাত্রে : আলো, কোলাহল, বিজলীর বিজ্ঞাপন আর খালি গাড়ীঘোড়া, হৈ চৈ। ভীড়, শুধু ভীড়! এর কোন মানে হয়! হ্যাঁ, এই হল মস্কো, আমাদের দেশের প্রাণকেন্দ্র! কিন্তু আমি যা দেখে এলাম তা শয়তানের কারখানা, কেবল এদিকে-ওদিকে লোকের ছুটো-ছুটি যার কোন অর্থই হয় না। আপনি বুঝি যুদ্ধে গিয়েছিলেন, কি যাননি ? আহতও বুঝি হয়েছিলেন, না ? দেখেই আমি বুঝতে পেরেছি। আচ্ছা, আমি একজন বৃদ্ধ, আমাকে বলুন দেখি এই অভিশপ্ত মস্কো নগরীর কল-কোলাহল ও দম্ভ রক্ষার জন্যই কি যুদ্ধক্ষেত্রে আমাদের রক্তপাত করা হচ্ছে ? আমাদের দেশের খবর কি ? আমাদের ধর্ম ? আমাদের জার ? সে-সব কোথায়, আমাকে বলুন দেখি ? কিছু সুতো কেনার জন্য আমি পেত্রোগ্রাদ যাচ্ছি। কিন্তু সুতো দিয়ে আমি কি করব ? আমি যখন তিউম্যানে ফিরে যাব, কি সঙ্গে নিয়ে যাব আমি ? সুতো ? না, সুতো নয়—ফিরে গিয়ে আমি লোককে বলব : 'আমরা শেষ হয়ে গেছি।' শুধু এই কথাই আমি তাদের বলব। মনে রাখবেন এই বৃদ্ধের কথা, এর মূল্য আমাদের দিতে হবে।..মূর্খামির খেসারত না দিয়ে উপায় আছে আমাদের!.."

দু' হাঁটুর ওপর হাত রেখে ভর দিয়ে বৃদ্ধ উঠে দাঁড়ান এবং জানালার পরদা টেনে দেন। পরদার বাইরে এঞ্জিনের কয়লার জ্বলন্ত স্ফুলিঙ্গ লাইন করে পেছন দিকে ছুটে চলেছে।

"আমরা ভগবানকে ভুলে গেছি এবং ভগবানও আমাদের ভুলে গেছেন।

আমি আপনাকে কিছু বলব: হিসেব-নিকেশ একদিন হবে, সে বড় নিষ্ঠুর হিসেব-নিকেশ।..."

"কি ধরনের হিসেব-নিকেশ হবে বলে আপনি মনে করেন? জার্মানরা কি রুশিয়া জয় করবে?" বলে তেলেগিন।

"কে জানে? আমাদের শিক্ষা দেবার জন্য ভগবান যাকেই পাঠান না তার কাছ থেকেই আমাদের শাস্তি গ্রহণ করতে হবে। মনে করুন আমার দোকানের কোন ছোকরা অসদাচরণ করতে আরম্ভ করল, আমি কিছুকাল তা বরদাস্ত করলাম, কিন্তু তারপর একদিন দেখা যাবে, একজন মারল তার মাথায় চাটি, আর একজন মারল ঘাড়ধাক্কা, তৃতীয় ব্যক্তি এসে তাকে রাস্তায়ই বার করে দিল।...কিন্তু রুশিয়া তো আমার ছোট দোকান নয়। রুশিয়া একটা বিরাট কারবার। পরমেশ্বর করুণাময়, কিন্তু তার কাছে যাবার পথ যখন লোকে ভুলে যায় তখন সেই পথ তো পরিষ্কার করতেই হবে, কি হবে না? আমি সে-কথাই বলছিলাম।...এই পৃথিবীর দিক থেকে ভগবান মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন। এর চাইতে ভয়ের কথা আর কি হতে পারে!.."

বৃদ্ধ হাত দুটো পেটের ওপর আড়াআড়িভাবে রেখে চোখ বোজেন এবং কালো আসনটার এক কোণে আরাম করে বসেন। ট্রেনের ঝাঁকুনিতে তাঁর দেহটা ওঠানামা করতে থাকে, আলো পড়ে চোখের চশমা জোড়া উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। তেলেগিন বেরিয়ে গলির জানালার পাশে গিয়ে দাঁড়ায়, মুখটা তার প্রায় কাচের সঙ্গে লেগে আছে।

ভেন্টিলেটারের কাচের ফাঁক দিয়ে বাইরের মুক্ত হাওয়া শির শির করে প্রবেশ করছে। জানালার বাইরে অন্ধকার ভেদ করে ছুটে চলেছে এঞ্জিনের জ্বলন্ত কয়লার স্ফুলিঙ্গগুলি, আসছে সেগুলি লাইন করে, একটা আর একটাকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে এবং তারপর পড়ছে গিয়ে মাটিতে। মাঝে মাঝে ধূসর বর্ণের ধূম্ররাশি ছুটে যাচ্ছে পেছনের দিকে। গাড়ীর চাকাগুলি শব্দ করছে বেশ তাল রেখে। এঞ্জিনটা অতঃপর অনেকক্ষণ ধরে টানা বাঁশী বাজিয়ে একটা মোড় ঘুরে যায়; ফার গাছগুলি কালো পিরামিডের মত দাঁড়িয়ে আছে, ফারনেসের আগুনের আভায় সেগুলি আলোকিত হয়ে ওঠে; একবার দেখা দিয়েই আবার অন্ধকারে সেগুলি মিলিয়ে যায়। রেলপথের সংযোগস্থলে গুড় গুড় আওয়াজ হয়, গাড়ীটা আস্তে দোলে, দূরে থালার মত একটা সবুজ সিগন্যালের আলো জ্বলে ওঠে, আবার জানালার ধার দিয়ে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের প্রবাহ পেছনের দিকে বয়ে যেতে থাকে। সেগুলির দিকে চেয়ে আছে তেলেগিন। হঠাৎ তার মধ্যে একটা আনন্দের ফোয়ারা খুলে যায়, গত পাঁচ দিনের ঘটনাকে সে সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করে। তার এই মনের আবেগকে যদি কারো কাছে সে ব্যক্ত করতে পারত তবে লোকে হয়ত ভাবত তার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। কিন্তু সে নিজে ভাবে এতে আশ্চর্যান্বিত বা বিচলিত হবার মত কিছুই নেই; সমস্তই অত্যন্ত পরিষ্কার।

সে ভাবে, রাত্রির অন্ধকারে লক্ষ লক্ষ লোক জীবন ধারণ করছে, কষ্ট পাচ্ছে, মরছে। কিন্তু তাদের জীবন তো প্রতীক মাত্র এবং পৃথিবীতে যা কিছু ঘটছে তা সবই তো প্রতীক স্বরূপ, কল্পনা বললেও চলে। এত কাল্পনিক যে তেলেগিনের মনে হয় সামান্য চেষ্টা করলেই সে সব কিছুর পরিবর্তন করে দিতে পারে। কিন্তু এই সমস্ত কল্পনার মধ্যে একমাত্র সত্যবস্তু হচ্ছে সে নিজে, ইভান ইলিয়িচ তেলেগিন, যে একটা ট্রেনের জানালার ধারে দাঁড়িয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে আছে যে ভালবাসা পেয়েছে। এই লোকটি ছায়াজগৎ থেকে বেরিয়ে এসে অন্ধকার পৃথিবীর ওপর দিয়ে অগ্নিবৃষ্টির মধ্যে উড়ে যাচ্ছে।

তার নিজের প্রতি ভালবাসার এই অদ্ভুত আবেগ কয়েক মুহূর্ত মাত্র স্থায়ী হয়। কামরায় ফিরে গিয়ে সে সর্বোচ্চ শয্যায় আরোহণ করে। জামা ছাড়বার সময় নিজের সুদীর্ঘ হাত দুটোর দিকে তার দৃষ্টি পড়ে: জীবনে এই প্রথম তার মনে হয় হাত দুটো কি সুন্দর। দু'হাত মাথার নীচে রেখে সে চোখ দু'টো বোজে, সঙ্গে সঙ্গে ভেসে ওঠে দাশার ছবি। সেদিন খাবার ঘরে যেভাবে তাকিয়ে ছিল ঠিক সেইভাবে দাশা চেয়ে আছে তার চোখের দিকে। দাশা কয়েকটা পিঠে কাগজ দিয়ে মুড়ছিল, তেলেগিন টেবিলটার পাশ দিয়ে ঘুরে গিয়ে তার উষ্ণ কাঁধে করেছিল চুম্বন, দাশা চট করে ঘুরে গিয়েছিল আর তেলেগিন তাকে জিজ্ঞেস করেছিল: "দাশা, তুমি কি আমাকে বিয়ে করবে?" কিন্তু সে একটি কথাও বলেনি, কেবল তার দিকে চেয়ে ছিল।

ওপরের শয্যায় শুয়ে তেলেগিন কল্পনায় দাশার মুখখানা দেখতে থাকে, যত দেখে তত্ই তার ভাল লাগে, ক্লান্তি নেই। জীবনে এই প্রথম আবার সে বিজয়োল্লাসে আত্মহারা হয়ে যায়, কারণ দাশা তাকে ভালবাসে -ভালবাসে এমন একজনকে যে দু'টি বিশাল ও সুন্দর বাহুর অধিকারী।

পিতার্সবুর্গে পৌঁছেই তেলেগিন বাল্টিক ওয়ার্কস্-এ গিয়ে হাজিরা দেয় এবং সেদিনই রাত্রের শিফ্ট্-এ তার কাজ পড়ে।

এই তিন বছরে কারখানার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। শ্রমিকের সংখ্যা তিনগুণ বেড়ে গেছে, তাদের মধ্যে কারো কারো বয়েস খুবই কম, উরাল থেকে অনেকে এসেছে, সৈন্যদল থেকেও কাউকে কাউকে বদলী করে এখানে এনে নিযুক্ত করা হয়েছে। শ্রমিকরা খবরের কাগজ পড়ে আর যুদ্ধ, জার, জারিনা, রাসপুতিন ও সেনাপতিদের অভিশাপ দেয়। তাদের মধ্যে অসন্তোষ বিদ্যমান; সকলেরই নিশ্চিত ধারণা যে যুদ্ধান্তে "বিপ্লব আসবে"। সকলেই অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়ে ওঠে যখন দেখা যায়, শহরের রুটির কারখানাগুলিতে রুটির মধ্যে ভুষি মেশান হচ্ছে; কয়েক দিন ধরে বাজারে কোন মাংসই পাওয়া গেল না অথবা যদিও পাওয়া যায় তাও পচা; আলুগুলি তুষার লেগে নষ্ট হয়ে গেছে, চিনিতে ধুলো মেশান, সর্বোপরি খাদ্যদ্রব্যের দাম ক্রমশ বেড়েই যাচ্ছে, যুদ্ধের ঠিকাদারী করে দোকানদার, মুনাফাখোর ও ফাটকাবাজেরা রাতারাতি ফেঁপে

উঠছে; পঞ্চাশ রুবল দিয়ে এক বাক্স মিছরি কিনতে তাদের একটুও আটকায় না, এক বোতল শ্যাম্পেনের জন্য অকাতরে তারা একশ' রুবল খরচ করে এবং জার্মানদের সঙ্গে শান্তির কথা তারা শুনতেও চায় না।

নিজের কাজ গুছিয়ে নেবার জন্য তেলেগিনকে তিন দিনের ছুটি দেওয়া হয়; ফ্ল্যাটের সন্ধানে এই তিনদিন সে সারা শহর ঘোরে। ডজনখানেক বাড়ি দেখে সে, কিন্তু একটাও তার পছন্দ হয় না। শেষের দিন তার মনোমত একটা বাড়ি সে পেয়ে যায়; ঠিক এরকম একটা বাড়ির কথাই সে ট্রেনে আসার সময় ভেবেছিল ঃ পাঁচটা ঘর, ঘরগুলি বেশি বড় নয়, জানালাগুলি পরিষ্কার, তকতকে ঝকঝকে, পশ্চিম দিক খোলা। ভাড়া তার সামর্থ্যের বাইরে, তবু তৎক্ষণাৎ সেই বাড়িটা ঠিক করে সে দাশাকে চিঠিতে এই বাড়ির কথা জানিয়ে দেয়।

চতুর্থ দিন রাত্রে সে কারখানায় যায়। কারখানার প্রাঙ্গনে কয়লার গুঁড়োয় কালো লণ্ঠনগুলি লম্বা লম্বা খুম্বার ওপর জ্বলছে। বাতাস ও বৃষ্টিতে চিম্‌নীর ধোঁয়া মাটির দিকে নেমে আসছে, ফারনেসের শ্বাসরোধকর হলদে বাষ্পে বায়ু ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছে। কারখানার বাড়িতে অর্ধবৃত্তাকারে ধূলি-পড়া যে বিরাট জানালা রয়েছে তা দিয়ে তেলেগিন দেখতে পাচ্ছে অসংখ্য পুলি ও ট্র্যান্সমিশন বেল্ট অনবরত ঘুরছে, বড বড় মেশিন ড্রিল করছে, প্ল্যান করছে ও ইস্পাত এবং ব্রঞ্জ ওল্টাচ্ছে পাল্টাচ্ছে। পান্‌চিং মেশিনগুলির ভার্টিকাল ডিস্কসমূহ অবিরাম ঘুরছে। মাথার ওপরে চলমান ক্রেনগুলির প্ল্যাটফর্মসমূহ সহসা দীপ্ত হয়েই আবার অন্ধকারে মিলিয়ে যাচ্ছে। ফারনেস থেকে লাল ও সাদা আভা বেরুচ্ছে। একটা বিরাট স্টীম হ্যামারের স্বল্প-স্থায়ী, দ্রুত আঘাতে মাটি কেঁপে ওঠে। নীচু চিম্‌নীগুলি থেকে আগুনের হল্কা অন্ধকার আকাশে উঠছে। যন্ত্রের কড়কড় ঘর্ঘর শব্দের মধ্যে মনুষ্য-দেহগুলি ধীরে এদিকে সেদিকে যাওয়া আসা করছে।

কারখানার যেখানে চাপ দিয়ে শ্র্যাপনেলের খোল তৈরী হচ্ছে, তেলেগিন সেখানে যায়। স্ত্রুকভ নামে একজন পূর্বপরিচিত এঞ্জিনিয়ার তেলেগিনকে কারখানা ঘুরিয়ে যেগুলি তার কাছে নতুন, সেগুলি বিশদভাবে বুঝিয়ে দেয়। তারপর তারা দুজনেই কারখানার এক কোণে পার্টিশন-দেওয়া যে ছোট অফিসটি রয়েছে সেখানে যায়। স্ত্রুকভ তেলেগিনকে বইপত্র বুঝিয়ে দেয় এবং চাবি তার হাতে অর্পণ করে; তারপর কোটটা গায়ে চাপিয়ে সে বলে ঃ

"শতকরা তেইশটা জিনিস অকেজো হচ্ছে—দেখবে এর বেশি যেন না হয়।"

যেভাবে কারখানার ভার তার ওপর দেওয়া হল এবং যেভাবে সে কথা বলল তাতে তেলেগিনের মনে হল যে স্ত্রুকভের কাজে আর তেমন উৎসাহ নেই, অথচ অতীতে সে দেখেছে এই স্ত্রুকভই কত উৎসাহী ও কেমন একজন দক্ষ

এঞ্জিনিয়ার ছিল। ভেবে দুঃখ হয় তেলোগিনের। স্ত্রুকভকে সে জিজ্ঞেস করে :

"কাজের অযোগ্য জিনিসের অনুপাত হ্রাস করা যায় বলে কি তুমি মনে কর না?"

হাই তুলে মাথা নাড়ে স্ত্রুকভ এবং তার অবিন্যস্ত চুলের ওপর টুপিটাকে আরো ঠেসে নামিয়ে দেয়; তারপর তেলোগিনকে নিয়ে অফিস থেকে বেরিয়ে মেশিনের দিকে হাঁটিতে থাকে।

"এ নিয়ে আমি মাথা ঘামাইনে, ভাই। কি তফাৎ তাতে? এ করে রণাঙ্গনে শতকরা তেইশজন জার্মান কম মরছে এই তো! আর তাছাড়া উপায়ও নেই—পুরনো ভাঙা মেশিন দিয়ে আর তুমি কত করবে—ওগুলো এখন ভাঙা লোহার স্তূপে ফেলে দিলেই ভাল হয়।"

চাপ দেবার একটা মেশিনের সামনে সে দাঁড়ায়। একজন বৃদ্ধ শ্রমিক, খাটো তার পা, গায়ে চামড়ার অ্যাপ্রন, একটা লাল তপ্ত ধাতুখণ্ড চাপ দেবার মেশিনটার তলায় রাখে, ওপর থেকে ফ্রেমটা নেমে আসে, তার রডটা ইস্পাত-খণ্ডের মধ্যে এমনভাবে প্রবেশ করে যে দেখে মনে হয় যেন একদলা মাখনের মধ্যে সেটা ঢুকে যাচ্ছে; এক ঝলক আগুন জ্বলে ওঠে, ফ্রেমটা আবার ওপর দিকে উঠে যায়, মাটির মেঝেতে শ্র্যাপনেলের খোলটা পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধটি আর একখণ্ড তপ্ত ধাতু তোলে। কালো গোঁফওয়ালা লম্বা আর একজন জোয়ান শ্রমিক ফারনেসের কাজে খুব ব্যস্ত। বৃদ্ধের দিকে ঘুরে স্ত্রুকভ বলে :

"ওহে রুবলেভ, শ্র্যাপনেলের খোলগুলির মধ্যে অনেকগুলিই অকেজো বেরুচ্ছে না?"

বৃদ্ধ হেসে তার পাতলা দাড়ি নাড়ে এবং চতুরের ন্যায় চোখ দুটো ছোট করে আড় নজরে তেলোগিনের দিকে চেয়ে বলে :

"সত্যি, আমাদের অকেজো খোল অনেক বেরুচ্ছে। এই প্রেস-মেশিনটা কিভাবে কাজ করে দেখুন!" যে থাম্বাটা দিয়ে প্রেস মেশিনটা ওঠানামা করে সেটায় হাত রাখে বৃদ্ধ, তেলে থাম্বাটা সবুজ হয়ে গেছে। "কিভাবে কাঁপছে দেখুন! ভাঙা লোহার স্তূপে অনেকদিন আগেই এটাকে ফেলে দেওয়া উচিত ছিল।"

ফারনেসের সেই জোয়ান শ্রমিক হেসে ওঠে। ইভান রুবলেভের ছেলে সে, নাম ভাসিলি।

"কাজের যোগ্য কিছু খোল যে বেরুচ্ছে এই তো বেশি," বলে সে। "গোটা মেশিনে মরচে পড়ে গেছে!"

"ওখানটা আলগা কর, ভাসিলি," হাসতে হাসতে বলে স্ত্রুকভ।

"ওখানটা আলগা কর, এখানটা আলগা কর," কোঁকড়ান চুলগুলি নেড়ে

বলে ভাসিলি। তার পাতলা মুখ, উন্নত গণ্ডাস্থি, কালো গোঁফ ও রহস্যঘন চোখের সুতীক্ষ্ম দৃষ্টিতে একটা আত্মপ্রত্যয়ের ছাপ সুস্পষ্ট।

"কারখানার দু'জন সেরা শ্রমিক," যেতে যেতে তেলেগিনকে চাপা গলায় বলে স্ত্রুকভ। "আচ্ছা' তবে, এখন বিদায়। যাবার পথে আমি এখন 'রেড জিংগল্স্' হয়ে যাব। কখনো গিয়েছ সেখানে? ভারী চমৎকার জায়গা, সেখানে মদ পাওয়া যায়।"

তেলেগিন উৎসুক নয়নে দুই রুবলেভকে অর্থাৎ পিতাপুত্রকে অবলোকন করতে থাকে। স্ত্রুকভের সঙ্গে তাদের কথা বলার ভঙ্গি ও তিনজনের মধ্যে হাসি ও দৃষ্টি বিনিময় একটু বিস্মিত হয়েই সে লক্ষ্য করেছিল। তাদের হাবভাব দেখে মনে হয়েছিল একটা সাংকেতিক ভাষায় যেন তারা কথাবার্তা বলছে, তিনজনেই যেন তাকে পরীক্ষা করে দেখছিল যে, সে মিত্র না শত্রু। কিন্তু পরদিন রাত্রেই দুই রুবলেভ যেরকম সহজভাবে তার সংগে আলাপ করল তাতে তার বুঝতে একটুও কষ্ট হল না যে, তাকে তারা তাদেরই একজন বলে ধরে নিয়েছে।

তেলেগিনকে নিজেদের লোক বলে মনে করার মধ্যে হয়ত তার রাজনৈতিক মতামতের প্রশ্ন ওঠেনি, সেটা বাহ্যিক ও ভাসাভাসা ব্যাপার, আসলে যে আস্থার ভাব নিয়ে সে লোককে অনুপ্রাণিত করে তাতেই শ্রমিকরা তার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে বেশি; অসাধারণ সে কিছু বলেও না করেও না, কিন্তু সকলেরই এই প্রত্যয় হয়েছে যে সে সৎ, সরল ও দয়ালু, কপটতার লেশমাত্র নেই, তার ওপর নির্ভর করা চলে।

রাত্রের শিফট্-এ কাজ পড়লে তেলেগিন প্রায়ই রুবলেভদ্বয়কে খুঁজে বার করে এবং পিতাপুত্রের মধ্যে যে তর্ক হয় তা মন দিয়ে শোনে।

ভাসিলি রুবলেভের ভাল পড়াশুনা আছে। তার মুখে খালি শ্রেণী-সংগ্রাম ও সর্বহারাদের একনায়কত্বের কথাই শুনতে পাওয়া যায়, বই-এর কথা-গুলিই সে আওড়ায় বেশি, তবে বলার মধ্যে বেশ জোর আছে। তার পিতা ইভান রুবলেভ প্রাচীনপন্থী, চতুর লোক, ধর্মবিশ্বাসও বড় কম নয়।

সে বলবেঃ

"গুহে, পার্মের জংগলে, ঋষির আশ্রমে, যেখানেই যাবে দেখতে পাবে ধর্মগ্রন্থসমূহে এই যুদ্ধের কথা সমস্তই লেখা আছে। এই যুদ্ধ থেকে কিভাবে ধ্বংস আসবে, আমাদের গোটা দেশ কিভাবে বিধ্বস্ত হয়ে যাবে এবং কতজন বেঁচে থাকবে—বেশি লোক বেঁচে থাকবে না—অরণ্যস্থিত ঋষির আশ্রম থেকে একজন লোক বেরিয়ে এসে ভগবানের নির্মম আদেশ বহন করে কিভাবে এই বসুন্ধরা শাসন করবে—সবই আছে তাতে।"

"পচা রহস্যবাদ," বলে ভাসিলি।

"পাজি, গাধা কোথাকার, মুখে খালি লম্বা লম্বা কথা।...নিজেকে সমাজ-তন্ত্রী বলে খুব জাহির করা হচ্ছে! ও! কি আমার সমাজতন্ত্রীরে! তুই

তো একটা কসাক, হ্যাঁ, তুই তাছাড়া আর কি! আমিও তাই ছিলাম। একবার সুযোগ পেলেই হল, লাল দেখলেই অমনি টুপিটা কানের কাছে পরে ছুটে যাবে আর চীৎকার করবেঃ 'এস, আমরা শেষ লড়াই লড়ি।' কার বিরুদ্ধে লড়াই? কিসের জন্য লড়াই? মাথায় কিছু আছে তোর--খালি গোবর ভরা!"

"শোন বুড়োর কথা," বাপের দিকে বুড়ো আঙুল নেড়ে বলে ভাসিলি। "ভয়ানক নৈরাজ্যবাদী সে, সমাজতন্ত্রের অ আ ক খ বোঝে না, আসে খালি গলার জোরে আমার সঙ্গে তর্ক করতে।"

"না," বাধা দেয় ইভান রুবলেভ। ফারনেস থেকে একটা তপ্ত ধাতুর পিন্ড টেনে বার করে সে। "না, মশায়!" শূন্যে সে অর্ধবৃত্তাকারে ধাতু-পিন্ডটাকে ঘুরিয়ে প্রেসের যে রডটা নেমে আসছে তার নীচে রাখে। "অনেক বই তুই পড়িস, সত্যি, কিন্তু সেগুলি সবই ভুল লেখা। তোদের মধ্যে কোন নম্রতা নেই —সেকথা তোরা ভাবিসও না। জানিস, আমাদের আমলে প্রত্যেককে মনে-প্রাণে বিনয়ী হতে হত।"

"তোমার মাথায় সমস্ত জগাখিচুড়ি হয়ে গেছে, বাবা," বলে ভাসিলি। "একটু আগেই কে চীৎকার করছিলঃ 'আমি একজন বিপ্লবী, হ্যাঁ, আমি তাই'?"

"হ্যাঁ, আমিই চীৎকার করে তা বলেছি। কেন বলব না? কিছু যদি হয়, বাস, তবে সবার আগে আমিই শস্য তোলার যন্ত্রটা নিয়ে দাঁড়াব। আমি অন্যের পক্ষ নেব কেন? আমি একজন কৃষক। কাঠের লাঙল দিয়ে আমি ত্রিশ বছর জমি চাষ করেছি। তুই কি জানিস তা দিয়ে কত জমি উল্টিয়েছি আমি? আমি নিশ্চয়ই একজন বিপ্লবী। আমি আমার আত্মাকে বাঁচিয়ে রাখতে চাইব, কি চাইব না?"

তেলেগিন রোজই দাশাকে চিঠি লিখে; দাশার কাছ থেকে উত্তর আসে কম। দাশার চিঠিগুলি অদ্ভুত- মনে হয় বরফে ঢাকা, তেলেগিন যখনি সেগুলি পড়ে তখনি কেমন একটা শিহরণ হয় তার। সাধারণত জানালার ধারে বসে দাশার চিঠির প্রত্যেকটি পাতা কয়েকবার করে পড়ে সে—বড় বড় হরফে লেখা, লাইনগুলি সোজা না গিয়ে নীচের দিকে হেলান। তারপর দ্বীপের ধূসর ও ধূমল বর্ণ বনের দিকে চেয়ে থাকে সে, মেঘলা আকাশের দিকে তাকায় খালের ঘোলা জলের মতই আকাশটাও ঘোলাটে -ভাবে, যেমনটি হওয়া উচিত ঠিক তেমনটিই তো সব আছে এবং যতখানি সে আশা করে, দাশার চিঠিগুলি ততখানি অনুরাগমিশ্রিত নাই বা হল, অতটা তার আশা করাই অসঙ্গত।

দাশা লিখেছেঃ "প্রিয় বন্ধু, পাঁচখানা পুরো ঘর-সমেত একটা ফ্ল্যাট নিয়েছি। ভেবে দ্যাখ, তাতে কত খরচ। তুমি একা যদি নাও থাক, তাতেই বা

পাঁচখানা ঘরের কি দরকার। এর জন্য তোমাকে দু'জন ঝি রাখতে হবে—এবং তুমি জান আজকালকার দিনে তার অর্থ কি। এখানে মস্কোতে এখন শরতের আবহাওয়া পড়েছে; বেশ ঠান্ডা এবং বৃষ্টিও হচ্ছে, সূর্যের মুখ দেখতে পাওয়া যায় না। বসন্তকাল পর্যন্ত আমাদের অপেক্ষা করতেই হবে।..."

মস্কো ছেড়ে আসার দিন তেলেগিন যখন দাশাকে জিজ্ঞেস করেছিল যে, সে তাকে বিয়ে করবে কিনা, তখন যেমন একটি দৃষ্টিপাতে সে তার উত্তর দিয়েছিল, এখন তার চিঠিগুলিতেও সেই একই ভাব প্রকাশ পাচ্ছে, তাদেব বিয়ের কথা বা তাদের ভাবী একত্র জীবনের কথা, কিছুরই সে উল্লেখ সরাসরি কখনো করে না। বসন্তকাল পর্যন্ত তেলেগিনকে অপেক্ষা করতে হবে।

প্রত্যেকেই আছে এখন এই বসন্তের আগমন প্রতীক্ষায় আর সকলেই নিরুপায় হয়ে ভাবছে দৈববলে যদি একটা কিছু অঘটন ঘটে তো বাঁচা যায়। জীবন এসে এক অচল অবস্থায় দাঁড়িয়েছে, শীতের জড়তায় পেয়েছে সকলকে, তারা যেন আর জেগে থাকতে পারছে না, আর একটা রক্তাক্ত বসন্তকাল যদি আসে কিভাবে বাঁচবে তারা ভাবতেও পারে না।

দাশা একদিন চিঠিতে লেখে:

"..বেসনভের মৃত্যু সম্পর্কে তোমাকে কিছু বলিওনি বা লিখিওনি, কিন্তু গতকাল তার শোচনীয় মৃত্যু সম্পর্কে আবার নতুন করে সব বিস্তারিত শুনলাম। সে যুদ্ধে যাবার কিছু আগে ভেরুস্কয় বুলভার-এ তার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। দেখে মনে হল তার অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। আমার ধারণা, আমি যদি তখন তাকে তাড়িয়ে না দিতাম তবে এভাবে বুঝি সে মরত না। কিন্তু আমি তাকে তাড়িয়ে দিয়েছিলাম। তা না করে উপায় ছিল না এবং সেই অবস্থায় পড়লে আবারও আমি তাই করব।"

এই চিঠির জবাব লিখতে তেলেগিনের অর্ধেক দিন কেটে যায়। অত্যন্ত যত্নের সহিত ধীরে আস্তে প্রতিটি শব্দ ওজন করে সে লেখে:

"কি করে তুমি ভাবতে পার যে তোমার সম্পর্কিত সব কিছুই আমি গ্রহণ করতে পারব না। সময় সময় আমি নিজেকে যাচাই করে দেখি এবং ভাববার চেষ্টা করি যে তুমি আর একজনকে ভালবাস—যদিও আমার কাছে তার চেয়ে মারাত্মক ব্যাপার আর কিছু হতে পারে না...তথাপি আমি তা মেনে নেব। তার মানে এই নয় যে, আমি সেই ব্যাপারে আপস করব—না, তা নয়! তা হলে পৃথিবী আমার কাছে অন্ধকার হয়ে যাবে। কিন্তু তোমার প্রতি আমার প্রেম কি শুধু সুখেরই জন্য? তোমার প্রেম এতই গভীর যে তার জন্য মানুষ মরতেও পারে একথা আমি জানি।..বেসনভ যখন যুদ্ধক্ষেত্রে যায় তখন তার মনে বোধ হয় এই ভাবই উদিত হয়েছিল। একথা তুমি জেনো, দাশা, তুমি সম্পূর্ণ মুক্ত। তোমার কাছে আমার কোন দাবীই নেই, এমন কি ভালবাসাও নয়। গত কয়েক সপ্তাহে আমি একথাই বুঝতে পেরেছি।..."

দিন দুই পরে তেলেগিন কারখানা থেকে একদিন প্রত্যুষে বাড়ি ফেরে।

স্নান সেরে সে গিয়ে বিছানায় শোয়, কিন্তু একটা টেলিগ্রাম পেয়ে আবার সে সংগে সংগেই উঠে বসে। টেলিগ্রামে লেখা আছে ঃ

"সব ঠিক আছে অসীম ভালবাসা নেবে তোমার দাশা।

এক রবিবার এঞ্জিনিয়ার স্দ্রুকভ তেলেগিনকে ডাকায় ও তাকে নিয়ে 'রেড জিংগল' পানশালায় যায়।

পানশালাটা একটা বাড়ির নিম্নতলে অবস্থিত। তার খিলানযুক্ত সিলিং-এ ও দেয়ালে নানা বর্ণের পাখী, বিকৃত মুখাকৃতিযুক্ত শিশু ও বিচিত্র ধরনের কতগুলি ছবি আঁকা রয়েছে। ঘরটায় ভয়ানক ধোঁয়া ও গোলমাল। টাক-পড়া একটা বেঁটে লোক গালে রং মেখে মঞ্চের ওপর বসে পিয়ানোতে সুর ভাঁজছে। একদল অফিসার বসে খুব কড়া মদ টানছে আর কোন স্ত্রীলোককে ঘরে ঢুকতে দেখলেই নানারূপ মন্তব্য করছে। কয়েকজন ব্যারিস্টার গলা ফাটিয়ে আর্ট সম্পর্কে তর্ক করছে। স্ফীতনয়না, কালোকেশী সুন্দরী একটি তরুণী হল এই পানশালার রাণী, সে খুব হি হি করে হাসছে। আন্তোশকা আর্নলদভ এক হাতের আঙুলগুলি নিজের চুলের ভেতর ঢুকিয়ে দিয়ে বসে খবরের কাগজের জন্য যুদ্ধের খবর লিখছে। দেয়ালের ধারে যেখানে মেঝেটা একটু উঁচু সেখানে টেবিলের পাশে বসে আছে ফিউচারিজমের (ভাবিষ্যৎবাদের) প্রবর্তক একজন পশুচিকিৎসক। মুখটা তার কিরকম বিকৃত, দেখে মনে হয় যক্ষ্মারোগী। মদে একেবারে চুর চুর। দেয়ালে ঠেস দিয়ে ঝিমোচ্ছে সে আর তার মাথাটা ঢলে পড়েছে বুকের ওপর। পানশালার মালিক একজন ভূতপূর্ব অভিনেতা। তার মাথায় লম্বা চুল, মদ্যপ হলেও শান্ত স্বভাব। মাঝে মাঝে সে এসে একটা পাশের দরজায় দাঁড়ায় এবং খদ্দেরদের দিকে তীক্ষ্ম দৃষ্টি হেনেই আবার চলে যায়।

বার কয়েক সুরাপানের পর স্দ্রুকভকে একটু নেশায় ধরেছে। তেলেগিনকে সে বলে ঃ

"জানো, এ জায়গাটা আমার কেন ভাল লাগে? যত ওঁছা লোককে পাবে তুমি এখানে। ঐ কোণের দিকে চেয়ে দ্যাখ, ঐ যে অস্থিচর্মসার স্ত্রীলোকটি বসে আছে, ওর প্রায় নড়বারও শক্তি নেই, হিস্টিরিয়া একেবারে ষোল আনা— বিশ্বাস হবে তোমার, তার কত খাতির।"

স্দ্রুকভ হাসে ও আর এক চুমুক মদ খায়, নরম ঠোঁট দুটো সে মোছেও না। ওষ্ঠের ওপর টুথব্রাশের মত তার একজোড়া গোঁফ আছে। রুগ্ন, তন্দ্রাতুর, অর্ধোন্মাদ মুখগুলির দিকে একে একে অংগুলি নির্দেশ করে সে তেলেগিনকে সকলের নাম বলে যায় ঃ

"এরা হচ্ছে মহিকানদের শেষ বংশধর, এরা সকলেই তাই। সৌন্দর্যের বৈঠকখানার ঝরতিপড়তি।...ফু! ছাতা-পড়া জীব সব! এখানে এসে সব জড়ো হয়ে এমন একটা ভাব দেখায় যেন মোটেই কোন যুদ্ধ নেই এবং যেটি যেমন ছিল ঠিক তেমনটিই আছে।"

তেলেগিন শোনে ও চারদিকে তাকায়। অগ্নিকুণ্ডের তাপ, ধোঁয়া ও সুরা সব কিছু মিলে মনে হয় একটা স্বপ্ন। তার মাথা ঘুরতে আরম্ভ করে। তেলেগিন দেখে, হঠাৎ কয়েকজনের মুখ প্রবেশদ্বারের দিকে ঘুরে যায়; এমন কি সেই পশুচিকিৎসকও তার নিদ্রাজড়িত পাণ্ডুবর্ণ চোখ দুটো অতি কষ্টে মেলে তাকায়; পার্টিসনের পেছন থেকে বাড়ির মালিকের পাগলাটে ধরনের মুখখানা দেখা দেয়: তেলেগিনের পাশে বসা আধমরা অস্থিচর্মসার স্ত্রীলোকটি তন্দ্রা-নিমীলিত আঁখির পাতা তোলে, সহসা তার চোখ দুটো যেন সজীব হয়ে ওঠে, বেশ টান হয়ে সতেজভাবে সে বসে নিজের আসনে এবং সকলের দৃষ্টি যেদিকে সেদিকে সে তাকায়। অকস্মাৎ গোটা পানশালাটা একেবারে নিস্তব্ধ হয়ে যায়। মেঝেতে একটা গ্লাস পড়ে গিয়ে টুং করে শব্দ হয়।

দরজার ফাঁকে একজন বয়স্ক লোক দাঁড়িয়ে আছে, খুব লম্বাও নয়, বেঁটেও নয়, একটা কাঁধ সামনের দিকে বাড়ান, সুতির জ্যাকেটের পকেটে রয়েছে হাত দুটো। তার লম্বা কালো দাড়িযুক্ত সরু মুখখানায় ফুটে আছে হাসি, বদনের দুধারে পড়েছে দুটি গভীর রেখা। সব কিছুকে ছাপিয়ে উঠেছে তার স্থির, চতুর, অন্তর্ভেদী দুটি চোখ। এক মিনিটকাল সমস্ত নীরব। তারপর দরজার ফাঁকের অন্ধকার থেকে তার মুখের কাছে আর একখানি মুখ এগিয়ে আসে, দেখে মনে হয় সরকারী আমলা, প্রথম লোকটির কানের কাছে মুখ নিয়ে হাসতে হাসতে সে যেন কি বলে, হাসলেও মনে হয় তার মধ্যে ভয় রয়েছে। বয়স্ক লোকটি বিরক্ত হয়ে তার প্রকাণ্ড নাসিকা কুঞ্চিত করে।

"আবার তোমার সেসমস্ত বাজে কথা! তোমাকে নিয়ে জ্বালাতন হল দেখছি!"

আরো বেশি উৎফুল্ল নয়নে সে পানশালার সকলের দিকে চায়, দাড়ি নাড়ে এবং চীৎকার করে টেনে টেনে বলে:

"অচ্ছা, বন্ধুগণ, বিদায়!"

তার পরমুহূর্তেই সে অন্তর্ধান হয়। দরজাটা সশব্দে বন্ধ হয়ে যায়। পানশালায় একটা গুঞ্জন ওঠে। তেলেগিনের কনুইতে নখ দিয়ে খোঁচা মেরে স্তুকভ বলে:

"দেখলে তাকে? এই হচ্ছে রাসপুটিন।"

॥ তেত্রিশ ॥

ডিসেম্বর মাসে একদিন রাত্রি চারটার সময় কুয়াশার মধ্যে তেলেগিন কারখানা থেকে হেঁটে বাড়ি রওনা হয়। কোন ঘোড়ারগাড়ী সে পায়নি, আজকাল এত রাত্রে শহরের বুকেও গাড়ী পাওয়া যায় না। জনশূন্য রাস্তার মাঝখান দিয়ে তেলেগিন দ্রুত হেঁটে চলে, উঁচু কলারের ভেতর তার নাকটা

ঢুকে আছে। রাস্তার বিবল আলোতে সে দেখে ছুঁচের মত অসংখ্য বরফের কণা বায়ু ভেদ করে পড়ছে। পায়ের তলায় জমাট তুষারখন্ড বেশ জোরে মড়-মড় করে উঠছে। সামনের দিকে একটা বাড়ীর হলদে সম্মুখভাগটায় লাল আলোর আভা পড়েছে। মোড় ঘুরে তেলোগিন দেখতে পায় একটা বড় কড়ায় আগুন জ্বলছে, তার চারপাশে কাপড়চোপড় মুড়ি দিয়ে বসে আছে কতগুলি লোক, শীতে যেন তারা জমে গেছে, বাষ্পে আচ্ছন্ন হওয়ার দরুন তাদের স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। রাস্তা দিয়ে আরো খানিকটা এগিয়ে গিয়ে সে দেখতে পায় প্রায় শ'খানেক আবালবৃদ্ধ বনিতা লম্বা সার দিয়ে নিঃশব্দে দাড়িয়ে আছে--খাদ্যের দোকানের সামনে কিউ। তাদের পাশে একজন পাহারা-ওয়ালা তার বুটপরা পা দুটো দিয়ে খটাখট শব্দ করছে আর দস্তানাপরা দু হাতে আস্তে আস্তে নিজের গাল থাবড়াচ্ছে।

তেলোগিন কিউর পাশ দিয়ে হেঁটে চলে আর দেখে কিভাবে ভগ্নোৎসাহ লোকগুলি চাদর ও কম্বল গায়ে দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে।

"কাল ভিবর্গ সাইড-এ তিনটা দোকান সাফ করে দিয়েছে" বলে একজন।

"তা ছাড়া আর এখন উপায় কি!"

তৃতীয় ব্যক্তি বলেঃ "কাল আমি এক পাঁট তেল চাইলাম বলে তেল নেই এবং আর পাওয়াও যাবে না। তার পরক্ষণেই দেমেন্তিয়েভের পাচক ভেতরে ঢুকে একেবারে চোখের সামনেই বালোবাতেলের দাম দিয়ে পাঁচ পাঁট তেল নিয়ে গেল।"

"কত করে নিল?"

"এ ভাই বললে কবে পাঁট।"

বার আউন্স তেলের দাম আড়াই রুবল?

"দোকানদার কি সেরে যেতে পারবে নাকি ভেবেছ। দিন এলে দেখে নেবেন।"

"আমার বোন বলল ওখ্তা জেলায় একজন দোকানদার এরকম বজ্জাতি করতে গিয়ে ধরা পড়ে। লোকে তখন তাকে ধরে একটা নোনাজলের পিপের মধ্যে ফেলে চুবোতে থাকে। ছাড়া পাবার জন্য তার তখন কত অনুনয় বিনয়!"

"তাতে কি আর কিছু হয়। এসব লোককে আরো শাস্তি দেওয়া উচিত।"

"এদিকে যে জমি যাবার উপক্রম হল!"

"আর ওদিকে সে খুব চা খাচ্ছে।"

"কে খুব চা খাচ্ছে?" কর্কশ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে একজন।

"খাচ্ছে তারা সবাই। আমার মনিবঠাকরুণ, তিনি একজন জেনারেলের গিন্নী গো। বেলা বারটায় ঘুম থেকে উঠবেন, তারপর রাত্রি বারটা পর্যন্ত বাটি বাটি চা চালাবেন। আশ্চর্য যে ফেটে যায় না, হারামজাদী নচ্ছার মাগী।"

"আর আমরা এখানে জমে গিয়ে ঠান্ডায় মরতেও পারি।"

"মিথ্যে বলনি। দ্যাখ না, কিরকম কাসি হয়েছে আমার।"

"আমাদের গিন্নীর স্বভাবচরিত্তির ভাল নয় গো। রোজই বাজার থেকে ফিরে দেখি খাবার ঘর নাগরে ভরতি। কি মদই খায় একেকটা। এসেই ফরমাশ, ডিম ভাজা চাই, কালো রুটি চাই, ভদকা চাই—এসব না পেলে কি তাদের গাল ওঠে!"

"এত মদ জোটে কোত্থেকে জান, ইংরেজদের টাকায়," প্রত্যয়ের সুরে বলে একজন।

"কি বলছ তুমি?"

"আমাদের সবাইকে বেচা হয়েছে—আমার কথা বিশ্বাস কর, লাইনে এসে দাঁড়াও, কিন্তু জাননা তো একথা যে আগামী পঞ্চাশ বছর দাসত্ব করার জন্য তোমাদের সবাইকে বেচা হয়েছে। সমস্ত সৈন্যকেও বেচে দেওয়া হয়েছে।"

"ও ভগবান!"

আর একজন ধরা-গলায় বলে:

"পাহারাদার মশায়, ও পাহারাদার মশায়, বলি শুনেছেন!"

"কি হয়েছে?"

"আজ কি লবণ দেওয়া হবে?"

"খুব সম্ভব না।"

"যত সব পাজি!"

"পাঁচদিন লবণ পাওয়া যাবে না।"

"লোকের রক্ত চুষে খাওয়া হচ্ছে, হারামজাদারা!"

"অত চেঁচালে গলা চিরে যাবে, লক্ষ্মীরা," ভারিক্কীচালে বলে প্রহরী।

তেলেগিন কিউটাকে পেছনে ফেলে এগিয়ে চলে। ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বরগুলি ক্রমশ মিলিয়ে যায়, আবার দেখা দেয় সোজা নির্জন রাস্তাসমূহ, বেশিদূর নজরে আসে না, তুষারকণা ও কুয়াশার মধ্যে ডুবে গেছে সেগুলি।

তেলেগিন সেতুমুখের বাঁধে পৌঁছয় এবং সেতুটা পার হবার জন্য ঘোরে। জোর হাওয়ায় তার কোটের নীচের দিকটা পৎপৎ করে ওঠে। মনে ভাবে সে যে-করেই হোক একটা ঘোড়ার গাড়ী তাকে যোগাড় করতেই হবে, কিন্তু পরমুহূর্তেই সে গাড়ীর কথা ভুলে যায়। দূরে নদীর ওপারে রাস্তার প্রায় অস্পষ্ট আলোগুলি মিটমিট করে জ্বলছে। বরফের ওপর দিয়ে লোক চলার ফলে যে ঢালু রাস্তাটার সৃষ্টি হয়েছে এক সারি ম্লান আলো থাকায় তা দেখা যাচ্ছে। নেভার অন্ধকার, বিস্তীর্ণ বক্ষের ওপর দিয়ে বয়ে চলেছে কনকনে হাওয়া, হাওয়ায় ঘুরছে রাশি রাশি তুষারকণা আর মাথার ওপরকার ট্রামের তার ও সেতুর দুপাশের লোহার রেলিং-এ হাওয়া লেগে যেন কান্নার সুর বেজে উঠছে।

তেলেগিন ক্ষণেকের জন্য দাঁড়ায়, চারপাশের ঘন অন্ধকারে সে তাকায় এবং তারপর আবার হাঁটতে শুরু করে। দাশার কথা, নিজের কথা, ট্রেনে তার সেই যে আনন্দ অগ্নিশিখার মত জ্বলে উঠেছিল সেই মুহূর্তটির কথা সে ভাবে।

এখনকার পারিপার্শ্বিক যেন অস্পষ্ট, বিশৃঙ্খল, স্ববিরোধী এবং তার সেই আনন্দের প্রতিকূল। এখন যেন সর্বদাই তাকে জোর করে বলতে হয়ঃ "আমি জীবন্ত ও সুখী, আমার জীবন উজ্জ্বল ও সুন্দর হয়ে উঠবে।" সেই ট্রেনের জানালার ধারে সে যখন দাঁড়িয়েছিল এবং অগ্নিস্ফুলিঙ্গগুলি পশ্চাদ্দিকে ছুটে চলেছিল তখন কিন্তু অতি সহজেই সে একথা আপনমনে বলতে পেরেছিল। আর এখন কিউর সেই শীতে কুঁকড়ে-যাওয়া মানুষগুলি, হিমেল বাতাসের সকরুণ আর্তনাদ, এক সামগ্রিক অবনতি ও আসন্ন বিপদের ছায়া থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে ভাবতে তার যথেষ্ট কষ্ট হয়।

একটা বিষয়ে তেলেগিনের সুনিশ্চিত ধারণা হয়েছেঃ দাশার প্রতি তার ভালবাসা, দাশার মাধুর্য, দাশা তাকে ভালবাসে একথা জেনে ট্রেনে জানালার ধারে দাঁড়িয়ে তার নিজের সেই অপার আনন্দ উপলব্ধি—এ সমস্তই ভাল। কিন্তু সেই প্রাচীন আরামপ্রদ জীবনদেউল—যা কিঞ্চিৎ সংকুচিত হলেও আনন্দময়—যুদ্ধের আঘাতে নড়ে উঠে ভেঙে যাচ্ছে; তার স্তম্ভগুলি থরথর করে কাঁপছে, চুড়োয় চির ধরেছে এবং পুরনো পাথরগুলি হুড়মুড় করে পড়ে ধূলিসাৎ হচ্ছে। তবু সেই উড়ন্ত ধূলোরাশি ও পড়ন্ত দেউলের হুড়মুড় শব্দের মধ্যে দুটি প্রাণী, সে ও দাশা, এক প্রেমের উন্মাদনায় আত্মহারা হয়ে চাচ্ছে সুখী হতে। এ কি ঠিক?

রাত্রির সূচিভেদ্য অন্ধকারের মধ্য দিয়ে সেই মিটমিটে আলোগুলির দিকে তাকিয়ে থাকে তেলেগিন, কান পেতে শোনে বাতাসের সকরুণ বিলাপ আর ভাবেঃ "কেন এই আত্মবঞ্চনা? সুখের আকাঙ্ক্ষাই জাগে সবার আগে। যাই হোক, আমি তা চাই। আমি কি এই কিউর অবসান ঘটিয়ে ক্ষুধিতের মুখে অন্ন দিতে পারি? আমি কি যুদ্ধ বন্ধ করতে পারি?—না, আমি পারিনে। যদি তা নাই পারি, তবে সুখ বিসর্জন দিয়ে কি এই বিষাদসাগরে আমি ডুবে মরব? না, কেন তা করব আমি?—কিন্তু আমি কি সুখী হতে পারি, পারব আমি সুখী হতে?"

সেতুটা পার হয়ে সে আবার বাঁধ ধরে হাঁটতে থাকে; জানে না সে কোথায় যাচ্ছে। এপারে অনেক উঁচুতে উজ্জ্বল বিজলী বাতিগুলি হাওয়ায় দুলছে। বাঁধান খালি ফুটপাথে গুঁড়ো গুঁড়ো তুষারকণাগুলির সামান্য খড়মড় আওয়াজ হচ্ছে। উইন্টার প্যালেসের জানালাগুলি অন্ধকার ও ফাঁকা। মেষের চামড়ার কোট গায়ে দৈত্যের মত একজন প্রহরী বন্দুকটা বুকে চেপে ধরে ডোরাকাটা একটা সেনট্রি-বক্সের পাশে দাঁড়িয়ে আছে। সেনট্রি-বক্সটার গোড়ায় এত তুষার জমেছে যে তার অর্ধেকটাই প্রায় ঢাকা পড়েছে।

তেলেগিন মুহূর্তকাল দাঁড়ায় এবং জানালাগুলির দিকে তাকায়। তারপর সে দ্রুত হাঁটতে থাকে, প্রথমে প্রতিকূল বাতাসের সঙ্গে লড়াই করে তাকে এগোতে হয় এবং পরে পেছন দিক থেকে বাতাস তাকে ঠেলে নিয়ে যায়। তার মনে হয় এখন সে প্রত্যেককেই স্পষ্ট ও সরল সত্য বলতে পারে এবং সকলেই

তাকে বিশ্বাস করবে। সে বলবেঃ "এটা সুস্পষ্ট যে এভাবে আর চলা অসম্ভবঃ বিদ্বেষের ওপর গড়ে উঠেছে সমস্ত রাষ্ট্র, বিদ্বেষের দ্বারাই নিরূপিত হয় সীমারেখা এবং তোমরা প্রত্যেকে হচ্ছ বিদ্বেষের এক একটি গুচ্ছ—একটি দুর্গ যেখানে সমস্ত দিকে মুখ করে সাজিয়ে রাখা হয়েছে কামান। জীবন সঙ্কুচিত ও ভয়ে আড়ষ্ট। বিদ্বেষে সারা দুনিয়ার শ্বাসরোধ হয়ে আসছে—মানুষ পরস্পর পরস্পরকে নির্মূল করছে, রক্তের গঙ্গা বয়ে যাচ্ছে। এতেও কি হয়নি? এখনো তোমার চোখ খোলেনি? ঘরে ঘরে মানুষ একে অন্যের গলা কাটুক এই কি তুমি দেখতে চাও—তার আগে কি তোমার চৈতন্য হবে না? জাগো, তোমার অস্ত্র ছুঁড়ে ফেলে দাও, সীমানা ভেঙে ফেল, জীবনের সমস্ত দ্বার ও গবাক্ষ দাও উন্মুক্ত করে। ফসলের জমির অভাব নেই, যথেষ্ট গোচারণ ভূমি আছে, আঙুরের চাষের জন্য পাহাড়ের ধারে ঢালু জমি কি কম আছে! ধরিত্রীর গর্ভে রয়েছে অফুরন্ত সম্পদ আর পৃথিবীতে আমাদের সকলের জন্যই রয়েছে যথেষ্ট স্থান। তুমি কি দেখতে পাচ্ছ না যে অতীত যুগের অন্ধকারেই এখনো তোমরা বাস করছ?"

এমন কি শহরের এই অঞ্চলে এসেও একখানি গাড়ী দেখতে পাওয়া যায় না। আবার নেভা নদী পার হয়ে তেলোগিন এবার পিত্রোর্সবুর্গ কোয়ার্টারের আকাবাঁকা রাস্তাগুলির মধ্যে প্রবেশ করে। গভীর চিন্তা করতে করতে এবং আপন মনে কথা বলতে বলতে সে রাস্তা ভুল করে। জনমানবহীন অন্ধকার রাস্তা দিয়ে ঘুরতে ঘুরতে শেষ পর্যন্ত সে গিয়ে একটা খালের ধারে বাঁধের ওপর হাজির হয়। দাঁড়িয়ে সে গভীর নিঃশ্বাস ফেলে, হাসে ও নিজের ঘড়ি দেখে। "বাঃ! হাঁটাটা কি চমৎকার হল," মনে মনে বলে সে। ঠিক পাঁচটা বেজেছে। আলোবিহীন একটা বিরাট খোলা মোটরগাড়ী রাস্তার মোড় ঘুরে এসে হাজির, চাকার নীচে পড়ে বরফের টুকরোগুলি কড়মড় করে ভাঙছে। গাড়ীটা চালাচ্ছে একজন সামরিক অফিসার। তার ওভার কোটটার বোতাম খোলা, দাড়িগোঁফ কামানো মুখটা বিবর্ণ, জ্বলজ্বলে চোখ দুটো দেখলেই বোঝা যায় যে, প্রচুর মদ খেয়েছে সে। পেছনে বসে আছে আর একজন অফিসার, তার টুপিটা যতদূর সম্ভব মাথার পশ্চাদ্দিকে ঠেলে দেওয়া হয়েছে এবং মুখটা রয়েছে মাদুরে জড়ানো লম্বা একটা বান্ডিলের আড়ালে, দু'হাতে বান্ডিলটা ধরে আছে সে। গাড়ীর তৃতীয় ব্যক্তি একজন অসামরিক লোক; তার কোটের কলার ওপরের দিকে ওল্টানো এবং মাথায় একটা উঁচু ফার টুপি। তার আসনে সামান্য একটু উঠে বসে সে গাড়ীচালকের কাঁধে হাত রাখে। ছোট পুলটার কাছেই গাড়ীটা থামে। তেলোগিন দেখে, লোক তিনজন গাড়ী থেকে লাফিয়ে পড়ে ধরাধরি করে বান্ডিলটা নামায়, বরফের ওপর দিয়ে কয়েক গজ টেনে নিয়ে যায় সেটাকে, তারপর কষ্ট করে তুলে পুলের মাঝখানে নিয়ে প্যারা-পেটের ওপর দিয়ে ছুঁড়ে বান্ডিলটা নীচে ফেলে দেয়। অফিসার দু'জন

তৎক্ষণাৎ গাড়ীতে ফিরে আসে; কিন্তু অসামরিক লোকটি পেছনে থেকে যায়,. প্যারাপেটের ওপর ঝুঁকে সে নীচের দিকে তাকায়; তারপর কলারটা নামিয়ে সে অপর দু'জনের সংগে এসে একত্র হয় এবং তিনজনে গাড়ী নিয়ে দেয় ছুট। স্টার্ট পেয়েই গাড়ীটা সামনের দিকে অত্যন্ত দ্রুত গতিতে ছুটতে থাকে এবং দেখতে না দেখতে অদৃশ্য হয়ে যায়।

"উঃ! কি পৈশাচিক কাজ," বিড়বিড় করে বলে ভেলোগিন। এতক্ষণ রুদ্ধশ্বাসে সে সমস্ত লক্ষ্য করছিল। হেঁটে সে পুলের ওপর যায় এবং প্যারাপেটের ওপর ঝুঁকে নীচের দিকে তাকায়, কিন্তু পুলের নিচে বরফের প্রকাণ্ড গহ্বরটায় সে কিছুই দেখতে পায় না; শুধু সেখানে একটা নর্দমার নলের মুখ দিয়ে দুর্গন্ধময় উষ্ণ জল পড়ে যে বুদ্‌বুদের সৃষ্টি হচ্ছে, তাই তার নজরে আসে।

"উঃ! কি পৈশাচিক কাজ," আবার বিড়বিড় করে বলে সে। তারপর বিস্ফারিত নয়নে খালের পাড় ধরে সে হাঁটতে থাকে। একটু এগিয়ে গিয়েই রাস্তার মোড়ে শেষ পর্যন্ত একটা ঘোড়ার গাড়ী সে পেয়ে যায়—কিন্তু কোচোয়ান বুড়ো, এবং ঠাণ্ডায় বরফের মত প্রায় জমে গেছে; ঘোড়াটারও হাড়গুলি বেরিয়ে পড়েছে, মুখটা খোলা। ভেলোগিন গাড়ীতে উঠে বসে, অ্যাপ্রনের বোতাম এঁটে হাঁটু ঢাকে এবং চোখ দুটো বোজে, ক্লান্তিতে সর্বদেহে সে যেন একটা সুতীব্র যাতনা অনুভব করছে। "আমি ভালবাসি এবং এই ভালবাসাই সত্য," মনে মনে ভাবে সে, "ভালবাসার জন্য যাই করব আমি তাই হবে ন্যায়সংগত কাজ।"

॥ চৌত্রিশ ॥

পুলের ওপর থেকে তিনজন লোক মাদুরে-মোড়া যে বাণ্ডিলটা নদীবক্ষে বরফের গহ্বরে ফেলে দেয় সেটা নিহত রাসপুতিনের মৃতদেহ। দানবের মত কঠিন ও বলশালী এই কৃষককে হত্যা করার জন্য হন্তারা প্রথমে তাকে মদের সংগে পটাসিয়াম সায়ানাইড মিশিয়ে খাওয়ায়, তারপর তার বুকে, পিঠে ও মাথায় গুলি করে এবং শেষ পর্যন্ত 'লাইফ-প্রিজারভার' দিয়ে তার মাথার খুলিটা গুড়িয়ে দেয়। এত করা সত্ত্বেও বরফের গহ্বর থেকে তার মৃতদেহটা উদ্ধার করে যখন শবব্যবচ্ছেদ করা হয় তখন প্রমাণ পাওয়া যায় যে, বরফের মধ্যে ফেলে দেওয়ার সময়ও রাসপুতিন জীবিত ছিল।

এই হত্যাকাণ্ডের ফলে ঘটনার মোড় ঘুরে যায় এবং এথেকেই দু'মাস পরে এক নতুন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। রাসপুতিন একাধিকবার বলেছিল যে, তার মৃত্যুর পর সিংহাসনের পতন হবে এবং রোমানভ রাজত্বের অবসান ঘটবে। শোনা যায় গৃহস্বামীর অমংগলের পূর্বাভাস সেই বাড়ির পালিত কুকুরেরা পায়।

এই বর্বর হিংস্র মানুষটাও যেন ঠিক তেমনি একটা বিপদের অস্পষ্ট অনুমান পূর্ব থেকেই করতে পেরেছিল। সিংহাসনের এই শেষ সমর্থক, কৃষক, ঘোড়া-চোর, ঘোর ভগবৎবিদ্বেষী, নাস্তিক লোকটা জীবনকে মরণ-কামড় দিয়ে আঁকড়ে ধরেছিল।

তার মৃত্যুতে রাজপ্রসাদে ভীতি ও নৈরাশ্যের ছায়া পড়ে আর সমগ্র দেশে ছোটে আনন্দের জোয়ার। রাস্তায় দেখা হলেই একজন আর একজনকে অভিনন্দন জানায়। মিনস্ক থেকে নিকলাই ইভানোভিচ কাতিয়াকে লিখেঃ "রাত্রিবেলা এই খবরটা পেয়েই প্রধান সেনাপতির স্টাফের সেনানীরা তাদের মেসের জন্য আট ডজন শ্যাম্পেনের অর্ডার দেয়। এই খবর পেয়ে সমস্ত রণাঙ্গনের সৈন্যরা উৎফুল্ল হয়ে ওঠে।.."

কয়েকদিনের মধ্যেই রুশিয়ার লোক এই হত্যাকাণ্ডের কথা বিস্মৃত হয়। তবে রাজপ্রাসাদের প্রভুরা এটাকে ভোলে না, রাসপুতিনের ভবিষ্যদ্বাণীকে তারা বিশ্বাস করে এবং আতঙ্কিত হৃদয়ে বিপ্লব ঠেকাবার জন্য প্রস্তুত হতে থাকে। গোপনে পেত্রোগ্রাদকে তারা কয়েকটি রণ-এলাকায় বিভক্ত করে। গ্র্যান্ড ডিউক সার্গেই মিখাইলোভিচের নিকট মেশিনগান চেয়ে পাঠালে তিনি তাতে অসম্মত হন। তখন আর্কএঞ্জেল থেকে বহু মেশিনগান আনিয়ে রাস্তার মোড়ে মোড়ে বিভিন্ন বাড়ির চিলেকোঠায় চারশ' মেশিনগান বসানো হয়। সংবাদ প্রকাশের ব্যাপারে আরো কড়া বিধিনিষেধ আরোপিত হবার ফলে সংবাদপত্রগুলি বিভিন্ন কলমে বড় বড় ফাঁকা জায়গা রেখে প্রকাশিত হতে থাকে। সম্রাজ্ঞী বিচলিত হয়ে স্বামীকে খানকয়েক চিঠি দেন যাতে তিনি আরো সজাগ হন, মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়ান। জার কিন্তু মোগিলেভে নিশ্চিন্তে মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় আছেন; তাঁর দৃঢ় ধারণা তাঁকে রক্ষা করার জন্য চতুর্দিকে আছে এক কোটি-বিশ্বস্ত সঙ্গীন উদ্যত। তিন সাম্রাজ্যের সৈন্যদল যে রুশ রণাঙ্গনের ওপর চাপ দিচ্ছে তা নিয়েই তাঁর যত দুর্ভাবনা, ওদিকে পেত্রোগ্রাদে কিউতে যে লোকের অসন্তোষ টগবগ করে ফুটছে, নারীরা যে লুট করতে আরম্ভ করেছে তাতে তাঁর তেমন উদ্বেগ নেই। তাঁর মনে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ হয়নি যে, ঠিক সেসময়ই খাস মোগিলেভে সর্বাধিনায়কের সেনানীমণ্ডলের অধ্যক্ষ জেনারেল আলেক্সিয়েভিচ জারিনাকে গ্রেপ্তার ও রাজসরকারের জার্মান-সমর্থকদের নিশ্চিহ্ন করার পরিকল্পনা প্রণয়নে ব্যস্ত।

প্রতিপক্ষ যাতে বসন্তকালে অভিযান চালাবার সুযোগ না পায় তদুদ্দেশ্যে জানুয়ারী মাসে উত্তর রণাঙ্গনে আক্রমণ করার আদেশ হয়। একদিন রাত্রে কন্‌কনে শীতের মধ্যে রিগার নিকটে আক্রমণ শুরু হয়। কামান দাগার সঙ্গে সঙ্গেই আরম্ভ হয় এক তুষারঝড়। গভীর বরফ ভেঙে এগিয়ে চলে সৈন্যরা। একদিকে তুষারঝড়ের ভীষণ গর্জন, আর একদিকে বিদীর্ণ কামানের গোলার অগ্নিঝঞ্ঝা। এই অবস্থার মধ্য দিয়ে চলতে হয় তাদের। আক্রমণে সাহায্য করার জন্য যে কয়েক ডজন বিমান নিযুক্ত করা হয় ঝড়ে সেগুলি বিপর্যস্ত

হয়ে পড়ে এবং তুষারঝড়ের সাদা কুয়াশার মধ্যে দেখতে না পেয়ে রুশ বিমানীরা মেশিনগান দেগে স্বপক্ষ বিপক্ষ উভয় দিকেরই বহু সৈন্যকে হতাহত করে। যে লৌহবেষ্টনী রুশিয়াকে চেপে ক্রমশ ছোট করে আনছে তা ভেদ করার জন্য সে শেষবারের মত চেষ্টা করে; উত্তর মেরুর তুষারঝঞ্ঝা-বিতাড়িত হয়ে শ্বেত-পরিচ্ছদ পরিহিত রুশ কৃষকগণ পৃথিবীর একষষ্ঠাংশ-ব্যাপী সাম্রাজ্যের জন্য শেষ সংগ্রাম করে, সংগ্রাম করে তারা এমন এক স্বৈরতন্ত্রের জন্য যা এক সময় সমগ্র পৃথিবীর ভীতির কারণ ছিল; এই স্বৈরতন্ত্রের সমাধি হওয়া উচিত ছিল অনেকদিন আগেই, তবু আজো সে বেঁচে আছে—এ এক ঐতিহাসিক অসঙ্গতি, জাতির জীবনে দুষ্ট ব্রণ।

দশ দিন ধরে এই যুদ্ধ চলে। হাজার হাজার জীবনের সমাধি হয় বরফের নীচে। আক্রমণ বন্ধ করে দেওয়া হয়, আর এগোনো সম্ভব হয় না। রণাঙ্গন আবার তুষারের মধ্যে জমে স্তব্ধ হয়ে যায়।

॥ পঁয়ত্রিশ ॥

তেলেগিন ঠিক করেছিল বড়দিনের ছুটির সময় মস্কো যাবে, কিন্তু বাল্টিক ওয়ার্কসের পক্ষ থেকে তাকে কাজে পাঠানো হয় সুইডেনে। ফেব্রুয়ারীর আগে সেখান থেকে সে ফিরতে পারে না। এসেই সে তিন সপ্তাহের ছুটি নেয় এবং দাশাকে তার করে যে, ২৬শে ফেব্রুয়ারী সে মস্কো রওনা হবে।

যাবার আগে তাকে পুরো এক সপ্তাহ কারখানায় কাজ করতে হয়। তার অনুপস্থিতির সময় কারখানার অভ্যন্তরে অবস্থার যে পরিবর্তন হয়েছে তা দেখে সে বিস্মিত হয়ে যায়। শ্রমিকদের প্রতি কারখানার কর্তৃপক্ষদের আচরণ এখন অনেকটা ভদ্রোচিত, সুরও তাদের নরম, আগে কখনো এরকম দেখা যায়নি। অপরদিকে শ্রমিকদের মধ্যে প্রবল অসন্তোষ ও মেজাজ তাদের খুব গরম। দেখে মনে হয় যেকোন মুহূর্তে তাদের কেউ একজন হাতের প্যাঁচকলটা মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলতে পারে: "কাজ বন্ধ করে সকলে রাস্তায় বেরিয়ে এস!"

ডুমায় খাদ্য পরিস্থিতি সম্পর্কে যে ধরনের আলোচনা হয়েছে তার বিবরণ শুনেই এসপ্তাহে শ্রমিকদের মধ্যে খুব বেশি উত্তেজনার ভাব দেখা দেয়। আলোচনার বিবরণ থেকে স্পষ্টই বোঝা গেছে যে, বিরোধী দলের আক্রমণের জবাব দিতে গিয়ে সরকারপক্ষ একেবারে নাজেহাল হয়েছেন এবং নিজেদের মর্যাদা হারিয়েছেন, মন্ত্রীদের সেই আত্মম্ভরিতা ও গোঁয়ার্তুমি আর নেই; বিবরণ থেকে এটাও বোঝা গেছে যে কি মন্ত্রী কি ডুমার ডেপুটি কারো কথাই সত্য নয়; দুর্ভিক্ষ ও বিশৃঙ্খলার দরুণ রণাঙ্গনে ও তার পশ্চাদ্দেশে একটা

ব্যাপক বিপর্যয় আসন্ন ব'লে লোকের মুখে মুখে যে ঘোর অশুভ গুজব ছড়িয়ে পড়ছে তাই হচ্ছে আসল সত্য।

গতরাত্রে কাজ করার সময় তেলেগিন লক্ষ্য করেছে শ্রমিকদের মধ্যে অস্বাভাবিক রকমের উত্তেজনা। কয়েক মিনিট পর পরই তারা মেশিন ছেড়ে গিয়ে একত্র হয়ে আলোচনা করে—দেখেই বোঝা যায় কোন একটা খবরের প্রতীক্ষায় আছে তারা। ভাসিলি রুবলেভকে তেলেগিন যখন জিজ্ঞাসা করে কি নিয়ে আলোচনা হচ্ছে সে তখন হঠাৎ তার তুলার প্যাডভরা কোটটা রাগতভাবে কাঁধের ওপর ফেলে দড়াম ক'রে দরজাটা বন্ধ ক'রে দিয়ে কারখানা থেকে সোজা বেরিয়ে যায়।

"ভাসিলিটা দিনদিন কি রকম বদমেজাজী হয়ে উঠছে, পাজি কোথাকার," বলে ইভান রুবলেভ। "কোত্থেকে একটা রিভলবার যোগাড় করেছে, এখন সেটাই পকেটে নিয়ে ঘোরে।"

পরক্ষণেই ভাসিলি ফিরে আসে এবং শ্রমিকরা সমস্ত কাজকর্ম ফেলে রেখে ওয়ার্কশপের পেছন দিকে গিয়ে তাকে ঘিরে দাঁড়ায়। "পিতার্সবুর্গ সামরিক জেলার সৈন্যদেব অধিনায়ক লেফ্‌টেনান্ট জেনারেল খাবালভের বিবৃতি," ভাসিলি কতগুলি শব্দের ওপব জোর দিয়ে উচ্চস্বরে একটা সাদা বিজ্ঞপ্তি থেকে প'ড়ে শোনাতে থাকে: "গত কয়েকদিন যাবৎ আগের মতই রুটির কারখানাগুলিতে ময়দা সরবরাহ হচ্ছে এবং সেই পরিমাণ রুটিও বেরিয়ে আসছে—"

"মিথ্যে কথা!" একসঙ্গে কয়েকজন চেঁচিয়ে ওঠে। "তিনদিন ধ'রে রুটি দেওয়া হচ্ছে না।"

ভাসিলি আবার পড়ে: "রুটি কম পড়ার কোন কারণ নেই —"

"ফতোয়া দিলেই হ'ল আর কি!"

আবার পড়ে ভাসিলি:, "কোন কোন দোকানে যদি রুটি কম পড়ে থাকে তবে বুঝতে হবে, পরে পাওয়া যাবে না এই আশংকায় অনেকে বেশি ক'রে রুটি কিনে সেগুলিকে বিস্কুটে পরিণত ক'রে রাখছে।"

"কে রাখছে তা? বার করো না সেগুলি!" গর্জে ওঠে একজন। "মনে হয় সে নিজেই তো সেই বিস্কুটগুলির একটা তাড়াতাড়ি গিলছে।"

"চুপ করুন, কমরেড সব," ভাসিলি গলার স্বর আরো তুলে বলে। "কমরেডগণ, চলুন, আমরা রাস্তায় বেরিয়ে পড়ি। ওবুখভ কারখানার চার হাজার মজদুর নেভস্কি প্রস্‌পেকেটের দিকে মার্চ ক'রে যাচ্ছে এবং ভিবর্গ কোয়ার্টার থেকেও আসছে অনেক লোক।"

"তাই ঠিক! তারা আমাদের রুটি দেখাক!"

"তারা আপনাদের কোন রুটিই দেখাবে না, কমরেডগণ। শহরে আর মাত্র তিন দিনের মত ময়দা আছে, তার পরে রুটি বা ময়দা আর কিছুই আসছে না। উরল পর্বতের ওধারে সমস্ত ট্রেন দাঁড়িয়ে আছে। উরলের অপর পার্শ্বে

শস্য গুদামগুলি শস্যে ভরতি। চেলিয়াবিনস্ক রেলস্টেশনে তিন হাজার টন মাংস পড়ে পড়ে পচছে। সাইবেরিয়ায় তারা গাড়ীর চাকায় তেলের বদলে দিচ্ছে মাখন।...”

সমস্ত কারখানাটা গর্জে ওঠে। ভাসিলি তার হাত তোলে।

“কমরেডগণ! আমরা নিজেরা যতক্ষণ না রুটি নিচ্ছি ততক্ষণ কেউ তা আমাদের দিচ্ছে না।...অন্যান্য কারখানার মজদুর ভাইদের সঙ্গে চলুন, কমরেডগণ, আমরাও এই স্লোগান দিয়ে বেরিয়ে পড়িঃ ‘সোবিয়েতগুলির হাতে সমস্ত ক্ষমতা চাই!’ ”

“হাতের যন্ত্র ফেলে দাও! কাজ বন্ধ কর! ফারনেস নিভিয়ে ফেল!” চীৎকার করে শ্রমিকগণ আর সারা কারখানায় ছড়িয়ে পড়ে।

ভাসিলি রুবলেভ তেলোগিনের কাছে আসে। তার ছোট গোঁফজোড়া কাঁপছে।

“আপনি চলে যান,” অত্যন্ত পরিষ্কার ভবে বলে সে। “ভাল চান তো আপনি চলে যান।”

বাকী রাতটুকু তেলোগিনের আর ভাল ঘুম হয় না; অত্যন্ত উদ্বেগের মধ্যে তার ঘুম ভাঙে। মেঘাচ্ছন্ন সকালঃ বাইরে লোহার কার্নিশ থেকে টিপটিপ করে বৃষ্টির ফোঁটা পড়ছে। তেলোগিন শুয়ে শুয়ে সমস্ত ভাববার চেষ্টা করে, কিন্তু মনের উদ্বেগটা তার যায় না, বৃষ্টির ফোঁটার টিপটিপ শব্দে তার বিপরীতবোধ হচ্ছে, মনে হচ্ছে সেগুলি বুঝি সোজা এসে তার মগজে পড়ছে। “ছাব্বিশ তারিখ পর্যন্ত আমার অপেক্ষা করা চলবে না--আগামী কালই আমি যাব,” ভাবে সে। লাফিয়ে উঠে সে গা থেকে শার্টটা খুলে ফেলে এবং স্নানঘরে গিয়ে শাওয়ারটা খুলে দেয় ও বরফের মত ঠাণ্ডা জলের স্প্রের নীচে দাঁড়িয়ে থাকে।

যাবার আগে তার অনেক কাজ। তাড়াতাড়ি কফি পান করে সে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে এবং একটা ট্রামে চড়ে। ট্রামটায় খুব ভীড। তার মনে এখনো সেই অস্বস্তির ভাবটা রয়ে গেছে। যাত্রীরা সেই একইভবে বিষণ্ণ বদনে নীরবে বসে আছে; তাদের পাগুলি আসনের নীচে গুটানো; যাদের কোটের কোণা পাশের যাত্রীরা চেপে বসেছে তারা তা বিরক্তির সহিত টেনে বার করে আনে, পায়ের তলাটা কিরকম চটচটে; জানালা দিয়ে বৃষ্টির জল গড়িয়ে পড়ছে; ড্রাইভারের পাশেই ঘণ্টাটা বিষম জোরে বাজতে থাকে। তেলোগিনের বিপরীত দিকে বসে আছে সামরিক বিভাগের একজন পদস্থ কর্মচারী, তার মুখটা ফ্যাকশে ও ফুলো; দাড়িগোঁফ কামান অধরোষ্ঠে বক্র হাসিটি লেগেই আছে, কিন্তু তার চোখ দুটিতে রয়েছে এমন একটা কৌতূহল ও সতর্কতা যা তার চেহারার দিকে চাইলে বিসদৃশ বলে মনে হয়। চোখ ঘোরাতেই তেলোগিন দেখে ট্রামের যাত্রীরা একে অন্যের মুখের দিকে বিহ্বল ও জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চেয়ে আছে।

বলশয় প্রসপেক্টের মোড়ে ট্রামটা থামে। যাত্রীরা যে যার আসনে চঞ্চল হয়ে ওঠে, কেউ কেউ জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখে, কয়েকজন পাদানি থেকে লাফ দিয়ে নেমে পড়ে। ড্রাইভার রেঞ্চটা খুলে তার বুকের কাছে নীল কোটটার ভেতর ঢুকিয়ে দেয় এবং একদম সামনের দোরটা খুলে বিকটভাবে চীৎকার ক'রে বলে সে ঃ

"গাড়ী আর যাচ্ছে না !"

যতদূর চোখ যায় ততদূরই দেখা যায় যে বড় বড় রাস্তায় ট্রাম গাড়ীগুলি দাঁড়িয়ে আছে। শান বাঁধানো রাস্তাগুলি লোকে লোকারণ্য। মাঝে মাঝে একটা দোকানের জানলার লৌহ খড়খড়ি সশব্দে নীচে নেমে আসে। অল্প অল্প তুষারকণা পড়ছে।

বোতাম খোলা লম্বা কোট গায়ে একটা লোক এসে ট্রাম গাড়ীটার ছাদের ওপর ওঠে এবং টুপি তুলে চীৎকার ক'রে কি বলে। জনতার মধ্যে একটা গুঞ্জন ধ্বনি ওঠে এবং তা বেশ খানিকক্ষণ স্থায়ী হয়। গাড়ীটার ছাদের সংগে লোকটা একটা দড়ি বাঁধে, তারপর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আবার মাথা থেকে টুপিটা খুলে ফেলে। লোকগুলি আর একবার হৈ হৈ ক'রে ওঠে। গাড়ীর ছাদ থেকে লাফিয়ে লোকটা রাস্তায় নামে। জনতা পেছনে হটে, দেখা যায় কর্দমাক্ত হলদে রংএর তুষারে পা পিছলে যাওয়া সত্ত্বেও একদল লোক ট্রামের সংগে বাঁধা দড়িটা ধরে টানছে। ট্রামটা কাত হয়ে পড়বার উপক্রম হয়। জনতা আরো পেছনে সরে যায়। রাস্তার ছোকরারা সব আনন্দে শিস দিতে থাকে। কিন্তু ট্রামটা আবার ঠিক দাঁড়িয়ে যায় এবং লাইনের বাইরে যাওয়া চাকাগুলি গুড় গুড় শব্দ করে আবার লাইনের ওপর এসে ওঠে। দড়ি ধরে যারা টানছিল, তাদের দিকে তখন চারদিক থেকে লোক ছুটে আসে এবং নিঃশব্দে তারাও দড়ি ধরে প্রাণপণ টানতে থাকে। ট্রামটা আবার কাত হয় এবং হঠাৎ হুড়মুড় করে রাস্তার ওপর প'ড়ে যায়, সংগে সংগে কাচ ভাংগার ঝনঝন শব্দ হয়। জনতা তখনো নীরব। ওল্টান গাড়ীটার কাছে তারা চলে আসে।

"অনলে এবার ঘৃতাহুতি পড়েছে," তেলেগিনের পেছন থেকে কে একজন বলে। সেই পান্ডুরবর্ণ স্ফীত বদন সামরিক কর্মচারীটি। সংগে সংগে দেখা যায় একদল লোক সমবেত কণ্ঠে শোকসংগীত গেয়ে ওঠে, তবে কারো সংগে কারো গলার মিল নেই। গায় তারা ঃ

"এই লড়াই হ'ল কাল, গেল তোদের প্রাণ.. "

নেভস্কি প্রস্‌পেক্টের দিকে যেতে যেতে পথে তেলেগিন দেখতে পায় লোকের সেই একই উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি ও উত্তেজিত মুখ। সর্বত্রই দেখা যায়, কেউ যদি কোন নতুন খবর আনে তবে ছোটখাট আবর্তের মত লোক তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে উৎকর্ণ হয়ে তা শোনে। বিভিন্ন বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে আছে সব নধরকান্তি দরোয়ান, এবং ঝিয়ের দল জানালা দিয়ে নাক গলিয়ে নীচে রাস্তার দিকে তাকিয়ে আছে। বেশ মসৃণ চকচকে দাড়িওয়ালা এক ভদ্রলোক,

ফারের বর্ডার দেওয়া তাঁর কোটটা খোলা এবং হাতে একটা ব্রিফ-কেস, একজন দারোয়ানকে জিজ্ঞেস করেন :

"ওহে, বলতে পার এখানে এত লোক কেন ? কি হয়েছে ?"

"তারা রুটি চাচ্ছে, হামলা করছে, সার।"

"ও !"

আরো এগিয়ে গিয়ে রাস্তার এক মোড়ে দেখতে পাওয়া যায় অত্যন্ত মলিন বদন এক ভদ্রমহিলা, আধমরা ঠকঠক ক'রে কাঁপছে এমন একটা হতভাগা ছোট কুকুরকে বুকে জড়িয়ে ধ'রে যাকে দেখতে পাচ্ছেন তাকেই প্রশ্ন করছেন :

"ওখানে অত লোকের ভীড় কেন ? কি চায় তারা ?"

"বিপ্লব বলে মনে হয়, মাদাম," তাঁর পাশ দিয়ে যাবার সময় সেই ফারকোট-পরা ভদ্রলোক প্রফুল্ল বদনে বলেন।

একজন শ্রমিক রাস্তার এক ধার ঘেঁষে হেঁটে আসে, গায়ের মেষের চামড়ার কোটটার প্রান্তভাগ তার পেছন দিকে বাতাসে উড়ছে। রুগ্ন তার চেহারা, মুখটা শীর্ণ ও কুঞ্চিত। সহসা ঘুরে দাঁড়িয়ে করুণ সুরে ভাঙ্গা গলায় চীৎকার ক'রে সে বলে ওঠে :

"কমরেডগণ, আর কতকাল তারা আমাদের রক্ত পান করবে ?"

মুখে গোলাপী আভাযুক্ত একটি তরুণ অফিসার একটা ঘোড়ার গাড়ী ধরে দাঁড় করায় এবং গাড়ির লাগামটা ধরে দাঁড়িয়ে রাস্তার উত্তেজিত লোক-গুলির দিকে এমনভাবে তাকায় যে মনে হয় সে বুঝি সূর্যগ্রহণ দেখছে।

"এস ! দ্যাখ ! ভাল ক'রে দ্যাখ !" তাকে লক্ষ্য ক'রে বলে শ্রমিকগণ।

ভীড় ক্রমশই বাড়তে থাকে এবং সমস্ত রাস্তাটা লোকে ভরে যায়। উত্তেজিত হয়ে লোকগুলি কোলাহল করতে করতে সেতুর দিকে এগিয়ে চলে। তিন জায়গায় সাদা নিশান তোলা হয়েছে। সমস্ত পথচারীই এই জনস্রোতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়, মনে হয় কাঠের টুকরোর মত তারা যেন একটা প্রবাহে ভেসে চলেছে। জনতার সঙ্গে তেলোগিন সেতুটা পার হয়ে যায়। অশ্বারোহী কয়েকজন অফিসার 'ফিল্ড অব মার্স'-এ ছুটোছুটি করছে, ঘোড়াগুলি লাফিয়ে লাফিয়ে চলছে। মাঠটা তুষারে আবৃত ও কুয়াশাচ্ছন্ন, ঘোড়ার খুরের অসংখ্য চিহ্ন পড়েছে সেখানে। জনতাকে দেখতে পেয়ে অশ্বারোহী অফিসারগণ ঘোড়াগুলিকে ঘুরিয়ে ধীরে ধীরে তাদের দিকে এগিয়ে আসে। তাদেরই মধ্যে খোঁচাখোঁচা দাড়িওয়ালা রক্তিম বদন একজন কর্নেল হাসে ও সামরিক কায়দায় অভিবাদন করে। জনতা দুঃখের গান গেয়ে চলে, তবে সকলের সুর ও গলার পর্দা এক নয়। কুয়াশাচ্ছন্ন 'সামার গার্ডেনের' নিষ্পত্র, কালো বৃক্ষশাখা থেকে গায়ে কাদা মাখা এক ঝাঁক দাঁড়কাক ডানা মেলে উড়ে যায়—এরাই বোধ হয় একদা সম্রাট পাভেলের হত্যাকারীদের ভীষণভাবে ভয় পাইয়ে দিয়েছিল।

তেলোগিন হেঁটে চলে; তার গলার ভেতর দলার মত একটা কি উঠে আটকে আছে। কেশে সে গলাটা পরিষ্কার করে নেয়, কিন্তু আবেগের দলাটা বার-

বারই ঠেলে ঠেলে উঠতে থাকে। এঞ্জিনিয়ার্স প্যালেস পর্যন্ত গিয়ে সে বাঁ-দিকে ঘোরে এবং লিতেইনি প্রস্পেক্ট ধরে এগোতে থাকে।

ভিবর্গ সাইড থেকে আর একটা ভীড় এসে লিতেইনি প্রস্পেক্টে পড়ে। বিশাল জনতা—সমস্ত পুলটা ও আশপাশের রাস্তাগুলি লোকে পরিপূর্ণ। প্রত্যেক বাড়িরই দরজা ফাঁক ক'রে লোক এই জনপ্রবাহ দেখছে, জানালায় জানালায় দেখা যাচ্ছে সব উত্তেজিত মুখ।

• তেলেগিন একটা ফটকে দাঁড়িয়ে আছে, তার পাশে রয়েছেন একজন প্রবীণ সরকারী কর্মচারী, তাঁর থলথলে গালদুটো জেলির মত কাঁপছে। ডান দিকে অনেক দূরে রাস্তায় একদল সৈন্য মোতায়েন করা হয়েছে, বন্দুকের কুঁদোগুলি মাটিতে ঠেকিয়ে তারা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

জনতা এগিয়ে চলে, তবে গতি কিছু মন্থর হয়ে আসে। ভীত কণ্ঠে চীৎকার করতে শোনা যায়: "থাম! থাম!"

পরমুহূর্তেই হাজার হাজার রমণী তাদের সরু গলায় চীৎকার ক'রে ওঠে: "রুটি! রুটি! রুটি!"

সেই সরকারী কর্মচারী তার চশমার ওপর দিয়ে তেলেগিনের দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টি হেনে বলেন: "অসহ্য!" এমন সময় লম্বা দুজন দরোয়ান বেরিয়ে এসে যারা ফটকে দাঁড়িয়ে দেখছিল তাদের ঠেলতে থাকে। সরকারী কর্মচারীর গাল দুটো আবার কেঁপে ওঠে এবং স্প্রীং-এর চশমা-পরা একটি তরুণী চেঁচিয়ে ওঠে: "কোন্ সাহসে তুমি আমাকে ধাক্কা মারলে, জানোয়ার কোথাকার!" কিন্তু দরোয়ান দুজন তাতে কর্ণপাত না ক'রে ফটকটা বন্ধ ক'রে দেয়। রাস্তার দু'পাশের সমস্ত ফটক ও দরজা একে একে বন্ধ হয়ে যেতে থাকে।

"ওগুলো বন্ধ ক'র না! বন্ধ ক'র না!" অনেকগুলি ভীত কণ্ঠ একসঙ্গে চেঁচিয়ে ওঠে।

চীৎকার করতে করতে জনতা আরো এগিয়ে আসে। একটি যুবক, তার মাথার টুপির ধারটা বেশ চওড়া আর উত্তেজনায় মুখটা লাল, ঠেলেঠুলে একেবারে সামনে গিয়ে হাজির হয়।

"ঝাণ্ডা নিয়ে আগে বাড়! ঝাণ্ডা নিয়ে আগে বাড়!" চীৎকার ওঠে জনতার ভেতর থেকে।

ঠিক সেই মুহূর্তে লম্বা, ক্ষীণকটি, মাথার একপাশে কানের ওপরে একটা ফার টুপি, একজন অফিসার সৈন্যদের সারির সামনে এসে দাঁড়ায়। কোমরে পিস্তলের খাপটায় হাত দিয়ে চীৎকার করে সে কি যেন বলে। তেলেগিন এইটুকু বুঝতে পারে: "গুলি চালাবার হুকুম হয়েছে।...আমি চাইনে রক্তপাত হয়।...সরে পড়।..."

"রুটি! রুটি! রুটি!" ভীষণভাবে চীৎকার করতে করতে জনতা সৈন্যদের দিকে এগিয়ে আসে। উন্মত্ত দৃষ্টিতে নরনারী ছুটে চলেছে

তেলেগিনের পাশ দিয়ে। "বুটি! ওরা নিপাত যাক! শুয়োরের বাচ্চারা ধ্বংস হোক!"

ভীড়ের মধ্যে একজন পড়ে যায়, তার কুঞ্চিত, বিশীর্ণ মুখটা মাটি থেকে ওপর দিকে তুলে গলা ফাটিয়ে চীৎকার ক'রে বলে: "ওদের আমি ঘৃণা করি! ঘৃণা করি ওদের আমি! "

হঠাৎ রাস্তায় অয়েলক্লথ ছেঁড়ার মত একটা আওয়াজ হয়। সঙ্গে সঙ্গে সকলে চুপ। স্কুলের একটি ছাত্র মাথার টুপিটা ঠাসতে ঠাসতে ভীড়ের মধ্যে এসে ঢোকে। সরকারী কর্মচারী ক্রুশচিহ্নের ভঙ্গিতে তাঁর নীলশিরা ওঠা হাত তোলেন।

এক সঙ্গে শূন্যে কতকগুলি গুলি ছোঁড়া হয়, দ্বিতীয়বার আর দরকার হয় না। জনতা পিছু হটতে থাকে একদল ছত্রভঙ্গ হয়ে যায় আর এক দল ঝাণ্ডা নিয়ে জ্নামেনস্কি স্কোয়ারের দিকে চলে। সারা রাস্তায় হলদে তুষারের ওপর অসংখ্য টুপি ও জুতো ছড়ানো অবস্থায় পড়ে থাকে। নেভস্কি প্রস্পেক্টে পৌঁছেও তেলেগিন বহু কণ্ঠের গুঞ্জন আর একবার শুনতে পায়। ভাসিলিয়েভস্কি দ্বীপ থেকে নেভা নদী পার হয়ে এসেছে এই তৃতীয় দলটি। সুবেশা মহিলা সৈন্য ছাত্র ও বিদেশী বলে মনে হয় এমন কতগুলি অপরিচিত লোকে রাস্তাগুলি ভরে গেছে। কাঁচ পোলাপী মুখ একজন ইংরেজ অফিসার খুঁটির মত শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। চুলে কালো বাঁকা চিরুনি বসান দোকানের মেয়েরা তাদের পাউডার-মাখা মুখগুলি বিপণির দরজার শার্সিতে এমন ভাবে ঠেসিয়ে চেয়ে আছে যে তাদের নাকগুলি চ্যাপটা দেখাচ্ছে। আর কুয়াশাচ্ছন্ন রাস্তার মাঝখান দিয়ে শ্রমজীবী নরনারীর এবং ক্রুদ্ধ জনতা চীৎকার করতে করতে এগিয়ে চলেছে: "রুটি! রুটি! রুটি'

একটা ঘোড়ার গাড়ীর পেছন দিককার আসনে বসে আছে একজন মহিলা। ভয়ে তার মুখ শুকিয়ে চুন হয়ে গেছে। কোচোয়ান একটু হেসে ঘাড় ফিরিয়ে হাসতে হাসতে তাকে বলে:

কি করে আমি গাড়ী চালাই বলুন' আপনি নিজেই দেখতে পাচ্ছেন একটা মাছি ঢুকবারও জায়গা নেই।'

"গাড়ী চালাও উজবুক কোথাকার আবার কথা বলছে!'

"থাক, আমার আর উজবুক হয়ে কাজ নেই। আপনি আমার গাড়ী থেকে নামুন!"

রাস্তায় লোক ঠেলাঠেলি ধাক্কাধাক্কি করে ঘাড় বাড়িয়ে একজনের মাথার ওপর দিয়ে আর একজন চায়, কান পেতে শোনে উত্তেজিত ভাবে জিজ্ঞেস করে:

"কি, লিতেইনিতে একশ' লোক মারা গেছে?"

"বাজে কথা। একটি গর্ভবতী নারী ও একজন বৃদ্ধ গুলিতে মরেছে।"

"ও ভগবান! একটা বুড়োকে গুলি ক'রে মারা হ'ল কেন?"

"প্রোতোপোপভের হুকুম। তারই ওপর তো এখন সমস্ত ভার। সে যে একটা পাগলা লোক একথা কে না জানে!"

"মশায়রা শুনুন খবর! শুনে বিশ্বাস হবে না! সাধারণ ধর্মঘট!"

"কী? জলের কল, বিদ্যুতের কারখানায়ও?"

"ভগবানকে ধন্যবাদ, শেষ পর্যন্ত তবে তাই হ'ল. ."

"সাবাস. মজদুর ভাইসব, সাবাস!"

"সবুর. অত নেচো না—ধর্মঘট ভেঙ্গে চুরমার ক'রে দিল বলে!"

"সাবধান, দেখ তোমার ঐ সুন্দর হাঁড়িপানা মুখখানা নিয়ে তুমি নিজেই সবার আগে ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যেয়ো না!"

এতটা সময় নষ্ট হ'ল বলে তেলোগিন নিজেই নিজের প্রতি বিরক্ত হয়। যে যে বাড়িতে যাবে বলে ঠিক করেছিল সেই সেই বাড়িতে সে যায়. কিন্তু গিয়ে দেখে কোন বাড়িতেই কেউ নেই। ক্ষুব্ধ মনে আবার নেভস্কি প্রস্‌পেক্ট ধ'রে সে ফিরে হাঁটতে থাকে।

রাস্তা দিয়ে পুনরায় গাড়ী চলতে আরম্ভ করে. বাড়ীর দ্বাররক্ষকরা বেরিয়ে এসে বাড়ির সামনের ফুটপাথ থেকে বরফ সরিয়ে ফেলতে থাকে. লম্বা কালো কোট গায়ে দীর্ঘকায় পুলিশ রাস্তার মোড়ে মোড়ে হাজির হয় এবং আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার যাদুকাঠি সেই ক্ষুদ্র সাদা দণ্ড অগণিত মানুষের উদ্ধত শির ও উদ্দাম চিন্তারাশির ঊর্ধ্বে তুলে ধরে। বিদ্বেষপরায়ণ কোন পথিক রাস্তা পার হতে হতে পুলিশের দিকে চেয়ে হয়ত ভাবতে পারেঃ "সবুর. ভায়ারা, তোমাদের দিন ঘনিয়ে আসছে!" কিন্তু স্বপ্নেও কেউ ভাবতে পারেনি যে, সেইদিন ইতিমধ্যেই এসে গেছে এবং দণ্ড হাতে গালপাট্টাওয়ালা ঐ যে বড় বড় মানুষগুলি স্তম্ভের মত দাঁড়িয়ে আছে সেগুলি এখন ভূত ছাড়া আর কিছুই নয়. আগামী কালই সেগুলি রাস্তার মোড় থেকে দৈনন্দিন জীবন থেকে এমন কি মানুষের স্মৃতি থেকেও মুছে যাবে।

"তেলোগিন! তেলোগিন! আরে দাঁড়াও একটু! কালা নাকি তুমি!"

স্মুকফ ছুটে আসে তার কাছে। টুপিটা তার মাথার পেছন দিকে সরান আর একটা হিংস্র পরিতৃপ্তির দৃষ্টি রয়েছে তার দু'টো চোখে।

"কোথায় যাচ্ছ তুমি? চল না একটা কাফেতে যাই।"

তেলোগিনের হাত ধ'রে টানতে টানতে তাকে নিয়ে সে গিয়ে ঢোকে একটা কাফেতে। সিগারেটের ধোঁয়ায় ঘরটা ভরে গেছে, এত ধোঁয়া যে চোখ জ্বালা করে। কারো মাথায় বোলার-হ্যাট, কারো মাথায় ফারের টুপি. কোটের বোতাম সবারই খোলা, বসে লোকগুলি ভীষণ তর্ক ও চেঁচামেচি করছে। তর্ক করতে করতে এক একজন লাফিয়ে উঠছে। কোন রকমে পথ ক'রে নিয়ে স্মুকফ জানালার পাশে চলে যায় এবং তেলোগিনকে নিয়ে একটা ছোট টেবিলের ধারে বসে।

"রুবলের দাম পড়ে যাচ্ছে," চীৎকার করে বলে সে এবং টেবিলের ধারটা দু' হাতে শক্ত ক'রে ধরে। "শেয়ারের বাজার একেবারে মন্দা। এই তো হ'ল আসল বস্তু! বল তুমি কি দেখে এলে।"

"আমি লিতেইনি প্রসপেক্টে ছিলাম," বলে তেলেগিন। "সেখানে গুলি চলেছে, তবে শূন্যের দিকেই চলেছে বলে আমার ধারণা।"

"আচ্ছা, এসমস্ত দেখেশুনে তোমার কি মনে হয়?"

"জানিনে আমি। তবে আমার মনে হয় খাদ্য সরবরাহের দিকে সরকারের বিশেষ ভাবে নজর দেওয়া দরকার।"

"সে অবস্থা কি আর আছে, সময় পার হয়ে গেছে", টেবিলের ওপরকার কাচের ঢাকনাটায় থাবড় মেরে চেঁচিয়ে বলে স্মুকফ। "সময় পার হয়ে গেছে! আমরা আমাদের নিজেদের নাড়িভুঁড়ি নিজেরাই হজম করে বসে আছি! যুদ্ধ এখানেই শেষ—আর কত, ঢের ঢের হয়েছে। কলকারখানায় শ্রমিকরা কি জিগির তুলেছে জানো? শ্রমিকদের প্রতিনিধি নিয়ে সোবিয়েত ডাকু!—এই হচ্ছে আজ তাদের দাবি। এই সমস্ত সোবিয়েত ছাড়া আর কাউকেই তারা বিশ্বাস করবে না।"

"তাই নাকি?"

"এই হচ্ছে শেষ, আসল জিনিস, বুঝলে ভায়া। জারশাসনের বারোটা বেজে গেছে। চোখ দুটো মেল! এ বিদ্রোহ নয়। বিপ্লবও নয়। এ হচ্ছে বিশৃঙ্খলতার সূচনা। বিশৃঙ্খলতা স্বয়ং এসে উপস্থিত।"

স্মুকফের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘামের নীচে একটা শিরা ভেসে ওঠে।

"তিনদিনের মধ্যে দেখবে সরকার, সৈন্য, প্রাদেশিক গবর্নর, পুলিশ বলতে আর কিছুই থাকবে না। থাকবে শুধু আঠার কোটি জঙ্গলী মানুষ। বুঝতে পারছ তুমি যে আমাদের এই জঙ্গলীগুলি কি চীজ? এগুলির তুলনায় বাঘ গণ্ডার তো শিশুর হাতের খেলনা হে। এক একটা জঙ্গলী মানুষ হচ্ছে পচনশীল দেহের এক একটা বীজাণু কোষের মত। অত্যন্ত মারাত্মক।"

"যাও, শয়তানের শরণ নাও গে!" বলে তেলেগিন। "কি সমস্ত বাজে কথাই বলছ তুমি! তুমি যা বলছ মোটেই তা নয়। এ হচ্ছে বিপ্লব এবং এ ভালর জন্যই হয়েছে।"

"না হে না, আজ তুমি যা দেখতে পাচ্ছ তা বিপ্লব নয়। এ হচ্ছে ভাঙ্গন। বিপ্লব আসবে পরে। তবে তুমি আমি বোধ হয় তা দেখে যেতে পারব না।"

"হয়ত তোমার কথাই ঠিক," উঠে দাঁড়িয়ে বলে তেলেগিন। "ভাসিলি রুবলেভ—সে বিপ্লব। তুমি নও, স্মুকফ। তোমার বাগাড়ম্বর বড় বেশি আর সব কিছুই অসম্ভব রকম চুলচেরা বিচার ক'রে দেখতে চাও।"

সকাল সকালই তেলেগিন বাড়ি ফেরে এবং গিয়েই শুয়ে পড়ে। কিন্তু ঘুম তার বেশিক্ষণ হয় না। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সে পাশ ফিরে কাত হয়ে

শোয় এবং চোখ দুটো মেলেই রাখে। চেয়ারের ওপর একটা চামড়ার স্যুটকেস খোলা অবস্থায় পড়ে আছে, সেটার গন্ধ তেলেগিনের নাকে আসছে। স্যুট-কেসটা স্টকহোমে কিনেছিল সে। তার মধ্যে রয়েছে চামড়ার আধারে রুপোয় বাঁধান চমৎকার একটা টয়লেট সেট; দাশার জন্য উপহার। তেলেগিনের বড় প্রিয়বস্তু এটি, প্রতিদিনই টিস্যু পেপারের ভেতর থেকে খুলে এটাকে সে দেখে এবং দেখে পরম তৃপ্তি লাভ করে। কল্পনায় ছবি আঁকে সে, রেলগাড়ীর একটা কামরা, রুশিয়ার বাইরে ট্রেনের কামরাগুলিতে যেমন লম্বা জানালা থাকে তাতে সেরকম একটা লম্বা জানালা, দাশা বসে আছে আসনে, তার গায়ে ভ্রমণের পোষাক, কোলে রয়েছে এই টয়লেট সেটের আধারটা, তা থেকে সুগন্ধী ও চামড়ার গন্ধ বেরুচ্ছে—স্বচ্ছন্দ, আনন্দদায়ক পর্যটনের প্রতীক।

সে উঠে বসে। তমসাচ্ছন্ন আকাশটায় নগরীর আলোর যে ঘোলাটে ধূমল-বর্ণ প্রতিফলন হয়েছে, জানালা দিয়ে সে তার দিকে চেয়ে থাকে। হৃদয়ের যে বেদনা ও বিদ্বেষ নিয়ে অজ্ঞ লোকগুলি রুটির জন্য চীৎকার করছিল, স্পষ্টভাবেই সে তা উপলব্ধি করে এবং ভাবে সেই বেদনা ও বিদ্বেষ নিয়েই তাদের এই আভার দিকে তাকান উচিত। অপ্রিয়, একঘেয়ে, ঘৃণ্য এই নগরী—তথাপি এই হ'ল দেশের মস্তিষ্ক ও ইচ্ছাশক্তি: আক্রান্ত হয়েছে এখন এক দারুণ ব্যাধিতে, মৃত্যু-যন্ত্রণা উপস্থিত হয়েছে এর।

বেলা বারোটা নাগাত তেলেগিন বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ে। কুয়াশাচ্ছন্ন প্রশস্ত রাস্তাগুলি জনমানবহীন। নীহার পড়ছে। একটা ফুলের দোকানের জানালার ঘামা কাচের মধ্য দিয়ে সে দেখতে পায় ভেতরে কাটা কাচের পাত্রে জল ছেটানো লাল গোলাপের একটা চমৎকার তোড়া। নীহার পর্দা ভেদ করে তার মুগ্ধ দৃষ্টি গিয়ে পড়ে সেগুলির ওপর।

একটা সরু রাস্তা থেকে পাঁচজন টহলদার অশ্বারোহী কসাক সৈন্য পর পর বেরিয়ে আসে। একেবারে শেষের জন বল্গা টেনে ঘোড়ার মাথাটা ঘুরিয়ে দেয়। ঘোড়াটা কদমে রাস্তাটা পার হয়ে ফুটপাথের যেখানে টুপি মাথায় ও ছেঁড়া কোট গায়ে তিনজন লোক চাপা গলায় উত্তেজিতভাবে আলোচনা করতে করতে হেঁটে চলেছে সেখানে যায়। কসাক সৈন্যটি আসায় তারা থেমে দাঁড়ায় এবং তাদের মধ্যে একজন হৃষ্টচিত্তে কি একটা মন্তব্য ক'রে একহাতে ঘোড়ার লাগামটা ধরে। এই দৃশ্যটা এতই অপ্রত্যাশিত যে দেখামাত্র তেলেগিনের হৃদয়টা তড়াক ক'রে লাফিয়ে ওঠে। কসাকটি শুধু হাসে, মাথা নাড়ে ও ঘোড়াটাকে আবার ছুটিয়ে সঙ্গীদের গিয়ে ধরে; তারা পাঁচজনই ধীরে ধীরে রাস্তার কুয়াশার মধ্যে মিলিয়ে যায়।

নদীর ধারে দলে দলে উত্তেজিত লোককে তর্ক করতে দেখা যায়; মুখে মুখে খবর রটে ও গুজব ছড়ায়। গতকালের ঘটনা এখনো তাদের মাথার মধ্যে রয়েছে। নেভার দিকে বহু লোক আসছে। আগাগোড়া পাথরের প্যারা-পেটটা ধরে উৎসুক নয়নে কয়েক হাজার লোক পিঁপড়ের সারির মত তুষারের

ওপর দিয়ে হাঁটাহাঁটি করছে। ওদিকে পুলের ওপর একদল মাথা গরম লোক খুব চেঁচামেচি শুরু করে দিয়েছে। যে সমস্ত সৈন্য পুলের মুখ থেকে ওপার পর্যন্ত পথ আগলে দাঁড়িয়ে আছে তাদের খুব চুটিয়ে কথা বলছে তারা। তুষারের পর্দা ভেদ করে পুলের অপর প্রান্তটা একরকম নজরে আসছে না বললেই চলে।

"পুল বন্ধ ক'রে রেখেছ কেন? আমাদের যেতে দাও!"

"আমরা শহরে যাব!"

"পুল আমাদের জন্য। তোমাদের বন্ধ করার অধিকার নেই।"

"তোমরা কি রুশ, না কি? আমাদের যেতে দাও!"

চারটে সেন্ট জর্জ ক্রুশ পদক বুকে এঁটে একজন দীর্ঘকায় কর্পোরাল লম্বা লম্বা পা ফেলে পুলটার একপাশ থেকে আর এক পাশ পর্যন্ত খালি হাঁটছে আর তার ভারী বুটজোড়ার মস্‌মস্‌ শব্দ হচ্ছে। ভীড়ের মধ্য থেকে একজন যখন তাকে গালি দেয় সে তখন তার ব্রণের দাগযুক্ত কদাকার মুখটা তাদের দিকে ঘুরিয়ে বলেঃ

"তোমরা ভদ্রলোক! ভদ্রলোকের মুখে এই ভাষা!" তার পাকানো গোঁফ-জোড়ার প্রান্তভাগ দুটো কাঁপতে থাকে। "আমি তোমাদের পুল পার হতে দিতে পারিনে। না মানবে তো গুলি চালাতে বাধ্য হব।"

এতে লোকগুলি আরো ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে।

"সৈন্যরা গুলি করবে না!" চিৎকার করে বলে একদল।

"জাহান্নমে যা, গায়ে উকুনপড়া কুত্তা কোথাকার!"

কর্পোরাল আবার ঘুরে দাঁড়ায় ও প্রতিবাদ করে; তবে তার কণ্ঠস্বর কর্কশ এবং সৈন্যেরই মত দাম্ভিকতাপূর্ণ হলেও কথাবার্তার মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে এমন একটা শঙ্কা ও সংশয়ের ভাব প্রকাশ পায় যা এখন প্রায় সকলেরই মধ্যে রয়েছে। এটা টের পেয়ে লোকগুলি তাকে প্রাণভরে গালাগালি দিতে থাকে আর বাধা ঠেলতে আরম্ভ করে।

স্প্রিংএর বাঁকা চশমা চোখে, গলায় স্কার্ফ জড়ানো, লম্বা, রোগাপানা একটা লোক হঠাৎ চীৎকার করে বলে ওঠেঃ

"তারা লোক ও যানবাহন চলাচলে বাধা দিচ্ছে, সর্বত্র প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করেছে আর এখন পুলটা বন্ধ করে দিয়েছে। এ জুলুম! আমরা কি আমাদের নিজেদের শহরে স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে পারব না না, আমাদের সেই অধিকারটুকুও এখন কেড়ে নেওয়া হবে? ভাইসব, আসুন সৈন্যদের অগ্রাহ্য করে আমরা বরফের ওপর দিয়ে হেঁটে নদী পার হই।"

"ঠিক আছে! বরফের ওপর দিয়েই চল! হুর্‌রে!..."

সঙ্গে সঙ্গে কয়েকজন লোক তুষার-ঢাকা যে পাথরের সিঁড়িগুলি বরফ-জমা নদীর দিকে নেমে গেছে সেদিকে ছুটে যায়। সেই লম্বা লোকটাও দৌড়ায়, তার গলার স্কার্ফটার প্রান্তভাগ পেছনের দিকে হাওয়ায় পতপত করে উড়তে

থাকে। সিঁড়ি দিয়ে নেমে গিয়ে সে পুলের তলায় বরফের ওপর দিয়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে হেঁটে চলে। পুলের ওপর থেকে সৈন্যরা নীচের দিকে ঝুঁকে চীৎকার করে বলে ঃ

"এই, ফিরে এস, না হলে গুলি করব! ফিরে এস, এই লম্বা পা'ওয়ালা শয়তান!"

কিন্তু তাদের কথায় কোনরূপ কর্ণপাত না করেই লোকটা বরফের ওপর দিয়ে এগোতে থাকে। তার পেছনে একটা সার বেঁধে আরো লোক লাফাতে লাফাতে চলে। বাঁধের ওপর থেকে একে একে লোক বরফের ওপর লাফিয়ে পড়ে, শুভ্র তুষারের ওপর ধাবমান মানুষগুলিকে কালো দেখায়। পুলের ওপর থেকে সৈন্যরা চীৎকার করে আর তলা থেকে চলন্ত মানুষগুলি মুখের দু'পাশে হাত তুলে চেঁচিয়ে পাল্টা জবাব দেয়। একজন সৈন্য তার রাইফেলটা তোলে, আর একজন তার কাঁধটা স্পর্শ করে, সে আর তখন গুলি করে না।

রাস্তায় যারা বেরিয়ে পড়েছিল তাদের কারোই কোন নির্দিষ্ট কর্মসূচী ছিল না, কিন্তু যখন তারা দেখল যে সেতুসমূহ ও রাস্তার মোড়গুলি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে তখনি তাদের রোখ চাপল, যা করতে নিষেধ করা হচ্ছে তাই করা হবে—সেতু পার হয়ে তারা ভীড়ের সঙ্গে গিয়ে যোগ দেবেই। লোকের কল্পনাশক্তি এমনিতেই লাগামহীন হয়ে পড়েছিল, এই নিষেধাজ্ঞার ফলে তা আরো উদ্দাম হয়ে উঠল। চারদিকে দাবানলের মত গুজব ছড়িয়ে পড়ল যে, এই সমস্ত বিশৃংখলার পশ্চাতে রয়েছে একজন অজ্ঞাত লোকের হাত।

দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যার দিকে পাভলভ রেজিমেন্টের কিছু সৈন্য এনে নেভস্কি প্রসপেক্টে মোতায়েন করা হয়। উৎসুক দর্শকরা কোথাও দল বেঁধে দাঁড়ালেই সৈন্যরা তাদের দিকে গুলি করে, বিচ্ছিন্ন পথচারীরাও বাদ পড়ে না। ঘটনার গতি দেখে লোক ভাবতে আরম্ভ করেছে, এবার বিপ্লব শুরু হল।

কিন্তু এর মূলকেন্দ্র কোথায়, বা কে এর নেতৃত্ব করছে কেউ জানে না—সেনাপতিও না, পুলিশও না, এমন কি ডিক্টেটর প্রোতোপোপভও না। শেষোক্ত লোকটি আজ সম্রাটের বড় প্রিয়পাত্র, একসময় ছিল সে সিমবার্স্কের একজন বস্ত্র-ব্যবসায়ী। সেখানকার ত্রয়তস্ক হোটেলের অসমাপ্ত দরজার প্যানেলের ভেতর ঢুকিয়ে দিয়ে নাউমফ নামক একজন স্থানীয় ভূস্বামী ঝগড়ার সময় তার মাথাটা ফাটিয়ে দিয়েছিল। মাথার খুলি ও মস্তিষ্কে আঘাত লাগার দরুন তার শিরঃপীড়া ও স্নায়ুরোগ হয়। পরবর্তীকালে সেই লোকের হস্তে যখন রুশ সাম্রাজ্যের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের ভার অর্পিত হয় তখন তার মাথা একেবারে বিগড়ে যায়। সর্বত্রই ছড়িয়ে আছে বিপ্লবের কেন্দ্র, প্রতি ঘরে, রাস্তায় প্রতিটি মানুষের কল্পনা, অসন্তোষ ও বিক্ষোভে ঠাসা মাথায়। বিপ্লবের প্রাণকেন্দ্র খুঁজে বার করতে কর্তৃপক্ষের অক্ষমতা একটা অশুভ লক্ষণ। পুলিশ ছায়ার

পেছনে ধাওয়া করছে। ধরতে হলে তাদের পেত্রোগ্রাদের চাব্বিশ লক্ষ অধিবাসীকেই ধরতে হয়।

তেলোগিন সারাদিন রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে কাটায়। সারাক্ষণ সে কেমন যেন একটা অস্বাভাবিক অস্থিরতা অনুভব করে. বোধ হয় সকলেরই এই অবস্থা। তার মনে হয় নগরীর উত্তেজনা বেড়ে ক্রমশ গিয়ে প্রায় উন্মত্ততার পর্যায় পেণছেছে: সকলেই যেন একসঙ্গে চঞ্চল হয়ে উঠেছে। অসংবন্ধ জনগণ উত্তেজিত অবস্থায় ঘুরে বেড়াচ্ছে রাস্তায় রাস্তায়, ব্যগ্রভাবে চেয়ে আছে তারা একটা সংকেত, একটা বিদ্যুৎ চমকের আশায় যা তাদের চোখ ঝলসে দিয়ে সকলকে এক করে দেবে।

নেভস্কি প্রসপেক্টে গুলি হওয়া সত্ত্বেও কেউ ভয় পায়নি। ভ্লাদিমির স্ট্রীটের মোড়ে দুটি মৃতদেহের চারপাশে এসে বহু লোক জড়ো হয়—ছাপা স্কার্ট-পরা একটি রমণী এবং ফার কোট-পরা একজন বৃদ্ধের মৃতদেহ। যখন খুব জোর গুলি চলে লোকগুলি ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়. আবার দেয়াল ঘেঁষে ঘেঁষে আস্তে আস্তে বেরিয়ে আসে তারা।

সন্ধ্যার দিকে গুলি বন্ধ হয়। একটা ঠাণ্ডা বাতাস আকাশটাকে পরিষ্কার করে দিয়েছে। সাগরের ওপর যে মেঘ জমেছে তা থেকে অস্তমিত সূর্যের ক্ষীণ আভা এখনো মিলিয়ে যায়নি। আকাশটা যেখানে কয়লার মত কালো সেখানে দেখা দিয়েছে কাস্তের মত সরু একফালি চাঁদ: মনে হয় শহর থেকে চাঁদটা বেশি উঁচুতে নয়। সে রাত্রে রাস্তার আলোগুলি আর জ্বালা হয়নি। সমস্ত বাড়িরই দরজা বন্ধ, জানালাগুলি অন্ধকার। কুয়াশাচ্ছন্ন, নির্জন নেভস্কি প্রসপেক্টের সর্বত্র রাইফেল গাদা করে রাখা হয়েছে। রাস্তার মোড়ে মোড়ে সতর্ক দৃষ্টি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে লম্বা লম্বা প্রহরী। জ্যোৎস্নায় চিকচিক করছে প্লেট-গ্লাসের জানালা, ট্রামলাইন আর সৈন্যদের হাতের সঙ্গীন। সমস্তই মনে হয় নীরব ও শান্ত। কিন্তু প্রতি ঘরেই লোক টেলিফোনে চাপা-গলায় দিনের বেলা যা যা ঘটেছে সেই সম্পর্কে ফলাও করে আলাপ-আলোচনা করছে।

পঁচিশে ফেব্রুয়ারী সকালবেলা জ্নামেনস্কি স্কোয়ার সৈন্য ও পুলিশে ভরে যায়। সরু পা'ওয়ালা, সোনালি-বাদামী রংএর ঘোড়াগুলি কেবল লাফায়। সেগুলিতে চড়ে একদল ঘোড়সওয়ার পুলিশ হাজির হয়েছে নর্দার্ন হোটেলের সামনে। তৃতীয় আলেকজান্দারের মূর্তি ঘিরে রয়েছে কালো কোট-পরা পদাতিক পুলিশ: স্কোয়ারের চার ধারেও ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে তারা অবস্থান করছে। রেলওয়ে স্টেশনের সম্মুখে কানের কাছে ফারটুপি পরে দাড়িওয়ালা কসাক সৈন্যরা অপেক্ষা করছে আর খালি হাসছে: তাদের ঘোড়ার জিনের সঙ্গে আঁটি আঁটি ঘাস ফিতে দিয়ে বাঁধা রয়েছে। নেভস্কি প্রসপেক্টের দিকে দেখা যাচ্ছে ম্যাড়মেড়ে ধূসর বর্ণের পোশাক-পরা পাভলভ রেজিমেন্টের সৈন্যদের।

পাথরের যে সিঁড়িটা স্টেশনের প্রবেশমুখে গিয়ে উঠেছে, তেলেগিন একটা স্যুটকেস হাতে সেটা দিয়ে ওপরে ওঠে এবং সেখান থেকে সমস্ত স্কোয়ারটা সে দেখতে পায়। স্কোয়ারের মাঝখানে রক্তবর্ণ একটা স্ফটিক প্রস্তরের ওপর দাঁড়িয়ে আছে ব্রঞ্জের বিরাট ঘোড়াটা, আরোহীর ভারে সেটার মাথা নত, ওপরে বসে আছে বিশালবপু সম্রাট, তার চওড়া কাঁধ দুটো এবং গোল টুপিটা ঢেকে আছে তুষারে। চীৎকার করে, শিস ও গালাগালি দিয়ে লোকের ভীড় এগিয়ে আসছে পাঁচটা রাস্তা ধরে এই মূর্তিটার পাদদেশের দিকে।

আগের দিন পুলের কাছে যেমন হয়েছিল ঠিক সেভাবেই সৈন্যরা, বিশেষ করে কসাকগণ পাশাপাশি দু' দুজন করে ঘোড়ায় চড়ে চারদিক থেকে যেসমস্ত লোক আসছে তাদের ঘেঁষে ধীরে ধীরে পরিক্রম করতে থাকে এবং দু'পক্ষ থেকেই পরস্পরের প্রতি কটূবাক্য বর্ষণ ও টিটকারি চলে। তবে হোঁৎকা পুলিশগুলি দাঁড়িয়ে আছে বিষণ্ণ বদনে, নীরবে; তারা যে কি করবে ঠিক করে উঠতে পারছে না।

এরকম একটা অস্বস্তিকর অবস্থা তেলেগিনের কাছে অপরিচিত নয়। শত্রু যখন একেবারে কাছে এসে পড়েছে, সকলেই জানে কি করা উচিত, প্রত্যেকেই আক্রমণের আদেশের প্রতীক্ষায় আছে অথচ তখনো পর্যন্ত আদেশ পাওয়া যায়নি, প্রতি মুহূর্তেই যন্ত্রণাদায়ক মনে হচ্ছে, তখন যে কি উদ্বেগ হয় তেলেগিন তা জানে। হঠাৎ স্টেশনের একটা দরজা ঘটাং করে খুলে যায় এবং সামরিক পুলিশের একজন অফিসার সিঁড়ির মাথায় দেখা দেয়। কর্নেলের চাপরাস আঁটা একটা খাট কোট তার গায়ে। মুখ তার বিমর্ষ। সোজা টান হয়ে দাঁড়িয়ে সে সমস্ত স্কোয়ারটা ভাল করে দেখে নেয়, তার ঈষৎ কটা চোখ দুটোর দৃষ্টি তেলেগিনের মুখের ওপর একবার পড়ে। তারপর সিঁড়ি দিয়ে লঘুপদে তাড়াতাড়ি নেমে কসাক সৈন্যদের কাছে সে যায়, তারা তাকে পথ ছেড়ে দেয়। দাড়িযুক্ত থুতনিটা ওপর দিকে তুলে কসাক ক্যাপ্টেনকে সে কি যেন বলে। ক্যাপ্টেন তার কথা মন দিয়ে শোনে এবং জিনে একটু পেছন দিকে হেলে বক্রহাসি হাসে। ওল্ড নেভস্কি স্ট্রীটের দিকে কর্নেল মাথাটা একবার নামায় এবং তারপর স্কোয়ারের ভেতর তুষারের গালিচার ওপর দিয়ে হেঁটে চলে। টাইট করে বেল্ট আঁটা বিরাট ভুঁড়িওয়ালা একজন পুলিশ ইন্‌স্পেক্টর তার সঙ্গে দেখা করার জন্য দৌড়ে আসে; কম্পিত হস্তে স্যালুট করে সে। ওল্ড নেভস্কি স্ট্রীট ধরে জনতা ক্রমশ এগিয়ে আসতে থাকে, কোলাহল স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে ওঠে এবং খানিকক্ষণের মধ্যেই বুঝতে পারা যায় তারা গান গাচ্ছে। কে একজন তেলেগিনের আস্তিনটা শক্ত করে ধরে, সে অত্যন্ত উত্তেজিত, মাথায় তার টুপি নেই, গালে আঘাতের চিহ্ন, কালশিরা পড়ে গেছে, কোন রকমে উঠে তার পাশে দাঁড়ায় সে।

"ভাইসব! কসাক!" খুন ও রক্তপাত দেখলে মানুষ যেরূপ ভয়ার্ত কণ্ঠে চীৎকার করে ওঠে ঠিক সেরূপ বীভৎস আওয়াজ বেরিয়ে আসে তার গলা

থেকে—এমন বিকট, ভয়ঙ্কর কণ্ঠস্বর যে শুনে বুক ঢিপ ঢিপ করে এবং চোখের সামনে এক বিভীষিকা নেমে আসে। "ভাইসব, তারা আমাকে মেরে ফেলল। বাঁচাও! বাঁচাও!!...খুন! খুন!!"

জিনে থেকেই কসাকরা ঘুরে যায় এবং বিরস বদনে ও বিস্ফারিত লোচনে লোকটার দিকে তাকায়; তবে তাদের মুখে একটি শব্দও নেই।

ঠিক সেই মুহূর্তে ওল্ড নেভস্কি স্ট্রীট থেকে জনসমুদ্রের এক ঘন কৃষ্ণ তরঙ্গ সামনের দিকে দুর্বার গতিতে এগিয়ে আসতে থাকে: কল্পিনো জেলার শ্রমিকদের ভীড়। তাদের ভেজা লাল নিশানটা হাওয়ায় পতপত করছে। ঘোড়-সওয়ার পুলিশ নর্দার্ন হোটেলের সম্মুখ থেকে এগিয়ে যায় এবং হঠাৎ তাদের হাতে উন্মুক্ত অসি ঝলক মেরে ওঠে। জনতার মধ্যে একটা ভীষণ হৈ চৈ পড়ে যায়। সেই পুলিশ কর্নেলের দিকে তেলেগিনের দৃষ্টি পড়ে: পিস্তলের খাপে তার এক হাত, আর এক হাত আন্দোলিত করে সৈনিকদের এগিয়ে যাবার জন্য সংকেত করছে আর দৌড়চ্ছে সে।

কল্পিনো শ্রমিকদের ভীড়ের ভেতর থেকে নুড়ি ও বরফের খণ্ড দিয়ে ঢিল ছুড়ে মারা হচ্ছে কর্নেল ও ঘোড়সওয়ার পুলিশের দিকে। সরু পা'ওয়ালা বাদামী রংএর ঘোড়াগুলি কেবল লাফাতে থাকে। রিভলবারের গুলির ক্ষীণ ফট ফট শব্দ তেলেগিনের কানে আসে এবং মূর্তিটার পাদদেশের চারদিকে ধোঁয়াও দেখতে পাওয়া যায়। পুলিশ কল্পিনো শ্রমিকদের ওপর গুলি চালিয়েছে। ঠিক এই সময় তেলেগিন যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখান থেকে দশ গজ দূরেই কসাক বাহিনীর মধ্যে বাদামী রংএর একটা কসাক-ঘোটকী পেছনের দু'পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়ায়; তার আরোহী ঘাড়ের ওপর ঝুঁকে পড়ে তাকে সামনের দিকে চালিয়ে নিয়ে যায়। ঘোটকী কয়েক পা যেতেই পুলিশ কর্নেলকে কসাক তার নাগালের মধ্যে পায়। সে তার অসি তুলে মারে তাকে এক কোপ, এত জোরে কোপ মারে যে বাতাসে অসিটা বেজে ওঠে। তারপরই লাগাম টানে সে আর সংগে সংগে ঘোটকীটা আবার তার পেছনের দু'পায়ে ভর করে দাঁড়িয়ে ওঠে। পুলিশ কর্নেল যেখানে নিহত হয়েছে সেদিকে দলে দলে কসাকরা যেতে থাকে। সমস্ত বাধা ভেঙে ফেলে জনতা বন্যার জলের মত স্কোয়ারের ভেতর ঢুকে পড়ে। কয়েকটা গুলির আওয়াজ হয়, কিন্তু চতুর্দিক থেকে উত্থিত আনন্দ-কোলাহলে তা তলিয়ে যায়।

"তেলেগিন, তুমি এখানে কি করছ?" বলে একজন।

"যেভাবেই হোক আমাকে আজ পেত্রোগ্রাদ ছেড়ে যেতেই হবে—মালগাড়ীতে উঠেই হোক, কি এঞ্জিনে চড়েই হোক, আমার তাতে কিছু যায় আসে না।"

"বৃথা চেষ্টা! তুমি এখন চলে যেতে পার না! দেখতে পাচ্ছ না, ভায়া, বিপ্লব!" আনতোশকা আর্নলদভ, তার একমুখ দাড়ি, ময়লা পোশাক, চোখের পাতা লাল ও তারা দুটো স্ফীত। তেলেগিনের কোটের কোণটা সে টেনে

খরে। "পুলিশ অফিসারের মুণ্ডটা কিভাবে উড়ে গেল দেখলে ? ফুটবলের মত গড়িয়ে পড়ল—খাসা! গবেট, বুঝতে পারছ না যে এটা বিপ্লব!"

আনতোশকা যেন প্রলাপ বকে যাচ্ছে। স্টেশনের প্রবেশপথে দাঁড়িয়ে আছে তেলেগিন ও সে, আর তাদের চার পাশে রয়েছে লোকের ঠাসা ভীড়।

"আজ সকালে লিথুয়ানিয়ান ও ভলিনস্ক রেজিমেন্টের সৈন্যরা গুলি চালাতে অস্বীকার করেছে।...পাভলভ রেজিমেন্টের এক কোম্পানী সৈন্যকে সম্পূর্ণরূপে অস্ত্রসজ্জিত অবস্থায় রাস্তায় মোতায়েন করা হয়েছে। সমস্ত নগরী উল্টে গিয়ে মাথায় ভর করে দাঁড়িয়েছে, কিন্তু কি যে হচ্ছে কেউ বুঝতে পারছে না। নেভস্কি প্রসপেক্টে মাছির মত সৈন্য গিশগিশ করছে—ব্যারাকে ফিরে যেতে তাদের ভয়।"

॥ ছত্রিশ ॥

ফারকোট গায়ে ও শাল মাথায় দিয়ে দাশা এবং কাতিয়া স্বল্প আলোকিত মালায়া নিকিৎস্কায়া স্ট্রীট ধরে দ্রুত হেঁটে চলেছে। পাতলা বরফের টুকরো তাদের পায়ের তলে পড়ে মড়মড় করে ভেঙে যাচ্ছে। সবুজ আভাযুক্ত শীতল আকাশে উজ্জ্বল বাঁকা চাঁদ উঠেছে। ফটকের পেছন থেকে কুকুরগুলি ঘেউ ঘেউ করে ডাকছে। বরফ ভাঙার মড়মড় শব্দ শোনে আর দাশা ভেজা নরম শালটার ভেতর থেকে হাসে। নিজের বুকে হাত রেখে সে বলেঃ

"দিদি, কেউ যদি একটা যন্ত্র আবিষ্কার করতে পারত তবে এখানে অনেক অদ্ভুত জিনিসের সন্ধান পেত সে।"

দাশা আস্তে গুণ্ গুণ্ করতে থাকে। কাতিয়া তার হাত ধরে বলেঃ

"নে, এখন চল!"

কয়েক পা এগিয়েই দাশা আবার থেমে দাঁড়ায়।

"দিদি, তোর কি বিশ্বাস যে এটা বিপ্লব ?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, আকাশে বাতাসে পর্যন্ত অশান্তি।"

"দিদি, এ বসন্তের আগুন। চেয়ে দ্যাখ, আকাশটা কেমন সবুজ!"

দূরে তারা দেখতে পায় উকিল-সভার লাইব্রেরী হলের দরজার ওপর বেশি পাওয়ারের ইলেকট্রিক বাল্ব জ্বলছে। পিতার্সবুর্গ থেকে অদ্ভুত রকমের সব গুজব এসে পৌঁছাবার ফলে পারস্পরিক মতামত বিনিময় ও একটা মিলিত কর্মসূচী নির্ধারণের উদ্দেশ্যে কন্স্টিটিউশনাল ডেমোক্রাটরা আজ রাত সাড়ে ন'টায় সেখানে একটা সভা ডেকেছে।

দুই বোন সিঁড়ি দিয়ে তাড়াতাড়ি গিয়ে তিনতলায় ওঠে; গায়ের ফার কোট তারা খোলে না, শুধু হলে ঢুকবার সময় মাথার শাল নামিয়ে ফেলে। সমস্ত হলটা লোকে পরিপূর্ণ। তারা উদ্গ্রীব হয়ে বক্তৃতা শুনছে। শ্মশ্রুমণ্ডিত

রক্তিমানন, স্থূলকায় এক ভদ্রলোক সুন্দর ভঙ্গিতে তাঁর হাত দুটো নেড়ে বলছেন ঃ

"অত্যন্ত দ্রুত গতিতে সমস্ত ঘটনা ঘটে যাচ্ছে," চমৎকার গম্ভীর স্বরে বলেন তিনি। "গতকাল পেত্রোগ্রাদে জেনারেল খাবালভকে সমস্ত ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে এবং তাঁর এই বিবৃতি সারা শহরে দেয়ালে দেয়ালে এ'টে দেওয়া হয়েছে ঃ

'গত কয়েকদিন যাবৎ পেত্রোগ্রাদে বিশৃংখলা দেখা দিয়েছে: সঙ্গে সঙ্গে হিংসাত্মক কাজ এবং সামরিক ও পুলিশ অফিসারদের জীবন নাশের চেষ্টা চলেছে। রাস্তায় যে-কোন রকম ভীড় করা নিষিদ্ধ হল। পেত্রোগ্রাদবাসীদের সতর্ক করে দিচ্ছি যে, সৈন্যদেব আমি অস্ত্র ব্যবহারের হুকুম দিয়েছি এবং তাদের বলেছি যে রাজধানীতে পুনরায় শৃংখলা আনয়নের জন্য তারা যেন যে-কোন ব্যবস্থা অবলম্বনে পরাঙ্মুখ না হয়!' "

"যত সব খুনী!" হলের পেছন দিক থেকে গম্ভীর স্বরে বলে ওঠে একজন।

"এইরূপ বিবৃতি কিছু অপ্রত্যাশিত নয় এবং বাঁচবার অবলম্বন হিসেবে এটাই হচ্ছে তাদের শেষ তৃণ। লোক ধৈর্যের শেষ সীমায় এসে পৌঁচেছে। পেত্রোগ্রাদ গ্যারিসনের বিভিন্ন শ্রেণীর পাঁচিশ হাজার সৈন্য বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে।"

তাঁর বলা শেষ হবার আগেই সারা সভাগৃহে আনন্দের তুফান ওঠে। লোক চেয়ারের ওপর দাঁড়িয়ে যায় এবং চীৎকার করতে থাকে, এমন ভঙ্গী করে তারা যেন পুরনো ব্যবস্থার বুকে ছোরা মারা হচ্ছে। বক্তা উদ্দীপিত শ্রোতাদের দিকে চান ও প্রাণখুলে হাসেন। তারপর সকলকে শান্ত করার জন্য তিনি তাঁর হাত তোলেন এবং বলতে থাকেন ঃ

"এইমাত্র টেলিফোনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা খবর পাওয়া গেছে।" এই বলে তিনি তাঁর চৌখুপি-ছিটের কোটটার পকেটে হাত দেন এবং একটা কাগজ তুলে তার ভাঁজ খোলেন। "আজ স্টেট ডুমার প্রেসিডেন্ট রদজিয়াঙ্কো তারযোগে জারকে সরাসরি এই বার্তা প্রেরণ করেছেন ঃ

'অবস্থা গুরুতর। রাজধানীতে অরাজকতা। সরকার অসহায়। যান-বাহন, খাদ্যসরবরাহ ও জ্বালানীর ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে ভেঙে পড়েছে। রাস্তায় রাস্তায় গুলি চলেছে। কোন কোন ক্ষেত্রে সৈন্যরাই সৈন্যদের প্রতি গুলি করছে। সমগ্র জাতির আস্থাভাজন কোন একজন লোককে নতুন সরকার গঠনের জন্য অবিলম্বে নিযুক্ত করা দরকার। দেরি না হয়। দেরি করলেই বিপদ হবে। ভগবানের নিকট প্রার্থনা এই রকম সময়ে সম্রাটের ওপর গিয়ে দায়িত্ব না পড়ে।' "

রক্তিমানন ভদ্রলোক কাগজটা নামিয়ে তাঁর উজ্জ্বল চোখ দুটো দিয়ে সমস্ত হলটাকে একবার দেখে নেন। এরকম উত্তেজনাকর পরিস্থিতির মধ্যে মস্কো-বাসীদের আর কখনো দেখা যায়নি।

"ভদ্রমহোদয়গণ, আমরা আমাদের ইতিহাসের বৃহত্তম ঘটনাবলীর সম্মুখীন হয়েছি," কোমল, কম্পিত কণ্ঠে বলে চলেন তিনি। "হয়তো এই মুহূর্তে সেখানে"—দান্তনের মূর্তির মতো তিনি তাঁর হাতটা বাড়িয়ে দেন—"সেখানে, পেত্রোগ্রাদে, বহু পুরুষের আকাঙ্ক্ষা ইতিমধ্যেই পূর্ণ হয়েছে এবং ডিসেম্ব্রিস্ট-দের মধ্যে যারা শহীদ হয়েছিল তাদের প্রেতাত্মারা প্রতিশোধ নিয়েছে!. ."

"ও, ভগবান!" একজন স্ত্রীলোক কাতরস্বরে খেদোক্তি করে ওঠে।

"হয়তো আগামী কালই সমগ্র রুশিয়া উজ্জ্বল ভ্রাতৃত্বের ঐকতানে মুক্তির বেদীমূলে এক হয়ে দাঁড়াতে পারে।"

"হুররে! মুক্তি!" শ্রোতারা চীৎকার করে ওঠে।

বক্তা তাঁর চেয়ারে বসে পড়েন এবং হাতের পেছন দিক দিয়ে কপালটা মোছেন। চুল তৃণের মত খাড়া, সরু ও নির্জীব মুখ, রক্তিম দাড়ী, দীর্ঘকায় একব্যক্তি টেবিলের এক কোণ থেকে উঠে দাঁড়ান এবং কারো দিকে না চেয়ে শ্লেষের সুরে বলেন:

"এইমাত্র কানে এল কোন কোন কমরেডের 'হুররে! মুক্তি!' বলে চীৎকার। খুব ভালকথা। মোগিলেফ-এ দ্বিতীয় নিকলাসকে গ্রেপ্তার ও তাঁর মন্ত্রীদের বিচার করা, গবর্নরগণ ও পুলিশকে লাথি মেরে তাড়ান এবং বিপ্লবের রক্ত-পতাকা উত্তোলন, এর চাইতে ভাল কথা আর কি হতে পারে?' আরম্ভ ভাল। সকল দিক দিয়েই বৈপ্লবিক পদ্ধতির সুষ্ঠু ও বলিষ্ঠ সূচনা হয়েছে এবং দেখে মনে হয় এবার এ আর ব্যর্থ হতে পারে না। কিন্তু এক ভদ্রলোক এখানে এইমাত্র চমৎকার একটি বক্তৃতা দিলেন এবং আমি যদি তাঁকে ঠিক বুঝে থাকি তবে তিনি আসন্ন বিপ্লবে পূর্ণ সন্তোষ প্রকাশ করেছেন এবং আশার কথা শুনিয়েছেন যে, অদূর ভবিষ্যতেই সমগ্র রুশিয়া এক উজ্জ্বল সৌভ্রাত্রের সংগীত-বেদীতে ঐক্যবদ্ধ হবে।"

খাড়া চুলওয়ালা লোকটি রুমাল বার করে মুখ চাপা দেন, মনে হয় হাসি ঢাকবার জন্য ওরকম করেন তিনি। কিন্তু তাঁর গণ্ডাস্থির ওপর রক্তের চাপ স্পষ্টভাবে দেখা দেয়, অস্থিসার কাঁধ দুটো ঊর্ধ্বে ওঠে এবং একটু কাশেন তিনি। পেছন থেকে দাশাকে একজন প্রশ্ন করে:

"যিনি বক্তৃতা করছেন তিনি কে?"

"কমরেড কুজমা," তাড়াতাড়ি ফিসফিস করে জবাবটা আসে।

"১৯০৫ সালে শ্রমিক প্রতিনিধিদের সোবিয়েতে তিনি একজন সদস্য ছিলেন, এই সেদিন সাইবেরিয়া থেকে ফিরে এসেছেন।"

"আমার মতে পূর্ববর্তী বক্তা একটু আগাম গেয়েছেন," বলেন কমরেড কুজমা। হঠাৎ তাঁর মোমের মত কোমল মুখখানা ক্রুদ্ধ ও কঠিন হয়ে ওঠে। "জবাইর জন্য এক কোটি বিশ লক্ষ কৃষককে প্রস্তুত করা হয়েছে, তারা এখনো পর্যন্ত যুদ্ধক্ষেত্রেই রয়েছে। লক্ষ লক্ষ শ্রমিক ভূগর্ভস্থ কক্ষগুলিতে একটু বাতাসের জন্য ছটফট করছে, আর অভুক্ত অবস্থায় খাদ্যের জন্য রাস্তায় দাঁড়িয়ে

আছে লাইন দিয়ে। এই সমস্ত শ্রমিক ও কৃষকের পিঠের ওপর দাঁড়িয়েই কি আপনাদের সৌভ্রাত্রসূত্রে আবদ্ধ চারণদল গান গাইবেন... ?"

হলের মধ্যে একটা হিস্‌হিস্‌ শব্দ ওঠে এবং ক্রুদ্ধকণ্ঠে একজন চীৎকার করে বলে: "আপত্তিকর, এ হচ্ছে মানুষকে বিগড়ে দেওয়া!"

রক্তিমানন ভদ্রলোক তাঁর কাঁধ দু'টো নাচান এবং ছোট ঘণ্টাটায় হাত দেন। কমরেড কুজমা বলে চলেন:

"সাম্রাজ্যবাদীরা ইওরোপকে এই ভয়ানক যুদ্ধে নিক্ষেপ করেছে: বুর্জোয়া শ্রেণীর নীচের তলা থেকে ওপরতলা পর্যন্ত প্রত্যেকে এটাকে ধর্মযুদ্ধ বলে ঘোষণা করেছে, বিশ্বের বাজার দখল ও পুঁজিবাদের চরম জয়ের জন্য এই ধর্ম-যুদ্ধ! ঐ সমস্ত হলদে চামড়ার খেঁকিকুত্তা, সোশ্যাল ডেমোক্রাটরা, তাদের প্রভুদের সমর্থন করেছে, বলেছে, 'এটা সত্যি জাতীয় সংগ্রাম ও ধর্মযুদ্ধ,' হ্যাঁ মশায়! তাই বলেছে তারা। জবাইর জন্য পাঠান হয়েছে কৃষক ও শ্রমিকদের। আমি জিজ্ঞেস করি আপনাদের, এই রক্তাক্ত দিনে কে তার প্রতিবাদ করেছে ?"

"লোকটা বলছে কি? কে সে? বসিয়ে দাও তাকে!" ক্রুদ্ধকণ্ঠে লোক চীৎকার করে ওঠে। সভার মধ্যে একটা হৈ চৈ পড়ে যায়। কোন কোন শ্রোতা লাফিয়ে ওঠে এবং হাত তুলে সকলকে শান্ত হতে বলে।

"সময় এসেছে। অগণিত কৃষক এবং শ্রমিকের মধ্যেও বিপ্লবের আগুন ছড়িয়ে পড়বেই।"

কিন্তু এদিকে সভায় এমন গোলমাল আরম্ভ হয় যে, বক্তা কি বলছেন তা আর শুনতে পাওয়া যায় না। প্রভাতী পোশাক-পরা কয়েকজন লোক টেবিলের দিকে ছুটে যায়। কমরেড কুজমা মঞ্চ থেকে লাফিয়ে পড়ে একটা দরজার ভেতর দিয়ে অদৃশ্য হন। শিশুশিক্ষায় পারদর্শিনী সুপরিচিতা এক মহিলা তাঁর স্থানে গিয়ে দাঁড়ান।

"পূর্ববর্তী বক্তা যে-সমস্ত গরম গরম কথা বলে গেলেন ."

ঠিক সেই মুহূর্তে আবেশমাখা কোমলকণ্ঠে দাশার কানের কাছে ফিস্‌ ফিস্‌ করে একজন বলে:

"ভাল আছ, প্রিয়তমে ?"

ফিরে না দেখেই দাশা তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ায়। তেলেগিন দরজার ফাঁকে দাঁড়িয়ে আছে। তার দিকে তাকিয়ে দাশা ভাবে: 'এমন সুন্দর পুরুষ কি পৃথিবীতে আর আছে! সে তো আমারই।' প্রায়ই তার যেমন হয়ে থাকে তেমনি এবারও তেলেগিন এই ভেবে অভিভূত হয়ে পড়ে যে, অসাক্ষাতে দাশার যে ছবি তার মনের মধ্যে জাগত আসলে সে তার চেয়ে আরো অনেক বেশি সুন্দরী। দাশার গণ্ডদেশে উষ্ণ রক্তের আভা ফুটে ওঠে, তার নীলাভ-ধূসর চোখ দু'টি দেখে মনে হয় যেন দু'টি অতল সরোবর। অনিন্দ্য রূপসী সে, একটুও খুঁত নেই।

দাশা মৃদুস্বরে বলেঃ "ভাল তো?" তারপর তেলেগিনের বাহু ধরে দুজনে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে।

বাইরে গিয়ে দাশা একবার দাঁড়ায়, তেলেগিনের দিকে চেয়ে হাসে, জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলে এবং তার কাঁধে দু'হাত রেখে অধরোষ্ঠে চুম্বন করে। আর একবার তার সুষমা, তার অঙ্গের সৌরভ পান করে পরিতৃপ্ত হয় তেলেগিন।

নীরবে তেলেগিনের হাত ধরে দাশা এবং তারপর তারা দুজনে হাঁটতে থাকে। কাস্তের মত চাঁদ উঠেছে আকাশে, মনে হয় মাটি থেকে সেটা বুঝি বেশি উঁচুতে নয়। চাঁদের আলোতে রাস্তায় ভাঙা বরফের টুকরোগুলি চিক-চিক করছে।

"আমি যে তোমাকে কত ভালবাসি, ইভান! তোমার আশায়ই পথ চেয়ে ছিলাম আমি।"

"আসবার আমার উপায় ছিল না, তুমি তো জান "

"ওরকম চিঠি লিখেছি বলে নিশ্চয়ই তুমি আমার ওপর রাগ করনি জান তো আমি গুছিয়ে লিখতে জানিনে। "

তেলেগিন দাঁড়িয়ে দাশার হাসিমাখা মুখখানার দিকে তাকায়। দাশা নীরবে তার দিকে চেয়ে আছে। মাথার দু'পাশে ঝুলান রেশম ও পশম-মিশ্রিত মসৃণ শালটার মাঝখানে তার মুখখানা বড় মধুর ও সরল দেখাচ্ছে, তার নীচে ভ্রূযুগল কালো রেখার মত টানা। আস্তে সে তাকে নিজের কাছে টানে, এক পা এগিয়ে দাশা তেলেগিনের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে দাঁড়ায়, এখন সে চেয়ে আছে তেলেগিনের চোখের দিকে। তেলেগিন আবার তাকে চুম্বন করে: তারপর দুজনে হেঁটে চলে।

"তুমি কি এখানে কিছুদিন থাকবে, ইভান?"

"বলা শক্ত—কখন যে কি অবস্থা দাঁড়ায়!"

"হ্যাঁ, তাই তো, বিপ্লব যে!"

"জান, আমাকে এঞ্জিনে চড়ে আসতে হয়েছে।"

"তুমি কি জান ইভান, "

নিজের জুতোর মাথার দিকে চেয়ে তার সঙ্গে পা ফেলে হেঁটে চলে দাশা।

"কি?"

"আমি তোমার সঙ্গে যাব—গিয়ে সেই ফ্ল্যাটে থাকব।"

তেলেগিন নিরুত্তর। দাশা শুধু উপলব্ধি করে যে অনেকখানি হাওয়া তেলেগিন গিলে বসে আছে, চেষ্টা করেও সে নিঃশ্বাস ফেলতে পারছে না। তার জন্য স্নেহ ও অনুকম্পায় দাশার হৃদয়টা ভরে যায়।

॥ সাইত্রিশ ॥

সময়ের আপেক্ষিকবাদ যে কতখানি সত্য তার প্রমাণ পাওয়া গেল পরের দিন এবং প্রধানত এজন্যই এই দিনটি উল্লেখযোগ্য। ভেকস্কায়ার হোটেল থেকে আরবাতে দাশার ফ্ল্যাটে তেলেগিনকে নিয়ে আসতে ঘোড়ার গাড়ীর কোচোয়ান প্রায় দেড় বছর লাগিয়ে দিল।

"না মশায়," বলে কোচোয়ান, "পঞ্চাশ কোপেক দিয়ে গাড়ী চড়ার দিন আর নেই। পেত্রোগ্রাদে লোক স্বাধীন হয়ে গেছে। মস্কোতেও আমরা এখন যে কোন দিন তা করব। ঐ যে দেখছেন পুলিশটা ওখানে দাঁড়িয়ে আছে, আমার ইচ্ছে হচ্ছে ওর কাছে গাড়ীটা চালিয়ে নিয়ে গিয়ে মারি এই চাবুক দিয়ে ওর মুখে কয়েক ঘা! সবুর করুন, মশায় বেশি দেরি নেই, হবে সবার সঙ্গেই বোঝাপড়া হবে।"

ভোজনকক্ষের দরজায় তেলেগিনের সঙ্গে দাশার দেখা। তার পরনে ড্রেসিং গাউন মাথায় পরিষ্কার চুল পাক দিয়ে একটা ঢিলে খোপা করে বাঁধা, অঙ্গে টাটকা জল ও সাবানের সৌরভ। কালের ঘণ্টা একবার বেজে ওঠে এবং কাল স্তব্ধ হয়ে দাঁড়ায়। দাশার কণ্ঠস্বর দাশার হাসি এবং প্রভাতের সূর্য-কিরণে উজ্জ্বল দাশার কেশরাশির সৌন্দর্য দিয়ে সর্বাক্ষণ পরিপূর্ণ। এমন কি টেবিলের একপাশে দাশার চলে যাওয়ার ব্যবধানটুকুও তেলেগিনের যেন সহ্য হয় না। একটা গা আলমারীর ঢাকনা খুলবার জন্য দাশা তার হাতটা তোলে ড্রেসিং গাউনের ঢোলা হাতা নীচের দিকে নেমে আসায় সমস্ত হাতটা অনাবৃত হয়ে যায়। তেলেগিন ভাবে মানুষের হাত কি কখনো এত সুন্দর হতে পারে কেবল কাঁধের নীচে বাহুতে দ চো টিকার ছোট দাগ থাকায় বিশ্বাস হয় এটা মানুষেরই হাত। দাশা কয়েকটা কাপ বের করে এবং তার দিকে ঘাড় ফিরিয়ে অনির্বচনীয় কিছু বলে ও হাসে।

দাশার অনুরোধে তেলেগিন কয়েক কাপ কফি পান করে। দাশা কিছু বলে, তেলেগিনও কিছু বলে কিন্তু দেখা যায় মানুষের কথার অর্থ তখনি থাকে যখন কাল তার স্বাভাবিক গতিতে চলে—আজ কথা অর্থহীন। ভোজন কক্ষে তাদের পাশে বসে কাতিয়া শোনে দাশা ও তেলেগিনের আলাপ কোন একটা বিষয়ে অত্যন্ত উৎসাহিত হয়ে উঠে আবার পরক্ষণেই তারা সেটার কথা ভুলে যাচ্ছে কখনো কফি কখনো চামড়ার ড্রেসিং কেস কখনো পেত্রোগ্রাদে মানুষের মুণ্ডচ্ছেদন আবার কখনো উজ্জ্বল রৌদ্রকিরণে সোনালি আভাপ্রাপ্ত দাশার চুল নিয়ে দুজনের মধ্যে কত আবোল তাবোল কথাই না হচ্ছে।

পরিচারিকা পত্রিকাগুলি ঘরে নিয়ে আসে। কাতিয়া রুশ সমাচার পত্রিকাটা খোলে এবং খোলামাত্রই তার মুখ দিয়ে একটা বিস্ময়সূচক শব্দ বেরিয়ে পড়ে। তারপর জার স্টেট ডুমা ভেঙে দেবার যে আদেশ দিয়েছেন তা সে জোরে জোরে পড়তে আরম্ভ করে। দাশা ও তেলেগিন এতে অত্যন্ত বিস্মিত হয়, কিন্তু

কাতিয়া আর জোরে না পড়ে মনে মনে খবর পড়তে থাকে। তেলোগিনকে বলে দাশা: "চল আমার ঘরে যাই।" সরু অন্ধকার গলির ভেতর দিয়ে সে আগে আগে যায়, ঘরে প্রথম ঢুকেই তাড়াতাড়ি বলে: "একটু সবুর কর, এক মিনিট, এদিকে চেয়ো না কিন্তু," বলেই সে কি একটা সাদা জিনিস ড্রয়ারে লুকিয়ে রাখে।

তেলোগিন তার জীবনে এই প্রথম দাশার শয়নকক্ষ দেখতে পায়। ঘরে রয়েছে একটা ড্রেসিং-টেবিল আর তার ওপর বিচিত্র ধরনের সমস্ত জিনিসপত্র; তার অপ্রশস্ত সাদা বিছানা, তার ওপর দুটো বালিশ, একটা বড় ও একটা ছোট, আর জানালার ধারে একটা বড় আর্মচেয়ার, তার হেলানটার ওপর পড়ে আছে সেই রেশম-পশম মিশ্রিত শালটা। তেলোগিনকে চেয়ারে বসতে বলে দাশা একটা টুল টেনে তার মুখোমুখি হয়ে তাতে বসে, কনুই দুটো রাখে হাঁটুর ওপর আর দু'হাতের চেটোর ওপর রাখে চিবুক। তেলোগিনের মুখের দিকে অপলক নয়নে চেয়ে থেকে দাশা তাকে বলতে বলে যে সে তাকে কতখানি ভালবাসে। কালের ঘণ্টা আবার বাজে।

"দাশা," বলে তেলোগিন, "জগতের সব কিছুও যদি আমি পেতাম, গোটা পৃথিবীটাই, তবু যে আমি সুখী হতে পারতাম না একথা কি তুমি বোঝ?"

দাশা ঘাড় নেড়ে সমর্থন জানায়। "একা বেঁচে থাকার সার্থকতা কোথায়? কি, তাই নয়? আমার নিজের জন্য প্রয়োজন কতটুকু?" ঘাড় নেড়ে সায় দেয় দাশা। "খাই, ঘুমোই, পান করি কিসের জন্য? এই হাত পা কিসের জন্য? ধর আমি যদি বিরাট ধনীই হই, তাতেই বা আমার এমন কি সুখ হবে? ভেবে দ্যাখ একা থাকার কি কষ্ট।" দাশা আবার তেমনিভাবে মাথা নাড়ে। "কিন্তু এখন যে তুমি আমার সামনে বসে আছ, তাতে আমি আর আমার মধ্যে নেই।, খালি তোমাকেই উপলব্ধি করছি আমি আর তাতেই আমার আনন্দ। তুমিই আমার সর্বস্ব। তোমার দিকে চাই আর আমার মাথা ঘোরে: আমি যেন বিশ্বাস করতে পাচ্ছিনে তুমি বাস্তব, তুমি জীবন্ত, তুমি আমার। দাশা তোমার কিছু মনে পড়ে?"

"হ্যাঁ মনে পড়ে," বলে দাশা, "স্টীমারের ডেকে বসে আছি, সমীরণ বইছে আর আমাদের কাচের পানপাত্রে সুরা চকচক করছে—হঠাৎ অনুভব করলাম যে আমরা আনন্দ-সায়রের দিকে ভেসে চলেছি। ."

"আর মনে পড়ে ছায়াগুলি ছিল কেমন নীল?"

দাশা ঘাড় নাড়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে তার মনে হয় সেই সুন্দর নীল ছায়াগুলি যেন তারও স্মৃতিপটে জেগে উঠছে। নৌকার পেছনে পেছনে উড়ন্ত সেই গাংচিলের ঝাঁক, নদীর নিম্নতট, দূরে জলের ওপর সূর্যকিরণোজ্জ্বল আলো-পথ যা দেখে তার মনে হত সেপথ বুঝি গিয়ে শেষ হয়েছে কোন এক নীল, সমুজ্জ্বল আনন্দ-সায়রে,—এসমস্তই তার মনে পড়ছে। এমন কি সেদিন

তার নিজের পরনে যে পোশাকটা ছিল তাও তার স্মরণপথে আসছে। তারপর কতগুলি শ্রান্ত বছরই না কেটে গেছে!

সেদিন সন্ধ্যায় কাতিয়া উকিল-সভা থেকে আনন্দিত ও উত্তেজিত অবস্থায় বাড়ি ফেরে এবং দাশা ও তেলেগিনকে বলেঃ

"পেত্রোগ্রাদে ডুমা কমিটির হাতে সমস্ত ক্ষমতা এসে গেছে। মন্ত্রীদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে। চারদিকে আরো সব সাংঘাতিক গুজব শোনা যাচ্ছে— লোক বলাবলি করছে যে জার সামরিক প্রধান কার্যালয় ত্যাগ করেছেন, এবং জেনারেল ইভানভ একটা গোটা আর্মি কোর নিয়ে পুনরায় শান্তি স্থাপনের জন্য পেত্রোগ্রাদের দিকে রওনা হয়েছেন। এখানে মস্কোতে স্থির হয়েছে যে আগামীকাল ক্রেমলিন ও অস্ত্রাগার আক্রমণ করা হবে। ..বিপ্লব দেখার জন্য কাল দাশা ও আমি তোমার হোটেলে যাব, ইভান ইলিয়িচ। .."

॥ আটত্রিশ ॥

তেলেগিনের হোটেলের জানালা দিয়ে তারা দেখতে পায় সরু ভেরস্কায়া স্ট্রীট দিয়ে জনতার একটা কালো প্রবাহ ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে—অগণিত চঞ্চল শির, টুপি, টুপি, খালি টুপি, হ্যাট, শাল আর পীত-বিন্দুর মত অসংখ্য মুখ। প্রতি গবাক্ষে উৎসুক দর্শক আর ছাদের ওপর ছোট বালকের দল।

কাতিয়ার মাথার অবগুণ্ঠন তার ভ্রূ পর্যন্ত এসে থেমেছে। জানালার ধারে দাঁড়িয়ে সে একবার দাশার আর একবার তেলেগিনের হাত ধরে টানছে।

"কি ভয়ানক!" বলে কাতিয়া। "কি ভয়ানক!"

"একাতেরিনা দমিত্রেভ্না, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, শহরের লোকের মনোভাব অত্যন্ত শান্তিপূর্ণ," বলে তেলেগিন। "আপনি আসার একটু আগেই আমি ক্রেমলিনে ছুটে গিয়েছিলাম--সেখানে আলাপ-আলোচনা এগিয়ে চলেছে এবং খুব সম্ভব একটি গুলিবর্ষণও না করে অস্ত্রাগার সমর্পণ করা হবে।"

"তবে যে লোকগুলি সেদিকে যাচ্ছে? দ্যাখ কত লোক! কি করতে চায় তারা?

তরঙ্গায়িত শিরসমুদ্রের দিকে দাশা একবার দৃষ্টিপাত করে এবং তারপর গৃহছাদ ও উচ্চ প্রাসাদসমূহের বাহির্ভাগস্থ রেখাবলীর দিকে তাকায়। কুয়াশাচ্ছন্ন স্নিগ্ধ প্রাতঃকাল। ক্রেমলিন গীর্জাসমূহের সোনালি গম্বুজগুলির ওপর এক ঝাঁক দাঁড়কাক চক্রাকারে উড়ছে আর লম্বা সরু চুড়োগুলির ওপর রাজকীয় ঈগল পাখীরা দু' পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে আছে।

দাশার মনে হয় বরফ গলে বড় বড় নদীতে প্লাবন হয়েছে আর সেই প্লাবনের জলে পৃথিবী ভেসে যাচ্ছে। সে ও তার প্রিয়তম পড়েছে সেই স্রোতে এবং তার এখন একমাত্র কর্তব্য হল প্রিয়তমের হাত চেপে ধরে তাকে যেতে না দেওয়া।

"আমি এর সব কিছুই দেখতে চাই। চল, রাস্তায় চল," বলে কাতিয়া।

বিপ্লবীরা তাদের প্রধান ঘাঁটি স্থাপন করেছে টাউন হলে। ইটের এই বাড়িটা অত্যন্ত অপরিচ্ছন্ন, থাম্বাগুলি দেখতে বোতলের মত; এতে আছে ক্ষুদ্র স্তম্ভশ্রেণী, একাধিক গাড়ী-বারান্দা ও ছাদের ওপর অনেকগুলি ছোট টাওয়ার; সেগুলির ওপর এখন লাল ঝাণ্ডা উড়ছে। লাল সালুর ফালি দিয়ে থাম্বাগুলি জড়ান হয়েছে এবং সদর দরজার সামনেও ঝুলছে লাল সালু। প্রবেশদ্বারের সম্মুখে তুষারে আবৃত শানবাঁধান রাস্তায় উঁচু চাকাওয়ালা গাড়ীর ওপর বসান রয়েছে ধূসর বর্ণের চারটে কামান। দরজায় মেশিনগান-ওয়ালারা তাদের কাঁধের স্ট্র্যাপের সঙ্গে লালফিতের গুচ্ছ এঁটে নিজেদের মেশিনগানগুলির পাশে বসে আছে। বাইরে অসম্ভব ভীড়। প্রচণ্ড উচ্ছ্বাস নিয়ে উৎসুক জনতা লাল ঝাণ্ডা ও টাউন হলের ধুলোপড়া কালো জানালা-গুলির দিকে তাকাচ্ছে। বেঁটে ধরনের একটি লোক উত্তেজিত অবস্থায় ছোট গাড়ী-বারান্দাটার ওপর ঘন ঘন এসে কি বলে, কিছুই শোনা যায় না, কেবল তার হাত নাড়াটাই দেখা যায়। শুনতে না পেলেও জনতা প্রতিবারই উল্লসিত হয়ে তাকে অভিনন্দন জানায়।

পতাকা ও কামানের দিকে চেয়ে চেয়ে পূর্ণ পরিতৃপ্তি লাভ করার পর জনতা কর্দমাক্ত তুষার ভেঙে ইভারস্কায়া উপাসনালয়ের গভীর খিলান তোরণের ভেতর দিয়ে রেড স্কোয়ারে গিয়ে উপনীত হয়। সেখানে ক্রেমলিনের স্পাস্কি ও নিকলস্কি তোরণদ্বয়ের সম্মুখে বিদ্রোহী সৈন্যগণ এবং ব্যারাকে আটক টেরিটোরিয়াল রেজিমেন্টের প্রতিনিধিদের মধ্যে আলোচনা চলেছে।

ভীড়ের ঠেলায় কাতিয়া, দাশা ও তেলেগিন গিয়ে একেবারে টাউন হলের প্রবেশদ্বারে উপস্থিত হয়। তেরস্কায়া স্ট্রীটে ও রেড স্কোয়ারে জনতার উল্লাসধ্বনি ক্রমশই উচ্চ থেকে উচ্চতর হতে থাকে।

"কমরেডগণ, আমাদের যেতে দিন।...শৃঙ্খলা রক্ষা ক'রে চলুন, কমরেড-গণ!" কয়েকটি তরুণ কণ্ঠ থেকে কথাগুলি বেরিয়ে আসে। রাইফেল উঁচিয়ে চারজন স্কুলের ছাত্র এবং হাতে তরবারি তুলে উস্কোখুস্কো চুল একটি সুন্দরী তরুণী ভীড় ঠেলে এগোচ্ছে; লোক নিতান্ত অনিচ্ছায় তাদের পথ ছেড়ে দিচ্ছে। ধৃত দশজন পুলিশকে পাহারা দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে তারা। পুলিশদের মুখে বিশাল গালপাট্টা, হাতগুলি পিছমোড়া ক'রে বাঁধা, নতমস্তক ও বিষণ্ণবদন। তাদের মধ্যে একজন ছিল পুলিশ ইন্‌স্পেক্টর, সকলের আগে রয়েছে সে, তার কামানো মাথাটা টুপিহীন, কপালের একপাশে রগের ওপর শুকনো জমাট রক্ত কালো হয়ে আছে। জনতার মধ্য থেকে যারা তাকে বিদ্রূপ করছে, তাদের দিকে সে তার উজ্জ্বল, পিঙ্গলবর্ণ চোখ দুটো দিয়ে এক এক-বার কটমট ক'রে চায়। তার কাঁধের স্ট্র্যাপগুলি এতই জোরে টেনে ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে যে সেগুলির সঙ্গে খানিকটা করে জামার কাপড়ও উঠে গেছে।

"তোমাদের যা পাওনা এখন তাই পাচ্ছ, সোনার চাঁদেরা!" জনতার মধ্য থেকে একজন বলে ওঠে।

"অনেককাল চোখ রাঙিয়েছ, বাবা, এবার তোমাদের পালা!"

"তোদের রাজত্বি শেষ!"

"যত সব বিষ্ঠার কীট!"

"ধরে এক একটাকে জ্যান্ত কবর দাও!"

"এস, যাদুরা!"

"কমরেডগণ, পথ দিন দয়া করে, কমরেডগণ–বিপ্লবী শৃঙ্খলা রক্ষা ক'রে চলুন আপনারা!" তীক্ষ্ন স্বরে বলে স্কুলের সেই ক'জন ছাত্র। পুলিশদের সামনের দিকে ঠেলতে ঠেলতে তারা টাউন হলের প্রবেশদ্বারে গিয়ে উপস্থিত হয় এবং বড় বড় দরজা পেরিয়ে অদৃশ্য হয়ে যায়। কিছু লোক তাদের পিছু পিছু দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ে, কাতিয়া, দাশা এবং তেলেগিনও রয়েছে সেই দলে। তারা দেখে মেশিনগানওয়ালারা খোলা, উঁচু, স্বল্পালোকিত দরদালানের ভেজা মেঝেতে তাদের মেশিনগানগুলির ধারে বসে আছে। গোলগাল মুখ একটি ছাত্রের চেঁচামেচি ও পরিশ্রমের দরুণ প্রায় মূর্ছা যাবার মত অবস্থা, ভেতরে যে-ই আসে তারই কাছে ছুটে গিয়ে চীৎকার ক'রে বলে সে ঃ

"ওসব বুঝিনে। আপনার পাস!"

কেউ কেউ তাকে পাস দেখায়, বাকী সকলে শুধু তার দিকে হাত নেড়ে প্রশস্ত সিঁড়ি দিয়ে তিন তলায় উঠে যায়। সেখানে চওড়া গলিগুলিতে দেয়াল ঘেঁষে এখানে সেখানে শুয়ে বসে আছে সৈন্যরা—ধূলোমলিন বেশ তাদের, হাতে রাইফেল, নীরব তারা, সকলের চোখেই অপরিবর্তিত তন্দ্রার ভাব। কেউ কেউ রুটি চিবোচ্ছে, কেউ কেউ বা নাক ডাকাচ্ছে। কৌতূহলী দর্শকেরা তাদের পাশ দিয়ে খালি যাওয়া আসা করছে আর দরজাগুলিতে যে সমস্ত অদ্ভুত বিজ্ঞপ্তি পিন দিয়ে আঁটা রয়েছে সেগুলির দিকে তাকাচ্ছে। ক্লান্ত কমিসাররা যতদূর সম্ভব উত্তেজিত অবস্থায় যে এঘরে ছুটোছুটি করছে তাও তারা দেখছে।

এসমস্ত অদ্ভুত ব্যাপার যতটা দেখার দেখে কাতিয়া, দাশা ও তেলেগিন লোক ঠেলে কোনরকমে কাউন্সিল হলে গিয়ে ঢোকে। হলের দু'পাশে দুটো বড় জানালায় বেগনী রংএর পর্দা ঝুলছে, পর্দার রংটা অবশ্য জ্বলে খানিকটা ফিকে হয়ে গেছে। মেঝেতে বেগনী রংএর গদি আঁটা বেঞ্চিগুলি অর্ধবৃত্তাকারে রঙ্গভূমির মত ক'রে সাজান। প্রধান দেয়ালটার গায়ে গিল্টি-করা একটা খালি ফ্রেম দশ ফুট কালো ফাঁকা জায়গা ঘিরে রেখেছে; আগে এই ফ্রেমটায় জারদের ছবি থাকত। তার সামনে সম্রাজ্ঞী দ্বিতীয় ক্যাথারিনের মর্মর মূর্তি, রঞ্জের রাজকীয় পরিচ্ছদ পরিহিতা সম্রাজ্ঞী দাঁড়িয়ে তাঁর প্রজাদের দিকে করুণার দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন আর সূক্ষ্ম তাৎপর্যপূর্ণ হাসি হাসছেন।

রঙ্গভূমির বেঞ্চিগুলি দখল ক'রে আছে ক্লান্ত একদল লোক, মুখে তাদের গোঁফদাড়ি। কেউ কেউ গালে হাত দিয়ে বসে আছে, আবার অনেকে সামনের ডেস্কে মাথা রেখে ঘুমোচ্ছে। কয়েকজনকে দেখা যাচ্ছে মাংসের কাবাবের ওপরকার ছাল ছাড়াতে, আবার কিছু লোক চিবোচ্ছে রুটি। সম্রাজ্ঞীর সহাস্য-বদন মর্মরমূর্তির সামনে সোনালি ঝালরযুক্ত সবুজ কাপড়ে ঢাকা একটা লম্বা টেবিলের পাশে কালো শার্ট গায়ে বসে আছে চুপসা গাল কয়েকটি যুবক। তাদের মধ্যে একজনের মাথায় লম্বা চুল ও মুখে লালচে দাড়ি।

"ঐ দ্যাখ্, দাশা, টেবিলের পাশে কমরেড কুজমা!" বলে কাতিয়া।

এমন সময় একটি মেয়ে, মাথায় তার বব ছাঁটের চুল, নাকটা খুব চোখা, কমরেড কুজমার কাছে আসে এবং তাঁর কানে কানে কি বলে। মুখ না ঘুরিয়েই তিনি কান পেতে তার কথা শোনেন এবং উঠে দাঁড়িয়ে বলেন:

"মেয়র গুচকফ আবার ঘোষণা করেছেন যে, শ্রমিকদের কোন অস্ত্র দেওয়া হবে না। বিপ্লবী কমিটির কাজের প্রতিবাদ ক'রে আমি আপনাদের সামনে এক প্রস্তাব রাখছি; আশা করি বিনা আলোচনায়ই আপনারা এই প্রস্তাব গ্রহণ করবেন।"

স্কুলের একটি ছাত্র যেন বাহাদুরী দেখাবার জন্যই সিগারেট টানছে। তার কাছ থেকে তেলেগিন শেষ পর্যন্ত জানতে পারে যে, এটার নাম ছিল সম্রাজ্ঞী ক্যাথারিন হল্ এবং গত আটচল্লিশ ঘণ্টা যাবৎ এখানে শ্রমিক প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত সোবিয়েতের অখণ্ড অধিবেশন চলেছে।

মধ্যাহ্ন ভোজনের সময় ক্রেমলিনের টেরিটোরিয়াল রেজিমেন্টের সৈন্যরা রেড স্কোয়ারে ফিল্ড কিচেন থেকে ধোঁয়া উঠতে দেখে ফটক খুলে দেয় এবং বিপ্লবীদের কাছে আত্মসমর্পণ করে। আনন্দকোলাহলে সমস্ত স্কোয়ারটা মুখর হয়ে ওঠে, লোক মাথার টুপিগুলি আকাশে ছুঁড়তে থাকে।

রেড স্কোয়ারের সেই ঢিবিটা, যেখানে প্রাচীন কালে ছিল বধ্যমঞ্চ; যেখানে মেষের মুখোস-পরা ও উদরের ওপর একটা মূর্খের ভেরী চাপানো অবস্থায় পড়েছিল নকল দ্মিত্রির* উলঙ্গ মৃতদেহটা; যেখান থেকে জারদের গদিলাভ ও গদিচ্যুতির বার্তা বিঘোষিত হ'ত; যেখান থেকে রুশ জাতির সমস্ত মুক্তি ও দাসত্বের ঘোষণা প্রচারিত হ'ত; যে স্থানটা এক-সময় আগাছায় ভরে যেত আবার অন্য সময় রক্তপ্লাবিত হ'ত, সেই ছোট ঢিবিটার ওপর এসে ওঠে ছেঁড়াময়লা লম্বা কোট গায়ে খাটো একটি সাধারণ সৈনিক। উঠেই সে জনতাকে অভিবাদন করে এবং দুহাতে মাথার ফার টুপিটা কান পর্যন্ত নামিয়ে দিয়ে কি যেন বলতে থাকে। কিন্তু এত গোলমাল যে তার কথা কেউ শুনতেই পায় না। সৈন্যটি বড়ই কৃশ ও বেঁটে। যুদ্ধের জন্য সর্বশেষে যে সৈন্যদল

* দুর্ধর্ষ ইভানের পুত্র দ্মিত্রির নাম গ্রহণ করে যারা রুশ সিংহাসন দাবী করেছিল এ ছিল তাদের মধ্যে তৃতীয়। ১৬১৩ খৃস্টাব্দে এই জাল দাবীদারের প্রাণদণ্ড হয়।

সংগৃহীত হয়েছে সে সেই দলেরই একজন। কোন্ এক অজ পাড়াগাঁ থেকে তাকে ধরে আনা হয়েছিল কে জানে। তা সত্ত্বেও পালক বসান টুপি মাথায়, একটু এলোমেলো ধরনের অল্পবয়স্কা এক ভদ্রমহিলা ছুটে গিয়ে তাকে চুম্বন করে। আর যায় কোথায়—লোক তাকে ঢিবি থেকে টেনে নামিয়ে একেবারে কাঁধে তুলে নাচতে থাকে। জনতার সে কি উল্লাস!

এদিকে ভেরস্কায়া স্ট্রীটে একটি তেজস্বী যুবক ভীড় ঠেলে পথ ক'রে নিয়ে গবর্নর জেনারেলের বাড়ীর ঠিক বিপরীত দিকে জেনারেল স্কোবেলেফের মূর্তির ওপর ওঠে এবং জেনারেলের তরবারিতে একটা লাল ঝাণ্ডা বেঁধে দিয়ে আসে। জনতা থেকে হর্ষধ্বনি উত্থিত হয়। তারপর কয়েকজন রহস্যজনক লোক পেছনের একটা সরু রাস্তা দিয়ে গোয়েন্দা পুলিশের দপ্তরে ঢোকে, একটু বাদেই কাচ ভাঙার শব্দ শুনতে পাওয়া যায়, সঙ্গে সঙ্গেই পাক খেয়ে ধোঁয়া বেরোতে থাকে। উল্লাসে জনতা আবার হৈহৈ ক'রে ওঠে। ভেরস্কায়া বুলভারে জনৈকা খ্যাতনাম্নী লেখিকা পুশকিনের মূর্তির পাদদেশে দাঁড়িয়ে এক জনতার সামনে বক্তৃতা করতে করতে কেঁদেই ফেলেন। নব জীবন-প্রভাত সম্পর্কে তিনি বক্তৃতা করেন এবং স্কুলের একটি ছাত্রের সহায়তায় চিন্তামগ্ন পুশকিনের হাতে একটি ছোট রক্তপতাকা এঁটে দেন। জনতার আনন্দ কোলাহল এমন আকাশবাতাস মথিত ক'রে তোলে।

সারাটা দিন গোটা নগরীটা যেন নেশায় মেতেছিল। কেউ বাড়ি যায়নি, দলে দলে লোক দাঁড়িয়ে গল্প করে, আনন্দে অশ্রু ফেলে, পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গন করে এবং যে কোন মুহূর্তে নতুন খবর নিয়ে টেলিগ্রাম আসতে পারে এই আশায় মাঝরাত্রি পর্যন্ত লোক রাস্তায় রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকে। তিনবর্ষব্যাপী দুঃখ ঘৃণা ও রক্তপাতের পর রাস্তার সাধারণ মানুষ নিজের অবরোধ খুলে দিয়ে মুক্তির অনাবিল আনন্দ উপভোগ করে।

কাতিয়া দাশা ও তেলেগিন সন্ধ্যার দিকে বাড়ি ফেরে। এসে তারা দেখে বাড়ির পরিচারিকা মিস প্রেচিস্তেনস্কি বুলভারে এক সভায় গেছে আর পাচিকা রান্নাঘরে দরজায় খিল দিয়ে বসে গলা ছেড়ে কাঁদছে। কাতিয়া অনেক ক'রে বলায় তবে সে দরজা খুলে দেয়।

"তোর কি হয়েছে, মারফুশা?"

"আমাদের জারকে তারা খুন করেছে," কেঁদে বলে সে। কান্নায় তার ঠোঁট দুটো ফুলে উঠেছে। একটা হাত দিয়ে সে তার পুরো ঠোঁট দুটো ঢাকে। তার মুখ থেকে ভদকার গন্ধ বেরিয়ে আসছে।

"কি বাজে বকছিস," বিরক্ত হয়ে বলে কাতিয়া। "জারকে কেউ খুন করেনি।"

সে তখন গ্যাসের উনুনে কেটলী চাপিয়ে টেবিলটা পাততে যায়। দাশা ড্রইং-রুমে সোফায় শুয়ে আছে আর তেলেগিন বসেছে তার পায়ের কাছে।

দাশা বলেঃ "আমি যদি ঘুমিয়ে পড়ি, চা এলে আমাকে ডেকে তুলে দিও, ইভান,—চা না হ'লে আর পারছিনে।"

সোফায় কাত হয়ে গালে হাত দিয়ে সে আরাম করে শোয় এবং ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে বলেঃ

"আমি তোমাকে কত ভালবাসি!"

দাশার গলায় সেই রেশম-পশম মিশ্রিত স্কার্ফটা অন্ধকারে চকচক করছে। তেলেগিন নিথর অবস্থায় বসে আছে, দাশার শ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দ তার কানে আসছে, হৃদয় তার কানায় কানায় পূর্ণ। দরজার ফাঁক দিয়ে একটা আলো দেখা দেয়, তারপর দরজাটা খুলে যায়, কাতিয়া ঘরে ঢুকে তেলেগিনের নিকটে সোফার একটা বাহুর ওপর বসে এবং দু'হাতে নিজের হাঁটু দুটো আবেষ্টন করে। সামান্য একটু কাল নীরব থেকে কোমল কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে সেঃ

"দাশা ঘুমিয়ে পড়েছে নাকি?"

"চা এলে তাকে জাগিয়ে দিতে বলেছে আমাকে।"

"জারকে খুন করা হয়েছে এই বলে মারফুশা রান্নাঘরে চেঁচিয়ে গলা ফাটাচ্ছে। ইভান ইলিয়িচ, এর পর কি হবে? মনে হয় সমস্ত বাঁধ ভেঙে গেছে। নিকলাই ইভানোভিচের জন্য আমি বড় চিন্তিত হয়ে পড়েছি। কাল প্রাতে অন্য কিছু করার আগে, তুমি তাকে একটা টেলিগ্রাম ক'রে দিতে পার, ভাই? তারপর বল দেখি দাশাকে পেত্রোগ্রাদে তুমি নিয়ে যেতে চাও কবে?"

তেলেগিন কিছুই বলে না। কাতিয়া ঘাড় ফিরিয়ে তার ডাগর ডাগর চোখ দুটো দিয়ে তেলেগিনের মুখের দিকে চায়, দাশার চোখের সঙ্গে এ চোখের বিশেষ কোন পার্থক্যই নেই, যেটুকু আছে তা হচ্ছে পরিণত বুদ্ধি ও একটু গাম্ভীর্যের ছাপ। তারপর হেসে তেলেগিনকে কাছে টেনে নেয় সে এবং তার ললাটে চুম্বন করে।

পরদিন ভোর হতে না হতেই রাস্তায় গোটা মস্কো শহর যেন একেবারে ভেঙে পড়ে। ভেরস্কায়া স্ট্রীটে আনন্দমুখর, নিশ্ছিদ্র জনতার মধ্য দিয়ে পথ করে চলেছে সৈন্যবোঝাই লরীর পর লরী: সৈন্যরা উঁচিয়ে রেখেছে সঙ্গীণ ও তরবারি। শানবাঁধান ফুটপাথের ধারে কর্দমাক্ত তুষার-স্তূপের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে অসিহস্তে তরুণীর দল ও বিদ্যালয়ের সশস্ত্র, কঠোর ছাত্রগণ। তরুণী-দের মুখে কাঠিন্যের ছাপ। এরা বিপ্লবী স্বেচ্ছা-সেনা, রাস্তায় শৃঙ্খলা রক্ষার কাজে নিযুক্ত। দোকানদারেরা মই বেয়ে উঠে তাদের সাইনবোর্ড থেকে রাজকীয় ঈগল প্রতীক মুছে ফেলে। একটা সিগারেটের কারখানার কয়েকটি রোগা মেয়ে শ্রমিক লিও টলস্টয়ের প্রতিকৃতি নিয়ে শহর প্রদক্ষিণ করে: প্রতি-কৃতিটি দেখে মনে হয় তিনি যেন তাঁর মোটা ভ্রুযুগলের নীচ থেকে তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে এই সমস্ত বিস্ময়কর ঘটনা লক্ষ্য করছেন। সর্বত্র যেন এই ইংগিতই সুস্পষ্ট আর কখনো যুদ্ধ হবে না, আর বিদ্বেষ থাকবে না; এখন একমাত্র কর্তব্য হচ্ছে আরো একটু ঊর্ধ্বে উঠে কোন উচ্চ প্রাসাদশিখরে রক্তকেতন

উড়িয়ে দিয়ে বিশ্ববাসীকে জানিয়ে দেওয়া, আজ থেকে মানুষ ভাই ভাই, আর ঘোষণা করা দুনিয়ায় আনন্দ, মুক্তি, প্রেম ও জীবনই হচ্ছে একমাত্র শক্তি।

যখন তারে একটা বড় খবর পাওয়া গেল যে, গ্র্যান্ড ডিউক মিখাইলের ওপর সমস্ত ক্ষমতা অর্পণ করে জার সিংহাসন ত্যাগ করেছেন এবং মিখাইল এই সম্মান গ্রহণে অপারগতা জানিয়েছেন তখন তাক লাগিয়ে দেবার মত এই সংবাদেও কারো মধ্যেই বিশেষ কোন চাঞ্চল্য দেখা গেল না, কারণ এখন এর চাইতে আরো ঢের বড় খবরের আশা রাখে লোক।

আকাশের স্বচ্ছ গভীর গায়ে তারাগুলি জ্বলজ্বল করছে আর তার নীচে, দেখা যাচ্ছে গৃহশীর্ষসমূহের আঁকাবাঁকা রেখাবলী ও পশ্চিমদিকে কমলা রংএর একটা আভা। লাইম গাছগুলির পল্লবহীন শাখারাজিকে দেখাচ্ছে কালো, সেগুলি নিস্পন্দ নিথর। বৃক্ষতল সম্পূর্ণ অন্ধকার। রাস্তায় তুষার ও কাদায় জমাট ঢেলাগুলি পায়ের তলায় পড়ে কড়মড় করে ভাঙছে। তেলোগিনের বাহুতে বাহু রেখে দাশা হেঁটে চলেছে হঠাৎ সে থেমে দাড়ায় এবং একটা নীচু বেড়ার ওপর দিয়ে উঁকি মেরে ছোট গীর্জাটার জানালা দিয়ে যে সামান্য আলো দেখা যাচ্ছে সেদিকে তাকায়। লাইম গাছের তলে অন্ধকার ছায়ায় রয়েছে ছোট গীর্জাটা ও তার সামনের দিককার অঙ্গন। দূরে একটা দরজা খোলার শব্দ পাওয়া যায় এবং ব্যাঙের ছাতির মত একটা টুপি মাথায় ও আপাদলম্বা একটা কোট গায়ে খর্বাকৃতি একজন লোক গীর্জার অঙ্গনটা হেঁটে পার হয় তার বুটের তলায় পড়ে ঝরাফর টুকরোগুলো গুঁড়ো গুঁড়ো হচ্ছে। তার চাবির ঝনঝন শব্দ কানে আসে তাদের। তারপর তার পায়ের শব্দ শুনে বোঝা যায় ঘণ্টাঘরের সিঁড়ি দিয়ে সে ওপরে উঠছে।

গীর্জার উপাসনার ঘণ্টা বাজাতে যাচ্ছে' আস্তে আস্তে বলে দাশা এবং ওপরের দিকে তাকায়। ঘণ্টাঘরের গিল্টিকরা ছোট গম্বুজটা তখনো অস্তমিত সূর্যের ক্ষীণ আভায় চিকমিক করছে।

তিন শতাব্দী ধরে যে ঘণ্টা লোককে প্রার্থনার জন্য আহ্বান জানিয়েছে সেই ঘণ্টা বাজতে থাকে। তেলোগিনের স্মৃতিপটে অকস্মাৎ একটা চিত্র ভেসে ওঠে: গ্যালিসিয়ায় একটা ছোট উপাসনালয় তার সিঁড়িতে বসে সাদা কোটপরা একটি রমণী মৃতছেলে কোলে নিয়ে কাঁদছে। তেলোগিন তার কনুই দিয়ে দাশার হাতটায় চাপ দেয়। দাশা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তার দিকে তাকায়।

'ভেতরে যাবে - চট করে চুপি চুপি জিজ্ঞেস করে দাশা। "চল যাই।'

তেলোগিনের মুখে হাসি আর ধরে না। দাশা ভ্রূভঙ্গ করে তাকায় এবং তার ছোট জুতো দুটো মাটিতে ঠোকে। মনে মনে ভাবে সে: 'জগতে তুমি যাকে সবচেয়ে বেশি ভালবাস আর তার বাহুতে বাহু রেখে হেঁটে যেতে যেতে যখন গীর্জার জানালা দিয়ে আলো দেখতে পাও তখন ভেতরে গিয়ে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়া কি খুবই হাস্যকর ব্যাপার?'

তেলোগিনের বাহুতে আবার সে নিজের বাহু ভাল করে জড়ায়।

"আমি কি বলছি বুঝতে পারছ, এখন?" বলে দাশা।

॥ উনচল্লিশ ॥

"নাগরিকবৃন্দ, এখন থেকে আপনারা মুক্ত রুশবাহিনীর সেনা। আজ বড় আনন্দের দিন; দাসত্বের শৃঙ্খল টুটে গেছে। এই শুভদিনে আপনাদের অভিনন্দন জানাবার পরম সৌভাগ্য লাভ করে সত্যি আমি ধন্য। তিন দিনে এক বিন্দু রক্তপাতও না করে রুশ জনগণ ইতিহাসের বৃহত্তম বিপ্লব সাধিত করেছে। সম্রাট নিকলাস সিংহাসন ত্যাগ করেছেন, তাঁর মন্ত্রীরা গ্রেপ্তার হয়েছেন; সিংহাসনের উত্তরাধিকারী মিখাইল অত্যন্ত গুরুভার বোধে স্বীয় মস্তকে মুকুট ধারণ করতে অসম্মত হয়েছেন। সমস্ত ক্ষমতা এখন জনসাধারণের হাতে। যত শিগ্‌গীর সম্ভব অখিল রুশ গণপরিষদের নির্বাচন পরিচালনার জন্য একটি অস্থায়ী সরকার গঠিত হয়েছে। সার্বজনিক ও সমানাধিকারের ভিত্তিতে সরাসরি ভোট গৃহীত হবে; ভোট সম্পর্কে গোপনীয়তা রক্ষার জন্য ব্যালট পেপারের ব্যবস্থা থাকবে। রুশ বিপ্লব জিন্দাবাদ! গণপরিষদ জিন্দাবাদ! অস্থায়ী সরকার জিন্দাবাদ!"

"হুর্‌রুর্‌-রে-রে!" এক সঙ্গে সহস্র সহস্র সৈন্যের আওয়াজ; সহজে থামে না তা। নিকলাই ইভানোভিচ স্মোকোভনিকভ তাঁর চামড়ার রেমান কোটটার পকেট থেকে খাকি রংএর একটা বড় রুমাল বার করে নিজের ঘাড়, মুখ ও দাড়ি মোছেন। তক্তায় নির্মিত একটা মঞ্চ থেকে তিনি বক্তৃতা করছেন, ধরন ধরে অতিকষ্টে তাতে গিয়ে উঠতে হয়। তাঁর পেছনে দাঁড়িয়ে আছে ব্যাটেলিয়ন কমান্ডার তেৎকিন, সম্প্রতি সে লেফ্‌টেনান্ট-কর্নেলের পদে উন্নীত হয়েছে; রোদে-পোড়া তার গায়ের রং, মোটা নাক, চোখেমুখে একাগ্রতার একটা ছাপ। আনন্দধ্বনি উত্থিত হলে সে তার হাত টুপির শীর্ষ পর্যন্ত তুলে কেমন একটু অপ্রস্তুতভাবে অভিবাদন করে। মঞ্চের সামনে এখনে সেখানে দেখা যাচ্ছে খালি কালো মাটি আর মাঝে মাঝে কাদা মেশান তুষার, তাতে দাঁড়িয়ে আছে প্রায় দুহাজার নিরস্ত্র সৈন্য। তাদের মাথায় লৌহ শিরস্ত্রাণ, গায়ে কুঁচকানো, ময়লা, ঢোলা লম্বা কোট; তুর্কী মোরগের মত রক্তিমবদন ভদ্রলোক যে-সমস্ত তাজ্জব কথা বলছেন তারা সেগুলি দাঁড়িয়ে হাঁ করে শুনছে। দূরে ধূসর কুয়াশা ভেদ করে আকাশে উঠেছে একটা ভস্মীভূত গ্রামের পোড়া কালো চিমনীগুলি। গ্রাম ছাড়িয়ে আরো খানিকটা গেলে পড়ে জার্মান ব্যূহ। কয়েকটা নোংরা দাঁড়কাক নির্জন প্রান্তরটার ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে।

"সৈন্যগণ!" হাত তুলে আঙুলগুলি বিস্তার করে নিকলাই ইভানোভিচ বলে চলেন। জোর দিয়ে বলতে গিয়ে তিনি লালকণ্ঠ হয়ে উঠেছেন। "গতকাল ছিলেন আপনারা কামানের খোরাক, জারের সেনানীরা জবাইর জন্য

আপনাদের দলে দলে তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। কিসের জন্য আপনারা মরতে যাচ্ছেন তাও আপনাদের তারা বলেনি। সামান্য অপরাধে আপনাদের বেত মারা হত; বিনা বিচারে গুলি করত তারা আপনাদের।" লেফ্‌টেনান্ট-কর্নেল তেংকিন একটু কাশে ও এক পা থেকে আর এক পায়ে জোর দিয়ে দাঁড়ায়, কিন্তু বলে না কিছুই, খালি ঘাড়টা বাঁকিয়ে আবার মন দিয়ে শুনতে থাকে। "অস্থায়ী সরকার পশ্চিম রণাঙ্গনের জন্য আমাকে সামরিক কমিসার নিযুক্ত করেছেন। আমি এখানে ঘোষণা করছি যে, অতঃপর 'সাধারণ সৈন্য' বলে আর কেউ গণ্য হবেন না, ও কথাটি তুলে দেওয়া হয়েছে। সৈন্যগণ, অতঃপর আপনারা রুশ রাষ্ট্রের নাগরিক, সকলের সমান অধিকার আপনাদের—সৈন্য ও সেনানায়কদের মধ্যে এখন আর কোন পার্থক্য নেই। 'হুজুর', 'মাননীয়', 'মহামান্য' প্রভৃতি কথা আর থাকবে না। এখন থেকে আপনারা বলবেনঃ 'ভাল তো, মিঃ জেনারেল', 'হ্যাঁ, মিঃ জেনারেল', 'না, মিঃ জেনারেল'। 'যে আজ্ঞে, মহামান্য বাহাদুর! না, মহামান্য বাহাদুর!' এ-ধরনের সম্বোধন আর করতে হবে না। যেরূপ পদমর্যাদাসম্পন্ন অফিসারই হোন না কেন তাঁকে দেখে সৈন্যদের আর স্যালুট করার দরকার নেই। জেনারেলের সঙ্গে করমর্দন করে ওঁকে অভিনন্দন জানাতে চান তো আপনারা জানাবেন, সে-সম্পর্কে কোন বাধা-বাধকতা থাকবে না।"

"হোঃ-হোঃ-হোঃ," সৈন্যদের মধ্যে হাসির তুফান ওঠে, তেংকিনের মুখেও মৃদু হাসি দেখা দেয়, চোখ দুটো মিট মিট করে, তবে একটু অপ্রতিভ ভাব তার।

"তারপর, সৈন্যগণ, এখন আপনাদের কাছে আমি যে বিষয়ে বলছি সেটি হচ্ছে সব চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এযাবৎ জারের মন্ত্রীরা যুদ্ধ চালিয়ে এসেছেন--কিন্তু এখন থেকে যুদ্ধ চালাবেন সাধারণ মানুষ--আপনারা! এই উদ্দেশ্যে অস্থায়ী সরকার আপনাদের কাছে প্রস্তাব করেছেন যাতে আপনারা প্রতি কোম্পানীতে, ব্যাটেলিয়নে, রেজিমেন্টে, আর্মিতে অর্থাৎ প্রত্যেকটি ইউনিটে সেনা কমিটি গঠন করেন। আপনাদের আস্থাভাজন কমরেডদের এই সমস্ত কমিটিতে নির্বাচিত করুন। এখন থেকে সামরিক মানচিত্রের ওপর প্রধান সেনাপতির পেন্সিলের পাশে দেখা যাবে সৈন্যদেরও অঙ্গুলি। সৈন্যগণ, বিপ্লবের এই বৃহত্তম সাফল্যে আমি আপনাদের অভিনন্দন জানাচ্ছি!"

আবার আনন্দোল্লাসে সারা প্রান্তর প্রতিধ্বনিত হয়ে ওঠে। হাত স্যালুটের ভঙ্গিতে রেখে এটেন্সন অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে তেংকিন, মুখটা তার পাংশু হয়ে গেছে।

সৈন্যদের মধ্যে কেউ কেউ চেঁচিয়ে প্রশ্ন করেঃ

"জার্মানদের সঙ্গে আমাদের সন্ধি হবে কবে?"

"মাথা পিছু কতটা করে সাবান পাওয়া যাবে?"

"বাড়ি যাওয়ার ছুটির কি হবে? সে-সম্পর্কে কোন নির্দেশ আছে?"

"মিঃ কমিসার, কি হবে এখন? আমাদের কি একজন রাজা নির্বাচন করতে হবে, না কি? যুদ্ধ এখন চালাবে কে?"

প্রশ্নগুলির জবাব ভাল করে দেবার জন্য নিকলাই ইভানোভিচ মঞ্চ থেকে নেমে নীচে আসেন: সঙ্গে সঙ্গে উত্তেজিত সৈন্যরা তাঁকে ঘিরে ধরে। লেফটেনান্ট-কর্নেল তেৎকিন মঞ্চের রেলিং-এর ওপর কনুই দুটো রেখে শিরস্ত্রাণরাশির মধ্যে সামরিক কমিসারের মুণ্ডিতপ্রায় অনাবৃত মাথা ও মোটা ঘাড়টা যে এখানে সেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে ও মাঝে মাঝে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে তা দেখতে থাকে। লাল চুল, কাঁধ থেকে লম্বা কোটটা আলগাভাবে ঝুলে আছে, বেশ পরিহাসপ্রিয়, এমন একজন সৈন্য (তেৎকিন তাকে চেনে, সিগন্যালের লোক সে) নিকলাই ইভানোভিচের বেল্টটা টেনে ধরে, চারদিকে নিজের সঙ্গীদের দিকে তাকায় আর প্রশ্ন করে:

"মিঃ কমিসার, ভাল ভাল অনেক কথাই তো আমাদের বললেন আপনি আর আমরাও তা মন দিয়ে শুনলাম। এখন আমার একটা প্রশ্নের জবাব দিন দেখি।..."

সৈন্যরা তাতে সরব-সমর্থন জানায় এবং আরো ঘেঁষে দাঁড়ায়। লেফটেনান্ট-কর্নেল তেৎকিন ভ্রূকুটি করে একটু ব্রস্তভাবে মঞ্চ থেকে নেমে আসে।

"আপনাকে আমার প্রশ্ন হল এই," সৈন্যটি তার আঙুলের কালো নখ নিকলাই ইভানোভিচের নাকে প্রায় ঠেকিয়ে বলতে থাকে, "আমার গ্রাম থেকে আমি চিঠি পেয়েছি—আমাদের গরু মরে গেছে, ঘোড়া আমাদের নেই, কাজেই আমার স্ত্রীপুত্রকে এখন এক টুকরো রুটির জন্য ভিক্ষে করে বেড়াতে হচ্ছে। . আমি যদি এখন বাড়িতে যাই সৈন্যদল ত্যাগের অপরাধে আমাকে গুলি করার অধিকার কি আপনার আছে? এই কথাটাই জানতে চাই আপনার কাছ থেকে।"

"নিজের ব্যক্তিগত ইচ্ছেই যদি মুক্তির চেয়ে আপনার কাছে বড় হয়ে থাকে, জুডাসের মত আপনিও যদি স্বীয় আদর্শের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করতে চান, করুন, তবে রুশিয়া আপনার মুখে এই কলঙ্কের ছাপ দিয়ে দেবে, আপনি বিপ্লবী বাহিনীর সৈন্য হবার অযোগ্য।...যান আপনি বাড়ি!" ক্রুদ্ধ কণ্ঠে চীৎকার করে ওঠেন নিকলাই ইভানোভিচ।

"আমাকে মেজাজ দেখাবেন না আপনারা।"

"আপনিই বা কে যে আমাদের অত মেজাজ দেখাচ্ছেন!"

"সৈন্যগণ!" জুতোর মাথায় জোর দিয়ে একটু উঁচু হয়ে দাঁড়ান নিকলাই ইভানোভিচ। "খানিকটা ভুল বোঝাবুঝি হয়ে গেছে। বিপ্লবের প্রথম কর্তব্য হল আমাদের মিত্র শক্তিবর্গের প্রতি বিশ্বস্ত থাকা। মুক্ত বিপ্লবী রুশ বাহিনীকে নবোদ্যমে স্বাধীনতার ঘোর শত্রু সাম্রাজ্যবাদী জার্মানীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে।"

"নিজের দিকে চেয়ে বলছেন তো? পরিখায় নিজে উকুনের খাদ্য হয়েছেন কখনো?" কর্কশকণ্ঠে বলে একজন।

"তিনি জীবনে কখনো উকুন দেখেনইনি!"

"এক জোড়া ছেড়ে দাও, ডিম পাড়ুক।"

"ও সমস্ত মুক্তি-ফুক্তির কথা আমাদের শোনাবেন না। যুদ্ধের কথা বলুন! তিন তিন বছর ধরে লড়াই করছি আমরা।...আপনাদের তো কোন অসুবিধেই নেই—বাড়িতে বসে দিব্যি খাচ্ছেন দাচ্ছেন আর ভুঁড়ি বাড়াচ্ছেন।... আমরা জানতে চাই যুদ্ধ শেষ হবে কবে?"

"সৈন্যগণ!" আবার চীৎকার করে বলেন নিকলাই ইভানোভিচ। "বিপ্লবের ধ্বজা উত্তোলন করা হয়েছে মুক্তি ও যুদ্ধে চূড়ান্ত জয়লাভের জন্য।..."

"হাঁদার কথা শোন!"

"তিন বছর ধরে যুদ্ধ করছি আমরা, কিন্তু জয় তো কোনদিনই দেখিনি।"

"আমাদের যদি যুদ্ধই করে যেতে হয় তবে আর জারের হাত থেকে মুক্তি পেয়ে লাভ হল কি?"

"জার চেয়েছিলেন যাতে লোক আর যুদ্ধ না করে: সেজন্যই তাঁকে সরান হয়েছে।"

"দালাল, লোকটা ঘুষ খেয়েছে, কমরেডগণ!"

লেফটেনান্ট-কর্নেল তেৎকিন দুই কনুই দিয়ে লোক সরিয়ে ভীড় ঠেলে নিকলাই ইভানোভিচের পাশে গিয়ে দেখে, কালো চুল, চওড়া কাঁধ, বিরাটকায় একজন গোলন্দাজ সামরিক কমিসারের কোটের বুকটা ধরে খুব ঝাঁকুনি দিচ্ছে, আর তাঁর কাছে মুখ নিয়ে গলা ফাটিয়ে বলছেঃ

"তুমি কিজন্য এখানে এসেছ? বল, কিসের জন্য এসেছ এখানে? আমাদের বেচবার জন্য এসেছ, শালা খেঁকী কুত্তার বাচ্চা।"

গোলন্দাজটি নিকলাই ইভানোভিচকে ধরে আবার যখন ঝাঁকুনি দেয় তখন মনে হয় তাঁর মাথার পেছন দিকটা যেন দু'কাঁধের মধ্যে ঢুকে গিয়েছে আর তাঁর উর্ধমুখখানি দাড়ি যেন কেউ মুখে বসিয়ে দিয়েছে, ঝাঁকুনির চোটে দাড়িগুলি অসহায়ের মত কাঁপছে। লোকটাকে তিনি ঠেলে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করেন, কিন্তু তাঁর কম্পিত হস্তের অঙ্গুলিগুলি লেগে গোলন্দাজটির টিউনিক কোটের কলারটা ছিঁড়ে খুলে যায়। লোকটা তখন রক্তচক্ষু করে ওঠে এবং মাথার লোহার টুপিটা খুলে নিয়ে তা দিয়ে নিকলাই ইভানোভিচের মাথায় ও মুখে ভীষণ জোরে মারতে থাকে।

॥ চল্লিশ ॥

মুরাভেইচিকের অলঙ্কারের দোকানের সামনে একজন নৈশ প্রহরী ও একজন মিলিসিয়াম্যান বসে চুপে চুপে কথা বলছে। রাস্তাটা জনমানবহীন এবং দোকানগুলি বন্ধ। বাবলা গাছের পল্লবহীন শাখাগুলিতে নব-বসন্তের বায়ু লেগে শোঁ শোঁ শব্দ উঠেছে আর বেড়ায় অযত্নে লাগানো 'মুক্তি ঋণের' একটা প্রাচীরপত্রের খানিকটা আলগা হয়ে যাওয়ায় ফড়ফড় করে শব্দ হচ্ছে। শহরের ওপর, বহু ঊর্ধ্বে দেখা যাচ্ছে জেলিফিশের মত উজ্জ্বল দক্ষিণী চাঁদ।

"ইয়াল্‌তায় তিনি একটু ছুটির আরাম ভোগ করছিলেন," নৈশ প্রহরীটি মিলিসিয়াম্যানের কাছে বেশ রসিয়ে রসিয়ে গল্প করে, "সাদা পোশাক পরে, সমস্ত পুরস্কার ও পদক ঝুলিয়ে তিনি সবে রাস্তায় বেড়াতে বেরিয়েছেন এমন সময় তাঁর হাতে এসে পড়ল একটি টেলিগ্রাম, মহামান্য জারবাহাদুরের সিংহাসন ত্যাগের খবর। সেটা পড়ে, বলব কি ভাই, সকলের সামনে তিনি কেঁদে ফেললেন..."

"ইস! ইস! বেচারা! বলে মিলিসিয়াম্যান।

"তারপর এক সপ্তাহের মধ্যেই বরখাস্ত।"

"কেন, কিসের জন্য?"

"কারণ তিনি ছিলেন একজন গবর্নর—আজকাল তো আর গবর্নর রাখা হবে না।"

"ইস্! ইস্! বড় খারাপ চাকরি তো," বলে মিলিসিয়াম্যান।

বাবলা গাছের তলে অন্ধকার ছায়ায় একটা রোগা বেড়াল পা টিপে টিপে সাবধানে নিজের কাজ সারছে। সেদিকে নজর পড়ে তার।

"...আর মহামান্য জার বাহাদুর সৈন্যপরিবেষ্টিত হয়ে মোগিলেফ-এ বেশ নিরুদ্বেগে দিন কাটাচ্ছিলেন। দিনের বেলা তিনি ঘুমোতেন আর রাত্রি বেলা পড়তেন যত যুদ্ধের খবর।"

"নিশ্চয়ই তেষ্টা পেয়েছে, পাজিটা; কেমন জলের দিকে যাবার চেষ্টা করছে," বলে মিলিসিয়াম্যান।

"কার কথা বলছ?"

"ঐ বেড়ালটার কথা বলছি। এইমাত্র সিনোপ্লির তামাকের দোকান থেকে বেরিয়ে এসেছে ওটা।"

"বহুত আচ্ছা। তারপর শোন। হঠাৎ মহামান্য জার বাহাদুরকে ফোনে বলা হল যে, পিতার্সবুর্গে লোক দাঙ্গাহাঙ্গামা শুরু করে দিয়েছে এবং সৈন্যরা লোকের ওপর গুলি করতে চাচ্ছে না, তারা বাড়ি চলে যেতে চায়। 'আচ্ছা,' জার ভাবলেন, 'অবস্থা ততটা খারাপ নয়!' কাজেই তিনি সমস্ত জেনারেলকে ডেকে পাঠালেন, অঙ্গে সব ফিতে এঁটে ও পদক ঝুলিয়ে তিনি তাঁদের কাছে বললেন: 'পিতার্সবুর্গে লোক দাঙ্গাহাঙ্গামা করছে, সৈন্যরা লোকের ওপর

গুলি করতে চাচ্ছে না, তারা বাড়ি চলে যেতে চায়। আমার কি করা উচিত? আপনাদের মতামত বলুন।' কি মনে কর তুমি? মহামান্য জার বাহাদুর জেনারেলদের মুখের দিকে চেয়ে রইলেন, কিন্তু কি বলব তোমাকে, জেনারেলরা তাঁকে তাঁদের কোন মতামত জানালেনই না, তাঁরা শুধু অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে নিলেন।"

"ইস্! ইস্! কি সাংঘাতিক কথা!" বলে মিলিসিয়াম্যান।

"তাঁদের মধ্যে মাত্র এক ব্যক্তি মুখ ঘুরিয়ে থাকেননি—একজন প্রবীণ মাতাল জেনারেল। তিনি বলেছিলেনঃ 'মহামান্য সম্রাট, আপনি হুকুম করুন, আপনার জন্য আমি প্রাণ দিতে প্রস্তুত।' কিন্তু জার ঘাড় নেড়ে বেদনার হাসি হাসলেন। 'আমার সমস্ত প্রজা, সমস্ত কর্মচারীর মধ্যে এই একটিমাত্র লোক আমার প্রতি অনুগত আছেন এবং ইনি সকাল বিকেল সব সময়ই মদে বিভোর হয়ে থাকেন। আমি আমার রাজত্বের অবসান দেখতে পাচ্ছি। আমাকে একখানা সরকারী কাগজ দিন, সিংহাসন ত্যাগ করলাম বলে আমি তাতে লিখে দেব।"

"তাই লিখলেন তিনি এবং দুঃখে কেঁদে ফেললেন।"

"ইস্! ইস্! কি সাংঘাতিক কথা!" আর একবার বলে মিলিসিয়াম্যান।

দুজনে বসে কথাবার্তা বলছে, এর মধ্যে একটা লোক দোকানের সামনে দিয়ে খুব দ্রুত হেঁটে চলে যায়: লোকটার মাথার টুপি চোখ পর্যন্ত নামান। তার সামরিক কোটটার একটা শূন্য হাতা কোমরবন্ধের সংগে আটকান। দোকানের সামনে বসা লোক দুটিকে সে একবার মুখ ঘুরিয়ে দেখে নেয়, জ্যোৎস্নায় তার সাদা দাঁতগুলি চিকচিক করে ওঠে।

"এবার নিয়ে লোকটা চারবার এখান দিয়ে গেল," প্রহরী আস্তে আস্তে বলে।

"লোকটা দস্যু বলে মনে হয়।"

"দস্যুর দল বেড়ে গেছে। যুদ্ধের ফলেই এটা হয়েছে। আগে চোর-ডাকাত যেখানে একটাও ছিল না এখন সেখানে অনেক পাবে। ওস্তাদ এক একজন।"

দূরে একটা গীর্জার চূড়োয় ঘড়িতে তিনটে বাজে এবং তার একটু পরেই মোরগ ডেকে ওঠে। এক হাতওয়ালা লোকটা আবার রাস্তায় দেখা দেয়, এবার সে দোকানের দরজার সামনে বসা লোকদুটির দিকে সোজা এগোতে থাকে। তারা নিঃশব্দে বসে তার আসা লক্ষ্য করছিল। হঠাৎ প্রহরী তার পাশের লোকটিকে কানে কানে বলেঃ

"বাঁশী বাজাও, ইভান, না হলে গেছি আমরা!"

মিলিসিয়াম্যান বাঁশীটা বার করতে যাবে এমন সময় সেই একহাতওয়ালা লোকটা ছুটে এসে মারে তার বুকে এক লাথি আর সংগে সংগে প্রহরীর মাথায়

রিভলবারের বাঁট দিয়ে মারে গ‍ুঁতো। ঠিক সেই মুহূর্তে আর একটা লোক দরজার দিকে ছুটে আসে। শেষের লোকটা দেখতে নাদুসনুদুস, মুখে লম্বা গোঁফদাড়ি, গায়ে একটা লম্বা সামরিক কোট। ছুটে এসেই সে তাড়াতাড়ি বিষম জোরে সৈন্যটির হাতদুটো পিছমোড়া করে বেঁধে ফেলে।

তারপর দস্যু দুজন নীরবে তালাটা ভাঙবার কাজে লেগে যায়। দরজাটা খুলতে বেশিক্ষণ লাগে না। বিহ্বল প্রহরী ও পিছমোড়া করে বাঁধা মিলিসিয়া-ম্যানকে টানতে টানতে তারা ভেতরে নিয়ে যায় এবং দরজাটা বন্ধ করে দেয়।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই কাজ সমাধা। জহরৎ ও সোনার দুটো পুঁটলি করা হয়।

"এদের কি করা হবে?" জিজ্ঞেস করে মোটা লোকটা। কাউন্টারের পেছনে মেঝেতে পড়ে আছে মিলিসিয়াম্যান। মোটা লোকটা তাকে বুটের মাথা দিয়ে খোঁচায়।

"না না, মের না," বলে সে। "দোহাই ঈশ্বরের মের না!"

"চল যাই" রুক্ষ মেজাজে বলে একহাতওয়ালা লোকটি।

"কিন্তু এরা সমস্ত বলে দেবে তোমাকে বলছি!"

"তুমি এস শুয়রের বাচ্চা" বলে আর্কাদি ঝাদভ। একটা পুঁটলি দাঁতে চেপে ধরে সে আর তার মাউসার-এর মুখটা সঙ্গীর দিকে তাক করে রাখে। মোটা লোকটা সামান্য একটু হেসে ও দরজার দিকে হেঁটে এগোয়। রাস্তাটা আগের মতই নির্জন। লোক দুটো নীরবে দোকান থেকে বেরিয়ে পড়ে এবং রাস্তায় নেমে একটা মোড় ঘুরে "চন্দু কাবারনে"র দিকে হেঁটে চলে।

যেতে যেতে মোটা লোকটাকে ঝাদভ শাসাতে থাকে: "হারামজাদা দস্যু, ভ্যানাড়ি কে থাকবে! আমার সংগে থেকে কাজ করতে হলে ওসমস্ত চলবে না। বুঝলে?"

"ঠিক আছে!"

"আচ্ছা এবার পুঁটলিটা আমার কাছে দাও এবং গিয়ে নৌকাটা তাড়াতাড়ি ঠিক করে রাখ। আমি আমার স্ত্রীকে নিয়ে আসছি। সূর্যোদয়ের আগেই আমাদের সাগরে পৌঁছাতে হবে।"

"আমরা কি ইয়াল্তা যাচ্ছি নাকি?"

"তা দিয়ে তোমার দরকার কি! ইয়াল্তা যাব কি কন্স্তান্তিনোপল যাব সে আমি দেখব। তোমাকে যা হুকুম করছি তাই কর।"

॥ একচল্লিশ ॥

কাতিয়া একা পড়েছে। তেলেগিন ও দাশা পেত্রোগ্রাদ রওনা হয়ে গেছে, কাতিয়া তাদের স্টেশনে তুলে দিয়ে এসেছে। তাদের দুজনকে দেখে মনে

হচ্ছিল, তারা যেন এক স্বপ্নলোকে বিচরণ করছে। কাতিয়ার বাড়ি ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যা হয়ে যায়।

সমস্ত বাড়ি ফাঁকা--মারফুশা ও লিজা গিয়েছে গেরস্ত বাড়ির ঝি-চাকরদের এক সভায়। ভোজনকক্ষে এখনো সিগারেট এবং ফুলের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। টেবিলের ওপর ভোজনান্তে যে সমস্ত জিনিসপত্র বিক্ষিপ্তভাবে পড়ে আছে সেগুলির মাঝখানে রয়েছে একটা ছোট পুষ্পিত চেরি-গাছ বসান পাত্র। কাতিয়া চেরি-গাছটার গোড়ায় জল দেয় এবং থালাবাসনগুলি সরিয়ে রাখে। তারপর জানালার দিকে মুখ করে আলো না জেলেই টেবিলের পাশে বসে সে। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ও অন্ধকার। ঘড়িটা টিক্ টিক্ শব্দ করে চলেছে। মনে মনে ভাবে সে, তার হৃদয়টা ভেঙে যদি চুরমার হয়েও যায় তবু ঘড়িটা ঠিক ঐ একই-ভাবে টিক্ টিক্ করে চলবে। স্থিরভাবে সে অনেকক্ষণ বসে থাকে, তারপর আরামকেদারার ওপর থেকে তার রেশম-পশম মিশ্রিত শালটা তুলে নিয়ে কাঁধে রাখে এবং দাশার শয়নকক্ষে প্রবেশ করে। আবছা আলোতে নগ্ন বিছানার ডোরাকাটা গদিটা নজরে পড়ে; চেয়ারের ওপর একটা খালি হ্যাট-বক্স পড়ে আছে আর মেঝেতে ছড়ান রয়েছে কাগজ ও কাপড়ের অসংখ্য টুকরো। কাতিয়া যখন দেখে যে, দাশা তার সামান্য জিনিসটুকু পর্যন্ত নিয়ে গেছে, কিছুই ফেলে রেখে যায়নি, তখন প্রাণে বড় আঘাত লাগে তার, কেঁদে ফেলে সে। ভোজন-কক্ষে যেমন স্তব্ধ হয়ে বসেছিল ঠিক সেইভাবে এখানেও সে বিছানায় ডুরে-ছিটের গদিটার ওপর অনেকক্ষণ বসে থাকে।

ভোজনকক্ষের ঘড়িতে ঢং ঢং করে দশটা বাজে। শালটা ভালভাবে গায়ে দিয়ে কাতিয়া রান্নাঘরে যায়। গিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে সে কান পেতে কি শোনবার চেষ্টা করে, তারপর উঁচু হয়ে হাত বাড়িয়ে ওপরের একটা তাক থেকে রন্ধনশালার খাতাটা পাড়ে সে এবং একটা সাদা পাতা ছিঁড়ে নিয়ে তাতে পেন্সিল দিয়ে লিখেঃ "লিজা ও মারফুশা, সারাদিন ধরে বাইরে বাইরেই আছিস। এত রাত হয়েছে তবু বাড়ি ফিরিসনি। এতে তোদের নিজেরই লজ্জিত হওয়া উচিত।" কাগজটার ওপর এক ফোঁটা চোখের জল পড়ে। রান্নাঘরের টেবিলটার ওপরে কাগজটা চাপা দিয়ে রেখে কাতিয়া নিজের শয়ন-কক্ষে চলে যায় এবং তাড়াতাড়ি জামাকাপড় ছেড়ে বিছানায় গিয়ে চুপ করে শুয়ে থাকে।

মাঝরাতে রান্নাঘরের দরজাটা দড়াম্ করে খুলে যায় এবং লিজা ও মারফুশা দুপদাপ ক'রে পা ফেলে ও চেঁচামেচি করতে করতে ঘরে ঢোকে। সামান্য একটু সময় তারা নীরব থাকে, কাতিয়ার চিরকুটটা পড়ে এবং হো হো ক'রে হেসে ওঠে। কাতিয়া চোখ মেলেই আবার বোজে, একটুও নড়েচড়ে না। তারপর রান্নাঘরে আর কোন সাড়াশব্দ নেই। অতন্দ্র ঘড়িটায় আবার ঢং ক'রে একটা বাজে। কাতিয়া চিত হয়ে শোয়, গায়ের কম্বলটা পা দিয়ে সরিয়ে ফেলে, দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করে, শ্বাসপ্রশ্বাসে যেন কষ্ট হচ্ছে তার, বিছানা

থেকে লাফিয়ে উঠে নেমে পড়ে। আলোটা জেবলে দেয় সে, ভ্রূকুঞ্চিত করে লম্বা ড্রেসিং-আয়নাটার সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। তার গায়ের পাতলা শেমিজটা হাঁটু পর্যন্তও নামেনি। লোক যেমন পরিচিত জিনিস দেখে ঠিক সেইভাবে সে দ্রুত ব্যগ্রভাবে নিজের দিকে তাকায়: হঠাৎ তার চিবুকটা কাঁপতে থাকে, আয়নাটার কাছে আরো এগিয়ে যায় এবং মাথার ডানদিকে চুলগুলি উল্টিয়ে তুলে দেয়। "হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাইত—এই যে! এই যে আর একটা!" সমস্ত মুখখানা সে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে। "হ্যাঁ, তাইত—এক বছরের মধ্যে আমার চুল সাদা হয়ে যাবে এবং তারপর আর একটি বছরে আমি বুড়ী হয়ে যাব।" আলোটা নিভিয়ে আবার সে শুয়ে পড়ে, বাহু দিয়ে চোখ দুটো ঢেকে রাখে তার। "জীবনে আমি এক মুহূর্তের জন্যও সুখী হতে পারিনি। আর এখন সব শেষ- কেউ আর আমাকে দুবাহু দিয়ে জড়িয়ে ধরবে না, কেউ আর আমাকে বুকে টেনে নেবে না কেউ আর আমাকে সম্বোধন করবেনা : প্রেয়সী, প্রিয়তমে, প্রাণেশ্বরী, জীবনসর্বস্ব—নয়নমণি"

এই বিষাদভরা চিন্তা ও অনুশোচনায় যখন সে নিমগ্ন তখন তার স্মৃতি-পটে সহসা ভেসে ওঠে একটা ছবি : তৃণক্ষেত্রের ভেতর দিয়ে চলে গেছে ভেজা, বালুময় একটা রাস্তা; বৃষ্টিতে তৃণক্ষেত্রটা নীল রং ধারণ করেছে। এখানে সেখানে রয়েছে লম্বা লম্বা লাইম গাছ। বাদামী রংএর পোশাক ও একটা কালো অ্যাপ্রন পরে সেই পথ দিয়ে হেটে চলেছে কাতিয়া। তার ছোট্ট জুতোর তলায় বালু পড়ে কচকচ শব্দ হচ্ছে, নিজেকে বেশ হালকা, ছিমছাম ও ছোট্ট লাগছে তার হাওয়ায় চুল উড়ছে, আর তারই পাশে রাস্তা ছেড়ে ভেজা ঘাসের ওপর দিয়ে সাইকেল ঠেলে নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে আলিয়োশা। কাতিয়া তার মুখটা ঘুরিয়ে নেয়, না হলে তাকে দেখে হাসি এসে যাবে তার। আলিয়োশা বিষণ্ণ কণ্ঠে বলছে তাকে : "প্রতিদানে তোমার ভালবাসা যে আমি পাব না সে আমি জানি, তেমন আশা আমার নেইও। শুধু এই কথাটিই আমি তোমাকে বলতে এসেছি, কাতিয়া, কোন এক অজ্ঞাত অখ্যাত রেল স্টেশনে আমি আমার জীবনের অবশিষ্ট দিন ক'টা কাটিয়ে দেব। আচ্ছা, বিদায়!" এই বলে সে লাফিয়ে সাইকেলটায় ওঠে এবং ঘাসের ওপর দিয়েই সাইকেল চালিয়ে চলে যায়: তার পেছনে ঘাসের ওপর পড়ে থাকে একটা লম্বা নীল দাগ। ধূসর বর্ণের স্কুল টিউনিকে ঢাকা তার পিঠটা ঝুঁকে আছে সাইকেলের হাতলের দিকে। সেটা এবং তার সাদা টুপিটা ক্রমশ পাতার মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যায়। কাতিয়া চীৎকার করে ওঠে : "আলিয়োশা, ফিরে এস!"

অনিদ্রায় ক্লিষ্ট এই কাতিয়া সত্যি কি একদিন সেই ভেজা পথে দাঁড়িয়েছিল, বৃষ্টিতে আর্দ্র গ্রীষ্মের সমীরণ কি সত্যি সেদিন তার কালো অ্যাপ্রনটা ধরে টানাটানি করেছিল? কাতিয়া বিছানায় বসে পড়ে, অনাবৃত জানুর ওপর কনুই রেখে দুহাতে মুখ ঢাকে। রাস্তার লম্ফগুলির ম্লান আলো, রেণু রেণু নীহারপাত, পত্রবহীন বৃক্ষের শাখাহত বাতাসের শোঁ শোঁ শব্দ, ঘোড়ার

গাড়ীর চাকার ক্যাঁচক্যাচানি ও কোচোয়ানদের গলা ফাটান বিকট চীৎকার, তার নিজের চোখের ওপর বেসনভের তুষারহিম দু'টো চোখ, দুর্বল মুহূর্তে আত্ম-সমর্পণের পুলকশিহরণ, ঔৎসুক্যজনিত ন্যক্কারজনক অনুতাপ স্পর্শ...একে একে সমস্ত মনে পড়ে তার।

আবার বিছানায় দেহটাকে এলিয়ে দেয় সে। বাড়ির নিস্তব্ধতা ভঙ্গ ক'রে সামনের দরজায় জোরে ঘণ্টা বেজে ওঠে। কাতিয়া শক্ত হয়ে যায়। আবার ঘণ্টা বাজে। আধা ঘুমন্ত অবস্থায় লিজা খালি পায়ে রাগে দাপাতে দাপাতে গলি দিয়ে এগোয়: সামনের দরজাটার শিকল ঝন্‌ঝন্‌ ক'রে ওঠে এবং তারপর লিজা এসে কাতিয়ার ঘরের দরজায় কড়া নেড়ে হাঁক দিয়ে বলেঃ

"আপনার টেলিগ্রাম, মাদাম।"

কাতিয়া ভ্রূকুটি ক'রে তার হাত থেকে সরু খামটা নেয় এবং সেটা ছিঁড়ে ভেতর থেকে টেলিগ্রামটা খোলে। শব্দগুলি তার চোখের সামনে ভাসতে থাকে।

ভয়ে লিজার ঠোঁট দু'টো কাঁপছে। তার দিকে চেয়ে কাতিয়া বলেঃ

"নিকলাই ইভানোভিচ মারা গেছে।"

লিজা হাউমাউ ক'রে কেঁদে ওঠে। কাতিয়া তাকে যেতে বলে। তারপর টেলিগ্রাফ-ফিতায় যে নিষ্ঠুর অক্ষরগুলি রয়েছে সেগুলি সে দ্বিতীয় বার পড়েঃ

"গৌরবজনক কর্তব্য পালন করতে গিয়ে নিকলাই ইভানোভিচ গুরুতর-ভাবে আহত হন ও মারা যান। লীগের খরচে তাঁর মৃতদেহ মস্কোতে প্রেরিত হবে "

কাতিয়া অসুস্থ বোধ করে, তার মাথা ঘুরতে থাকে, দু'চোখে অন্ধকার দেখে। আবার বালিশে মাথা রাখতে না রাখতেই অজ্ঞান হয়ে পড়ে সে।

পরদিন প্রখ্যাত উদারনৈতিক নেতা প্রিন্স কাপুস্তিন-উন্‌ঝেস্কি এসে কাতিয়ার সঙ্গে দেখা করেন। বিপ্লবের প্রথম দিনে উকিল সভার ক্লাবে শ্মশ্রুমণ্ডিত রক্তিমবদন এই ভদ্রলোককেই কাতিয়া বক্তৃতা করতে দেখেছিল। দু'হাতে কাতিয়ার হাত দু'টো টেনে নিয়ে তিনি নিজের খসখসে ওয়েস্টকোটের ওপর চেপে ধরেন এবং বলেন যে, যে-প্রতিষ্ঠানে নিকলাই ইভানোভিচের সঙ্গে তিনি একত্র কাজ করতেন সেই প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে, বর্তমানে একজন ভাইস-কমিসার হিসাবে মস্কো নগরীর পক্ষ থেকে, রুশিয়া ও বিপ্লবের পক্ষ থেকে তিনি এসেছেন তাঁদের আদর্শ রক্ষা করতে গিয়ে এই কীর্তিমান যোদ্ধার অকাল মৃত্যু হওয়ায় কাতিয়ার প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানাতে।

প্রিন্স কাপুস্তিন-উনঝেস্কি এমনই প্রসন্নবদন এবং তাঁর এমনই সুন্দর স্বাস্থ্য ও মধুর স্বভাব, তাঁর সমবেদনা এতই আন্তরিক, তাঁর দাড়ি ও ওয়েস্ট-কোট থেকে নির্গত চুরটের গন্ধ এমনই তৃপ্তিদায়ক যে কাতিয়া সত্যি মুহূর্তের জন্য সান্ত্বনা পায়। সে তার তন্দ্রাহীন চোখ দু'টি তুলে ভদ্রলোকের মুখের দিকে তাকায় এবং শুষ্ক অধরোষ্ঠ খোলেঃ

"নিকলাই ইভানোভিচ সম্পর্কে দরদ দিয়ে আপনি যে কথাগুলি বললেন তার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।"

একটা প্রকাণ্ড রুমাল বার করে প্রিন্স তাঁর চোখ দু'টো মোছেন এবং তাঁর বেদনাদায়ক কর্তব্য সেরে তিনি বিদায় গ্রহণ করেন—সরু রাস্তায় তাঁর মোটরটার ভীষণ গর্জন শুনতে পাওয়া যায়। কাতিয়া আবার তার ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে থাকে। সিংহের মত মুখের আকৃতিবিশিষ্ট একজন অজ্ঞাত জেনারেলের ফোটোগ্রাফের সামনে সে দাঁড়ায়। একটা এলবাম, একটা বই, একটা চীনা বাক্স যার ঢাকনার 'ওপরে একটা বক একটা ব্যাঙ ঠোঁটে করে আছে, উদ্দেশ্যবিহীন-ভাবে এগুলি সে হাতে নিয়ে আবার রেখে দেয়। ওয়ালপেপার ও পর্দাগুলির দিকে চোখ রেখে সে ঘরে আবার পায়চারি করতে থাকে। মধ্যাহ্নের খাবার স্পর্শও করে না সে।

"অন্তত একটু জেলি খেলেও তো হ'ত মাদাম," লিজা অনুরোধ করে।

কিন্তু কাতিয়া ঘাড় নাড়ে ও দাঁত চেপে থাকে। দাশাকে একটা ছোট চিঠি লিখতে আরম্ভ করে সে, কিন্তু আবার ছিঁড়ে ফেলে সেটা।

শুয়ে খানিকক্ষণ ঘুমিয়ে নিতে পারলে ভাল হয়, বোঝে কাতিয়া। কিন্তু বিছানায় গা দিলেই তো তার মনে হবে শবাধারে শুয়ে আছে সে; গত রাত যেভাবে কেটেছে তাতে শোবার নামে আতঙ্ক হয় তার। নিকলাই ইভানোভিচের কথা ভেবে তার জন্য অনুকম্পায় ভ'রে উঠছে তার মন আর এই পোড়া অনু-কম্পাই তাকে পীড়া দিচ্ছে সব চেয়ে বেশি। আহা, বেচারা! ভালমানুষ ছিল সে, হৃদয়টা ছিল কোমল, তবে বুদ্ধিটা একটু স্থূল ছিল। তার স্বভাব মেনে নিয়েই তাকে তার ভালবাসা উচিত ছিল; কিন্তু তার কাছে পেয়ে গেছে সে শুধু আঘাত। আঘাত পেয়েই তার চুলগুলি অকালে পেকে সাদা হয়ে গিয়ে-ছিল... জানালা দিয়ে বাইরে বিষণ্ণ, পাণ্ডুবর্ণ আকাশটার দিকে কাতিয়া তাকায় আর এক হাতের আঙুল দিয়ে অন্য হাতের আঙুল মটকায়।

পরদিন নিকলাই ইভানোভিচের আত্মার সদ্গতি কামনা ক'রে প্রার্থনা হয়। তারপর দিন দেওয়া হয় তাঁকে সমাধি। সমাধিক্ষেত্রে অনেকে চমৎকার বক্তৃতা করেন। একজন তাঁকে আফ্রিকার সামুদ্রিক পাখী অ্যালব্যাট্রস-এর সঙ্গে তুলনা ক'রে বলেন যে, তিনি সেই পাখীরই মত তুষারস্তূপের মহাগহ্বরে বিলীন হয়ে গেছেন, আবার একজন বলেন যে, তাঁর গৌরবময় জীবনব্যাপী তিনি এক উজ্জ্বল আলোক বর্তিকা ঊর্ধ্বে তুলে ধ'রে রেখেছিলেন। বক্তাদের মধ্যে একজন দেখতে খাটো, চোখে চশমা, খ্যাতনামা সমাজবাদী বিপ্লবী নেতা। আসতে তাঁর দেরি হয়ে যায়। রাগে কাতিয়াকে তিনি খেঁকিয়ে বলেনঃ "দয়া করে আমাকে একটু যেতে দিন দেখি, মহাশয়া!" লোক ঠেলে তিনি সমাধির পাশে গিয়ে হাজির হন এবং বক্তৃতায় বলেন যে, নিকলাই ইভানোভিচের মৃত্যুর দ্বারা এটাই আবার প্রমাণিত হ'ল যে, তাঁর, অর্থাৎ বক্তার, দল ভূমি সংক্রান্ত যে নীতি অনুসরণ করে চলেছে তা অভ্রান্ত। তাঁর অপরিষ্কার

জুতোর চাপে মাটির একটা ডেলা ভেঙে যায় এবং খানিকটা মাটি ঝুরঝুরে ক'রে শবাধারের ওপর পড়ে। কাতিয়ার কিরকম গা-বমি গা-বমি ও খিলধরা ভাব হয়, যেন গলাটা আটকে আসছে তার। উঠে সবার অলক্ষ্যে কেটে পড়ে সে এবং বাড়িতে চ'লে আসে।

এখন কেবল স্নান ক'রে শুয়ে পড়া ছাড়া অন্য কোন ইচ্ছে তার নেই। কিন্তু বাড়িতে ঢুকেই সেই নানাবর্ণের ডোরা-ডোরা ওয়ালপেপার, বিভিন্ন ফটোগ্রাফ ঢাকনার ওপর বকওয়ালা চীনা বাক্সটা, খাবারঘরে কুঞ্চিত টেবিল-ক্লথ ধুলোপড়া জানালাসমূহ দেখে তার কিরকম গা ছমছম করে। সব কিছু দেখেই যেন তার হৃৎকম্প উপস্থিত হচ্ছে। স্নানের টবটা সে ভরতি করতে বলে। তারপর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে গরম জলে দেহটাকে ডুবিয়ে দেয় সে। সমস্ত দেহটা তার ক্লান্ত, অবসন্ন। অতি কষ্টে কোন রকমে সে শোবার ঘরে গিয়ে পৌঁছে এবং চাদর না পেতেই বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় যেন ঘণ্টা বাজার শব্দ, পদধ্বনি, কণ্ঠস্বর ও দরজায় করাঘাতের আওয়াজ তার কানে আসে, কিন্তু সাড়া দেয় না সে।

জেগে দেখে কাতিয়া অন্ধকার হয়ে গেছে। তার হৃদয়ে একটা তীব্র বেদনা অনুভব করছে সে। "এ কি ?" বিচলিত হ'য়ে ভীত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে সে। উঠে বিছানায় খানিকক্ষণ বসে, মুহূর্তের জন্য মনে হয় তার, সমস্ত দিনের এই ভয় আতঙ্ক ও বেদনা একটা দুঃস্বপ্ন ছাড়া আর কিছুই নয়। পরক্ষণেই আবার ভেঙে পড়ে সে। কেন এত অবিচার ? এভাবে সে ক্ষতবিক্ষত হবে কেন ? অবশেষে ঘুমের ঘোর একদম কেটে যাবার পর অবিন্যস্ত চুলগুলি একটু ঠিক ক'রে নিয়ে খালি পায়ে চটিজোড়া প'রে সে এবং দ্বিধাহীন চিত্তে শান্ত ভাবে আপনমনে বলেঃ "যথেষ্ট হয়েছে আমার।

দেয়ালে টাঙানো ছোট একটা ওষুধের তাকের কাছে ধীরে হেঁটে যায় সে এবং শিশির গায়ে আঁটা লেবেলগুলি পড়তে থাকে। আফিংএর একটা শিশি খুলে সে তা শোঁকে, তারপর হাতের মুঠোতে সেটা নিয়ে গ্লাসের জন্য ভোজনকক্ষের দিকে যায়। ড্রইং রুমে আলো দেখতে পেয়ে মাঝপথে থেমে দাঁড়ায় সে। "কে ওখানে ?" মৃদুস্বরে জিজ্ঞেস করে কাতিয়া এবং দরজাটা একটু ফাঁক করে।

সামরিক পোষাক-পরা একটি লম্বা লোক সোফায় বসে আছে। মুড়োনো মাথাটায় একটা কালো ব্যাণ্ডেজ তার। কাতিয়া ঘরে ঢুকতেই সে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ায়। কাতিয়ার পা দুটো যেন অবশ হয়ে আসছে, হৃদয়ের অন্তস্তলটা ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে তার। লোকটি ভীতিবিহ্বল, বিস্ফারিত লোচনে তাকায় কাতিয়ার দিকে; তার সোজা ঠোঁট দুটো জোরে চেপে রেখেছে সে।

লোকটি আর কেউ নয়, ভাদিম পেত্রোভিচ রশাচিন। কাতিয়া দু'হাত দিয়ে নিজের বুকটা ধরে। তার মুখের দিকে চোখ রেখেই রশাচিন অকম্পিত কণ্ঠে ধীরে ধীরে বলেঃ

"আমি এসেছিলাম আপনাকে আমার শ্রদ্ধা জানাতে। এসে আপনার

ঝিয়ের মুখে পেলাম এই দুঃসংবাদ। আপনাকে শুধু এই কথাটা বলবার জন্য আমি অপেক্ষা করছিলাম যে, আপনার যখনি প্রয়োজন হবে তখনি আপনি পাবেন আমাকে আর সারাজীবন আমি আপনারই হয়ে থাকতে প্রস্তুত।"

শেষের ক'টি কথা বলার সময় তার গলার স্বরটা একটু কেঁপে ওঠে এবং শুকনো গাল দুটোয় কালচে রক্তের ঝলক খেলে যায়। কাতিয়া যত জোরে পারে নিজের বুকটা দু'হাতে চেপে ধরে। তার চোখ দেখে রশচিনের মনে হয় তার কাছে তার এগিয়ে যাওয়া উচিত। কাতিয়ার দিকে এগোতেই সে বলে:

"ভাল আছেন তো, ভাদিম পেত্রোভিচ!"

বলার সময় কাতিয়ার দাঁতগুলিতে কিচ্‌মিচ্‌ শব্দ হয়। তাকে জড়িয়ে ধরবার জন্যই যেন অনিচ্ছায় রশচিন তার দু'বাহু তোলে; হাতের মুঠোতে শিশিটা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে কাতিয়া; বড়ই দুর্বল, বড়ই বিষাদমগ্ন দেখাচ্ছে তাকে। রশচিন তৎক্ষণাৎ তার হাত দুটো আবার নামিয়ে নেয় এবং ঘাড় হেঁট করে। মুহূর্তের মধ্যে নারী-প্রকৃতিই যেন তাকে বলে দেয়, যত অসুখী যত ক্ষুদ্র, যত পাপিষ্ঠা, যত অসহায়া আর রুদ্ধ অশ্রুতে যত ভারাক্রান্তই সে হোক না, তার অন্তরাত্মাকে নিজের অন্তরাত্মার সঙ্গে এক ক'রে নেবার জন্য এই যে কঠোরজীবী লোকটি মৌনভাবে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে, তার কাছে সে প্রিয়, অপরিহার্য। অশ্রু সম্বরণ ক'রে, একটি কথাও না বলে, মুখ বুজে সে রশচিনের হাতের ওপর ঝুঁকে পড়ে এবং মুখ ও অধরোষ্ঠ দিয়ে তার হাত দুটোর ওপর চাপ দিতে থাকে।

॥ বিয়াল্লিশ ॥

মার্বেল পাথরের গোবরাটে কনুই রেখে দাশা জানালা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে আছে। পশ্চিমে কালো বর্ণের ঊর্ধ্বে অর্ধেক আকাশ জুড়ে দেখা যাচ্ছে সূর্যাস্তের আভা। ইভান ইলিয়িচ পাশে স্থিরভাবে ব'সে তার দিকে চেয়ে আছে। একটুও নড়েনা সে, অবশ্য ইচ্ছে করলেই সে যত খুশি নড়তে পারে, কারণ ঘরের সাদা দেয়ালে সূর্যাস্তের রক্তিম আভা যতক্ষণ প্রতিফলিত হচ্ছে ততক্ষণ দাশা এখান থেকে উঠে কোথাও যাবে না।

"কত বাধা, অথচ কত আনন্দ," বলে দাশা। "মনে হয় আমরা যেন কোন বিমানপোতে ক'রে ভেসে চলেছি।"

ইভান ইলিয়িচ মাথা নাড়ে। জানালার গোবরাট থেকে দাশা তার হাত সরিয়ে আনে।

"আমার মন গান-বাজনা একটা কিছু চাচ্ছে," বলে দাশা। "কতকাল পিয়ানো বাজাইনে জানো! সেই যুদ্ধ বাধবার পর থেকে। ভাব দেখি, এখনো সেই যুদ্ধ চলেছে। কিন্তু আমরা..."

তেলেগিন নড়ে বসে। দাশা তাড়াতাড়ি বলে চলেঃ

"যুদ্ধ যখন থেমে যাবে তখন আমরা প্রচুর গানবাজনা করতে পারব। মনে আছে, ইভান, কিভাবে আমরা সমুদ্রতটে শুয়ে ছিলাম এবং কিভাবে ঢেউ-গুলি বালুর ওপর ছুটে আসছিল? সমুদ্রের সেই রূপটা ভাব দেখি! সেই তরল নীল! আমার মনে হ'ত আমি যেন সারা জীবন ভরেই তোমাকে ভালবেসে আসছি।"

তেলেগিন আবার নড়ে বসে এবং কি বলবার চেষ্টা ক'রে, কিন্তু তার আগেই দাশা হঠাৎ চীৎকার ক'রে বলে ওঠেঃ "কেটলীতে জল টগবগ ক'রে ফুটছে!" ছুটে সে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। আধা আলো আধা অন্ধকারে দোরটা খোলবার জন্য দাশা যখন থেমে একটু দাঁড়ায়, তেলেগিন শুধু তার মুখ, পর্দাধরা হাত ও ধূসর বর্ণের মোজাপরা পা দেখতে পায়। মাথার পেছনে হাত দু'টো নিয়ে তেলেগিন চোখ বন্ধ করে।

সেদিনই বেলা দু'টোয় তেলেগিন ও দাশা এসে পিতার্সবুর্গে পৌঁচেছে। আগের দিন ট্রেনের করিডরে ভীড়ের মধ্যে লাগেজের ওপর বসে তাদের সারারাত কাটাতে হয়েছে। কিন্তু ফ্ল্যাটে এসেই দাশা তার সমস্ত জিনিসপত্র খুলে ফেলে, চারদিকে চেয়ে দেখে কোথায় কি আছে না আছে, ধুলোবালি ঝেড়ে পরিষ্কার ক'রে, ফ্ল্যাটটা দেখে খুবই আনন্দ পায় এবং সঙ্গে সঙ্গেই স্থির করে সমস্ত আসবাবপত্র নতুন ক'রে সাজাতে হবে। নীচের হলঘর থেকে দ্বার-রক্ষীকে ডাকিয়ে ওপরে আনা হয়। তিনজনে মিলে সোফা, আলনা, তাক ইত্যাদি এক ঘর থেকে আর এক ঘরে নেয়। নতুন ক'রে ঘর সাজান হ'লে দাশা তেলেগিনকে সমস্ত জানালা খুলে দিতে বলে এবং গা ধোবার জন্য স্নান-ঘরে চলে যায়। সেখানে গিয়ে সে জল নিয়ে খেলা ক'রে অনেকক্ষণ, তার চুলে ও মুখে কি করে, তারপর যখন বেরিয়ে আসে তখন তেলেগিনকে একবার এঘরে, একবার ওঘরে ঢুকতে বারণ করে, অথচ তেলেগিনের ইচ্ছে সেদিন দাশাকে এক মুহূর্তের জন্যও কাছছাড়া না ক'রে তার দিকে সারাক্ষণ চেয়ে থাকে সে।

অবশেষে সন্ধ্যার দিকে দাশা শান্ত হয়। দাড়িগোঁফ কামিয়ে তেলেগিন স্নান সেরে নেয়। তারপর খাবারঘরে এসে দাশার পাশে বসে সে। মস্কো ছেড়ে আসার পর এই তারা প্রথম নীরবে নিরালায় বসেছে। এই নীরবতাকে যেন দাশা ভয় করে, সেজন্যই সে সারাক্ষণ কথা বলার চেষ্টা করেছে। অনেক পরে দাশা তেলেগিনের কাছে স্বীকার করে যে, হঠাৎ তার ভয় হয়ে গিয়েছিল যে, আবার বুঝি সে তাকে 'ঠিক সেই রকম কণ্ঠস্বরে' বলবেঃ

"আচ্ছা, দাশা, এ সম্বন্ধে কি হবে?"

দাশা যখন কেটলীর জল দেখতে যায় তেলেগিন তখন চোখ বুজে বসে থাকে। দাশা ঘরে নেই, কিন্তু ঘরের বাতাস যেন এখনো তার নিঃশ্বাসে পরিপূর্ণ। রান্নাঘরে তার জুতোর ছোট গোড়ালির খট্‌খট্‌ শব্দ বড়ই মধুর

শোনাচ্ছে। হঠাৎ একটা কি পড়ে গিয়ে ঠুংঠাং ক'রে শব্দ হয়। দাশাকে সখেদে বলতে শোনা যায়ঃ "একটা কাপ!" তেলেগিনের ভেতরে আনন্দের একটা উষ্ণ তরংগ খেলে যায়। "কাল যখন আমার ঘুম ভাঙবে, তখন তা সাধারণ প্রভাত হবে না—হবে দাশা প্রভাত।" দাশাকে দরজার ফাঁকে দেখা যেতেই তেলেগিন তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ায়।

"একটা কাপ ভেংগে ফেলেছি। সত্যি তোমার চায়ের দরকার, না ইভান?"

"না।"

তেলেগিনের কাছে যায় সে। এতক্ষণে ঘরটা একেবারে অন্ধকার হয়ে গেছে। দাশা তার কাঁধে হাত রাখে।

"কি ভাবছিলে?" কোমল কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে দাশা।

"তোমাকে।"

"জানি তা। কিন্তু আমার সম্বন্ধে আবার কি ভাবছিলে?"

গোধূলির অন্ধকারে মনে হয় মুখে যেন তার ভ্রূকুটি. কিন্তু আসলে হাসছে দাশা। তার নিঃশ্বাসে ছন্দের ব্যত্যয় নেই. তালে তালে ওঠানামা করছে তার বুক।

"আমি ভাবছিলাম সমস্ত কিছু আমার মনের মধ্যে কেমন যেন জট পাকিয়ে গেছে—তুমি যে আমার স্ত্রী একথা উপলব্ধিই করতে পারছিলাম না। তারপর হঠাৎ যখন আমি তা হৃদয়ংগম করলাম এবং তোমাকে বলতে এলাম, তখন আবার সবই ভুলে গেছি।"

"ও, ও!" জানালার ধারে যেতে যেতে বলে দাশা। "বসো, আমি চেয়ারের এই হাতলের ওপর বসছি।"

তেলেগিন আরাম কেদারায় বসে এবং দাশা বসে তার হাতলের ওপর। "আর কি কি ভাবছিলে তুমি?" বলে দাশা।

"তুমি যখন রান্নাঘরে তখন আমি এখানে বসে বসে ভাবছিলাম যে, এক অতি আশ্চর্য একটি প্রাণী এসেছে এ বাড়িতে বাস করতে। তা ভাবা কি খারাপ?"

"হ্যাঁ," চিন্তান্বিতভাবে বলে দাশা। "ওরকম ভাবা অত্যন্ত খারাপ।"

"তুমি আমাকে ভালবাস, দাশা?"

"ও," পেছন দিকে ঘাড় হেলিয়ে বলে সে, "ঐ ছোট ভূর্জ গাছটারই মতন আমি তোমাকে ভালবাসি।"

"কোন্ ভূর্জ গাছটা?"

"জান না বুঝি? জীবনান্তে প্রত্যেকেরই জন্য থাকে একটা ক'রে ছোট ঢিবি এবং তার ওপর ছোট একটি নতশাখ ভূর্জ বৃক্ষ।"

তেলেগিন দু'বাহু বাড়িয়ে দাশাকে আলিংগন করে। বাহুবন্ধনে প'ড়ে দাশা নিজের দেহটাকে এলিয়ে দেয়। সমুদ্রসৈকতে যেমন হয়েছিল ঠিক তেমনিভাবে হাঁপিয়ে না ওঠা পর্যন্ত তারা বহুক্ষণ ধ'রে একে অন্যের অধর-সুধা পান করে।

"ও, ইভান!" বলে দাশা এবং দু'বাহু দিয়ে তেলেগিনের কণ্ঠ জড়িয়ে ধরে। তার বুকের ধড়ফড়ানি দাশার কানে আসে, তেলেগিনের জন্য কষ্ট হয় তার। একটা গভীর নিঃশ্বাস ফেলে সে আরামকেদারা ছেড়ে ওঠে এবং অত্যন্ত সহজ ভাবে বলেঃ "এস ইভান!"

আসার পাঁচদিন বাদে দাশা তার দিদির চিঠি পায়। চিঠিতে কাতিয়া নিকলাই ইভানোভিচের মৃত্যুখবর জানিয়েছে।

"...একটা সময় আমার বড় যন্ত্রণা ও নৈরাশ্যের মধ্যে কেটেছে। পরিষ্কারই আমি বুঝতে পারলাম, এরপর আমাকে সারাজীবন একাকীই কাটাতে হবে। উঃ, সে কি ভয়ংকর! এত ভয়ংকর যে অবিলম্বে আমি তার অবসান ঘটাবার সিদ্ধান্ত করলাম। আমি কি বলতে চাচ্ছি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছিস, দাশা। তারপর হঠাৎ দৈব আমাকে বাঁচিয়ে দিলঃ কিংবা ঘটনাচক্রও বলতে পারিস।... কিন্তু না, সত্যি এ দৈবের চেয়েও বেশি। এ সম্পর্কে আমি এখন লিখতে পারছিনে। সাক্ষাতে তোকে সব বলব।"

ভগ্নীপতির মৃত্যুসংবাদ এবং কাতিয়ার চিঠি পেয়ে দাশা প্রচণ্ড আঘাত পায়। স্থির করে সে অবিলম্বে মস্কো যাবে; কিন্তু পরদিনই আবার কাতিয়ার চিঠি আসে যে পেত্রোগ্রাদে আসার জন্য সে তার লটবহর বাঁধছে, দাশা যেন তার জন্য অল্প ভাড়ায় একটা ঘর দেখে রাখে। পুনশ্চ দিয়ে লিখেছে সেঃ "ভাদিম পেত্রোভিচ রশচিন তোর সঙ্গে দেখা করবে। আমার সম্বন্ধে তার কাছে সমস্ত শুনতে পাবি। সে আজ আমার ভাই, বন্ধু, পিতা সবই।"

দাশা ও তেলেগিন প্রশস্ত রাস্তাটা ধরে হেঁটে চলেছে। এপ্রিলের একটি রবিবার। বসন্তের শীতল নীল আকাশে উড়ন্ত পাতলা খণ্ড খণ্ড মেঘ সূর্য-কিরণে গলে গলে মিলিয়ে যাচ্ছে। মনে হয় জলের মধ্য দিয়ে বুঝি পরিস্রুত হয়ে রোদ এসে রাস্তায় পড়েছে, দাশার সাদা পোশাক ঝলমল করছে রোদে। দেবদারু গাছের শুষ্ক লাল গুঁড়িগুলি যেন তাদের দিকে এগিয়ে আসছে, গাছের চূড়োয় উঠেছে মর্মরধ্বনি আর পাতাগুলি করছে শিরশির শব্দ। দাশা তেলেগিনের দিকে এক ঝলক দৃষ্টি ফেলে। তেলেগিন তার টুপিটা মাথা থেকে নামিয়ে নিয়েছে; ভ্রূকুঞ্চিত করে হাসে সে। দাশা আজ প্রশান্ত। দিনের সৌন্দর্য, নির্মল বায়ুসেবনের আনন্দ, স্বচ্ছন্দ ভ্রমণের পরিতৃপ্তি আর আজকের এই দিনটি ও তারই পাশে ভ্রমণরত মানুষটির কাছে তার সম্পূর্ণ আত্ম-সমর্পণের অনুভূতিতে দাশার হৃদয় কাণায় কাণায় ভরে উঠেছে।

"ইভান," দাশা বলে এবং তার দিকে চেয়ে হাসে।

তেলেগিনও হেসে তাকে জিজ্ঞেস করেঃ "কি, দাশা?"

"না, কিছু নয়। আমি ভাবছিলাম..."

"কি ভাবছিলে?"

"না। পরে বলব।"

"আমি জানি তুমি কি বলতে চাচ্ছিলে।"

দাশা তেলোগিনের দিকে হঠাৎ ঘুরে যায়।

"বাজি রেখে বলতে পারি, তুমি জান না।"

একটা বড় দেবদারু গাছের কাছে এসে তারা থেমে দাঁড়ায়। তেলোগিন দেবদারু গাছটা থেকে এক টুকরো বাকল টেনে খসিয়ে নেয়, তাতে রয়েছে ফোঁটা ফোঁটা নরম রজন। আঙ্গুলের চাপে বাকলটাকে ভাঙে সে এবং সস্নেহে আড়নয়নে দাশার দিকে চেয়ে বলে:

"হুঁ, আমি জানি!"

দাশার হাত কাঁপে।

"শোন," চুপে চুপে বলে সে, "আমার মন চাচ্ছে এর চেয়ে আরো বেশি আনন্দের মধ্যে ডুবে যেতে। আমি পরিপূর্ণ, জীবন আমার টইটম্বুর "

তেলোগিন ঘাড় নাড়ে। তারা এবার কাননমধ্যস্থিত একটা ফাঁকা জায়গা দিয়ে হাঁটতে থাকে; পীতাভ সবুজ দূর্বায় ঢাকা জায়গাটা দেখে মনে হয় যেন গালিচা বিছিয়ে রাখা হয়েছে, হলদে বাটারকাপ লতা হাওয়ায় দুলছে। বাতাসে উড়ছে দাশার স্কার্টটা। হাঁটতে হাঁটতে বার কয়েক উপুড় হয়ে সে স্কার্টটা নীচের দিকে নামিয়ে দেয় আর বার বার বলে:

"ভারী অসভ্য বাতাস তো!"

একটা প্রাসাদের উঁচু লোহার রেলিংএর কাছে এসে কাননপথটা শেষ হয়েছে। রেলিংএর ঝকঝকে শূলগুলি কালের প্রভাবে উজ্জ্বলতা হারিয়ে ফেলেছে। দাশার জুতোর ভেতর একটা কাঁকর ঢোকে। তেলোগিন বসে প'ড়ে জুতোটা খুলে ফেলে এবং দাশার সাদা মোজাপরা উষ্ণ পায়ে চুম্বন করে। দাশা আবার জুতোটা প'রে নিয়ে মাটিতে পা ঠোকে ও বলে:

"আমি মা হতে চাই, ইভান।"

॥ তেতাল্লিশ ॥

একটা ছোট কাঠের বাড়িতে কাতিয়া একখানি ঘর নিয়েছে। দাশাদের ফ্ল্যাট থেকে বাড়িটা খুব বেশি দূরে নয়। বাড়িটা আছে দুই বৃদ্ধার হাতে; একজনের নাম ক্লাভদিয়া ইভানোভনা এবং আর একজনের নাম সোফচকা। ক্লাভদিয়া ইভানোভনা বহুদিন আগে গান গেয়ে জীবিকা অর্জন করত আর সোফচকা ছিল তার দোসর। সকালের দিকে ক্লাভদিয়া ইভানোভনা তার ভ্রূ চিত্রিত ক'রে কালো পরচুলাটা পরে এবং সারাদিন ব'সে পেসেন্স খেলে।

সোফচকা সংসারের কাজকর্ম দেখে; গলার আওয়াজটা তার পুরুষের মত। বাড়িটা পরিচ্ছন্ন, তবে সাবেক ধরনের জিনিসপত্রের বাহুল্য কিছুটা আছে, ছোট ছোট সীবনের কাজ ও জানালার পর্দা আর দেখা যায় কতগুলি বিবর্ণ প্রতিকৃতি, বিগত যৌবনের কথা সেগুলি স্মরণ করিয়ে দেয়। সকাল বেলা ঘরগুলিতে ভাল কাফির গন্ধ পাওয়া যায়, তারপর সোফচকা যখন রান্না চড়ায়, ক্রাভদিয়া ইভানোভনা রান্নার ঝাঁজাল গন্ধ নাকে আসে বলে খালি গজগজ করতে থাকে আর তার স্মেলিং-সল্ট শোঁকে; ওদিকে সোফচকা রান্নাঘর থেকে পুরুষালি গলায় চেঁচিয়ে বলেঃ "ঝাঁজ যাবে তো আমি কি করব! অ'-ডি-কোলন দিয়ে তো আর আলু ভাজা যাবে না!" সন্ধ্যাবেলা তারা ঘোলাটে কাঁচের গ্লোবযুক্ত তেলের লম্ফ জ্বালে।

দুই বৃদ্ধাই কাতিয়াকে খুব খাতির করে। কালের ঝঞ্ঝা স্পর্শ করতে পারেনি এ বাড়ির প্রাচীন পরিবেশ। কাতিয়া এখানে শান্তিতেই আছে। প্রত্যূষে ঘুম থেকে উঠেই সে নিজের ঘর গুছোয়, তারপর জানালার ধারে ব'সে জামাকাপড় ও মোজা রিপু করে অথবা আগেকার ফ্যাশানী সান্ধ্য পোশাক-গুলি নতুন ভাবে সাদাসিধে ধরনের ক'রে নেয়। প্রাতরাশের পর সে সাধারণত দ্বীপে চলে যায় বেড়াতে, সঙ্গে নিয়ে যায় বই অথবা সেলাইর জিনিসপত্র। একটা ছোট হ্রদের ধারে একটা বেঞ্চের ওপর বসে থাকতেই তার ভাল লাগে বেশি। সেখানে বসে বালির স্তূপের ওপর বাচ্চাদের খেলা দেখে সে, নয়তো বই পড়ে, কি সীবনের কাজ করে, অথবা চুপ ক'রে বসে ভাবে। বিকেল ছ'টায় বাড়ি ফিরে দাশার ওখানে খেতে যায় সে। রাত এগারোটায় দাশা ও তেলেগিন তাকে বাড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিতে আসে; হাতে হাত রেখে দু'বোন যায় আগে আগে আর তেলেগিন টুপিটা মাথার পেছন দিকে ঠেলে দিয়ে শিস দিতে দিতে চলে তাদের পিছু পিছু। সাবধানতা অবলম্বনের জন্যই সে পেছনে থাকে; কারণ আজকাল রাত্রিবেলা রাস্তায় চলাফেরা করা নিরাপদ নয়।

কাতিয়া প্রত্যহই ভাদিম পেত্রোভিচ রশচিনকে চিঠি লিখে। সেই থেকে একটা বিশেষ কাজে রণাঙ্গনে গিয়ে আছে সে। প্রতিদিন সে কি করে না করে, কি ভাবে, সমস্তই বিস্তারিতভাবে চিঠিতে লিখে কাতিয়া জানায় তাকে। রশচিন তাকে অনুরোধ করেছিল এভাবে সমস্তই লিখে জানাবার জন্য এবং প্রত্যেকটি চিঠিতেও এই অনুরোধই আসে।

"আপনি এলাগিন পুলের ওপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন, বৃষ্টি পড়তে লাগল, ছাতা ছিল না আপনার সঙ্গে, কাজেই বৃষ্টি না থামা পর্যন্ত গাছের তলায় আপনাকে অপেক্ষা করতে হ'ল—কথাগুলি প'ড়ে ভারী আনন্দ পেলাম। আপনি যাই লেখেন তাই ভাল লাগে আমার একাতেরিনা দ্‌মিত্রেভ্‌না। আপনার জীবনের অতি তুচ্ছ ঘটনাগুলিও আমার কাছে অত্যন্ত প্রিয়, এত প্রিয় যে আমার মনে হয় সেগুলি ছাড়া আমি বুঝি আর বাঁচব না।"

কাতিয়া বোঝে এতে একটু বাড়াবাড়ি আছে এবং তার জীবনের তুচ্ছতম

ঘটনাগুলি ছাড়া সে বাঁচবেও; কিন্তু আবার একটি দিনের তরেও নিঃসঙ্গতার কথা ভাবতেই এমন আতঙ্ক উপস্থিত হয় যে, সেই চিন্তাটাকে সে মনের মধ্যে আমলই দিতে চায় না; সুতরাং সহজভাবেই সে নিজেকে প্রবোধ দেয় যে, তার গোটা জীবনটাই ভাদিমির পেত্রোভিচের কাছে প্রিয় ও প্রয়োজনীয়। সেজন্যই এখন যা-ই সে করে তারই একটা বিশেষ তাৎপর্য থাকে। একদিন সে তার আংগুস্তানটা হারিয়ে ফেলে, এক ঘণ্টা খোঁজাখুঁজির পর দেখতে পায় যে সেটা তার আঙুলেই পরান আছে; তখন মনে মনে ভাবে সে যে, তার এই অন্যমনস্কতার কথা জানতে পেরে ভাদিম পেত্রোভিচ নিশ্চয়ই হাসবে। নিজের সম্বন্ধে ভাবতে গিয়ে কাতিয়া এখন আর শুধু তার একলার কথা ভাবে না। একদিন বাতায়নের ধারে বসে কাজ করতে করতে সে যখন গভীর চিন্তায় নিমগ্ন তখন লক্ষ্য করে তার হাতের আঙুলগুলি কাঁপছে। কোলের সেলাইর জিনিসটায় ছুঁচটা ফুঁড়ে রেখে মাথা তুলে সে সামনের দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে থাকে। অবশেষে পোষাক রাখার আলমারীর সামনের দিককার আয়নাটার ওপর তার নজর পড়ে, তাতে সে দেখতে পায় একখানি পাতলা ছোট মুখ বিষাদভরা দুটো ডাগর চোখ আর পেছন দিকে আচড়ান চুলের একটি সাধারণ গিঁঠ। কাতিয়া ভাবেঃ "এ কি সত্যি আমারই মুখ?" চোখ নামিয়ে নিয়ে আবার সেলাইয়ে মন দেবার চেষ্টা করে সে, কিন্তু তার হৃদয় এমনই চঞ্চল হয়ে ওঠে যে, আঙুলে ছুঁচের খোঁচা লেগে যায়। আঙুলটা মুখে পুরে ফের সে আয়নার দিকে চায়—এবার দেখে তার নিজেরই মুখখানি প্রতিফলিত হয়েছে আয়নাটায়, তবে তেমন সুন্দর আর দেখাচ্ছে না। সেদিনই সন্ধ্যাবেলা সে ভাদিম পেত্রোভিচকে লিখেঃ

"আজ সারাদিন খালি আপনার কথাই ভেবেছি আমি। আপনার অভাব বোধ করছিলাম, প্রিয় বন্ধু, তাই সারাদিন জানালার ধারে বসে আপনার প্রতীক্ষায় ছিলাম। বহুদিনের একটা বিস্মৃত জিনিস আবার আমার মধ্যে জেগে উঠছে—তারুণ্যের স্বপ্ন।.."

যদিও তেলেগিনের প্রেমে বিভোর হয়ে দাশা আজকাল একটু অনমনস্ক থাকে এবং ভাবে যে তার ও তেলেগিনের মধ্যে এখন যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সম্পর্ক, সৃষ্টির আদি থেকে অদ্যাবধি কারো মধ্যে এমনটি আর হয়নি, তথাপি কাতিয়ার ভাবান্তর তার দৃষ্টি এড়ায়নি। একদিন সন্ধ্যাবেলা চায়ের সময় দাশা অনেকক্ষণ ধরে জোর তর্ক করে যে, কাতিয়ার এখন উঁচু কলারওয়ালা সাদাসিধে কালো পোশাক পরাই উচিত।

"একথা জোর করেই বলতে পারি, দিদি," বলে দাশা, "আমি তোকে যতখানি দেখতে পাই, তুই তোর নিজেকে ততখানি দেখতে পাসনে। তোকে দেখায়, হ্যাঁ, তোকে দেখায় উনিশ বছরের একটি মেয়ের মত। ইভান, ঠিক কি না যে দিদিকে আমার চেয়ে ছোট দেখায়?"

"হ্যাঁ—ঠিক তা না হলেও প্রায় তাই।..."

"হুঃ! কিচ্ছু বোঝ না তুমি," বলে দাশা। "বয়েস দিয়ে নারীর তারুণ্য বিচার করা চলে না, তা বিচার করতে হয় অন্য জিনিস দিয়ে। বয়েসের সঙ্গে তার কোন সম্পর্কই নেই।"

নিকলাই ইভানোভিচের মৃত্যুর পর যে সামান্য পুঁজি কাতিয়ার ছিল তা এরই মধ্যে নিঃশেষ হয়ে গেছে। পান্তেলেইমোনভ স্ট্রীটে তার যে ফ্ল্যাটটা রয়েছে সেটা বেচে দেবার জন্য ভেলেগিন তাকে পরামর্শ দেয়। মার্চ মাস থেকে ফ্ল্যাটটা খালিই প'ড়ে আছে। এই প্রস্তাবে সম্মত হয়ে কাতিয়া দাশাকে নিয়ে গাড়ী ক'রে যায় সে-বাড়িতে এমন কতগুলি জিনিস আনতে যেগুলির সঙ্গে তাদের জীবনের অনেক মধুর স্মৃতি আছে জড়িয়ে।

তিন তলায় উঠেই তাদের নজরে পড়ে সেই সুপরিচিত ওক কাঠের দরজায় পেতলের প্লেটে খোদাই করা নাম "এন আই স্মোকভনিকভ"। কাতিয়ার মনে হয় জীবনটা তার এখন একটা পূর্ণ বৃত্ত হয়ে এসেছে। সেই পুরনো, পরিচিত দ্বাররক্ষক, যে আগে প্রায়ই মাঝরাতে রাগে ও ঘুমের ঘোরে গলা সাঁ সাঁ করে আর গলাটা ঢাকবার জন্য কোটের কলারটা উল্টে দিয়ে কাতিয়াকে সদর-দরজা খুলে দিত এবং কাতিয়া তিনতলায় ওঠবার আগেই সুইচ টিপে আলো নিভিয়ে ফেলত, এখন তাদের দেখে টুপিটা মাথা থেকে নামিয়ে নেয় এবং নিজের চাবি দিয়ে ফ্ল্যাটের দরজা খুলে দেয়। তাদের আগে ঢুকতে দিয়ে পাছে সে ঢোকে এবং শান্তভাবে বলেঃ

"আপনি ভাববেন না, মা, একটা জিনিসও খোয়া যায়নি। যারা ভাড়াটে ছিল তাদের ওপর আমি দিনরাত নজর রাখতাম। যুদ্ধে তাদের ছেলেটা মারা গেল, না হ'লে তারা এখনো এখানেই থাকত; এই ফ্ল্যাটটা তাদের খুব পছন্দ হয়েছিল।"

হলটা অন্ধকার, খালি প'ড়ে থাকায় একটা গন্ধ হয়েছে। সবগুলি ঘরেই পর্দা ফেলা। খাবারঘরে গিয়ে কাতিয়া সুইচ টিপে আলো জ্বালে। ধূসর কাপড়ের ঢাকা টেবিলের ওপরে কাটা কাচে তৈরী ঝাড়টা ঝলমল ক'রে ওঠে। টেবিলের মাঝখানে সেই আগেরই মত এখনো দাঁড়িয়ে আছে চিনেমাটির একটা ফুলদানি, তাতে রয়েছে বহুদিনের শুকনো মাইমোজ্যা ফুলের একটা তোড়া। অতীতের হর্ষোৎফুল্ল দিনগুলির নিরপেক্ষ সাক্ষীরূপে দেয়ালের ধারে সারি-বদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে আছে চামড়ার গদি আঁটা উঁচু হেলানের চেয়ারগুলি। অর্গ্যানের মত বড় বাঁকা সাইডবোর্ডটার একটা দরজা খোলা আছে, তা দিয়ে দেখা যাচ্ছে উপুড় করা কতগুলি মদের গ্লাস। ডিম্বাকৃতি ভেনেসিয়ান আয়নাটায় পুরু হয়ে ধুলো জমে আছে, আয়নাটার মাথায় একটা সোনালি মোড়ান কাগজের দিকে হাত বাড়িয়ে এখনো সেই ছোট সোনালি ছেলেটা ঘুমোচ্ছে।

কাতিয়া দরজার ফাঁকে স্থির হয়ে দাঁড়ায়।

"দাশা," কোমলকণ্ঠে বলে সে, "তোর সব মনে পড়ে, দাশা? ভাব দেখি, তাদের কেউ নেই এখন!"

তারপর ড্রইং-রুমে প্রবেশ ক'রে প্রকাণ্ড ঝাড়টা জ্বালে কাতিয়া: ঘরের চারদিক একবার দেখে নিয়ে কাঁধদু'টো নাচায় সে। একসময় যে কিউবিক ও ফিউচারিস্ট ছবিগুলি অত উগ্র, অত ভয়াল দেখাত, এখন সেগুলি মলিন ও শোচনীয় অবস্থায় দেয়ালে ঝুলছে; সেগুলির দশা দেখে মনে হয় যেন কার্নি-ভাল্ শেষে পরিত্যক্ত সাজসজ্জা।

"দিদি, তোর এটার কথা মনে পড়ে?" হলদে কোণে ফুল নিয়ে যে "এযুগের উর্বশী" বসে আছে সেই ছবিটার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ ক'রে বলে দাশা। "তখন আমার মনে হ'ত আমাদের যত অশান্তির মূলে রয়েছে এ।"

দাশা হাসে আর পিয়ানোর চাবিগুলির ওপর দিয়ে তার আঙ্গুলগুলি দ্রুত চালিয়ে যায়। কাতিয়া এবার তার আগেকার শয়নঘরে ঢোকে। তিন বছর আগে যেমন ছিল এখনো এখানকার প্রত্যেকটি জিনিস ঠিক তেমনি আছে। ভ্রমণের পোষাক প'রে বেরোবার আগে কাতিয়া একবার এ ঘরে আসত ড্রেসিং-টেবিলের ওপর থেকে তার দস্তানাজোড়া নিয়ে যেতে।

কিন্তু এখন এখানকার সব কিছুর ওপরেই যেন নিষ্প্রভতার একটা পাতলা পর্দা পড়ে গেছে আর প্রতিটি জিনিসই যেন আগের চেয়ে ছোট দেখাচ্ছে। কাতিয়া পোশাক রাখার ছোট কাঠের সিন্দুকটা খোলে; লেস ও সিল্কের টুকরো, কাপড়ের খণ্ড এবং মোজায় সেটা ভরতি—কি না আছে তাতে! এক-সময় এগুলি তার কাছে কত বেশি প্রয়োজনীয় বলে মনে হ'ত, এখনো এগুলিতে লেগে আছে সেই সুগন্ধির লেশ। উদ্দেশ্যহীনভাবে কাতিয়া সেগুলিতে আঙুল বুলোয—প্রত্যেকটি জিনিসই জানিয়ে দেয় সেই জীবনের কোন না কোন স্মৃতি যে-জীবন আর কখনো ফিরে আসবে না।

হঠাৎ স্তব্ধতা ভেঙ্গে গিয়ে ঘরটা ভরে ওঠে গানের সুরে। তিন বছর আগে পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হবার সময় দাশা যে গৎটা শিখেছিল সেটাই এখন সে বাজাতে আরম্ভ করেছে। কাতিয়া দড়াম্ ক'রে পোষাকের সিন্দুকটা বন্ধ করে এবং ড্রইং-রুমে এসে বোনের পাশে বসে।

"দিদি, কেমন চমৎকার, না?" অর্ধেক ঘুরে বলে দাশা। "শোন্, এই জায়গাটা শোন্..." বলেই সে আরো খানিকটা বাজায় এবং মেঝে থেকে স্বর-লিপির আর একটা খণ্ড কুড়িয়ে নেয়।

"চল, দাশা," বলে কাতিয়া, "আমার বড্ড মাথা ধরেছে।"

"কিন্তু তোর জিনিসগুলির কি হবে?"

"এখান থেকে কিছুই আমি নিতে চাইনে। পিয়ানোটা তোর ফ্ল্যাটে পৌঁছিয়ে দেবার ব্যবস্থা আমি করব। আর সমস্ত চুলোয় যাক।"

সেদিন সন্ধ্যায় নীল অবগুণ্ঠনযুক্ত একটা নতুন টুপি পরে দ্রুত হেঁটে

বেশ হৃষ্ট চিত্তে কাতিয়া দাশার এখানে খেতে আসে। তার মধ্যে সেই অবসাদের ভাব আর নেই।

"সারাটা পথ আমি ছুটতে ছুটতে এসেছি," উষ্ণ অধরোষ্ঠ দিয়ে দাশার চিবুকটা স্পর্শ ক'রে বলে কাতিয়া, "কিন্তু জুতো দু'টো আমার ভিজে গেছে। দে দেখি যা হয় কিছু, এ দু'টো আমি ছাড়ি।"

হাতের দস্তানা দু'টো খুলে সে জানালার ধারে যায়। এর আগে বার কয়েক বৃষ্টি হয়ে আবার ধরেছে, কিন্তু এবার তা নেমেছে চারদিক ঝাপসা ক'রে মুষলধারে, সঙ্গে আছে বাতাসের ঝাপ্‌টা, ছাদ থেকে নালা দিয়ে বৃষ্টির জল কল্‌কল ক'রে পড়ছে। নীচে রাস্তায় ছাতাগুলিকে দ্রুত ছুটোছুটি করতে দেখা যাচ্ছে। জানালার বাইরে কালো আকাশের বুক চিরে একটা চোখ-ঝলসান বিদ্যুৎ খেলে যায়, কড়কড় ক'রে বাজ পড়ার এমন শব্দ হয় যে দাশা চমকে ওঠে।

"জানিস, আজ সন্ধ্যায় এখানে কে আসছে?" ঠোঁট বাঁকিয়ে একটু হেসে জিজ্ঞেস করে কাতিয়া।

দাশা সবে প্রশ্ন করেছে, "কে?"– ঠিক এমন সময় দরজায় ঘণ্টা বেজে ওঠে আর সে ছুটে যায় দরজা খুলে দিতে। হাসি ও পাপোশে জুতো ঘষবার শব্দ কানে আসে কাতিয়ার। তারপর তেলেগিন ও দাশা জোরে গল্প করতে করতে শোবার ঘরে চলে যায়, তাদের মুখে হাসি আর ধরে না। কাতিয়া তার দস্তানা দু'টো নামিয়ে রাখে, টুপিটা খুলে ফেলে এবং চুল পরিপাটি করে নেয়; তার অধরোষ্ঠে সেই মৃদু হাসিটি এখনো লেগেই আছে।

খেতে বসে তেলেগিন সেদিনকার ঘটনা বলতে থাকে। তাকে খুব প্রফুল্ল দেখাচ্ছে; চুল তার এখনো ভেজা এবং গালে গোলাপী আভা। অন্য সমস্ত কারখানার মতই বল্টিক ওয়ার্কস্‌-এর শ্রমিকরাও অত্যন্ত উত্তেজনার মধ্যে আছে। তাদের দাবীসমূহ সোবিয়েতগুলি সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করছে। বেসরকারী কাজকারবার একে একে সব বন্ধ হয়ে আসছে আর সরকারী কারবার লোকসান খাচ্ছে; কিন্তু এই যুদ্ধ ও বিপ্লবের সময় কেউ মুনাফা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে না। বল্টিক কারখানায় সেদিন আর একটা সভা হয়ে গেছে। কয়েক-জন বলশেভিক বক্তৃতা করে এবং তারা সকলেই বলে: "যুদ্ধ থামাও! বুর্জোয়া সরকারের সঙ্গে আপস নেই! মালিকদের সঙ্গেও কোন আলোচনা করা হবে না! সোবিয়েতগুলির হাতে সমস্ত ক্ষমতা চাই –যা করবার তারাই করবে!"

"আমি বলবার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু মুখই খুলতে পারিনি! বক্তৃতা-মঞ্চ থেকে তারা আমাকে টেনে নামিয়ে দেয়। ভাসিলি রুবলেভ উঠে দাঁড়িয়ে বলে: 'আমি জানি আপনি আমাদের শত্রু নন, তবে কেন মেলাই বাজে বকছেন —কতগুলি আজগুবী ধারণার বশবর্তী হয়ে আছেন আপনি!' 'ভাসিয়া!' আমি বললাম তাকে, 'ছ'মাসের মধ্যে কারখানা বন্ধ হয়ে যাবে, তখন খাওয়া

জুটবে না' সে তখন আমাকে জবাব দিল: 'আগামী বছরের মধ্যে সমস্ত কারখানা শ্রমিকদের হাতে এসে যাবে, কমরেড—রিপাব্লিকে একটি বুর্জোয়াও অবশিষ্ট থাকবে না—ঘোড়ার ঘাস কাটবার জন্যও না! অর্থই আর তখন সর্বস্ব হবে না। কাজ কর আর খাও-পর—তখন সবই তোমার। এই হচ্ছে সমাজবিপ্লব—আপনার মাথায় একবার এটা ঢোকাবার চেষ্টা করুন দেখি।' নিশ্চয় ক'রে সে বলল, নতুন বছর আসার আগেই সমস্ত হয়ে যাবে।"

তেলেগিন মাথা নেড়ে শান্তভাবে হাসে আর টেবিলক্লথের ওপরে রুটির গুঁড়োগুলি কুড়িয়ে জড় করতে থাকে। দাশা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে।

"মনে হয় একটা বড় পরীক্ষা রয়েছে সামনে," বলে দাশা।

"হ্যাঁ," বলে তেলেগিন, "যুদ্ধ শেষ হয়নি, আসল কথাই হ'ল তাই! সত্যি কথা বলতে কি, ফেব্রুয়ারীর পর এযাবৎ কি পরিবর্তন হয়েছে? জার-শাসনের অবসান হয়েছে, কিন্তু বিশৃংখলা তো আরো বেড়েই গেছে। আর একদল উকিল ও অধ্যাপক—অবশ্যি তাঁরা খুবই শিক্ষিত লোক সন্দেহ নেই!—গোটা জাতকে আশ্বাস দিচ্ছেন: ধৈর্য ধর, যুদ্ধ ক'রে যাও, সুদিন এলে আমরা তোমাদের একটা বৃটিশ সংবিধান, কি তারও চেয়ে ভাল কিছু দেব। তাঁরা অর্থাৎ এসমস্ত অধ্যাপক রুশ জাতকে চেনেন না। রুশ ইতিহাস থেকে তাঁরা কোনই শিক্ষালাভ করেননি। রুশ জাতি একটা নিরাকার বস্তু নয়। তারা আবেগপ্রবণ, গুণসম্পন্ন, বলিষ্ঠ জাতি। বল্কলপাদুকা পদে রুশ কৃষক কিভাবে প্রশান্ত মহাসাগরের তীরের দিকে তার পথ ক'রে নিয়েছে, দ্যাখ। সংগ্রাম ও দুঃখভোগ ক'রে একজন জার্মান একশ' বছর একই জায়গায় থাকতে পারে। কিন্তু রুশ কৃষকের অত ধৈর্য নেই। বিশ্বজয়ের স্বপ্নে সে অনুপ্রাণিত হয়ে উঠতে পারে। তাঁতের ছিটের পাৎলুন পরে, গাছের ছালের পাদুকা পায়ে দিয়ে কোমরে একটা কুঠার নিয়েই এই বিশ্বজয়ের অভিযানে সে বেরিয়ে পড়তে পারে। অধ্যাপকগণ ভাবছেন এই বিক্ষুব্ধ জনসমুদ্রকে তাঁরা একটা ভদ্র সংবিধানের মধ্যে আবদ্ধ ক'রে রাখতে পারবেন। হ্যাঁ, অত্যন্ত গুরুতর ঘটনাবলী প্রত্যক্ষ করাই বোধ হয় আমাদের অদৃষ্টে আছে!"

টেবিলের ধারে দাঁড়িয়ে দাশা কাফি ঢালতে থাকে। হঠাৎ কাফির পাত্রটা রেখে দিয়ে সে তেলেগিনের গা ঘেঁষে দাঁড়ায় ও তার বুকে মুখ লুকোয়।

"এস, দাশা, ঘাবড়াবে না," তার চুলে আস্তে আস্তে টোকা মেরে বলে তেলেগিন। "এ যাবৎ তেমন ভয়ংকর কিছু ঘটেনি। এখনকার তুলনায় আগে আমরা আরো অনেক খারাপ অবস্থায় ছিলাম। আমার মনে পড়ে—শুনছ তুমি?—আমরা যাচ্ছিলাম এমন একটা জায়গায় যেটাকে বলা হ'ত 'নরকের দ্বার'।..."

যুদ্ধের সময়কার দুর্দৈবগুলি একে একে সে স্মরণ করতে থাকে। কাতিয়া বড় দেয়ালঘড়িটার দিকে একবার তাকিয়ে খাবার ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। স্বামীর দৃঢ়তাব্যঞ্জক, সৌম্য মুখখানি ও হর্ষোচ্ছল ধূসর চোখ দুটো দাশাকে

শান্ত করেঃ এরকম পুরুষের পাশে থাকলে ভয়ের কোন কারণ নেই! সেই 'নরকের দ্বারে' যাবার কাহিনীটা শেষ পর্যন্ত সে উৎকর্ণ হয়ে শোনে এবং তারপর মুখে পাউডার মাখবার জন্য শোবার ঘরে যায়। ড্রেসিং-টেবিলের সামনে বসে কাতিয়া প্রসাধন করছে।

"দাশা," নম্রস্বরে বলে সে, "তোর কাছে আর সেই সেন্ট আছে? সেই যে —প্যারিস শিশি!"

মেঝেতে দিদির পায়ের কাছে দাশা বসে পড়ে ও তার দিকে অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে তাকায়।

"তুই সাজগোজ করছিস, দিদি?" ফিসফিস করে বলে সে।

কাতিয়ার মুখ লাল হয়ে ওঠে। মাথা নেড়ে সে দাশার প্রশ্নের জবাব দেয়।

"তোর আজ হয়েছে কি, দিদি, বল তো?"

"আমি তোকে বলতে চেয়েছিলাম, কিন্তু তুই তো কানই দিলিনে—ভাদিম পেত্রোভিচ আসছে আজ রাত্রে—স্টেশন থেকে সে সোজা এখানে চলে আসবে। আমার কাছে সে আসতে পারে না এত দেরি হয়ে গেল।.."

রাত সাড়ে ন'টায় দরজায় ক্রিং ক্রিং ক'রে ঘণ্টা বেজে ওঠে। কাতিয়া, দাশা ও তেলেগিন হলঘরে ছুটে যায়। তেলেগিন দরজাটা খুলে দেয়, ভেতরে ঢোকে রশচিন, ধোপার পাট ভাঙ্গা লম্বা কোটটা ঝুলছে তার কাঁধ থেকে, মাথার টুপিটা এসে নেমেছে প্রায় চোখ পর্যন্ত। কাতিয়াকে দেখামাত্রই তার ঝলসান কালো শুকনো মুখটা হাসিতে ঈষৎ কোমলতা লাভ করে। কাতিয়া আনন্দে বিহ্বল হয়ে তার দিকে চেয়ে থাকে। কোট ও টুপিটা খুলে একটা চেয়ারের ওপর রেখে দেয় রশচিন। তারপর সকলের সঙ্গে করমর্দন ক'রে বলিষ্ঠ, অথচ একটু রুক্ষ কণ্ঠে বলে সেঃ "এত রাত্রে এসে বিরক্ত করলাম, মাফ করবেন। তবে ভাবলাম, একাতেরিনা দ্মিত্রেভ্না ও দারিয়া দ্মিত্রেভ্না, আপনাদের সঙ্গে আজ রাত্রেই এসে আমার দেখা করা দরকার।" আলোতে কাতিয়ার চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে।

"আপনি আসায় আমি খুশি হয়েছি, ভাদিম পেত্রোভিচ," বলে কাতিয়া। রশচিন কাতিয়ার হাতের ওপর ঝুঁকতেই কাতিয়া তার কম্পিত ওষ্ঠাধর দিয়ে রশচিনের ললাটে চুম্বন করে।

"জিনিসপত্র নিয়েই আপনার এখানে এসে ওঠা উচিত ছিল," বলে তেলেগিন, "আপনাকে আমরা যেতে দিচ্ছিনে, এটা আপনি নিশ্চয় জানবেন!"

"আমাদের খাবার ঘরে গদিআঁটা টুলটায়ই উনি শুতে পারবেন," বলে দাশা। "খাটো হয়, চেয়ারটা সঙ্গে জুড়ে দিলেই হবে।"

এই সমস্ত মার্জিত রুচিসম্পন্ন সহৃদয় ব্যক্তির কথা শুনে রশচিনের মনে

হয় এ কি স্বপ্ন। ট্রেনে অনিদ্রায় রাত্রির পর রাত্রি কাটানো, দিনের বেলা গাড়ীর জানালা দিয়ে ঠেলাঠেলি ক'রে অতি কষ্টে খাদ্য সংগ্রহ করা, দাঁড়াবার ছয় ইঞ্চি জায়গার জন্য অসভ্যের মত অনবরত ধাক্কাধাক্কি ও মারামারি—এসমস্ত কারণে তার মেজাজটা তিরিক্ষি হয়ে গিয়েছিল। সেই বিশ্রী অবস্থাটার কথা সে ভুলতে পারছিল না ঃ এখানে এই তিনজন প্রিয়দর্শন, পরিচ্ছন্ন, সুরভিত লোক তকতকে ঝকঝকে মেঝেতে তাকে অভ্যর্থনা করছে—এবং এ হচ্ছে সে, রশচিন, যাকে দেখে তারা খুশি হয়েছে।...স্বপ্নাতুরের মত সে কাতিয়ার সুন্দর চোখ দুটির দিকে তাকায়, তার সেই চোখের ভাষায় যেন প্রকাশ পাচ্ছে ঃ সুখী, সুখী, সুখী। ..

বেল্ট্টা টেনে ও কাঁধ দুটো সোজা করে রশচিন একটা গভীর নিঃশ্বাস ত্যাগ করে।

"ধন্যবাদ আপনাদের," বলে সে। "বলুন কোথায় যেতে হবে।"

গা ধোবার জন্য তারা প্রথমে তাকে স্নানঘর দেখিয়ে দেয়। তারপর কিছু খাবার জন্য তারা তাকে ভোজনকক্ষে নিয়ে আসে। থালায় কি পড়েছে না পড়েছে, না দেখেই সে খাবারগুলি খেয়ে ফেলে, ক্ষুধার নিবৃত্তি হ'লে থালাটা সে এক ধারে সরিয়ে রাখে এবং একটা সিগারেট ধরায়।

দরজার ফাঁকে তার কঠিন, কৃশ পরিষ্কার করে কামানো যে মুখখানি দেখে কাতিয়া একটু ভীত হয়ে পড়েছিল, এখন তা অপেক্ষাকৃত কোমল হয়ে এসেছে কিন্তু মনে হচ্ছে সে যেন আরো বেশি ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। টেবিলল্যাম্পের কমলা রংএর আচ্ছাদনটার আলো এসে পড়েছে তার দীর্ঘ দু'বাহুর ওপর, দেশলাইর কাঠি ধরাবার সময় ক্লান্তি হেতু তার হাত দুটো যে কাঁপে, কাতিয়া তা লক্ষ্য করে। ল্যাম্পের আচ্ছাদনের আড়ালে পড়েছে কাতিয়ার মুখ। সে রশচিনের দিকে তাকায় ; তার হাতের পেছন দিক্কার লোম, গাঢ় পিঙ্গলবর্ণের পাট ভাঙ্গা রোমান কোটটার ওপরকার বোতামগুলি ভালই লাগছে কাতিয়ার। লক্ষ্য করে সে যে, চোয়াল দুটো চেপে চিবিয়ে চিবিয়ে কথা বলতে রশচিন বেশ অভ্যস্ত। মুখ থেকে কথাগুলি বেরুবার সময় যেন হোঁচট খেতে খেতে বেরোয়। ইচ্ছে করেই সে এরকম করছে। দেখেই বোঝা যায় তার ভেতরের অনেকদিনকার কোন একটা আক্রোশপূর্ণ উত্তেজনা সে চেপে রাখতে চাচ্ছে। দিদির ও স্বামীর সঙ্গে একবার দৃষ্টি বিনিময় ক'রে নিয়ে দাশা রশচিনকে জিজ্ঞেস করে, নিশ্চয়ই সে শ্রান্ত হয়ে পড়েছে, এখন শুতে যাবে কি না।

হঠাৎ রশচিনের মুখ লাল হয়ে ওঠে, চেয়ারে বেশ টান হয়ে বসে সে।

"আমি এখানে শুতে আসিনি...না...না..."

গাড়ীবারান্দার ওপর গিয়ে সে অন্ধকারে ঝিরঝিরে বৃষ্টির মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকে। দাশা গাড়ীবারান্দার দিকে চেয়ে মাথা নাড়ে। বাইরে থেকে রশচিন ভেতরের উদ্দেশে বলে ঃ

"ক্ষমা করবেন, দারিয়া দুমিত্রেভনা! আজ চতুর্থ বিনিদ্র রজনী।..."

আবার ঘরে ঢুকে সে মাথার চুল হাত দিয়ে পাট করে নেয় এবং আগের জায়গায় এসে বসে।

"সামরিক প্রধান কার্যালয় থেকে সোজা আমি এখানে চলে এসেছি," বলে সে। "আমি যে খবর নিয়ে এসেছি, সমর-মন্ত্রীর পক্ষে তা অত্যন্ত দুঃসংবাদ।... আপনাদেব সবাইকে দেখে আমার দুঃখ হয়েছিল। সবই বলব আপনাদের: একাতেরিনা দমিত্রেভ্না, আপনাদের মত প্রিয়জন দুনিয়ায় আমার আর কেউ নেই।. "

কাতিয়ার মুখ বিবর্ণ হয়ে যায়। পেছনে হাত রেখে তেলেগিন দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দাশা চোখ বড় বড় ক'রে রশচিনের দিকে তাকায়।

"দৈববলে অসম্ভব কিছু ঘটে তো ভাল," বলে রশচিন, "না হ'লে আমরা গেছি। সৈনাদলের আর অস্তিত্ব নেই। রণাঙ্গন ভেঙ্গে পড়ছে.. রেলগাড়ীর ছাদে উঠে সৈন্যরা যুদ্ধ ছেড়ে চলে আসছে .রণাঙ্গনে এই ভাঙ্গন রোধ করা মানুষেব সাধ্যাতীত। এ যেন জোয়ারের স্রোত। কিসের জন্য সে যুদ্ধ করছে এসম্বন্ধে রুশ সৈন্যের আর কোন ধারণাই নেই। যুদ্ধে আস্থা হারিয়ে ফেলেছে সে, কেবল এই নয়, রাষ্ট্র, রুশিয়া অর্থাৎ যুদ্ধের সহিত সংশ্লিষ্ট সমস্ত কিছুরই প্রতি অবিশ্বাস জন্মেছে তার। সৈনাদেব মনে দৃঢ়প্রত্যয় হয়েছে যে, কেউ একজন যদি কোনদিন শুধু চীৎকার করে বলেঃ 'শান্তি!' তবে সেদিনই যুদ্ধ বন্ধ হয়ে যাবে আমরা, ভদ্রসম্প্রদায়ই কেবল চাচ্ছিনা যুদ্ধের অবসান হয়। যে জায়গায় ব'সে কোন সৈন্য তিন বছর ধ'রে প্রতারিত হয়ে আসছে সেখানে এখন সে নিষ্ঠীবন ত্যাগ ক'রে বন্দুকটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে তাকে দিয়ে আর যুদ্ধ করানো যাবে না। শরৎকালের মধ্যে এই এক কোটি লোক যখন রণাঙ্গন ছেড়ে জলোচ্ছ্বাসের মত ফিরে আসবে, তখন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে রুশিয়ার অস্তিত্ব লোপ পাবে।"

চোয়াল দুটো সে এত জোরে চাপে যে, তার গন্ডদেশে পেশী সংকুচিত হয়। একটি কথাও কেউ বলে না। আবার সে ঠিক তেমনি রুদ্ধকণ্ঠে বলে চলেঃ

"সমর মন্ত্রীর কাছে আমি একটা পরিকল্পনা নিয়ে যাচ্ছি। রণাঙ্গন রক্ষার এক পরিকল্পনা কয়েকজন জেনারেল মিলে করেছেন।.. একেবারে অভিনব. . আর যাই হোক, মিত্রশক্তিবর্গ অন্তত দোষ দিতে পারবেনা যে, আমাদের জেনারেলরা যুদ্ধ চালিয়ে যেতে অনিচ্ছুক ছিলেন। পরিকল্পনাটা হচ্ছে এই: যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সমস্ত সৈনাদল ভেঙ্গে দেওয়া অর্থাৎ সৈনাদের বর্তমান দলত্যাগকে আরো সংগঠিত করা। তাতে রেলপথে চলাচল করতে সুবিধে হবে আর কামান বন্দুক, গোলাগুলি ও খাদ্য বাঁচান যাবে। আমাদের মিত্রশক্তিবর্গকে নিশ্চিত আশ্বাস দিতে হবে যে, আমরা যুদ্ধ চালিয়ে যেতে চাই। সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বস্ত ইউনিটগুলি নিয়ে এক প্রতিরক্ষা বাহিনী গ'ড়ে তুলতে হবে। ভল্গার তীরবর্তী জেলাগুলিতে এসমস্ত বিশ্বস্ত ইউনিট পাওয়া যাবে। একেবারে

নতুন ক'রে সৈন্যদল গঠনের কাজে লেগে যেতে হবে, মূলে থাকবে স্বেচ্ছাসেনার ডিভিশনগুলি; পাশাপাশি গেরিলা দল সমূহ গঠনে সাহায্য করতে হবে। ...উরল কারখানা সমূহ থেকে অস্ত্র এবং সাইবেরিয়া থেকে কয়লা ও খাদ্যশস্য সরবরাহ করা হবে...এবং এভাবে আবার সর্বত্র আরম্ভ করা হবে যুদ্ধ।..."

"তার মানে জার্মানদের কাছে আমাদের রণাঙ্গন উন্মুক্ত করে দেওয়া! লুণ্ঠনের জন্য তাদের হাতে আমাদের দেশ তুলে দেওয়া!" চীৎকার ক'রে ওঠে তেলেগিন।

"আপনার কি আমার দেশ বলতে কিছু নেই আর—যা ছিল এক সময় আমাদের দেশ, সেটা এখন শুধু একটা স্থানে পরিণত হয়েছে," টেবিলের ওপর ন্যস্ত হাত দুটো রশচিন মুষ্টিবদ্ধ করে। "আমাদের রুশিয়ার অস্তিত্ব সেই মুহূর্তেই লোপ পেয়েছে যখন দেশের লোক তাদের হাতের অস্ত্র ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। এরই মধ্যে যা আরম্ভ হয়েছে, মনে হয়, আপনি তা উপলব্ধি করতে পারছেন না।...সেন্ট নিকলাস কি এখন আপনাদের বাঁচাবেন? তাঁর কাছে কিভাবে প্রার্থনা করতে হয় তাও তো লোক ভুলে গেছে।.. মহান রুশিয়া এখন গোবরে পরিণত হয়েছে, একমাত্র খেতের সার হিসেবে তা চলতে পারে। আবার নতুন ক'রে সব গড়তে হবে: সৈন্যদল, রাষ্ট্র—আমাদের মধ্যে এক নতুন আত্মাকে সঞ্চারিত করতে হবে।"

নাসারন্ধ্র দিয়ে সে একটা গভীর শ্বাস টানে এবং টেবিলের ওপর দু'হাতে মাথা রেখে ভেউভেউ করে কাঁদতে থাকে। তার বুকফাটা কান্না শুনে মনে হয় যেন একটা কুকুর ঘেউঘেউ ক'রে ডাকছে।..

রশচিন এতটা বাড়াবাড়ি ক'রে ফেলায় সকলেই একটু অস্বস্তি বোধ করে। এই অবস্থাটাকে হাল্কা করার জন্য সে আবার গাড়ীবারান্দায় গিয়ে দাঁড়ায়, বৃষ্টিতে সর্বাঙ্গ ভিজে যায় তার। পুনরায় ঘরে ঢুকে সকলের কাছে মাফ চায় সে এবং বলে যে এবার শুয়ে পড়াই শ্রেয়ঃ। পোষাক ছাড়বারও তর সয় না তার, শোয়ামাত্রই সে ঘুমিয়ে পড়ে।

সে-রাত্রে কাতিয়া আর বাড়ি গেল না। পড়বার ঘরে তেলেগিনের শোবার ব্যবস্থা করে দাশা দিদিকে নিয়ে নিজের বিছানায় গিয়ে একত্র শুয়ে পড়ে। আলো নেভাবার জন্য তেলেগিন পা টিপে টিপে রশচিনের ঘরে এসে দেখে, সে বুকে হাত রেখে চিত হয়ে ঘুমোচ্ছে; তার শুষ্ক রোগাপানা মুখ, শক্ত করে বোজানো চোখের পাতা ও ঊষার আলোতে স্পষ্টভাবে ভেসে ওঠা কুঞ্চিত ললাটের রেখাগুলি দেখে মনে হয় যেন কোন অব্যক্ত বেদনাকে জয় করবার জন্য সংগ্রাম চলেছে তার মধ্যে।

একই কম্বলের নীচে শুয়ে কাতিয়া ও দাশা অনেকক্ষণ ধ'রে ফিসফিস করে আলাপ করে। ফ্ল্যাটের কোথায় কি হচ্ছে না হচ্ছে, মাঝে মাঝে দাশা তা

কান পেতে শোনে। তেলেগিন এখনো ঘুমোয়নি, পড়বার ঘরে তার নড়াচড়ার শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। দাশা বলে:

"এখনো সে ঘরের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে, অথচ সকাল সাতটায়ই তাকে কাজে বেরুতে হবে।"

কম্বলের নীচ থেকে বেরিয়ে খালি পায়েই সে স্বামীর ঘরে চলে আসে। তেলেগিন গা থেকে শার্টটা খুলে ফেলেছে; পাৎলুন ধরে রাখবার ফিতেগুলি তার কাঁধের ওপর থেকে ঝুলছে। সোফা জোড়া দিয়ে যে বিছানাটা পাতো হয়েছে তাতে বসে একটা বিরাট বই কোলে রেখে পড়ছে সে।

"এখনো ঘুমোওনি?" বলে তেলেগিন এবং উজ্জ্বল দু'টো চোখ দিয়ে অর্থহীনভাবে তাকায় দাশার দিকে। "বসো। দ্যাখ, আমি কি পেয়েছি। শোন একটা জায়গা!" আগের দিককার দু'একটা পৃষ্ঠা উল্টিয়ে সে পড়তে থাকে:

"তিনশ' বছর আগে রুশিয়াব কানন, প্রান্তর, মহাশ্মশানে-পরিণত রুশ-ভূমির ওপর দিয়ে মুক্ত বায়ু প্রবাহিত হ'ত। দৃষ্টিপথে পড়ত শুধু নগর সমূহের অগ্নিদগ্ধ প্রাচীর সমূহ, ভস্মীভূত পল্লীগুলির ভস্মস্তূপ, জঙ্গলাকীর্ণ রাস্তায় নবকংকাল ও ক্রুশসমূহ, ঝাঁকে ঝাঁকে দাঁড়কাক, এবং নিশায় শোনা যেত নেকড়ে বাঘের ডাক। বনপথ দিয়ে এখানে সেখানে ঘুরে বেড়াত দস্যুদল সমূহের অবশিষ্ট অংশ; দশ বছর ধ'রে বয়ারদেব যে সমস্ত দামী পশুর লোম, মূল্যবান পানপাত্রসমূহ ও বিগ্রহের মুক্তাখচিত অলঙ্কাররাশি লুণ্ঠন করেছিল, বহুদিন আগেই মদ খেযে তারা সেগুলি উড়িয়ে দিয়েছিল। রাশিয়ায় লুণ্ঠন করার মত আর কিছুই ছিল না, সমস্ত উজাড় হয়ে গিয়েছিল।

"রুশিয়া রিক্ত ও জনহীন হয়ে পড়েছিল। এমন কি ক্রিমিয়ার তাতারগণও অকর্ষিত স্তেপ অঞ্চলে তাদের হানা বন্ধ করে দিয়েছিল--লুণ্ঠন করার মত কোন দ্রব্য আর অবশিষ্ট ছিল না। দশবর্ষব্যাপী বিষম গোলযোগের সময় প্রতারক, তস্কর, কসাক ও পোলিশগণ অসির আঘাতে এবং এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত আগুন লাগিয়ে দিয়ে সমগ্র রুশভূমিকে ছারখার করে দিয়েছিল। ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। ঘোড়ার লাদ ও নোনা নরমাংস খেয়ে লোক জীবন ধারণ করত। তারপর এল সারা দেশে মড়ক। যারা বেঁচে ছিল তারা নানা জায়গায় ছড়িয়ে পড়ল, কতক গেল উত্তরে শ্বেত সাগরের দিকে, কতক গেল উরলে আর কতক গেল সাইবেরিয়ায়।

"সেই দুর্দিনে কুলপতির পরামর্শে সমস্ত নিঃস্ব বয়ার, বাণিজ্যহারা বণিক এবং উত্তরাঞ্চল ও ভল্গাতীরস্থ জেলাসমূহের কঠোর কৃষকগণ মস্কোর জারপদে বরণ করল ভয়ে জড়সড় এক বালককে। তাকে নিয়ে এক অশ্বশকট রওনা হল মার্চের কর্দমাক্ত রাস্তা দিয়ে বিধ্বস্ত ও লণ্ডভণ্ড মস্কোর অগ্নিদগ্ধ কালো প্রাচীরগুলির দিকে। বহু কষ্টে সেখান থেকে পোলিশ হানাদারদের বিতাড়িত করা সম্ভব হয়েছে, নগরের সর্বত্র পড়ে আছে রাশি রাশি ভগ্ন প্রস্তরখণ্ড ও

ভস্মের বিশাল বিশাল স্তূপ। নতুন জার পারত শুধু কাঁদতে আর প্রার্থনা করতে। তাই মস্কোর সিংহদ্বারসমূহের বাইরে তাকে স্বাগত জানাবার জন্য যখন ছিন্নবাস পরিহিত, অমার্জিত রুশ জনসাধারণ তার সামনে এসে ভীড় করে দাঁড়াল, তখন অশ্বশকটের ভেতর থেকে ভয়ে ভয়ে মুখ বাড়িয়ে তাদের দেখেই সে কেঁদে ফেলল আর করজোড়ে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে লাগল। নতুন জারের প্রতি রুশ জনগণের খুব বেশি আস্থা ছিল না। কিন্তু তাদের তো বাঁচতে হবে: সুতরাং আবার তারা কোনরকমে বাঁচবার পথে পা বাড়াল। স্ত্রগানভ বণিকদের কাছ থেকে অর্থ ধার করা হ'ল। নগরবাসীরা আবার নতুন ক'রে নগর গড়তে লাগল আর চাষীরা দিল পতিত জমিতে লাঙ্গল।

"দস্যু তস্করদের কবল থেকে রাস্তাগুলি মুক্ত করার জন্য অশ্বারোহণে ও পদব্রজে বেরিয়ে পড়ল সমস্ত উপযুক্ত লোক। তারা দরিদ্র ও কঠোর জীবন যাপন করত। ক্রিমিয়ার তাতার, লিথুয়ানিয়ান ও সুইডিসদের কাছে তারা মাথা নত করল। কিন্তু অন্তরের বিশ্বাস তারা হারাল না। তারা জানত একটি মাত্র শক্তি আছে—বলিষ্ঠ, জাগ্রত, প্রাণপ্রাচুর্যপূর্ণ জনগণ। তাদের আশা ছিল, ধৈর্য ধরে থাকতে পারলেই সেই দুর্দিন কাটিয়ে তারা বেঁচে উঠবে এবং সত্যি তারা বেঁচে উঠল। আগাছায় পরিপূর্ণ মরুভূমিতে আবার গড়ে উঠতে লাগল জনপদ।"

তেলেগিন সশব্দে বইটা বন্ধ করে।

"বুঝলে, এই দুর্দিনের অবসান হবে এবং আমরাও আবার এভাবে বেঁচে উঠব। বিশাল রুশিয়া সত্যি বিধ্বস্ত। ছেঁড়া কাপড় পরে রুশিয়ার যেসমস্ত কৃষক তীক্ষ্ম শূল হাতে নিয়ে একদিন এসেছিল মস্কো রক্ষা করতে তাদেরই বংশধরগণ দ্বাদশ চার্লস ও নেপোলিয়নকে পরাজিত করেছিল। আর অশ্ব শকটে চড়িয়ে যে বালককে একদিন জোর ক'রে টেনে নিয়ে আসা হয়েছিল মস্কোতে তারই বংশধর গড়ে তুলেছিলেন এই সেন্ট পিতার্সবুর্গ নগরী। প্রাচীন রুশিয়ার সর্বনাশ হয়েছে, সন্দেহ নেই। কিন্তু জানবে একটি প্রদেশও যদি আমাদের হাতে থাকে তবে সেখানেই জন্ম নেবে আবার নতুন রুশিয়া।"

সে জোরে নিঃশ্বাস ফেলে ও জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকায়। ধূসর ঊষার অন্তে পূর্বগগনে দেখা দিয়েছে অরুণালোক। স্বামীর কাঁধের ওপর দাশা মাথা রাখে। তেলেগিন তার কেশরাশিতে চুম্বন করে ও আঙুল দিয়ে আস্তে আস্তে টোকা মারে।

"যাও ঘুমোও গে, লক্ষ্মীটি আমার।"

দাশা হাসে ও তাকে চুম্বন ক'রে বিদায় নেয়। যাবার সময় ঘরের দরজার ফাঁক থেকে সে বলে:

"দিদি তাকে এত ভালবাসে, ইভান!"

"কেন বাসবে না? চমৎকার লোকটি।"

উষ্ণ, স্তব্ধ সন্ধ্যা। বায়ুতে পেট্রল ও রাস্তার আলকাতরার মিশ্রিত গন্ধ। নেভস্কি প্রসপেক্ট ধ'রে নানা বর্ণের পোষাকপরা লোকের ভীড় ইতস্তত এদিকে সেদিকে যাওয়া আসা করছে পোড়া তামাকের ধোঁয়া ও ধুলোর পর্দা ভেদ ক'রে। পৎপৎ ক'রে পতাকা উড়িয়ে সরকারী মোটর গাড়ীগুলি যখন রাস্তা দিয়ে যায় তখন জনতা ভীষণভাবে চীৎকার করে ওঠে এবং ধিক্কার দেয়। সংবাদ-পত্রের হকাররা গলা ফাটিয়ে সব গরম গরম খবর বলে যাচ্ছে, কিন্তু ও সমস্ত খবরে এখন আর কারো বিশ্বাস নেই। ভীড়ের মধ্য দিয়ে কোনরকমে ঠেলে-ঠুলে যাচ্ছে সিগারেট দেশলাই ও চোরাই মাল বিক্রেতারা। ব্যাগগুলি সৈন্য ভরা; ফুলের বাগানের ভেতর ঘাসের ওপর শুয়ে শুয়ে তারা সূর্যমুখী ফুলের বিচি চিবোচ্ছে।

নেভস্কি প্রসপেক্ট থেকে কাতিয়া একা একা ফিরছে। নেভার বাঁধের ওপর রাত আটটায় রশচিনের সঙ্গে সে সাক্ষাতের সময় দিয়েছে। প্যালেস স্কোয়ারে এসে পড়ে সে। রক্তবর্ণ, থমথমে প্রাসাদের ত্রিতলস্থিত কালো জানালাগুলি দিয়ে হলদে আলো দেখা যাচ্ছে। প্রধান ফটকের সামনে খান কয়েক মোটর গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে; সৈন্য ও গাড়ী চালকগণ পায়চারি করছে আর হাসছে। একজন বার্তাবহ ভট্‌ভট্‌ ক'রে মোটর সাইকেল চালিয়ে দ্রুতবেগে চলে যায়, বয়েস তার বেশি নয়, মাথায় একটা ড্রাইভারের টুপি আর পিঠের দিকে শার্টটা বেলুনের মত ফুলে আছে। প্রাসাদের এক কোণে একটা ঝুল-বারান্দায় স্থির-ভাবে দাঁড়িয়ে আছেন এক বৃদ্ধ, মুখে তার সাদা লম্বা দাড়ি। প্রাসাদটা প্রদক্ষিণ ক'রে কাতিয়া ফিরে তাকায়। সেনানী মন্ডলের খিলান দপ্তরখানার শীর্ষে ব্রঞ্জনির্মিত ছোট ঘোড়াগুলি অস্তাচলের দিকে মুখ করে এখনো সেই আগেরই মত পেছনের দু'পায়ে দাঁড়িয়ে আছে। বাঁধটা অতিক্রম ক'রে সে এসে জলের ধারে একটা স্ফটিক প্রস্তরের আসনে বসে। ধীরে বয়ে চলেছে নেভা; তার ওপর ঝুলছে সেতুসমূহের বহির্ভাগস্থ নীলাভ স্বচ্ছ রেখারাজি। পিটার-পল গীর্জার স্বর্ণচূড়া ঝলমল করছে আর নদীবক্ষে কম্পিত হচ্ছে তার প্রতিবিম্ব। একটি জীর্ণ ক্ষুদ্র তরণী নাচতে নাচতে চলেছে সেই প্রতিবিম্বের ওপর দিয়ে। পিতার্সবুর্গ সাইড-এ বাড়ির ছাদ ও ধোঁয়ার স্তম্ভগুলির পশ্চাতে কমলা আভার মধ্যে ডুবে যাচ্ছে নিষ্প্রভ থালার মত সূর্যটা।

কোলের ওপর হাত রেখে চুপ ক'রে বসে কাতিয়া ক্রমবিলীয়মান সূর্যাস্ত দেখে আর ধৈর্য ধ'রে ভাদিম পেত্রোভিচের জন্য অপেক্ষা করে। এদিকে কখন যে সে এসে তার পেছনে দাঁড়িয়েছে কাতিয়া তা টেরও পায়নি। স্ফটিক প্রস্তরের ওপর কনুইতে ভর ক'রে রশচিন সামনের দিকে হেলে কাতিয়ার মুখের দিকে চায়। এবার টের পেয়ে কাতিয়া ঘুরে তাকায় এবং হাসতে হাসতে উঠে দাঁড়ায়। রশচিনের চোখ বিস্ময়বিমুগ্ধ দৃষ্টি। সিঁড়ি দিয়ে বাঁধের ওপর উঠে কাতিয়া রশচিনের বাহুতে নিজের বাহু জড়ায়। হেঁটে চলে তারা। কাতিয়া কোমল স্বরে জিজ্ঞেস করে:

"কুশল তো ?"

কোন জবাব দেয় না সে, শুধু ঠোঁট বাঁকা করে ও একটা কাঁধ তোলে। নীরবে ত্রয়ৎস্কি সেতু হেঁটে পার হয়ে তারা কামেনো-ওস্ত্রভ স্ট্রীটে এসে পড়ে। সামনে লাল টালি দেওয়া একটা প্রকাণ্ড বাড়ির পাশ দিয়ে যাবার সময় রশচিন হঠাৎ থুঁতনিটা তুলে সেটার দিকে চায়। এই শিল্পকলা ভবনের প্রশস্ত গবাক্ষসমূহ উজ্জ্বল আলোকে উদ্ভাসিত। গাড়ীবারান্দার নিকটে কয়েকটি মোটর সাইকেল অপেক্ষা করছে।

এক বিখ্যাত নর্তকীর বাড়ি ছিল এটা, বর্তমানে বলশেভিকদের প্রধান কার্যালয়ে পরিণত হয়েছে। দিনরাত্রি চব্বিশ ঘন্টা এখানে টাইপরাইটারের খটাখট্ শব্দ। প্রত্যহই এই অট্টালিকার সামনে বহু শ্রমিক, যুদ্ধফেরৎ সৈন্য ও নাবিক এসে সমবেত হয় এবং বলশেভিক দলের নেতা গাড়ীবারান্দার ওপর এসে তাদের বলেন যে, শ্রমিক ও কৃষকদের অবিলম্বে ক্ষমতা দখল করতে হবে এবং অচিরেই যুদ্ধের অবসান ঘটিয়ে নবন্যায়ের ভিত্তিতে রুশিয়া ও সারা দুনিয়াকে এক সুশৃঙ্খল অবস্থায় আনতে হবে।

"এখানে কাল ভীড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে আমি এই বক্তৃতা শুনেছি।" চিবিয়ে চিবিয়ে বলে রশচিন, "এই গাড়ীবারান্দার ওপর থেকেই আগুন ছড়ান হচ্ছে আর লোক তা গিলছে।...ওঃ, কিরকম মনোযোগ দিয়ে শোনে তারা। এই শহরে এখন কারা যে পর, তারা না আমরা, আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারছিনে।' মুখ তুলে সে গাড়ী-বারান্দার দিকে চায়। "আমাদের কথায় আর কেউ কর্ণপাত করে না। আমাদের কথা এখন অর্থহীন হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখানে যখন আসছিলাম তখন মনে হচ্ছিল আমি একজন রুশ।..কিন্তু এখানে আসার পর মনে হচ্ছে আমি যেন একজন পরদেশী।. কিছু বুঝতে পারছিনে সাগ্র কিছু বুঝতে পারছিনে আমি।..."

কাতিয়া ও রশচিন হাঁটতে থাকে। ছেঁড়া কোট গায়ে ও ঘাসের টুপি মাথায় একটি লোক তাদের পাশ দিয়ে আগুবেড়ে যায়, তার এক হাতে একটা ছোট বালতি ও আর এক হাতে পোস্টারের বাণ্ডিল।

"আমি শুধু এইটুকু বুঝি," আবেগপূর্ণ কণ্ঠে রশচিন বলে ও মুখের ভাবটা ঢাকবার জন্য ঘাড়টা অন্যদিকে ঘোরায়, "এই হুজুগের মধ্যে একমাত্র আলো ও জীবন্ত সত্য হচ্ছে তোমার হৃদয়, কাতিযা। তোমার আমার মধ্যে যেন কখনো বিচ্ছেদ না হয়।"

"তোমাকে এতক্ষণ তা আমার বলতে সাহস হয়নি," মৃদুস্বরে বলে কাতিয়া। "কিন্তু কেন আমাদের বিচ্ছেদ হবে, বন্ধু ?"

সেই লোকটি যেখানে প্রাচীরের গায়ে ছোট একটা পোস্টার মেরেছে এতক্ষণে তারা সেখানে গিয়ে উপস্থিত হয়; তাদের দুজনের মধ্যেই উত্তেজনা বিদ্যমান, কাজেই তারা থেমে দাঁড়ায় একটু। রাস্তার আলোতে দেখতে পায় তারা পোস্টারে লেখা আছে ঃ

“হুঁশিয়ার! সকলে হুঁশিয়ার! বিপ্লব বিপন্ন!”

“একাতেরিনা দ্‌মিত্রেভনা,” তার সরু হাতটা নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে বলে রশাচিন। জনবিরল প্রশস্ত রাস্তাটা দিয়ে হেঁটে এগিয়ে চলে দু'জন। রাস্তার শেষ প্রান্তে সূর্যাস্তের ক্ষীণ আভা এখনো একেবারে বিলীন হয়নি। “দিন যাবে, বর্ষ যাবে, এবং যুদ্ধও যাবে—এই বিপ্লব-বহ্নিও একদিন নিভে আসবে, কিছুই থাকবেনা, কিন্তু থাকবে একটি জিনিস—তোমার শান্ত, মধুর হৃদয়টি।”

কানে আসে বড় বড় বাড়ির বাতায়ন-পথ দিয়ে নির্গত কলহ, আনন্দ ও সংগীতের ধ্বনি। বালতি হাতে সেই ন্যুব্জদেহ লোকটি আবার কাতিয়া ও রশাচিনের পাশ দিয়ে যায়। একটা পোস্টার মারে ও মুখ ফেরায়। ছেঁড়া টুপিটার নীচ থেকে ঘৃণায় ভরা দু'টো জ্বলন্ত চোখ দিয়ে একদৃষ্টে সে চেয়ে থাকে তাদের দু'জনের দিকে।

এই উপন্যাসের

পরবর্তী দুই খণ্ড

উনিশ-শো আঠারো

ও

বিষণ্ণ প্রভাত